বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

পঞ্চদশ সংখ্যা

২০১০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

পঞ্চদশ সংখ্যা

২০১০

সম্পাদক

মণিলাল খান

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

সনৎকুমার নস্কর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

A Literary Journal, Department of Bengali Language and Literature
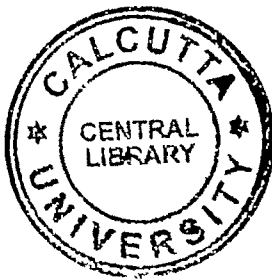
Vol. 15, September 2010

Editor

Prof. Manilal Khan

Executive Editor

Prof. Sanat Kumar Naskar

ISSN : 0975-5594

নিবন্ধক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ, সুপারিনটেন্ডেন্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ৪৮, হাজরা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯ হতে মুদ্রিত।

Regd. No. 2646B.

মূল্য— ১০০/- মাত্র।

কার্যনির্বাহী সম্পাদকের নিবেদন

সারস্বত প্রতিষ্ঠান থেকে কোনও মুখপত্র প্রকাশের রীতি বোধহয় মুদ্রণোত্তর যুগের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাংলা সাময়িক পত্রের ঊষা-লগ্ন থেকে শুরু করে এ তাবৎ কালে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলবে। একক ব্যক্তি-উদ্যোগের বাইরে প্রতিষ্ঠানগত এই প্রচেষ্টা নানা কারণেই স্বভাবে স্বতন্ত্র। এ ধরনের কোনও পত্রিকা সাধারণভাবে বিবেচিত হয় প্রকাশক প্রতিষ্ঠানটির মুখপত্র হিসেবে। যার মধ্যে ধরা পড়ে তার উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং অবশ্যই প্রতিষ্ঠানটির চরিত্র। সম্ভবত এ জাতীয় পত্রিকাকে ঘিরে তৈরি হয় একটি বিশেষ ধরনের পাঠক-বলয়, যাঁদের নিরন্তর ঔৎসুক্য পরবর্তী কর্মপ্রণোদনায় চালিকাশক্তির ভূমিকা নিয়ে থাকে।

'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা' এই প্রচ্ছদ-নামাঙ্কিত হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগ থেকে যে মুখপত্র বেরিয়েছিল ১৯৬৯ সালে, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করতে করতে আজ সে এসে পৌঁচেছে ২০০৯-এ। মাঝখানের অতিক্রান্ত সময়ে চোদ্দটা সংখ্যায় সে বিচিত্র বিষয় পরিবেশন করেছে সাহিত্য-ভাবুক পাঠকের কাছে। এমন ধরনের পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক সংকট থাকে না হয়তো, কিন্তু অন্যবিধ অনেক সমস্যা থেকেই যায়। আর তার জেরে পত্রিকা প্রকাশের দিনক্ষণ পিছোতে পিছোতে নির্দিষ্ট সময় থেকে এমন একটা অস্বাভাবিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, যা রীতিমত অস্বস্তিকর। আসলে নিয়মিত প্রকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যথা সময়ে লেখা না-পাওয়া। সারালো লেখা তো বটেই, দস্তুর মতো গবেষণাধর্মী নিবন্ধ প্রকাশ এ বিভাগের চিরকালীন ঐতিহ্য। এবং ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, এ ধরনের লেখা জোগাড় করা কত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর তাই একটি সংখ্যা আর একটি সংখ্যাকে অনিবার্যভাবে বিলম্বিত করে এবং অনিয়মিত হওয়াটাই শেষ অব্দি হয়ে দাঁড়ায় এর অলিখিত নিয়ম। পরিণামে নিন্দুকরা আমাদের দুষতে থাকেন।

সম্ভবত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অব্যবহিত পূর্ববর্তী সংখ্যায় নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের সংকল্পবাণী উচ্চারণ করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে যে বাস্তবে পরিণত করা কত কঠিন সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেল কাজে নেমে। বিভাগের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এ সংখ্যার নিয়মতান্ত্রিক সম্পাদক হলেন অধ্যাপক মণিলাল খান। অনেকদিন হল তিনি অধ্যাপনা-বৃত্তি থেকে অবসর নিয়েছেন (জানুয়ারি, ২০০৮)। ফলে বিভাগে তাঁর প্রাত্যহিক অনুপস্থিতিতে বাকি সাংগঠনিক কাজটি বর্তমান কলমচিকে চালিয়ে যেতে হয়েছে। বিভাগের সব শিক্ষকই লেখা দিয়েছেন। এই সময়কালের মধ্যে বিভাগে বেশ কয়েকটি স্মারক বক্তৃতা ও সাধারণ আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। সে সব বিশিষ্ট বক্তাদের কাছ থেকে কিছু লেখা মিলেছে। সব মিলিয়ে আকারে বেশ পুষ্ট হয়ে উঠলো

এবারের সংখ্যা। যাঁরা আমাদের অনুরোধ রক্ষা করে লেখা দিয়েছেন বিভাগের তরফে তাঁদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও। তাঁদের প্রত্যক্ষ সহায়তা ব্যতীত বিভাগের প্রতিটি কর্মই তো অসম্পূর্ণ, খণ্ড। শেষের দিকটায় দ্রুততার কারণে দু'চারটি বানান ভুল হয়তো সতর্ক চোখকেও ফাঁকি দিতে পারে। এ ব্যাপারে মার্জনা ভিক্ষা ছাড়া আর কি-ই বা এখন করতে পারি। একনিষ্ঠ পাঠকের আগ্রহ থেকে এবারও বিচ্যুত হবে না এই সংকলন এমন আশা রেখে কলম নামিয়ে রাখছি।

সূচিপত্র

যুগে যুগে জাতিগতবৃত্তি এবং লোকশিল্প

মণিলাল খান

আর্যরা প্রথমে পাঞ্জাবে এসে পঞ্চনদীতীরে বসতি স্থাপন করে। কায়িক ও মানসিক—সমস্ত রকম কর্মই নিজেরা নিজের হাতে করে প্রয়োজন মেটাতেন। বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের কালে এক ব্রাহ্মণবর্ণ ছাড়া আর্যদের আর কোন বর্ণ বা জাতি ছিল না। তখন 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত সবই আর্যরা নিজেরাই করতেন। ঋগ্বেদে অনেকগুলি বৃত্তির কথা আমরা জানতে পারি ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত, 'A History of Civilisation In Ancient India' (1889-1990) গ্রন্থে।

ঋগ্বেদ আসলে দেবতাদের হোমযজ্ঞ ও স্তব-সংগ্রহের গ্রন্থ। তবু তার মাধ্যমেই অনেক ধরণের বৃত্তি বা পেশার কথা উঠে এসেছে। রমেশবাবু যথেষ্ঠ পরিশ্রম করে আর্য-ভারতীয়দের প্রচুর বৃত্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করার সুযোগ করে দেন, সেগুলি নিখুঁত ভাবে উদ্ধার করে। যেমন, কৃষিকর্মের উল্লেখ আছে। একই সাথে ক্ষেত্রপতির কথা পাচ্ছি; ক্ষেত্রপতি বলতে ভূমি-কর্ষণকারী কৃষদের কথা বোঝান হয়েছে। একই ভাবে কাঠের লাঙ্গল প্রস্তুতকারী সূত্রধর বা কাঠশিল্পী, লৌহ ফলা বা 'সীতা' প্রস্তুতকারী কর্মকার;[১] কৃষিকাজে ব্যবহৃত অশ্ব ও বলীবর্দ্দর কথা পাচ্ছি। এদের পরিচর্যার জন্য পশুপালকের বর্ণনা পাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একশত উনিশ সূক্তে দেখি গাভীগুলিকে গোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া ও পুনরায় বাড়িতে ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গ।[২]

এত প্রাচীন গ্রন্থেও পণ্য-বাণিজ্য বা ব্যবসায়ের কথা পাই। তাই টাকা অথবা স্বর্ণমুদ্রা লেনদেনের কথা, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডল চব্বিশ সূক্তের নবম ঋকে বর্ণিত হয়েছে। এতে মুদ্রা ও অলঙ্কার নির্মাতা স্বর্ণশিল্পীদের কথা জানা যায়। আগেই কাষ্ঠশিল্পী সূত্রধরদের কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল একশত ষোল সূক্তে ও পঁচিশ সূক্তে, চতুর্থ মণ্ডলের পঞ্চান্ন সূক্তে কাষ্ঠ নির্মিত নৌকা ও সমুদ্র ভ্রমণের কথা পাচ্ছি। সপ্তম মণ্ডল অষ্টাশী সূক্তের তৃতীয় ঋকেও একই উক্তি দেখি। রথ, বিমান, নৌকা ও লাঙ্গল নির্মাতা সূত্রধরদের বৃত্তি সেই প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

একই ভাবে প্রস্তরশিল্পী, গৃহনির্মাণশিল্পী, নৌকার মাঝি, রথের সারথি ও বিমানের চালক প্রভৃতির কর্মী বা বৃত্তিজীবীদের কথা স্বাভাবিক ভাবে চলে আসে। তেমন ভাবে তস্কর ও দস্যুদের প্রতিরোধের জন্য সৈনিক বা পাহারাদার প্রভৃতি বৃত্তির কথাও জানা যায়। একই রকম ভাবে সবার মঙ্গলকারী ও হোমযজ্ঞকারী পুরোহিত, চাষের জন্য মেঘ বা বৃষ্টি গণনাকারী জ্যোতিষ-বৃত্তিও দেখতে পাই। আবার মাটির পাত্র নির্মাতা কুম্ভকার, বস্ত্র নির্মাণের শিল্পী তন্তুবায়, সোমরস বানানোর কর্মী সমস্ত বৃত্তিই ঋগ্বেদের কালে একমাত্র ব্রাহ্মণকেই করতে হয়েছে।

ক্রমে জনচাপে পাঞ্জাবে বসবাসের স্থান সংকুলান না হওয়ায় আর্যরা পঞ্চনদ অতিক্রম করে গঙ্গা-দোয়াব উপত্যকায় নতুন বসতি নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, যমুনা-গঙ্গার অন্তর্গত অঞ্চলে প্রথমে 'কুরুজাতিরা' আধুনিক দিল্লির চারপাশে কুরুরাজ্য এবং তারপরে আধুনিক কনৌজের চারপাশে কাম্পিল্য নগরীতে রাজধানী স্থাপন করে দ্বিতীয়

বলশালী আর্য উপজাতির জনপদ 'পাঞ্চালরাজ্য' স্থাপন করে বসতি বিস্তার করে। এমনি করে গোটা আর্যাবর্ত ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে ষোলটি প্রাচীন জনপদ গঠিত হয়। রচিত হয় পরপর বেদ-সংহিতা, মহাকাব্য, পুরাণ, উপনিষধ প্রভৃতি। সেই বিপুল জনবৃদ্ধি নতুন আর্য সমাজে সবাইকে কর্মে নিয়োগ করতে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিতে থাকে। সম্ভবত সেটা মেটাতেই তারা নব-নব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সেই রকম একটি হচ্ছে গুণ ও কর্মভেদে প্রাচীন এক বর্ণীয় আর্যগোষ্ঠীকে পৃথক চারটি বর্ণে ভাগ করে দেওয়া হল, কোন অংশকে বড় ও কোন অংশকে ছোট—এই রকম ধারণার বশবর্তী না হয়েই। নতুন ওই ব্যবস্থা আমরা শ্রীমদ্ভাগবদগীতার অষ্টাদশোহধ্যায়ে[২] নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে দেখতে পাই। যথা—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্মস্বভাবজম্।। ৪২

অনুবাদ—শম্, দম, তপঃ, শৌচ (অন্তর্বহিঃ শুদ্ধি), ক্ষমা, সরলতা জ্ঞান, বিজ্ঞান (হাতে-কলমে কর্ম অথবা শিল্পকৃতি), এবং আস্তিক্য ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম।

'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ 'অমর কোষে' বলা হয়েছে, 'মোক্ষে ধীজ্ঞানং মন্যন্ত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।" অর্থাৎ মোক্ষ বিষয়াধীকে (বুদ্ধিকে) জ্ঞান বলা হয় এবং শিল্পশাস্ত্রাদি বিষয়াধীকে বা বুদ্ধিকে বিজ্ঞান বলে। শিল্প বিদ্যা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অঙ্গ; জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতীত কোন শিল্পবৃত্তিই সম্পাদিত হতে পারে না। তাই প্রাচীন ঋষিগণ তাঁদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে শিল্পীদের মেধাবী বা জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ধীমান (বুদ্ধিমান) প্রভৃতি শব্দে আখ্যাত করেছেন।[৩]

এখানে পুঁথিগত বিদ্যা ও হাতে-কলমে শিক্ষাকে বোঝাতে 'বিজ্ঞান' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলি এদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ও তাঁর মেধাবী শিল্পী পুত্রদের দ্বারা সূচনা ও প্রসার লাভ করে। বর্ণ বিভাজনের পরেও বিশেষ বিশেষ শিল্পকর্ম বিশ্বকর্মার পুত্র ও বংশধরদের জন্য নির্দিষ্ট ব্রহ্মকর্ম রূপে থেকেই যায় এবং তা পরবর্তী কালে রচিত অনেকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থে স্বীকার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ের জন্য বর্ণিত হয়েছি—

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।। ৪৩

অর্থাৎ—পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান এবং সকলকে আয়ও করার শক্তি, ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম।

উপরের শ্লোকে ক্ষত্রিয় বলতে আয়ও করার ক্ষমতা রূপে রাজা এবং আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য সাহায্য করতে সাহায্যকারী সৈন্য-মন্ত্রী-আমলা সবাইকে বোঝায়। সম্ভবত, ক্ষাত্র্যকর্মেই অধিক জনকে কর্মে নিয়োগ করার সুবিধার কথা ভাবা হয়েছিল, অনুমান করা যায়।

তৃতীয় ও চতুর্থবর্ণ—বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য নির্দিষ্ট হয়—

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।। ৪৪

অর্থাৎ—কৃষিকাজ, গবাদি পশুপালন ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম। আর তিন বর্ণের সেবা ও পরিচর্যা শূদ্রের কর্মবলে নির্দিষ্ট হয়েছিল।

এখানে বাণিজ্য শব্দটা ব্যাপকতর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিল্পীদের উৎপাদিত নানা প্রকার শিল্পসামগ্রী, কৃষির উৎপন্ন শস্য, প্রস্তুত করার পর বৈশ্যরা সেগুলি রাজা-প্রজাদের কাছে বা হাটে-বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যায়। সাধারণত স্থলপথে রথ বা শকটে বহন করে বৈশ্যরা অধিক অর্থের জন্য অন্য জনপদে বিক্রয় করতেন এবং আবার কিছু পণ্য নৌকায় বহন করে জল পথে অন্যত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে বেশি অর্থ উপার্জন করতেন।

হাট-বাজার বসানো, পণ্য বাণিজ্য থেকে দেশের রাজকোষেও অর্থ জমা হয়। রাজাও সেজন্য মাঝি, দানী, ভারী প্রভৃতি রাজকর্মী নিয়োগ করে নব-নব বৃত্তি বা পেশায় মানুষজনকে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। আদি-মধ্যযুগের বাংলাকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দানী (শুল্ক সংগ্রাহক), ভারী (মালবাহক) ঘাটোয়াল বা মাঝির কথা পাই।

একসময় বৈশ্যকর্ম বা বাণিজ্যই অর্থগৌরবে আর সব বর্ণের মানুষের বৃত্তিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। এই বাণিজ্য লক্ষ্মীর কৃপায় গুপ্ত-মৌর্যের রাজা-মহারাজারা মগধ ও পাটলিপুত্র নগরীতে রাজধানী স্থাপন করে বৃহৎ-সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

আর আজকের বিশ্বের তাবড়-তাবড় রাষ্ট্র শক্তির মূল চাবিকাঠি এই সব বণিকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রনাধীন, তা সে আমেরিকা, ফ্রান্স বা জাপানই হোক, কিংবা ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশই হোক তাতে কিছু আসে-যায় না।

আধুনিক বিশ্বে ক্ষাত্র্যকর্মের মত বাণিজ্য বা বৈশ্যকর্মেও কোটি কোটি লোক খাটছে। এ কাজ এখন উৎপাদন-বহন ও বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। আজকাল তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ক্ষেত্র। যেমন, বিজ্ঞাপন, মার্কেট রিসার্চ, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ, গুণমান নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নিত্য নতুন ক্ষেত্র।

বর্ণ বিভাগের পর এই তৃতীয়বর্ণের বৈশ্যকর্ম এককালে বৈশ্যজাতিদের এককোণে ঠেলে দিয়েছিল। তাদের থেকে উচ্চবর্ণীয়রা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলতেন। কিন্তু দিন বদলের ফলে বৈশ্যের বাণিজ্যকর্ম এখন গোটা দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছে। বাণিজ্যকর্ম এখন সবদেশের সেরাবৃত্তি যা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যসূচীতেও চলে এসেছে।

যেমন, ধরা যাক আগে কোন পণ্যের প্রচার শুধু মাত্র সংবাদপত্রে বা একটুকরো লিফ্লেটে প্রচার করলেই চলতো। আজকাল ছোটপর্দা, বড়পর্দা, শহরের বড় হোর্ডিং, পণ্যের সঙ্গে পুরস্কার, জলশা, বিচিত্রানুষ্ঠান, ফুটবল ও ক্রিকেট প্রভৃতি মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের প্রচার চলে। পর্দায় কুশীলব দ্বারা সিরিয়াল, বিচিত্রানুষ্ঠান ও খেলাধূলায় 'স্পন্সরসিপের' মাধ্যমে কোটি-কোটি টাকা হাতবদল হচ্ছে। পণ্য-উৎপাদন বাজার আমদানী-রপ্তানী লাফিয়ে-লাফিয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠার সাথে সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাঙের ছাতার মত চোখ বাঁধানো অসংখ্য বিজ্ঞাপন-গবেষণা বা প্রচার সংস্থা গড়ে উঠেছে। বৈশ্যবৃত্তি এখন উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে সব বর্ণেরই জপের মন্ত্র।

আধুনিক কালের এই সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বহু কালের অবহেলা আর তিন জাতির নিন্দিত

শূদ্রজাতির বৃত্তি বা পরিষেবাও এখন অনেকখানি অর্থমূল্যে কিনতে হয়। জুতো বানায় যে মুচি তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে এসেছে যে সভ্য-সমাজ, জুতো তৈরির ফ্যাক্টরিতে এখন লম্বা-চওড়া লেদার টেক্‌নোলজির ডিগ্রি নিয়ে মোটা মাসহারার একটা চাকরি জোগাড় করতে শূদ্রদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের ছেলেরাও লাইন দেয়। এমন কি প্যান্ট-সার্ট পরে নিজের হাতে জুতোও বানায় এবং বৈবাহিক সম্বন্ধও করে।

এমনি করে কালে কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাষ্ট্র বা রাজশক্তির হাতবদল, অর্থ-কৌলীণ্যের গৌরবে অথবা গৌরবহীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে জাতিগত পেশা বা বৃত্তি এক যুগে অবহেলা আর অমর্যাদা কুড়িয়েছে, আর এক যুগে তাই ফিরিয়ে দিয়েছে সেই সমাজকে।

ঋগ্বেদের কালে কৃষিকাজ, মাটির হাড়ি-কলসি তৈরি, সোমরস বানানো, কাঠের রথ ও নৌকা নির্মাণ—এ সবই এক ব্রাহ্মণরাই করতেন। বর্ণ-বিভাজনের পরে লৌহ, সোনা, তামা, পাথর কাষ্ঠশিল্প বাদে অবশিষ্ট বৃত্তিগুলি বৈশ্যরাই করে থাকেন। ব্রাহ্মণরা যখন করতেন তখন এ-সব বৃত্তি নিন্দিত ছিল না। পরে ধীরে ধীরে মদ তৈরি করা ও তা বিক্রয়কর্ম সবার পছন্দ নয়। নেশার দ্রব্যবলে তা সামাজিক ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে যুক্ত এবং কেনাবেচায় সরকারী আরোপও লাগান হয়। অন্যদিকে যুগ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় বড়-বড় নামি-দামি মদ-নির্মাতা কোম্পানীতে মোটা মাইনের কর্মিদের লোকে আর ঘৃণার চোখে দেখে না। কারণ মদ এখন আভিজাত্যেরও সোপান। রাষ্ট্রশক্তির কাছে সোনার ডিমপাড়া হাঁস। ভারতে ও বাংলায় ইংরেজ অধিকারের পর থেকে আর্থ-সামাজিক চিত্রটা দ্রুত বদলেছে। কৃষি নির্ভর সমাজের একটা অংশ উপার্জন নির্ভর হয়ে দাঁড়ায় এবং তখন থেকেই একজাতি অন্যজাতির বৃত্তি বা পেশার দিকে হাত বাড়ায়।

এতে একটা লাভ হয়েছে, বর্ণগত দূরত্বটা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু আর একদিকে ধনি ও দরিদ্রের বৈষম্যটা দেখা দিতে থাকে। ধনিরাই একালের 'কুলীন'।

বলাই বাহুল্য একবর্ণ বা জাতি থেকে আর এক জাতির দূরত্ব বা বৈষম্যটা উস্কে দিয়েছিল প্রাচীন হিন্দু যুগে বাংলায় সেনরাজ-আমলে স্মৃতিশাস্ত্রব্যবহার গ্রন্থকারীগণ। স্মৃতিশাস্ত্রকার ভবদেব ভট্ট ব্রাহ্মণদের কোনো কোনো বৃত্তিকে ব্রহ্মকর্ম থেকে বাতিল করে একটি তালিকা দেন, এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেও নির্দেশ দেন। অর্থাৎ তালিকায় নির্দিষ্ট পেশা সম্পাদন করলে, ব্রাহ্মণজাতি জরিমানা দেবেন অথবা পতিত হবেন।

অথচ স্মৃতিশাস্ত্রকার ব্রাহ্মণগণ সব সময় নিজেরা নিজেদের বিধি নিষেধ মান্যতা দিয়ে চলেননি, লঙ্ঘণ করেছেন। তার জন্য তাঁদের কোন প্রকার শাস্তি ভোগ করতে হয়নি।

ব্রাহ্মণগণ যে সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করতেন ও তাঁদের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ মেনে জীবনযাপন করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। 'তাহাদের পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সমাজের আদর্শ ছিল। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণই যে একই রকম আদর্শ অনুযায়ী চলিতেন, এরূপ মনে করা ভুল। এমনকি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের যে সমুদয় নির্দিষ্ট কর্ম আছে, অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণও তা মেনে চলেননি'।[৪]

সেজন্য, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন সেই তাঁদের প্রতি যাঁরা ব্রহ্মকর্ম না করেও অন্যবর্ণের বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবন কাটান কোন শাস্তি ভোগ

না করে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন ভবদেব ভট্ট ও দর্ভপাণি। তাঁরা উভয়েই বংশানুক্রমিক রাজমন্ত্রী ছিলেন।[৫] তিনি আরও বলেছেন যে সমতটে দুটো ব্রাহ্মণবংশ সপ্তম শতকে রাজত্ব করতেন। ব্রাহ্মণেরাও যুদ্ধবিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন। তারা যে অন্য নানাবিধ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন, শাস্ত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ইহার কোন কোনটি—যেমন অনুমোদিত ছিল। কিন্তু অনেকগুলিই নিন্দনীয় ছিল এবং তাঁহার জন্য ব্রাহ্মণগণকে প্রায়শ্চিত্য করিতে হইত'।[৬]

ভবদেব ভট্ট ক্ষাত্র্যকর্ম করেও কোন শাস্তিভোগ করেননি, উল্টে তিনিই ব্রাহ্মণদের নিন্দনীয় কর্মের একটা তালিকা প্রস্তুত করে দেন। শূদ্রের অধ্যাপনা ও যাজন ইহার অন্যতম।[৭] ক্ষোভের সঙ্গে তাই ঐতিহাসিক রমেশবাবু মন্তব্য করেছেন, 'তৎকালে জাতিভেদের কুফল সমাজের অধঃপতন কতদূর পৌঁছিয়াছিল ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। ভবদেব ভট্ট রাজার মন্ত্রীত্ব ও যুদ্ধ করিয়াও ব্রাহ্মণের সর্ব্বোচ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের আদর্শ বৃত্তি অধ্যাপনা ও যাজন অবলম্বন করিয়া কোন ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রের জ্ঞান লাভের ও ধর্মকাজে সহায়তা করিতেন, তবে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত। অর্থাৎ ধর্ম ও জ্ঞান লাভের জন্য ব্রাহ্মণের উপদেশ যাহাদের সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন, তাহাদিগকে সাহায্য করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল'।[৮]

উচ্চবর্ণের এই ধরণের জাতিগত বৃত্তি নিয়ে পক্ষপাতিত্ব বঙ্গীয় সমাজকে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছে। অথচ এই জনপদে জাতপাতমুক্ত নতুন এক সমাজের সন্ধান দিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'আপনি আচরি ধর্ম' অপরকে শিখিয়েছেন। বাংলা জুড়ে প্রবল প্রতিকূল ব্রাহ্মণ্য—ধ্বজাধারীদের বিপক্ষে গিয়ে এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণ বালক গদাধর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর অগ্রজ রামকুমার ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজের প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে 'ছোট জাত' রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির অভিষেক ও সূচনার দায়ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, ছোটজাতের অর্থাৎ প্রথা বহির্ভূত বাঙালি পুরোহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইতিহাসের পাতায় আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। রাণীর মন্দিরও আজ গোটা ভারতের এক তীর্থক্ষেত্র।

সেই দেশেই ভবদেব ভট্টরা নিজেদের দিকে উচ্চবর্গীয় কর্মগুলিকে টেনেছেন, ভাবতে অবাক লাগে। তাই তিনি চিত্রাদি শিল্প, বৈদ্যক ও জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি চর্চা ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৯] সেজন্য ঐতিহাসিক রমেশবাবু একটি মন্তব্য করে বলেছেন, রাজ্য শাসন, যুদ্ধ করা ব্রাহ্মণের আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী কাজ করেও ভবদেবের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ আত্মশ্লাঘা করতেন। ব্রাহ্মণগণের এই মনোবৃত্তিই যে সামাজিক অবনতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুন্নতির একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[১০]

ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষেধের তালিকায় উপরে বর্ণিত গণনা, জ্যোতিষ ও চিকিৎসার মত কিছু বৃত্তি থাকলেও, শাস্ত্রকারদের কেউ কেউ নিজেদের তৈরি বিধান নিজেরাই লঙ্ঘন করে এসেছেন। এমন কি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যদের জাতিগত বৃত্তিও ব্রাহ্মণদের পক্ষে স্মৃতিশাস্ত্রকারদের অনুমোদন লাভ করে। তার কারণ, ভূমিই তখন অন্নবস্ত্রের লক্ষ্মী, সেটা তাঁরা বুঝেছিলেন এবং পেটে যাতে টান না পড়ে সেই, রাস্তাটা তাঁরা খোলা রেখেছিলেন। তাই কৃষিকাজ ব্রাহ্মণের পক্ষে অনুমোদন পেয়েছিল।

কিন্তু কয়েকটি আদর্শ শিল্পবৃত্তি ঋগ্বেদের কাল থেকেই ব্রহ্মকর্ম বলে বিশ্বকর্মার বংশধরগণ চর্চা করে আসছেন। হিন্দুযুগে স্মৃতিশাস্ত্রকার ভবদেব ভট্ট ব্রাহ্মণদের করণীয় নয়—এমন এক তালিকায় সেগুলিকে কেন ফেলেন, তার কোন কারণ বা ব্যাখ্যা দিলেন না। তার পরিবর্তে সেই আমলের কোন এক সময়ে, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—নতুন করে লিখিত হয়েছিল অথবা বিশ্বকর্মার বংশধর পাঞ্চাল ব্রাহ্মণসহ আরও কয়েকটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু গল্প ও ঘটনা বা কথা পুরাণ দুটিতে প্রক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল, সেকথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। ওই দুই পুরাণে শিল্প পেশাজীবী ব্রাহ্মণদের বর্ণ-ই হরণ করে নেওয়া হল।

বাস্তবে বাঙালি শিল্পীরা কোন কালেও জাতিগত বৃত্তি থেকে কারো ভয়ে সরে দাঁড়াননি। তাঁরা মনে করেন আদি শিল্পগুরুর কাছ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত বর্ণ এবং শিল্পবিদ্যা—কোনটাই তাঁরা ছাড়তে পারেন না। ভারতভূমির নানা প্রদেশে তাঁদের সম্প্রদায়ের বর্ণ ও বৃত্তি নিয়ে কখনও এ ধরণের সমস্যা দেখা দেয়নি। এ ব্যাপারে বিশ্বকর্মা এবং তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে ভারতের নানা প্রদেশ ঘুরে এসে নিজ অভিজ্ঞতার কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন ধাতু শিল্পী মীরা মুখোপাধ্যায় 'বিশ্বকর্মার সন্ধানে' গ্রন্থে।

মীরাদেবী ভারতের নানা মঠ-মন্দির-স্তূপ ঘুরে ঘুরে জেনেছেন যে বিভিন্ন ধাতুমূর্তিতে পিঠের অংশে খরোষ্ঠী, ব্রাহ্মী, পালি, এমনকি সংস্কৃতেও বিশ্বব্রাহ্মণ কথাটি লেখা আছে। কোথাও বিশ্বশ্রমণ[১১] কথা লেখা। তার অর্থ বৌদ্ধযুগে এদের কেউ কেউ বৌদ্ধধর্মও গ্রহণ করে থাকতে পারেন। অর্থাৎ পেশায় শিল্পী হয়েও ব্রাহ্মণ, উপবীতি। দিল্লির আশপাশে তাঁরা পাঞ্চাল ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেন।[১২] তিনি অনেকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন যে তারা কেউ লোহার শিল্পী, কেউ কাঠের শিল্পী, আবার কেউ বা প্রস্তর, তাম্র, সুবর্ণ কর্ম করেন।

বঙ্গ জনপদেও শিল্পী সম্প্রদায়গণ একই সাথে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপা লাভ করে সুখে ও সম্মানের সঙ্গে তুর্কী অধিকারের সময়েও বাস করতেন। সোনা, রূপা, মণি, হীরা ও বিচিত্র দ্যুতিময় প্রস্তর সজ্জিত নানা অলঙ্কার বিত্তশালী সমাজে ব্যবহৃত হত।[১৩] 'দেবদেবীর অলঙ্কার ঐশ্বর্য দেখিলে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তব-কত-ই-নাসিরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, লক্ষ্মণ সেন সোনা ও রূপার বাসনে আহার করিতেন। রাজা রাজড়াতো করিতেনই, বণিক সাধু সওদাগররাও করিতেন; তাহার কিছু আভাস মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও আছে।[১৪] রামচরিত কাব্যে, বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপি, লক্ষ্মণ সেনের নৈহাটী লিপি প্রভৃতি অন্যান্য লিপিতে দেবদাসী, রাজান্তপুরের নারী ও পরিচারিকাদের নানা মূল্যবান অলঙ্কার-সজ্জার উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়, 'এই বিলাস ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী সেন আমলেই বেশি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।'

নীহারবাবু কেবল স্বর্ণশিল্পের কথা বলেছেন তা নয়, অন্যান্য শিল্পের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "লৌহশিল্পও ছিল; দুই-একটি শাসনে কর্মকার তো রাজপাদোপজীবী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। চাও-জু-কুয়া যে বলিয়াছেন, বাংলাদেশে দুমুখো খুব ধারালো তলোয়ার তৈরী হয়, তাহার মধ্যে লৌহ ইত্যাদি ধাতুশিল্পে এ দেশের শিল্প কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে।"[১৫] নীহারবাবু কর্মকারদের জাতিগত বৃত্তির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "কর্মকারদের সুপ্রাচুর্য না থাকিলে তো কৃষিকর্ম এবং কৃষি সমাজ চলিতেই পারে না। দা, কুড়াল, কোদালি, খন্তা, খুরপি, লাঙল ইত্যাদি

ছাড়া লোহার জলপাত্র (ইদিনপুর লিপি), তীর, বর্শা, তরোয়াল ইত্যাদি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর তৈরী হইত। অগ্নিপুরাণের মতে অঙ্গ ও বঙ্গদেশ তরোয়ালের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; বঙ্গদেশীয় তরোয়াল নাকি ছিল খুব শক্ত ও ধারালো।"[১৬]

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা-গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দ-কেশবের শাসনে রাজবিগা নামে জনৈক হস্তিদন্তকারের কথা জানা যাচ্ছে। কেশব সেনের ইদিলপুর লিপিতেও দ্বিপদন্ত-দন্ত-শিবিকার উল্লেখ পাওয়া গেছে।[১৭] নীহারবাবু কাষ্ঠশিল্পী সূত্রধরদের বৃত্তি সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'কাঠের শিল্পের প্রচলনও কম ছিল না। কাঠের তৈরি ঘরবাড়ি কালের ভ্রুক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া আজ আর বাঁচিয়া নাই, কিন্তু স্তম্ভ, খিলান, খুঁটি ইত্যাদির দুই চারিটি টুকরা আজও যাহা পাওয়া যায় তাহাদের কারু ও শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময়কর। সংসারের আসবারপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, গোরুর গাড়ি, রথ, বিশেষভাবে নদীগামী নানা প্রকার নৌকা ও সমুদ্রগামী বৃহদাকৃতি নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি সমস্তই তো ছিল কাঠের।[১৮]

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জনবাবুর উপরোক্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের উপরে বর্ণিত শিল্পীদের জাতিগত বৃত্তিগুলি যথেষ্ট অর্থ ও মর্যাদার ছিল বলে মনে করা যায়। রাজশক্তি ও বণিক উভয়ের কাছেই শিল্পীদের বানানো সামগ্রীর যথেষ্ট কদর ছিল। আর সেজন্যই মৌর্য গুপ্তযুগে প্রস্তরনির্মিত অসংখ্য মঠ-মন্দির-স্তূপ-দেবমূর্তি-বুদ্ধমূর্তি, লৌহস্তম্ভ, কারুকার্য ঘোচিত কাষ্ঠনির্মিত 'রাজপ্রাসাদ', ঘরবাড়ি, নৌকা, জাহাজ, রথ, শকট, চোখ বাঁধানো রত্নখোচিত নানা অলংকার প্রভৃতির ছড়াছড়ি গোটা আর্যবর্ত জুড়ে এক সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে আশীহাজার স্তূপ নির্মিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকগণ জানিয়েছেন। সর্বত্রই শিল্প বৃত্তিগুলির জয়জয়কার।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের নানা জনপদের এইসব শিল্প পেশাজীবী সম্প্রদায়গণ শিল্পশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র, স্থাপত্যবেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের পাঠ নিয়ে বংশানুক্রমে শিল্পচর্চা করে দেশকে শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং সর্বোপরি যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা আত্মনির্ভর হতে শিখিয়েছেন। যুগে-যুগে এইসব শিল্পবৃত্তিগুলি শিল্পীকে এবং তার সাথে সাথে রাজার রাজকোষে অর্থ, সম্পদ ও সম্মান—এসবই যুগিয়েছে।

প্রাচীন পাঞ্চাল জনপদ গঠনের পরে শিল্পীরা অভিজাত শিল্পীসংঘ গঠিত করে নিজেদের মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন, বঙ্গজনপদে এসেও সেই শিল্পীবাহিনী শিল্প নিগম গঠন করে রাজাকে নানাভাবে পরামর্শ দান করেছিলেন, বলেও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জনবাবু বলেছেন যে, সাধারণ ভাবে সমাজের মধ্যে শিল্পীদের একটা স্থান ছিল। তিনি আরও বলেন যে, বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপির খোদাইকর রাণক শূলপাণির "বারেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি"—এই বিশেষণটির মধ্যেও পাওয়া যায়।[১৯]

মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের এক স্থানে স্বর্ণশিল্পের কারিগর স্বর্ণকারদের উপযুক্ত সম্মান জানানোর উল্লেখ রয়েছে। উজানি নগরের রাজা একটি শুকপাখি কিনে সোনার খাঁচায় রেখে পুষতে, বণিক ধনপতিকে গৌড়ে পাঠালেন একটি 'সুবর্ণ পিঞ্জর' গড়িয়ে আনতে।

ধনপতি যথারীতি গৌড়ে গিয়ে রাজসমীপে নিজের নামধাম ও আগমন বার্তা জানালে, গৌড়রাজ যা করেছিলেন, তা হল :

'সাধুর বচন শুনি আনন্দিত নৃপমণি
ডাকিয়া আনাইলা কারিকর
পান ফুল দিয়া হাতে বসন বান্ধাল্য মাথে
গড়িবারে সুবর্ণ পঞ্জর।'

কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর উপরোক্ত 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনা সমাপ্তিকাল ধরা হয়েছে ১৫৫৫-৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।[২০] বাংলাদেশে সেটা মুসলমান-অধিকারের কালপর্ব। এখানে ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, গৌড়রাজ জনৈক স্বর্ণকারকে ডেকে এনে হাতে পান ও ফুল দিলেন এবং মাথায় উত্তম 'বসন' জড়িয়ে সম্মান জানালেন। তারপর একটি সুবর্ণ পিঞ্জর নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। একজন রাজা তাঁর একজন স্বর্ণশিল্পী প্রজাকে ডেকে পাঠিয়ে আদেশ করলেই চলতো, কিন্তু তিনি তা না করে, যা করলেন সেটা প্রাচীন ভারতবর্ষের অতিথি বরণ প্রথা। স্বর্ণশিল্পীর হাতে পান ও ফুল এবং মস্তকে উত্তম বসন বা পাগড়ি পরিয়ে দিলেন। তারপরে সুবর্ণ-পঞ্জর গড়িয়ে দেবার অনুরোধ করলেন।

যুগে যুগে এভাবেই পাঞ্চাল শিল্পীরা জাতিগত পেশায় যুক্ত থেকে সম্মান ও দক্ষিণা লাভ করে থাকেন। সুদূর ত্রেতাযুগ থেকে এই শিল্পী সম্প্রদায় ভারতের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে গেলেও নিজস্ব পেশাতেই যুক্ত থেকে নিজেদের কর্মধারা সচল রেখে চলেছেন। তবে সব কালেই যে সম্মান ও অর্থ দুই তাঁদের ভাগ্যে জুটেছে তা নয়। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের আর্যাবর্তের সর্বত্র একাধিক রাজা মহারাজা ও সম্রাটদের রাজত্বে নির্মিত অসংখ্য তীর্থ ও তীর্থের দেবদেবীর মূর্তি, অজান্তা ইলোরা-খাজুরাহো ইত্যাদি গুহামন্দিরের শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও এই শিল্পী সম্প্রাদায়গণ প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থেকেছিলেন।[২১]

আবার হিন্দুযুগের অবসানে ভারতে মুসলমান অধিকারের সময়েও বিশ্বকর্মার বংশোদ্ভর শিল্পীদের গুরুত্ব একইভাবে অক্ষুন্ন ছিল। ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সুলতান 'কুতুব-উদ-দীন' স্থানীয় হিন্দু শিল্পী ও কারিগরদের স্থাপত্য নির্মাণে কাজে লাগান।[২২] সেই কালে হিন্দু শিল্পীদের নির্মাণশৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অধ্যাপক ডক্টর মোহম্মদ রফিকুল আলম মন্তব্য করেছেন, তাদের নিখুঁত শিল্পকীর্তির ছাপ এই মিনারের সর্বত্র প্রতিফলিত। মসজিদের পশ্চিমে একটি সুঁচালো খিলান তৈরি করা হয়। খিলান ও মিনারের নকশা ও কারুকাজগুলো কোরানের বাণী দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছিল। নকশাগুলো ফুল ও লতাপাতার আকৃতি। এটিই ভারতবর্ষে নির্মিত প্রথম মুসলিম স্থাপত্য যেখানে হিন্দু ও ইসলামী রীতির মিশ্রণ দৃষ্ট হয়।[২৩]

বলা বাহুল্য এখানে মিনার বলতে 'কুতুর মিনারের' কথা বলা হয়েছে। হিন্দু শিল্পীরা কোরান না জেনেও খিলান ও মিনারের নকশা ও কারুকর্ম কোরানের বাণী বসিয়েই অলংকৃত করেছিলেন। এই শিল্পীদের এটি একটি বিস্ময়কর ও অভিনব স্থাপত্যকীর্তি।

প্রায় ত্রয়োদশ শতকের গোড়া থেকেই (১২০৩/১২০৪ খ্রিঃ) বঙ্গদেশ তুর্কী-অধিকারে যাওয়ার পর দেড়শ বছরের মত সময়কাল বাঙালির জীবনে ধ্বংস ও লাঞ্ছনা নেমে আসে। তখনও বাঙালি শিল্পীরা বাংলায় স্মৃতিশাস্ত্রর শিল্পকাজের নিষেধ বিধিকে অগ্রাহ্য করেই মুসলমান শাসকদের

চাহিদা মত শিল্পকর্মে একনিষ্ঠ ছিলেন। অন্যদিকে অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের অনেকেই মুসলমান-রাজশক্তির আনুকূল্যে নানাকর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে জীবিকানির্বাহ করেন।[২৪] কেউ কেউ বৈবাহিক সম্বন্ধেও জড়িয়ে পড়েন। বাংলায় ইলিয়াশ-শাহ-এর আমল (খ্রিঃ ১৩৪২-১৩৫৮) থেকে পরপর কয়েকজন মুসলমান সুলতান হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করেন। তখন থেকে নানা শ্রেণীর হিন্দুরা সুলতানদের অনুগ্রহ লাভ করেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও যবন রাজশক্তির আনুকূল্য গ্রহণ করতে আপত্তি করেননি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র, যশোহর নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপন্ডিত সনাতন, রূপ এবং তাঁদের অপর ভ্রাতা অনুপ যথাক্রমে দবীব খাস, সাকর-মল্লিক ও মুদীর-ই জবর ছিলেন।[২৫]

গোড়ার দিকে অনেকের যবন দোষের কারণে জাত হারাতে হয়েছে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে ঠগ্ বাছতে গিয়ে গাঁ উজোড় হয়ে যায়, তখন তারা (বিধানকর্তারা) এ সম্বন্ধে শাস্তিটাকে লঘু করে দিয়েছিলেন। অন্ততঃ দেবীবরের মেল-বন্ধন সেই সাক্ষ্যই বহন করে।[২৬]

তারপর প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর পরে বাংলাদেশ মুসলমান রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আর এক বিদেশী-বৃটিশ শক্তির অধিকারে চলে যায়। জাতিগত বৃত্তি আঁকড়িয়ে দিন যাপনের অতি পুরাতন ছকটাই ইংরেজ আমলে একেবারে বদলে গেল।

নিত্য-নতুন নগর-শহর গড়ে ওঠে। কলকাতা মহানগরীর কলেবর বৃদ্ধি ঘটে। গ্রাম-গঞ্জ থেকে মানুষের স্রোত নগরমুখী হতে থাকে। দোকান-পাট হাট-বাজার গজিয়ে ওঠে। ডাকপড়ে শিল্পী সম্প্রদায়গুলোর। কাঠের আসবারপত্রের দোকান, কামারশালা, তাঁমা-কাঁসার দোকান, সোনারূপাব দোকান, আর সব দোকানের সঙ্গে ঠাঁই-ঠাঁই জড় হয়। এভাবে আদিম কলকাতা তিল তিল করে নিজের আয়তন বাড়িয়ে চলে। এর মধ্যে দিয়েও পারিবারিক বৃত্তিকে আশ্রয় করে বাঁচার স্বপ্নদেখে অনেকে। অন্য দিকে বিশ্বকর্মার শিল্প-বিজ্ঞানবিদ্যা[২৭] পশ্চিম থেকে ইংরেজরা নতুন ভাবে এদেশে আমদামী করলেন টেকনিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পত্তন করে।

বাংলায় হুগলীনদীর উভয়তীরে পরপর পাটকল, কাগজকল, ঔষধশিল্প, লৌহ-ইস্পাত কারখানা, বন্দুক-রাইফেল কারখানা, কাপড়কল প্রভৃতি ছোট মাঝারি কলকারখানা গড়ে ওঠে। কলকাতা, দমদম, দুর্গাপুর, কাঁচড়াপাড়া, বার্ণপুর, কুলটি, চিত্তরঞ্জন, কাঁকিনাড়া, ইচ্ছাপুর, কাশীপুর ইত্যাদি স্থান এদেশের শিল্প মানচিত্রে স্থান করে নেয়। প্রায় একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, কোর্ট-কাছারি, আইনকলেজ, হাসপাতাল, রেলব্যবস্থার পত্তন রাস্তাঘাটের উন্নয়ন প্রভৃতি বাঙালির জীবনধারাই একদম পাল্টে দিল। ঘরমুখো বাঙালি বাইরের দিকে তাকাতে শিখল ইংরেজ রাজত্বে।

ইংরেজ-সৃষ্ট ওই সমস্ত স্কুল কলেজে অফিস-আদালতে পাশাপাশি বেঞ্চিতে অথবা অফিসের এক টেবিলে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সন্তানদের পাশে মুচি মেথরের ছেলেদের পড়াশুনায় কাজকর্মে কোন ভেদ থাকল না। শূদ্রের ছেলের সংস্কৃত পড়তে অথবা শিক্ষক হয়ে সংস্কৃত পড়াতে ইংরেজি বিদ্যালয়ে কোনরকম বিধি-নিষেধ রইল না।

এমনিতেই প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গ জনপদে রাঢ়ী-বারেন্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণ সন্তানরাই নিজেদের টোলে বা বাড়িতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় আর সবার থেকে এগিয়েই ছিল, ইংরেজি স্কুল

কলেজে তারাই অধিক সংখ্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে জলপানি পেয়ে উচ্চতর বিদ্যা বা ট্রেনিং নিতে কালাপানি পার হয়ে বিলেতেও পাড়ি দেয়। তাদের অনেকেই দেশে ফিরে উচ্চবিত্তের চাকরি পেয়ে বংশগৌরব বৃদ্ধি করে। কেউ কেউ আবার নিষিদ্ধ মাংস খেয়ে ও বিলিতি কন্যার পাণি গ্রহণ করে আধা ইংরেজ হয়ে দেশে ফিরলে, সমাজ শাসকগণ আর একটা স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করে তাদের সবার জাতগোত্র কেড়ে নিয়েছিলেন, এমন কথা জানা নেই।। অথচ এই বাংলাদেশে প্রাচীনকালে শূদ্রদের যজমানি ও শিক্ষাদীক্ষায় সাহায্য করার অপরাধে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবারকে পতিত হতে হয়েছিল। শিল্প বিজ্ঞান চর্চার দায়ে পাঞ্চাল ব্রাহ্মণদের শূদ্র বলে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রক্ষিপ্ত বাক্য যোজনা করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে আরো একটা সহস্রাব্দর বদল ঘটলো। স্বাধীন ভারত সরকার এর মধ্যে নটি পাঁচশালা পরিকল্পনা সমাপ্ত করেও নানা সমস্যায় জেরবার। ওই প্রকল্পর দ্বারা দেশে একদিকে মুষ্টিমেয় কোটিপতির জন্ম দিয়েছে, আর একদিকে গরীব আরও গরীব হয়েছে।

বর্তমান সমাজের মধ্যে গোটা ভারতে ছোট-বড় মিলিয়ে কয়েক লক্ষ্য কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে যেগুলির মধ্যে ইংরেজ রাজত্বে সৃষ্ট বহু নামকরা প্রতিষ্ঠানও আছে। বহু কারখানার মালিকানা বদল হয়েছে, বিক্রি হয়েছে।

একদিকে হাই-টেক সুপার পাওয়ারদের দেশে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান, বিশ্বজুড়ে বাজার দখলের লড়াই, আর অন্য দিকে ছোট-ছোট মেসিনটুল বসিয়ে ছোট ছোট কারখানা, মিনি ফ্যাক্টরি, গ্রিলের কারখানা, লেদ-মেসিন বসিয়ে বেঁচে থাকার তীব্র চেষ্টা। তার এক-পাশে হাজার বছর পার করে মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে কাষ্ঠশিল্পী সূত্রধরদের কাঠের ফার্ণিচার তৈরির দোকান, লৌহশিল্পী কর্মকারদের কামারশালা, সোনারূপার দোকান, পেতল-কাঁসার কারখানা, পাথরের ফলক ও থালা-বাটি গেলাস তৈরির দোকান বংশপরম্পরায় আপন ছন্দে চলছেই।

পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়ের দোকানপাটও আছে, যেমন, কুমোরের হাড়ি-কলসী-ফুলের টব ও চায়ের ভাড়ের দোকান, মুদির দোকান, সেলুন, ফল ও ফুলের দোকান প্রভৃতি গ্রাম ও শহরের নিত্যদিনের চিত্র।

এর মধ্যে যাদের অবস্থা ভাল তাদের অনেকেই পুঁজি লগ্নি করে শহরের জমজমাট রাজপথের ধারে চোখ-ধাঁধানো আলোর রোশনাই দিয়ে জুয়েলারীর শোরুম খোলেন, কেউ কাঠের আধুনিক ডিজাইনের আসবারপত্রের দোকান দেন, কেউ বা মৃৎশিল্প চন্দনকাঠ বা হাতির দাঁতের মনকাড়া কারুকাজের পসরা সাজিয়ে বসেন। অনেকে আবার আধুনিক ইলেকট্রনিক গুড্‌স-রেডিও-টিভি-ভিসিপি-ভিসিআর, ঘড়ির জমকালো-শোরুম সাজিয়ে বসেন। তবে এই সংখ্যাটা নেহাতই কম।

তবে শেষ পর্যন্ত মানতেই হয় যে, আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে জাতিগত পেশায় যুক্ত থেকে টিকে থাকা কঠিন ব্যাপার। শুধু পুরুতগিরি করে যেমন দিন চলে না, তেমনি উক্ত শিল্পী সম্প্রদায়ের একই অবস্থা। যারা উচ্চতর বিদ্যার পাঠ শেষ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারলো তো ভালই, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, স্কুল, শিক্ষক, উকিল না হোক, সরকারী দপ্তরের দশটা পাঁচটার একটা কেরানীয় চাকরি জোটাতে পারলে একটা নিশ্চিত জীবন। আর যারা পারলো না পাঠ শেষ করতে, যে কোন কারণে, তারাই বংশপরম্পরা বা উত্তরাধিকার

সূত্রে গ্রহণ করেন জাতিগত বৃত্তিকে। ঋগ্বেদের কাল থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এসেও বলতে পারি, বাঙালি পাঞ্চাল-শিল্পী-সম্প্রদায়ের একটা অংশ এমনি ভাবেই আদি শিল্পগুরু বিশ্বকর্মার প্রবর্তিত লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ও ভবিষ্যতে রাখবেনও।

পাদটীকা

১। রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, শ্রীনাথ দত্ত।
২। অনূদিত।
৩। পণ্ডিত অমূল্যচরণ শর্মা, শাস্ত্রভূষণ, বিশ্বকর্মাকুলচন্দ্রিকা।
৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আদিযুগ, সমাজের কথা।
৫। ঐ।
৬। ঐ।
৭। ঐ।
৮। ঐ।
৯। বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, সমাজের কথা দ্রঃ।
১০। তদেব।
১১। বিশ্বকর্মার সন্ধানে, পৃষ্ঠা ৭ দ্রঃ।
১২। বিশ্বকর্মার সন্ধানে, পৃষ্ঠা ৭ দ্রঃ।
১৩। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ধন-সম্বল দ্রঃ।
১৪। ঐ।
১৫। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ধন-সম্বল।
১৬। ঐ।
১৭। ঐ।
১৮। ঐ।
১৯। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ১৫১ পৃষ্ঠা, দ্রঃ (দে'জ সং)।
২০। ড. সুকুমার সেন, চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য একাডেমি সং, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।
২১। মীরা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বকর্মার সন্ধানে।
২২। ড. মোঃ রফিকুল আলম, উপসমহাদেশের শিল্পকলা, ঢাকা বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩।
২৩। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব ও অতুল সুর, বাংলাব সামাজিক ইতিহাস দ্রঃ।
২৪। ঐ।
২৫। অতুল সুর, বাংলার সামাজিক ইতিহাস, ৯১-৯২ পৃষ্ঠা (১৯৯৮ সং)।
২৬। ঐ।
২৭। মীরা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বকর্মার সন্ধানে গ্রন্থে ভাস্কর মীরা দেবী দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প দেবতার একটা মিল বা একটা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। দেশগুলি হচ্ছে চীন, জাপান, পারস্য, সুমের, মেক্সিকো প্রভৃতি।

নজরুল-সাহিত্যে মানুষ ও ধর্ম

মানস মজুমদার

প্রথমত এবং প্রধানত নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) কবি। তাঁর প্রতিভা মূলত কবির প্রতিভা। স্বল্প পরিমাণ গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ আর নাটক অবশ্য তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সেগুলির ওপর নির্ভর করে না। স্বভাবতই এ আলোচনায় তাই তঁার কবিতা আর গানই বেশি গুরুত্বপ্রাপ্ত।

মানুষের মহিমা-প্রচারে নজরুল অক্লান্ত। 'সাম্যবাদী'র (১৯২৫) 'মানুষ' কবিতায় তাঁর স্পর্ধিত ঘোষণা—'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'। সমাজে-সংসারে, যুগ যুগ ধরে যে মানুষ উপেক্ষিত অবহেলিত সেই মানুষের পাশে দাঁড়ালেন তিনি। মানসিক ভীরুতা, গ্লানি আর দীনতা থেকে মুক্ত করতে চাইলেন। সাহস জোগালেন। উৎসাহ দিলেন। তাদের শক্তিতে ও সামর্থ্যে অপার বিশ্বাস তঁার।

তাকালেন স্বদেশের কৃষককুলের দিকে। লক্ষ লক্ষ কৃষকের দুঃখ-দুর্দশা তাঁর চোখে পড়লো। শতাব্দী-পরম্পরায় এরা বঞ্চিত, উৎপীড়িত, শোষিত। এরা চাষ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায়, কিন্তু জমিতে এদের অধিকার নেই, এরা মালিকানা-স্বত্ব বঞ্চিত। জমিদার আর মহাজন জমির মালিক। তারা কৃষকদের শোষণ করে, ফসলের সিংহভাগ দখল করে; কৃষকেরা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়। নজরুল এ ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইলেন। কৃষককে তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। 'ধর্মঘট' প্রবন্ধে ধ্বনিত হলো তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ঃ 'চাষী সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়-ভাঙা মেহনত করিয়া মাথায় ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়-ভাত খাইতে পায় না, হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা টেনা বা নেঙটা ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা সারা জীবনেও ঘটিয়া উঠে না, ছেলেমেয়ের সাধ আর মান মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া বারমাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবী চালে দিন কাটাইয়া দেন।' (যুগবাণী ঃ ১৯২২)[১]

একদিকে শোষক মানুষ, আর একদিকে শোষিত মানুষ। নজরুল শোষিত মানুষের পক্ষ নেন। শোষক ও শোষিত মানুষের অবস্থা-বৈপরীত্যের তুলনা করেন। শোষক মহাজনদের সমালোচনা করেন। প্রসঙ্গত নজরুলের একটি চিঠির অংশ বিশেষ স্মরণ করা যেতে পারে। তাতে কৃষক ভাইদের সম্বোধন করে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'আপনারাই দেশের প্রাণ, দেশের আশা, দেশের ভবিষ্যৎ। মাটির মায়ায় আপনাদেরই হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর। মাটির খাঁটি ছেলে আপনারাই। রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া দিন নাই রাত নাই সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আপনারাই তো এই মাটির পৃথিবীকে সন্তানদের মত লালন পালন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন..... এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর যে শস্য শ্যামল মাঠ আপনারা আমার কৃষক ভাইরা ছাড়া তাহার অন্য অধিকারি কেহ নাই।'....[২] চিঠিটি ময়মনসিংহ কৃষক-শ্রমিক সম্মেলনে অনুপস্থিত নজরুলের পক্ষ থেকে পড়ে শোনানো হয়। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭-১৮ জানুয়ারি ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমসূত্রে স্মরণযোগ্য 'ফরিয়াদ' (সর্বহারা ঃ ১৯২৬) কবিতার পংক্তিগুচ্ছ, যেখানে শোষক মহাজন ও শোষিত কৃষকের আবির্ভাব ঘটে ঃ

জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাহারাই হন—
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।[৩]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় কৃষক সমাজের দুরবস্থার সঙ্গে তিনি আশৈশব পরিচিত। সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ধর্মঘট' প্রবন্ধে তিনি প্রথম নিপীড়িত কৃষকের পক্ষ নেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ক্রমে মুজফ্ফর আহমেদের সান্নিধ্যে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ তিনি গ্রহণ করেন নি। তাহলেও কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। রুশ বিপ্লব সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। সমাজে মেহনতি মানুষের শ্রমের গুরুত্ব, ধন-বন্টন ব্যবস্থা, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক ইত্যাদি তাঁকে ভাবিয়েছে এবং তাঁর কৃষক-ভাবনা পরিণতি লাভ করেছে। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে কলকাতায় যে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টি গঠিত হয় তার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন তিনি। 'লাঙল' এই পার্টির মুখপত্র। নজরুল পত্রিকাটির প্রধান পরিচালক ছিলেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর 'লাঙল' পত্রিকায় 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টির গঠন-প্রণালী'র উল্লেখে কৃষকদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত দাবি তিনি পেশ করেন তার কয়েকটি হলো—জমিতে কৃষককে কায়েমী স্বত্ব দিতে হবে, উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে, অন্যায় এবং বে-আইনি কাজে আদায় বন্ধ করতে হবে, স্বেচ্ছায় বিনা সেলামিতে জমি হস্তান্তর করার অধিকার রাখতে হবে, গাছকাটা কুয়ো খোঁড়া পুকুর কাটা পাকা বাড়ি তৈরির অধিকার বিনা সেলামিতে দিতে হবে, মহাজনের সুদের চরম হার নির্ধারণ করতে হবে।[৪] দাবি-সনদ থেকে কৃষকদের সম্পর্কে নজরুলের চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুলের কবিতার কৃষকের আলোচনায় এ সমস্ত তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, 'লাঙল' পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের কল্যাণ-সাধন। প্রথম দিকের কয়েকটি সংখ্যায় পত্রিকার শিরোদেশে যে কবিতা পংক্তিটি শোভা পেত, সেটি হলো—'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' কৃষকেরা যে মানুষ, এই কথাটি জাতির মনে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন নজরুল। পত্রিকার ত্রয়োদশ সংখ্যা (২৫ মার্চ ১৯২৬) থেকে অবশ্য চণ্ডীদাসের ঐ পংক্তিটির পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) আশীর্বাণী মুদ্রিত হতে থাকে, যাতে কৃষকের প্রশস্তি কীর্তিত—

জাগো জাগো বলরাম
ধরো তব মরুভাঙ্গা হল।
বল দাও ফল দাও
স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।।

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই আশীর্বাণী। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের মনের কথাটি ধরতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাব্যের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় কৃষক উপেনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। বলদর্পী জমিদারের অত্যাচারের শিকার সে। এ অত্যাচারের প্রতিকারের সাধ্য নেই তার। স্বয়ং জমিদার হয়েও রবীন্দ্রনাথ যে অত্যাচারী জমিদার আর অত্যাচারিত কৃষককে তাঁর

কবিতায় নিয়ে আসেন, এজন্য কিছু বাহবা তাঁর প্রাপ্য বৈকি। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে মান্য করে তাঁকে যে সতর্ক হতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কৃষক উপেনকে জমিদারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহী করে তুলতে পারেন নি।

নজরুল-সমসাময়িক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) 'মরীচিকা'র (১৯২৩) 'মানুষ' ও 'চাষার বেগার' এবং 'মরুমায়া'র (১৯৩০) 'নবান্ন' কবিতায় অত্যাচারিত লাঞ্ছিত দারিদ্র্যপীড়িত কৃষককে পাওয়া গেল। এ কৃষকও সর্বংসহ। কিন্তু নজরুল স্বপ্ন দেখলেন বিদ্রোহের। 'ওঠরে চাষী' (নতুনচাঁদ ঃ ১৯৪৫) কবিতায় কৃষককে তিনি প্রতিবাদী ও সংগ্রামী মূর্তিতে দেখতে চাইলেন—

তোর হাঁড়ির ভাতে দিনে রাতে যে দস্যু দেয় হাত,
তোর রক্ত শুষে হ'ল বণিক, হ'ল ধনীর জাত—
তাদের হাতে ঘূণ ধরাবে তোদেরই ঐ হাড়
তোর পাঁজরার ঐ হাড়ে হবে ভাই যুদ্ধের তলোয়ার।[৫]

নজরুলের সে ডাক ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তীকালে কৃষকেরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। অধিকার সচেতন হয়েছে। দাবি আদায়ে সচেষ্ট হয়েছে। 'তেভাগা আন্দোলন' (১৯৪৬) কৃষককে দিয়েছে যোদ্ধার সম্মান। স্বাধীন ভারতে জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটেছে। দরিদ্র কৃষককুল বর্গা-স্বত্বের অধিকার অর্জন করেছে। কৃষক তার শক্তি ও সামর্থ্য প্রমাণ করেছে।

একদিকে সর্বহারা কৃষক শ্রেণী, অন্যদিকে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিকেরাও শোষণ-পীড়ন লাঞ্ছনা-বঞ্চনা অত্যাচারের শিকার। নজরুল দেখেছেন কোনও এক কুলির অসম্মান। তার অপরাধ সে কুলি, তাই তথাকথিত ভদ্রলোক এক বাবুসাহেব তাকে ট্রেন থেকে নীচে ফেলে দেয়—

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে—
(কুলি-মজুর, সাম্যবাদী ঃ ১৯২৫)[৬]

নজরুল দেখেছেন, 'শ্রমিক-মজুর'[৭]-দের চাল-চুলো নেই, দারিদ্র্য দুঃখে তারা নাজেহাল, তাদের বাসস্থানের মতো তাদের ভাষাও নোংরা, কিন্তু অন্তরে তারা সাদা। তারা অন্নহীন, বস্ত্রহীন। অথচ তাদেরই পরিশ্রমের ফল অন্যেরা ভোগ করে। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটায়। অভাব, ব্যাধি, দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গী। এরা শিক্ষাবঞ্চিত। মানুষের অবিচার আর লাঞ্ছনার শিকার। শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষেরা এদের সঙ্গে নানাভাবে প্রতারণা করে। প্রাপ্য পারিশ্রমিকটুকুও দেয় না।

এদের শ্রম আর ত্যাগেই গড়ে উঠেছে মানুষের সভ্যতা। 'কুলি-মজুর' কবিতায় সেই সত্যটুকু নির্ভুলভাবে চিহ্নিত—

রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো তো এসব কাহাদের দান? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান নাক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে।[৮]

এরা চিনির বলদ, চিনির বস্তা বয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু চিনির স্বাদ পায় না। 'সর্বহারা'-র (১৯২৬) 'শ্রমিকের গান'-এ শ্রমিকদের জবানীতে সেই তিক্ত সত্যের প্রকাশ ঃ

আমরা চিনির বলদ চিনি নে স্বাদ
চিনি বওয়াই সার কেবল।[৯]

নজরুল মেকি শ্রমিক-দরদী ছিলেন না। একসময় রুটির দোকানে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন, শিয়ারশোল স্কুলে পাঠরত অবস্থায় রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা-খনির শ্রমিকদের জীবনযাত্রা নিজের চোখে দেখেছেন, নিছক বইপড়া বিদ্যা নিয়ে এবং ধার করা বুলি আউড়ে তিনি শ্রমিকদের জন্য কলম ধরেন নি। এক্ষেত্রে মাক্সিম গোর্কির সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল আছে। শ্রমিকদের জন্য তাঁর টান ছিল আন্তরিক, যথার্থ। এর প্রমাণ রয়েছে 'লাঙল' পত্রিকায়। ১৯২৫-এর ১৬ ডিসেম্বর 'লাঙল' পত্রিকায় শ্রমিকদের জন্য যে দাবিসমূহ তিনি পেশ করেছিলেন, তাতে চেয়েছিলেন—

১। জীবন-যাত্রার পক্ষে যথোপযুক্ত মজুরীর একটা নিম্নতম হার আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া।

২। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের পক্ষে সপ্তাহে পাঁচদিন খাটুনি চরম বলিয়া আইন করা; নারী এবং অল্প বয়স্ক ছেলেপিলের জন্য বিশেষ শর্ত নির্ধারিত করা।

৩। শ্রমিকগণের আবাস, কাজের শর্ত, চিকিৎসার বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি দাবি মালিকগণকে আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া পূরণ করানো।

৪। অসুখ, বিসুখ, দুর্ঘটনা, বেকার অবস্থা এবং বৃদ্ধ অবস্থায় শ্রমিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন।

৫। সমস্ত বড় কলকারখানার লাভের ভাগে শ্রমিকগণকে অধিকারী করা।

৬। মালিকগণের খরচায় শ্রমজীবীগণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

৭। কলকারখানার নিকট হইতে বেশ্যালয়, নেশার দোকান উঠাইয়া দেওয়া।

৮। শ্রমিকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

৯। শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিকে আইনত মানিয়া লওয়া এবং শ্রমিকদের দাবি-পূরণের জন্য ধর্মঘট করিবার অধিকার স্বীকার করা।[১০]

শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা এবং কল্যাণ সাধনের জন্য নজরুলের এ সমস্ত দাবির যাথার্থ্য অনস্বীকার্য। বেশ বোঝা যায়, তাঁর শ্রমিকভাবনা যথেষ্ট পরিণত ছিল।

নজরুলের কবিতায় শ্রমিককে দু'ভাবে দেখতে হবে। এক, সমকালীন স্বদেশে শ্রমিকের যে রূপটি পরিচিত সেই রূপে তাকে দেখা। সে শ্রমিক দরিদ্র, সে শ্রমিক শোষিত, সে শ্রমিক বঞ্চিত। দুই, সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামী মূর্তিতে শ্রমিককে দেখা। ভাবীকালের শ্রমিকদের যেন নজরুল মানস-নেত্রে প্রত্যক্ষ করলেন। তারা প্রতিবাদী—

তুমি শুয়ে রবে তে-তলার'পরে, আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।

সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।
(কুলি-মজুর ঃ সাম্যবাদী)[১১]

এবং তারা বিদ্রোহী

যে হাতে হাতুড়ি দিয়া গড়িয়াছি প্রাসাদ হর্ম্য-রাজি,
সেই হাত দিয়া বিলাস কুঞ্জ ধ্বংস করিব আজি।
দেয় নাই ওরা পারিশ্রমিক মজুরের শ্রমিকের—
যা দিয়েছে, তাহে মেটেনি মোদের ক্ষুধা তৃষা ক্ষণিকের।
মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্জি শক্ত কর;
গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর।
(শ্রমিক-মজুর)[১২]

অথবা—

যত শ্রমিক শু'ষে নিঙড়ে প্রজা
রাজা উজির মার্‌ছে মজা,
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে।
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দল্‌বিরে আয় মজুর দল।
ধর্‌ হাতুড়ি, তোল্‌ কাঁধে শাবল।।
(শ্রমিকের গান ঃ সর্বহারা)[১৩]

রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবে সে দেশের শ্রমিকদের অগ্রণী ভূমিকা নজরুলের অবিদিত ছিল না। তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই শ্রমিকেরা বাস্তব হয়ে উঠেছে। সংগ্রামী আন্দোলনে নেমেছে। দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়েছে।

ভারতবর্ষ বিপুল সংখ্যক মানুষের বাসভূমি। নানা ভাষার, নানা ধর্মের, নানা বর্ণের, নানা সম্প্রদায়ের মানুষজনের বাস এখানে। বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি বিভেদও আছে। বিভেদ আর অনৈক্যই ভারতবর্ষের বড়ো সমস্যা। এর একটি উৎস হলো, সমাজের উঁচুতলা ও নীচুতলার মানুষজনের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ সন্দেহ ও অবিশ্বাস। প্রথম দলে রয়েছে তথাকথিত 'ভদ্রলোকেরা', অর্থাৎ উঁচুতলার মানুষেরা। দ্বিতীয় দলটি 'ছোটলোকদের', যারা প্রজন্ম-পরম্পরায় উপেক্ষিত ও অবহেলিত। জল-অচল, নীচুজাত, দলিত, হরিজন। দ্বিতীয় দলটিই সংখ্যা-গরিষ্ঠ, এরা শূদ্র জনগণ। উভয় দলের বিভেদ ও অনৈক্য দূর করে, সকলেই ভারতবাসী এই বোধে যদি সকলকে উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করা যেত, তা হলে দেশ শক্তিশালী হতো। ভারতবর্ষের সমাজ-দেহের এই দুষ্ট ক্ষতের প্রতি আঙুল তুলে দেখালেন নজরুল। উঁচুতলার মানুষজনের কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন: 'আজ আমাদের.... সেই শক্তিকে ভুলিলে চলিবে না—যাহাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করিতেছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সে হইতেছে,

আমাদের দেশের তথাকথিত 'ছোটলোক' সম্প্রদায়। আমাদের আভিজাত্য-গর্বিত সম্প্রদায়ই এই হতভাগাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোন যন্ত্র দিয়া এই দুই শ্রেণীর লোকের অন্তর যদি দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ তথাকথিত "ছোটলোক"-এর অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং ঐ আভিজাত্য-গর্বিত তোমাদের "ভদ্রলোক"-এর অন্তর মসীময় অন্ধকার। এই "ছোটলোক"রা এমন স্বচ্ছ অন্তর, এমন সরল মুক্ত উদার প্রাণ লইয়াও যে কোন কার্য করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার। সে বেচারা জন্ম হইতে এই ঘৃণা, উপেক্ষা পাইয়া নিজেকে এত ছোট মনে করে, সঙ্কোচ জড়তা তাহার স্বভাবের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায় যে, সেও যে আমাদেরই মত মানুষ—তাহারও যে মানুষ হইবার সমান অধিকার আছে, তাহা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। যদি কেউ এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে, অমনি আমাদের ভদ্র সম্প্রদায় তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। এই হতভাগাদিগকে—আমাদের এই সত্যিকার মানুষদিগকে আমরা এইরকম অবহেলা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অধঃপতন।' (উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন)[১৪] নজরুল প্রশ্ন তুললেন: 'ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার তোমার কি অধিকার আছে?... তোমার জন্মগত অধিকারটাই কি এত বড়?' (ঐ)

নীচুজাতের মানুষজনের প্রতি উঁচুজাতের মানুষজনের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা নজরুলকে ব্যথিত করেছে। কেন এদের অস্পৃশ্য করে রাখা হবে? অন্ত্যজ বলে ঘৃণা করা হবে? জন্মগত পরিচয়টাকেই কেন বড়ো করে দেখা হবে? এসব প্রশ্ন নজরুলই যে প্রথম করলেন তা নয়। ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে গৌতম বুদ্ধ, নানক, কবীর, রামানন্দ, শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী এদের কথা ভেবেছেন, বিচলিত হয়েছেন; এদের মানুষের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র (১৯১০) 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতায় জাত্যভিমানী অভিজাত ভারতীয় সমাজের রূঢ় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) 'শূদ্র' ও 'মেথর' কবিতায় প্রচলিত সমাজ-মানসিকতার বিরোধিতা করেছেন।

নজরুল আরও উচ্চকণ্ঠ, আরও স্পষ্টবাক। 'সাম্যবাদী'র (১৯২৫) 'মানুষ' কবিতায় তিনি আমাদের জাতপাতের সংস্কারে নাড়া দিলেন ঃ

> ১। ওকে? চণ্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব।
> ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।[১৫]
>
> ২। রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও হেলা কাহারে বাজে
> হয়তো গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে।[১৬]

পুরাণের সাহায্য নিয়ে নজরুল আমাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞাটুকু দূর করতে চাইলেন। অবশ্য তাঁর অজানা ছিল না যে, এত সহজে ঐ ঘৃণা ও অবজ্ঞা দূর করা যাবে না। প্রয়োজন আঘাতের। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই পথই বেছে নিয়েছেন।

জাতপাতের নামে যে অন্ধ সংকীর্ণতা আর বিচারমূঢ়তা সমগ্র ভারতীয় সমাজে শতাব্দী পরম্পরায় আধিপত্য বিস্তার করেছে, নজরুল তার অবসান চাইলেন। বিদ্রূপের কশাঘাতে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ঃ

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছো জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাই তো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ' খান।
এখন দেখিস ভারত-জোড়া
পচে আছিস বাসি মড়া
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কা-হুয়া।
(জাতের বজ্জাতি, বিষের বাঁশি ঃ ১৯২৪)[১৭]

জাতপাতের নামে সমাজে চলেছে অত্যাচার-উৎপীড়ন-লাঞ্ছনা। উঁচুজাতের মানুষের কাছে নীচুজাতের মানুষ প্রতিদিন নিগৃহীত হচ্ছে। এসবই তো বজ্জাতি, অসভ্যতা। সুযোগসন্ধানীর দল জাতপাতের নামে মানুষের জীবনকে নিয়ে যেন জুয়ো খেলছে। ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে চলেছে বাড়াবাড়ি। নীচুজাতের মানুষকে উঁচুজাতের মানুষ অস্পৃশ্য করে রেখেছে, তাদের স্পর্শও নাকি অশুচিকর। জন্মসূত্রেই কি কোনও মানুষ অশুচি অপবিত্র হতে পারে? নীচুজাতের মানুষ ছুঁয়ে দিলেই উঁচুজাতের হুঁকো আর ভাতের হাঁড়ি ফেলে দিতে হবে? তার ব্যবহারযোগ্যতা থাকবে না? আমরা কী বিচারমূঢ়! বাহ্যিক আচার-বিচারের জালে আমরা এমনই বাঁধা পড়েছি যে, পারস্পরিক এই বিভেদ-বিদ্বেষ সমাজকে প্রতিমুহূর্তে দুর্বল করছে। নজরুল প্রশ্ন করলেন, বাহ্যিক আচার-বিচার বড়ো, না মানুষ বড়ো?

জীবন্মৃত নজরুল দেখার সুযোগ পান নি। কিন্তু দেখতে পেলে খুশি হতেন যে, স্বাধীন ভারতবর্ষে তথাকথিত উপেক্ষিত অবহেলিত মানুষজন তাদের হৃত মর্যাদা ক্রমশ ফিরে পাচ্ছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান এদের রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। দেশের আইন এদের সহায়তা করছে। দলিত মানুষজন ক্রমেই অধিকার সচেতন হয়ে উঠেছে। কবির প্রত্যাশা সফল হতে চলেছে।

নারী-সমাজের দিকে তাকালেন। দেখলেন তাদের প্রতি অবজ্ঞা অবিচার আর প্রবঞ্চনার সীমা-পরিসীমা নেই। আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে নারীর স্থান পুরুষের নীচে, সে নাকি নরকের দ্বার, তাই অবজ্ঞার পাত্রী। তার সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করে তাকে অবরোধবাসিনী করে রাখা হয়েছে। তার শ্রম-প্রেম-ত্যাগ আর সেবার কোন মূল্যই দেয় না পুরুষসমাজ—

শস্যক্ষেত্র উর্বর হ'ল, পুরুষ চালাল হল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
(নারী ঃ সাম্যবাদী)[১৮]

তার এই শ্রমের যোগ্য মর্যাদা কি সে পেয়েছে?

পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা ল'য়ে—নারী যোগায়েছে মধু। (ঐ)[১৯]

অথচ তাকেই 'নরককুণ্ড' বলে উপেক্ষা করা হয়েছে—

> জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
> মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান। (ঐ)[২০]

কবির চোখে পড়ে—

> কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
> কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নেই তার পাশে। (ঐ)[২১]

এই ত্যাগের কি কোনও মূল্য নেই? কবি প্রশ্ন করেন—

> কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
> বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কে বা? (ঐ)[২২]

হাতে রুলি আর পায়ে মল পরানো তো আসলে শিকল পরানোরই নামান্তর। পুরুষশাসিত সমাজে তাদের দাসীর ভূমিকা। তা তো শ্রদ্ধাযোগ্য নয়। নয় সমর্থনযোগ্যও। অথচ আমরা জ্ঞানের গানের ও শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনা করেছি। নারীর বিরহ-মিলন নিয়ে কাব্য-কবিতা রচনা করেছি। একদিকে ভাবজগতে নারীকে মহিমামণ্ডিত করেছি, অন্যদিকে বাস্তব জগতে তাকে উপেক্ষা করেছি। রীতিমতো অসংগতি বৈকি।

নজরুল দাসত্ব থেকে নারীর মুক্তি চেয়েছেন। নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রেও তিনি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রেরই উত্তরসূরী। স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীসমাজ এগিয়ে এসেছে। সমাজ-মানসিকতার এই পরিবর্তনে নজরুলের মতো কবিদেরও যে ভূমিকা রয়েছে তা স্বীকার করতেই হয়।

শুধু কুলাঙ্গনাদের কথাই যে ভেবেছেন তা নয়, বারাঙ্গনাদের কথাও ভেবেছেন। সমাজ প্রচলিত সতীত্বের মাপকাঠি কতখানি নির্ভরযোগ্য, সে প্রশ্ন তিনি তুলেছেন। শরৎচন্দ্রও এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, সতীত্ব বাইরের ব্যাপার নয়, অন্তরের সতীত্বই হলো আসল সতীত্ব। পরিচিত সমাজজীবন থেকে তিনি তাঁর কাহিনীর মাল-মশলা সংগ্রহ করেছিলেন। অন্যদিকে নজরুল পুরাণ থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করে আমাদের সতীত্ব-ধারণায় ঘা দিতে চেয়েছেন। ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে বারাঙ্গনাদের দেখেন নি তিনি। *সাম্যবাদীর* 'বারাঙ্গনা' কবিতায় বারাঙ্গনাদের প্রতি তাঁর ঔদার্যই প্রদর্শিত। এই ঔদার্যের সঙ্গে মিশে রয়েছে মমত্ব ও সহানুভূতি। নজরুল দেখলে খুশি হতেন, এ বিষয়ে একালে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক প্রসারিত। সমাজে এদের যথাযোগ্য পুনর্বাসন নিয়ে বিভিন্ন স্তরেই ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে।

নজরুল মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যে আস্থাবান। মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনায় তিনি ব্যথিত। মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার উৎপীড়ন উপেক্ষা অবজ্ঞায় তিনি ক্ষুব্ধ। এসবের বিরুদ্ধেই তাঁর প্রতিবাদ। দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-উৎপীড়নমুক্ত এক সুস্থ সবল সমাজই তাঁর কাম্য। মানুষকে দাসত্ব এবং পরাধীনতা থেকে তিনি মুক্ত করতে চান। মানুষকে তিনি দেখেছেন গোষ্ঠীগত ভাবে। কৃষক, শ্রমিক, শূদ্র, নারী, বারাঙ্গনা এ সমস্ত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে তিনি বেছে নিয়েছেন কবিতার বিষয়

হিসেবে। সমাজে এরা উপেক্ষিত, উৎপীড়িত। নজরুল উৎপীড়নকারীদের শনাক্ত করেছেন। কৃষকদের দুর্দশার হেতু জমিদার-মহাজনেরা। শ্রমিকেরা মালিকদের নির্যাতনের শিকার। জমিদার-মহাজন-কারখানা মালিক সকলেই বুর্জোয়া বা পরশ্রমজীবী। নজরুল শ্রমজীবী ও পরশ্রমজীবীদের সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। শ্রেণী-সংগ্রামের ডাকও তিনি দিয়েছেন। মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে তিনি যে পরিচিত ছিলেন, তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু মতবাদ তাঁর কবিতায় গুরুভার হয়ে ওঠেনি। শূদ্র-প্রসঙ্গে জাতপাতের বিরুদ্ধে সোচ্চার তিনি। নীচুজাতের প্রতি উঁচুজাতের ঘৃণা ও বিদ্বেষের উচ্ছেদ চান তিনি। সমাজের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীগত বিরোধ-বৈষম্যে সমাজ যে দুর্বল হয় তা দেখিয়েছেন। 'নারী' কবিতায় নারী-পুরুষের বৈষম্যটুকু দূর করে নারীর প্রাপ্য অধিকারটুকু আদায় করতে চেয়েছেন। নারী-পুরুষের যৌথ প্রয়াসেই সমাজ শক্তিশালী হতে পারে এ ধারণা পোষণ করেছেন। 'বারাঙ্গনা'য় বারাঙ্গনাদের প্রতি রক্ষণশীল সমাজের মনোভাব পরিবর্তনের প্রয়াসী তিনি। তারাও মানুষ, 'মাতা-ভগিনীরই জাতি', এবং মানুষের মর্যাদা তাদের দেওয়া উচিত, একথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

'আদিকালে বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের যখন কোনও জ্ঞান ছিল না, তখন ধর্মই তাকে তার জীবনের সমস্যাবলীর সমাধানে কাজে পরিচালিত ও সাহায্য করেছে। ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেই মানুষ তার চেয়ে শক্তিশালী বলে কথিত অতিপ্রাকৃত সত্তার সাহায্য কামনা করেছে। ইহলোকের অবস্থা পরিবর্তনে ব্যর্থতা তার মনে সৃষ্টি করেছে এমন এক পরলোকে বিশ্বাস ও কল্পনা, যেখানে তার সব অপূর্ণ আশা-আকাঙক্ষা পূর্ণ হবে।

ধর্মের দুটি দিক আছে—বিশ্বাস ও কর্ম। বিশ্বাস বলতে বোঝায় জীবন পরিচালনা ও কল্যাণসাধনাসহ সেইসব মৌল ধারণা, যেগুলো সব ধর্মে সমানভাবে উপস্থিত। সুতরাং বলা যায়, ধর্মের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের কল্যাণসাধন। আর এ লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে ধর্ম মানুষের সামনে উপস্থাপিত করছে কতিপয় ধারণা ও মূল্যমান। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন সময়ের জীবনাবস্থা অনুযায়ী দেশান্তরে ও কালান্তরে বিভিন্ন ধর্মের আচরণ ও অনুশীলন ভিন্নতর হয়ে থাকে। ধর্মে ধর্মে যে তিক্ত বিরোধ ও সংঘর্ষ লক্ষ্য করা যায়, এ সবেরই মূলে রয়েছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞের পার্থক্য।' সাইদুর রহমান তাঁর 'An Introduction to Islamic Culture and Philosophy' গ্রন্থে এভাবে ধর্মের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন।[২৩]

নজরুল যে ধর্মের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন, তা তাঁর সাহিত্য থেকে বেশ বোঝা যায়। জন্মসূত্রে তিনি মুসলমান। বাল্যে গ্রামের মাজারে খাদেমগিরি করেছেন, মসজিদে মোল্লাগিরি। ধর্মমতে ইসলামপন্থী। কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি বর্জিত। উদার ও সহিষ্ণু। এই ঔদার্য ও সহিষ্ণুতার একাধিক উৎস। তাঁর পিতার ধর্মীয় সহিষ্ণুতা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। বাল্যে বাউল সুফী বৈষ্ণব ও সাধু-সন্ন্যাসীদের সাহচর্য তাঁর ধর্মবোধকে প্রসারিত করেছিল। শিয়ারশোল স্কুলের শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের সান্নিধ্যও এবিষয়ে তাঁকে সহায়তা করেছিল। নিবারণচন্দ্র ছিলেন বিপ্লবী। 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত। সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁকে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হতে শিখিয়েছিল। সৈনিকদের মধ্যে ছিল নানা ধর্মের মানুষ। হাফিজ ও

ওমর খৈয়াম এই দু'জন কবি তাঁর প্রিয় ছিলেন। মধ্যযুগে ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে আর্বিভূত হয়েও তাঁরা ছিলেন মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনচিন্তার অধিকারী। 'নজরুল এঁদের দর্শনের সান্নিধ্যে এসেই সম্ভবত অধিকতর জীবনবাদী, যুক্তিবাদী, মানবিক, উদার, পরমতসহিষ্ণু ও সংস্কারমুক্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পান ও ধর্মীয় বিধিবিধানের সমালোচনায় সাহসী হয়ে ওঠেন'।[২৪] রুশ বিপ্লব এবং কমিউনিস্ট মতাদর্শও তাঁর মনে প্রভাব ফেলেছিল। ফলে ধর্ম ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি হয়ে উঠেছিল উদার ও স্বচ্ছ। তিনি মনে করতেন, ধর্মের উদ্দেশ্য লোককল্যাণ। প্রকৃত ধর্ম কখনও মানুষকে অবজ্ঞা করতে পারে না। সেবা, প্রেম, করুণা ধর্মের অঙ্গ। মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। বাহ্যিক আচার-বিচারে ধর্ম নেই। ধর্মের মূল অনেক গভীরে।

ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে আক্রমণ করেছিলেন ওমর খৈয়াম—

ভণ্ড যত ভড়ং ক'রে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ,
চায় না খোদায়—লোকের তারা প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ।
দিব্যি আছে মুখোশ প'রে শুধু ফকির ধার্মিকের,
ভিতরে সব কাফের ওরা, বাইরে মুসলমানের সাজ।
(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, ১৩৫ সংখ্যক)[২৫]

আর নজরুল বললেন—

নামাজ রোজার শুধু ভড়ং,
ইয়া উয়া প'রে সেজেছ সং
ত্যাগ নাই তোর একছিদাম।
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কর জড়,
ত্যাগের বেলায় জড়সড়।
তোর নামাজের কি আছে দাম?
(শহীদী ঈদ ঃ ভাঙার গান ঃ ১৯২৪)[২৬]

নতুন চাঁদ-এর (১৯৪৫) 'কৃষকের ঈদ' কবিতায় নজরুলের কণ্ঠস্বর শ্লেষতীক্ষ্ণ—

নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ জানি,
হায় তোতা পাখি। শক্তি দিতে কি পেরেছে একটুখানি?[২৭]

মন্দির মসজিদ গির্জায় গেলেই কি ধর্ম হয়? নজরুল তা মানেন না। তাঁর মতে, প্রকৃত মসজিদ গির্জা আছে মানুষের হৃদয়ে—

মসজিদ এই মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
(মানুষ ঃ সাম্যবাদী ঃ ১৯২৫)[২৮]

হৃদয় দিয়ে সত্যকে চেনো, সত্যকে জানো। তা হলেই ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করবে। কারণ, 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।' (সাম্যবাদী)[২৯]

স্মরণযোগ্য, ওমর খৈয়ামও বলেছিলেন ঃ

নহে ঐ এক হিয়ার সমান
হাজার কাবা হাজার মসজিদ
(ওমর খৈয়াম-গীতি, ৫ সংখ্যক)[৩০]

আর মদন বাউল বলেছেন ঃ 'তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।'[৩১]

মন্দির-মসজিদ আর মোল্লা-পুরোহিতের ওপর আস্থা নেই কবির। কবি দেখেন, ক্ষুধার্ত মানুষটি মন্দির-মসজিদের দরজা থেকে ফিরে যায়। দেহ তার শীর্ণ, বস্ত্র তার জীর্ণ। পূজারী অথবা মোল্লা সাহেব কেউ তার করুণ আবেদনে সাড়া দেয় না। ক্ষুধার্ত মানুষটির মুখের সামনে মন্দির-মসজিদের দরজা বন্ধ হয়। নজরুল ক্রুদ্ধ হন। প্রবল প্রতিবাদ জানান ঃ

খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা।
হায়রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।
(মানুষ ঃ সাম্যবাদী ঃ ১৯২৫)[৩২]

ধর্মের সেবককে মানুষের সেবক হতে হবে। ক্ষুধার্ত মানুষকে মন্দির-মসজিদের দরজা থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে ধর্ম নেই। এতো নীচতারই সামিল। অন্যত্র কবি বলেছেন ঃ 'মানুষের কল্যাণের জন্য ঐ-সব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই।'
(মন্দির-মসজিদ ঃ রুদ্রমঙ্গল ঃ ১৯২৬)[৩৩]

মানুষের চেয়ে ধর্মশাস্ত্র বড়ো হতে পারে না। মানুষের প্রয়োজনেই ধর্মশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজনে মানুষ নয়। মানুষকে ঘৃণা করে ধর্মশাস্ত্র যখন প্রাধান্য পেতে চায় কবিকে তখন প্রতিবাদ জানাতেই হয়—

মানুষেরে ঘৃণা করি,
ও' কারা কোরাণ, বেদ বাইবেল, চুম্বিছে মরি মরি।
ও' মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে। (ঐ)[৩৪]

কবি স্মরণ করিয়ে দেন ঃ

পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।—মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ,—গ্রন্থ আনে কি মানুষ কোনো। (ঐ)[৩৫]

ধর্মগ্রন্থের পুজো করে কী হবে? মানুষের সেবা করো। প্রকৃত ধর্ম-সন্ধানীকে নজরুল বিভ্রান্ত হতে নিষেধ করেন। আদর্শটি পুরনো। গৌতম বুদ্ধ, যিশু, হজরত মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য থেকে উনিশ শতকের স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত অনেকেই সেকথা বলেছেন।

শাস্ত্র-পুঁথিতে নয়, নিজের মনের মধ্যে তাঁকে খোঁজো—

কেন খুঁজে ফের' দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।
(সাম্যবাদী ঃ সাম্যবাদী)[৩৬]

অথবা—

শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু-জলে।
(ঈশ্বর ঃ সাম্যবাদী)[৩৭]

আমাদের সমাজে ছোঁয়াছুঁয়ির বড়ো উৎপাত। যুক্তি-বুদ্ধির ধার ধারি না, অন্ধ বিশ্বাসে আস্থা। কোনো মুসলমানের স্পর্শেই কি হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হয়? ধর্ম এত ঠুনকো নয়। নজরুলও এ মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নন। 'ছুঁৎমার্গ' প্রবন্ধে তিনি তাই বলেন ঃ "হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়াছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোনো ধর্মেরই অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কোন ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কেননা একটা ধর্ম কখনো এত সঙ্কীর্ণ, অনুদার হইতেই পারে না। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য।....ছুঁৎমার্গ যখন ধর্মের অঙ্গ নয়, তখন নিশ্চয়ই ইহা মানুষের সৃষ্টি বা খোদার উপর খোদকারী।....

মানুষ হইয়া মানুষকে কুকুর বিড়ালের মত এত ঘৃণা করা—মনুষ্যত্বের ও আত্মার অবমাননা করা নয় কি?" (যুগবাণী ঃ ১৯২২)[৩৮] ধর্মকে উপলক্ষ্য করে যে সাম্প্রদায়িতার উদ্ভব, নজরুল তার বিরোধী ছিলেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যে সমাজকে দুর্বল করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান বাড়ায়, নজরুল সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা তাঁর প্রশ্রয় পায় নি। জীবনে-কর্মে, বাক্যে-আচরণে ও রচনায় তিনি তার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন।

যে গ্রামে তিনি জন্মেছেন, সে গ্রামটি হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত। উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। আজীবন উভয় সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর ব্রত।

বহু শতাব্দীব্যাপী পাশাপাশি বসবাস সত্ত্বেও অদৃশ্য একটি ব্যবধানের দেওয়াল দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে। নজরুল এই দেওয়ালটি ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিদেশী শাসক, ধান্ধাবাজ রাজনীতিবিদ এবং সুচতুর মোল্লা-পুরোহিতের দল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস, ঘৃণা ও অবজ্ঞা জিইয়ে রাখতে চায়। এর ফলে দেশের সংহতি ও ঐক্য বিনষ্ট হয়। নজরুল এই বিভেদ-বিরোধের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। দুটি সম্প্রদায়কে কাছাকাছি আনতে চেয়েছেন। 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান' এই ছিল তাঁর উপলব্ধি। ১৯২৬-এর এপ্রিলে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হলে 'মন্দির-মসজিদ' প্রবন্ধে তিনি তাই আমাদের নির্বুদ্ধিতার নিন্দা করে শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আমাদের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করেন ঃ 'মারো শালা কাফেরদের।' আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপরে মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা-কালীর 'প্রেষ্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম—তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে 'বাবাগো, মাগো'—মাতৃপরিত্যক্ত দুটি ভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাদের মাকে ডাকে।

দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না। মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না।

শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।' (রুদ্রমঙ্গল ঃ ১৯২৬)[৩৯] ধর্মের উন্মাদনায় সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে মানুষেরই যে ক্ষতি হয়, নজরুল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।

১৯২৬-এর ২২ মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সম্মেলনে নজরুল যে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাতেও সাম্প্রদায়িতার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' সেই সঙ্গীত। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় দেশ তখন ক্ষতবিক্ষত। নজরুল তাই সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আহ্বান জানান ঃ

'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী। বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।
(কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ঃ সর্বহারা ঃ ১৯২৬)[৪০]

হিন্দু বা মুসলমান পরিচয়ে নয়, মানুষকে মানুষের পরিচয়েই দেখতে চেয়েছেন নজরুল। 'মন্দির-মসজিদ' প্রবন্ধেও তাই বলেছেন ঃ 'নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন দেখি, একটা লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ প্রশ্ন করবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান। একজন মানুষ ডুবছে, এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটি হিন্দু—তার জন্য তো তার আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। তার মন বলে, আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি—আমারই মত একজন মানুষকে।' (রুদ্র মঙ্গল ঃ ১৯২৬)[৪১]

'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে নজরুলের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মনোভাব আরও তীক্ষ্ণ, আরও সোচ্চার ঃ 'একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন ঃ "দেখ, যে ন্যাজ বাইরের তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?" প্রশ্ন করেছিলাম, এই যে ভিতরের ন্যাজ, এর উদ্ভব কোথায়? আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে। টিকিপুর ও দাড়িস্থানই বুঝি এর আদি জন্মভূমি। পশু সাজবার মানুষেব একি 'আদিম' ও দুরন্ত ইচ্ছা। ন্যাজ গজাল না বলে তারা টিকি ও দাড়ি গজিয়ে যেন সান্ত্বনা পেল।' (রুদ্রমঙ্গল ঃ ১৯২৬)[৪২]

'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' (ফণি-মনসা ঃ ১৯২৭) কবিতায় ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে বিচলিত হয়েছেন নজরুল ঃ

কে কাহারে মারে, ঘোচে নি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার।
উদিবে অরুণ, ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বন্ধ করিয়া দ্বার।
ভারত-ভাগ্য করেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার।[৪৩]

নজরুল চেয়েছিলেন, দুটি সম্প্রদায়ের বিভেদ-বিদ্বেষের অবসান। চেয়েছিলেন, পারস্পরিক সম্প্রীতি। ধর্ম যেন প্রতিবন্ধকতা না করে। ১৯২৯-এর ১৫ ডিসেম্বর অ্যালবার্ট হলে (একালের

কলেজস্ট্রীটের কফি হাউস) তাঁকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয় তার প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ 'কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি'।[৪৪]

স্মরণযোগ্য, ব্যক্তিগত জীবনাচরণেও তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তিনি হিন্দুকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। পুত্রদের নামকরণেও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। যেমন ঃ কৃষ্ণ মহম্মদ, অরিন্দম খালেদ (ডাকনাম ঃ বুলবুল), কাজী সব্যসাচী (ডাকনাম ঃ সানি। সান ইয়াৎসেনের সংক্ষেপকরণ), কাজী অনিরুদ্ধ (ডাকনাম ঃ লিনি। লেনিনের সংক্ষেপকরণ)। স্মরণযোগ্য, তাঁর কবিতা ও গানে যুগপৎ হিন্দু ও ইসলামী পুরাণ-প্রসঙ্গ এবং চরিত্রের অবতারণা ঘটেছে। যেমন:

১. আমি ব্যোমকেশ, ধরি' বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর

২. ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'।

(বিদ্রোহী ঃ অগ্নিবীণা ঃ ১৯২২)[৪৫]

তাঁর রচনায় আরবী ফারসী শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন না তিনি। একটি চিঠিতে তাই লিখেছেন ঃ "বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেবদেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এই সংস্কারে আঘাত দেবার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেবদেবীর নাম নিই।"[৪৬]

নজরুল একদিকে ইসলামী সঙ্গীত রচনা করেছেন, অন্যদিকে শ্যামাসঙ্গীত। যেমন ঃ

১. তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে।।
যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে।।

(জুলফিকার ঃ ১৮ সংখ্যক ১৯৩২)[৪৭]

২. কে পরালো মুণ্ডমালা আমার শ্যামা মায়ের গলে।
সহস্রদল জীবন-কমল দোলেরে যার চরণতলে।।
কে বলে মোর মাকে কালো মায়ের হাসি দিনের আলো।
মায়ের আমার গায়ের জ্যোতি গগন পবন জলে স্থলে।।

(রাঙাজবা ঃ ১৪ সংখ্যক ঃ ১৯৬৬)[৪৮]

এভাবেই সাম্প্রদায়িক মিলনের প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে এজন্য তাঁকে কম বিব্রত হতে হয়নি। যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু আপস করেন নি। 'আমার কৈফিয়ৎ' (সর্বহারা ঃ ১৯২৬) কবিতায় ঈষৎ কৌতুকের সুরে বরং নিজের দুরবস্থার পরিচয় দিয়েছেন ঃ 'যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি, নাড়ি' কাছা'।[৪৯] একদিকে অসহিষ্ণু মৌলবীদের বিরক্তি ঃ 'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে।'[৫০] অন্যদিকে

গোঁড়া হিন্দুদের বিরূপতা; 'হিন্দুরা ভাবে, পার্শী শব্দে কবিতা লেখে ও পা'ত-নেড়ে।'[৫১] নজরুল নাচার। পাজিই বলুক, আর 'পাতি-নেড়ে'ই বলুক—আপন সংকল্পে অটল তিনি।

নজরুলকে তাই বিশেষ কোনও ধর্মের কবি বলা চলে না। ধর্মনিরপেক্ষ সুস্থ-সুন্দর সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন মানবতাবাদের উজ্জ্বল প্রতীক তিনি। তিনি তাই বলতে পেরেছেন ঃ

কাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম নেশা,
ধ্বংস করেছি ধর্ম-যাজকী পেশা।
ভাঙি' মন্দির, ভাঙি' মসজিদ
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত
এক মানবের একই রক্তে মেশা
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা।
(শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র ঃ প্রলয়শিখা ঃ ১৯৩০)[৫২]

তিনি বিশ্বাস করতেন ঃ

সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর
এ বিশ্ব-মায়ের ঘর
মায়ের ছেলে সবাই সমান,
তাঁর কাছে নাই আত্ম-পর।
(জাতের বজ্জাতি ঃ বিষের বাঁশি ঃ ১৯২৪)[৫৩]

স্মরণযোগ্য তাঁর স্বীকারোক্তি—'যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।'[৫৪]

তাঁর ধর্ম মানবতা। মনুষ্যত্ব ও বিবেকই তাঁর কাছে ধর্মের মাপকাঠি। মোল্লাতন্ত্রও নয়, পুরোহিততন্ত্রও নয়, নজরুল হচ্ছেন মানবতন্ত্রের ভাষ্যকার। এজন্যেই তাঁর সাহিত্যের কোথাও কোরানে-পুরাণে লাঠালাঠি নেই। নেই বেদ-বাইবেলে সংঘাত।[৫৫]

উল্লেখপঞ্জি

১. সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ-এ প্রথম প্রকাশিত। ১৯২০। দ্রঃ নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৮১৬।

২. লাঙল, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৭ মাঘ ১৩৩২, জানুয়ারি ২১, ১৯২৬, বৃহস্পতিবার।

৩. নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ২৯০।

৪. কল্পতরু সেনগুপ্ত, জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯২, পৃ. ৬৮–৬৯।

৫. নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ৩১-৩২।

৬. নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ২৪৬।

৭. নজরুল-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২৪।
৮. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬।
৯. তদেব, পৃ. ২৮৩।
১০. কল্পতরু সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৮।
১১. নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৪৬।
১২. নজরুল-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ৫২৫।
১৩. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২।
১৪. শ্রেষ্ঠ নজরুল, আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত, অবসর প্রকাশন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৪৭-৪৪৮।
১৫. নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ২৩৬।
১৬. তদেব।
১৭. তদেব, পৃ ১১৬।
১৮. তদেব, পৃ. ২৪২।
১৯. তদেব, পৃ. ২৪১।
২০. তদেব, পৃ. ২৪২।
২১. তদেব, পৃ. ২৪২।
২২. তদেব, পৃ. ২৪২।
২৩. মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, রূপান্তর ও সম্পাদনা : ড. আমিনুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৬-৭।
২৪. মোহম্মদ হারুন অর-রশীদ, *নজরুল সাহিত্যে ধর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ ১৩।
২৫. নজরুল-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ১২৯।
২৬. নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ২৫৪।
২৭. তদেব, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৭, পৃ. ৪৩।
২৮. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩।
২৯. তদেব, পৃ. ২৩৩।
৩০. তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩।
৩১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১০৪৩।
৩২. নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ২৩৫।
৩৩. তদেব, পৃ. ৭০৬।
৩৪. তদেব, পৃ. ২৩৫।
৩৫. তদেব।
৩৬. তদেব, পৃ. ২৩৩।
৩৭. তদেব, পৃ. ২৩৪।

৩৮. নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ৮২২-৮২৩।

৩৯. তদেব, পৃ. ৭০১।

৪০. নজরুল-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৯৬৯, পৃ. ৩৭।

৪১. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০৭।

৪২. তদেব, পৃ. ৭০৬।

৪৩. নজরুল-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।

৪৪. তদেব, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ. ৯১।

৪৫. নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৮-৯।

৪৬. অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে লেখা চিঠি (৩০ সংখ্যক চিঠি)। তদেব, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ৪০০।

৪৭. নজরুল-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩২।

৪৮. নজরুল-রচনাসম্ভার, ২য় খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৩৮।

৪৯. নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৯৩।

৫০. তদেব, পৃ. ২৯৩।

৫১. তদেব।

৫২. নজরুল-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৩৮৪।

৫৩. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০।

৫৪. প্রতিভাষণ, ১৯২৯ ডিসেম্বর ১৫। অ্যালবার্ট হল। সংবর্ধনার উত্তরে। তদেব, ৪র্থ খণ্ড, নতুন সংস্করণ, পুণর্মুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃ. ৯১।

৫৫. মোহম্মদ হারুন অর-রশীদ, নজরুল সাহিত্যে ধর্ম, পৃ. ১০৭।

লোকসাহিত্যের ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' (১৩১৪) গ্রন্থটি যেমন উক্ত বিষয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ ভাবনাচিন্তার একমাত্র ফসল নয়, তেমনি এই বই-এ 'কবি-সংগীত'-এর মতো এমন বিষয়ের আলোচনাও স্থান পেয়েছে, বিশেষজ্ঞরা যাকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হবেন না। অন্যপক্ষে 'ছেলেভুলানো ছড়া' বা 'গ্রাম্যসাহিত্য'-র বাইরেও লোকসাহিত্যের বিচিত্র প্রসঙ্গ নিয়ে কমবেশি আলোচনা করেছেন তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে, যা গ্রন্থভুক্ত হয়নি। ব্রতকথা কথকতা রূপকথা বাউল এবং অন্যান্য লোকসংগীত, যাত্রাগান, মৈমনসিংহগীতিকা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তাঁর ছোটবড়ো আলোচনাগুলি 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হতে পারত। তেমনি বাদ পড়তেই পারত 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধটি।

রবীন্দ্রনাথ যাকে গ্রাম্যসাহিত্য বলেছেন তার বিচারেও কবিগান তো তা নয়; অতএব 'লোকসাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত হবার পক্ষে তার কোনো দাবি খুঁজে পাওয়া ভার। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ভাবনায় আপাত-দ্বিধার আভাস লক্ষ্য করাও যেতে পারে। অন্তঃস্বভাবে কিংবা বহিঃপ্রকৃতিতে প্রাচীন সাহিত্যের মিশাল থাকলেও কবিগানের রচনাশৈলী ভারতচন্দ্রের উত্তরকালে—ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বৈতিহ্যবাহী। 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধেই এই ধরনের রচনাকে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।[১] অন্যপক্ষে 'বাংলা কাব্যপরিচয়' (১৯৩৮) সংকলনে কবিওয়ালা এমন কি ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত সন্নিবিষ্ট হয়েছেন প্রাচীন পর্বে, বাউলগানের আগে। এই বিন্যাস নিশ্চয়ই কবির মতেও কালানুক্রমিক ছিল না। 'অক্সফোর্ড বুক অফ্ বেঙ্গলি ভার্স' সংকলনের প্রসঙ্গেও দেখেছি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠিতে ওই সব রচনাকে প্রাচীন পর্বে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও একই সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন কবিওয়ালারাও ঈশ্বর গুপ্তের কালের এবং ওই ভাবনাসূত্রে গুপ্তকবিও প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে যান। মনে হয় এই চিন্তাটা প্রধানতঃ বিদেশী পাঠকদের দিকে তাকিয়েই। রবীন্দ্রনাথের মূল ঐতিহাসিক ধারণা তাতে বিচলিত হয়নি। সুতরাং কবিগানে গ্রাম্যসাহিত্যের আদল কিছু এসেগিয়ে থাকলেও কিংবা 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করলেও, বর্তমান আলোচনায় বিশেষ বিবেচনার পক্ষে তা প্রাসঙ্গিক নয়।

লোকসাহিত্য সম্পর্কিত সাহিত্যিক ধারণা যথেষ্ট স্বচ্ছ না হলেও ইংরেজি 'Folk Lore' শব্দের অন্যতম বিকল্পরূপেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উন্নততর সমাজের প্রত্যন্তবর্তী অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জনগোষ্ঠীর ধারণাই ইংরেজি অভিধানে 'Folk' শব্দের দ্বারা সূচিত হয়েছে।[২] সেইসঙ্গে শিক্ষা-প্রভাবিত পরিশীলনহীন স্বতঃস্ফূর্তি ও ব্যক্তিসচেতনতা-রহিত সংঘচেতনাও লোকসমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে বিজ্ঞানীরা নির্দেশ করে থাকেন। আর লোকসাহিত্য একান্তভাবে লোকজীবনের ফসল। এই সাহিত্যে তাই 'সর্বায়ব গোষ্ঠী মানসের পরিচয়' প্রত্যাশিত। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি নিরপেক্ষতার জন্যে, ব্যক্তির রচনাতেও সেখানে সমগ্র সংঘমানসের অখণ্ড প্রতীতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া সম্ভবত একেবারে প্রাথমিক স্তরের 'আক্ষরিক জ্ঞান (literacy)-হীনতা'ই লোকসাহিত্যের মৌখিক (oral tradition)-রূপটিকে গড়ে দিয়েছিল। জ্ঞানপ্রকর্ষের (sophistication) অভাব তার একটা প্রধান

লক্ষণ বলে বিবেচিত হলেও, লোকজীবনের ক্রমিক বিবর্তন, তথা উন্নততর সমান্তরাল ভাবনার সংক্রমণ সূত্রে তাতে ক্রমশ বিচিত্রমাত্রার বিমিশ্রতারও সঞ্চার ঘটে। এই সব কথা বিবেচনা করেই হয়ত জটিল এই সাহিত্য চরিত্রটির খুব স্থূল সংক্ষিপ্ত পরিচয় ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে একটি মাত্র বাক্যে ঃ—"লোকসাহিত্য হচ্ছে কোন এক অখণ্ড সমাজের অলিখিত সাহিত্য।"[৩] রবীন্দ্রনাথও জানতেন লোকসাহিত্যের একটা প্রধান লক্ষণ তার অলিখিত মৌখিক রূপ। পরিণত বয়সে তিনি লিখেছেন—"প্রচলিত লোকসাহিত্যে গ্রন্থ স্বত্ব থাকে না, মুখে মুখে তার ব্যবহার চলে, নানা হাতের ছাপ পড়ে, তবু মোটের উপর তার ঐক্যধারা নষ্ট হয় না।"[৪] রবীন্দ্রনাথ একথা লিখেছিলেন ১৯৩৮ সালে; পণ্ডিতমহলে লোকসাহিত্যের আলোচনার সূত্রপাত তখন হয়ে গেছে। কিন্তু 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি লেখার সময় (১৩০১-১৩০৫) এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তার কোনো পরিবেশই তৈরী হয়নি। বর্তমান আলোচনায় একথা স্মরণ রেখেই এগোতে হবে।

লোকসাহিত্যের সন্ধানে উপকরণ-সংগ্রহ হল প্রথম কাজ, সেই কর্মে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোধা। দ্বিতীয় স্তরে দরকার লোকসাহিত্যের বিচার ও মূল্যায়ন। এব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব গুণে ও পরিমাণে একালেও অকল্পনীয়। লোকসাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বাংলাদেশে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রথম পথচারীর। তা সত্ত্বেও সীমিত সংগ্রহের সম্বল নিয়ে এই কাজে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন। কেননা লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ব্যাপারে সেকালে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করলেও এর ব্যাখ্যা-বিচার-বিশ্লেষণে অবনীন্দ্রনাথের মত দু'একজন ছাড়া অনেকেই অগ্রসর হতে পারেন নি। এ-বিষয়ে তাঁর মননশীল চিন্তা আজও সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। লোকসাহিত্যের পরম্পরা, সাহিত্য হিসেবে তার মূল্য, লোকসাহিত্যে সমাজ-ইতিহাসের অনুসন্ধান ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর যে অবধান ছিল, তারই দফাওয়ারি একটা ছবি স্পষ্ট করে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতে—

ক) এক সহজ স্বাভাবিক কাব্যরসে লোকসাহিত্য ভরপুর।

খ) এবং সে রসাবেদন চিরকালীন।

গ) প্রায় ক্ষেত্রেই লোকসাহিত্যের রচয়িতাদের পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা লোকসাহিত্যের উৎপত্তি বা সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত।

ঘ) লোকসাহিত্যের মধ্যে সচল একটি প্রবাহমানতা আছে; দেশকাল অনুযায়ী তা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

ঙ) লোকসাহিত্যে মাঝে মধ্যে দুর্বল কল্পনার উদ্ভট প্রকাশ ঘটলেও তা আনন্দদায়ক।

চ) দেশ-কালের চিহ্ন বহন করে বলে লোকসাহিত্যের মধ্যে পল্লীজীবনের সজীব টুকরো ছবি, জীবন্ত ইতিহাস, লোকশ্রুতি দুর্লক্ষ্য নয়।

ছ) পল্লীর সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক বলে লোকসাহিত্য মাটির কাছাকাছি।

জ) স্থানীয়তার বিশেষ মূর্তি তাতে ধরা আছে—কখনও কখনও তা সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ। স্থানীয় জনসাধারণ বা লোক জীবনের পক্ষেই তা উপভোগ্য বা তাদের অধিগম্য।

ঝ) লোকসাহিত্যেরও ভালোমন্দ-মাঝারি রকমফের আছে।

ঞ) লোক-সমাজ থেকেই লোকসাহিত্যের সৃষ্টি।

ট) লোকসাহিত্যের ভাষাতত্ত্বগত মূল্যও রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বীকৃত। তদুপরি এর রূপশৈলী বিশেষত ছন্দপ্রকৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

লোকসাহিত্যের ব্যাখ্যায় এই সব আদর্শসূত্রের প্রতিফলন কিভাবে কতটা প্রতিফলিত তাই আমরা এখানে দেখতে ও দেখাতে চাইছি। তার আগে রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ভাবনাকে বিষয়ানুযায়ী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া ভাল। প্রথমেই 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলির হিসাব নেওয়া যেতে পারে :—

১. ছেলেভুলানো ছড়া ২. গ্রাম্যসাহিত্য ৩. ব্রতকথা ও রূপকথা ৪. যাত্রা ও কথকতা
৫. মৈমনসিংহগীতিকা ৬. বাউল গান।

ছেলেভুলানো ছড়া ঃ বাল্যরসের মাধুর্য

তরুণ বয়সে লোকসাহিত্যের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ বাউল গান দিয়ে। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ। 'ভারতী' পত্রিকায় 'সংগীতসংগ্রহ/বাউলের গাথা' গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা করেন যথাক্রমে বৈশাখ ১২৯০ এবং অশ্বিন ১২৯১ সংখ্যায়। সূত্রপাত এইভাবে হলেও লোকসাহিত্যের সংগ্রহ, সংকলন ও মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ পুরোদস্তুর আত্মনিয়োগ করেছিলেন আরো কয়েক বছর পরে ১২৯৯-১৩০০ সনে; সাহিত্যজীবনে তখন তাঁর শিলাইদহ-পর্বের সূচনা হয়ে গেছে। 'ছেলেভুলানো ছড়া' নিয়েই লোকসাহিত্যের বিচার-ব্যাখ্যায় তখন অবতীর্ণ হন তিনি। 'মেয়েলি ছড়া' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায় (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১)। তিন মাস পরে একটি ছোট্ট 'ভূমিকা' সহ সংগৃহীত ছড়াগুলি প্রকাশ করেন 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় (মাঘ ১৩০১ এবং কার্তিক ১৩০২)। 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটির অনেকাংশ বর্জিত হয়ে 'ছেলেভুলানো ছড়া' শিরোনামে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়াগুলি এবং এ সম্পর্কে লিখিত 'ভূমিকা'র কিছু অংশ বর্জন করে 'ছেলেভুলানো ছড়া-২' শিরোনামে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪৫) সংযোজিত হয়। ছড়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমতের আলোচনায় এই লেখা দুটি ভিত্তি-তুল্য হলেও অপরাপর নানা প্রসঙ্গেও এ বিষয়ে তাঁর টুকরো কথার বিবেচনাও করতেই হবে।

'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, 'ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে' ছড়ার বিশেষ গুরুত্ব থাকলেও তার 'সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস'-এর দ্বারাই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অথচ সমগ্র প্রবন্ধটি পড়ে শেষ করলে এবং ছড়া নিয়ে কবির অন্যান্য আলোচনাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শুধু কাব্যরসের বিচারই নয়, কমবেশি ভাষাতত্ত্ব নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে ছড়াগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। ছেলেভুলানো ছড়ার রস-পরিচয়ের ক্ষেত্রে তাঁর সহায় হয়েছিল নিজের বাল্যকালে ছড়ার রসাস্বাদনের ঘরোয়া স্মৃতি। সেই আত্মগত (subjective) রসোপলব্ধিতে পাঠককেও ছড়া-রাজ্যের রস-ভাণ্ডারে উত্তীর্ণ করে দিতে পেরেছিলেন তিনি। ছড়ার 'কাঁচা গাঁথুনি'র মধ্যেই তিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন জনচিত্তের শাশ্বতপরিচয়। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশের আগে, 'চৈতন্য লাইব্রেরী'র সভায় প্রবন্ধটি যখন প্রথম পঠিত হয়েছিল (১৬ আশ্বিন ১৩০১), তখন 'অনেক উচ্চভুরু তার্কিকও সভাস্থলে অশ্রু সম্বরণ করতে পারেন নি।'[৪ক] যে তুচ্ছ ছড়াগুলি এতদিন সাহিত্যপদবাচ্য ছিলনা, রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে তাই সাহিত্যের দরবারে

উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে, অনেকেই তার সমাদর করেন। 'সাহিত্য' (পঞ্চম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা) পত্রিকার 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লেখেন— "ছেলে ভুলাইবার জন্য বঙ্গগৃহলক্ষ্মীদের মুখে যে সব অদ্ভুত অথচ সরল ও সুমিষ্ট ছড়া শুনা যায়, তাহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা। সমালোচনাটি রবীন্দ্রবাবুর স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ। ভাবগুলি ক্ষুদ্র পার্বতীয় প্রবাহিনীর ন্যায় ভাষার কঠিন উপল খণ্ডের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। স্রোতস্বিনীর কলধ্বনি রচনার ঝংকারে পরিণত।"[৫]

'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে যে সব সারগর্ভ মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তাতে কেবল কবির উপলব্ধি নয়, মননশীল চিন্তারও প্রকাশ ঘটেছে। যুক্তি ও অনুভব দুই-ই ক্রিয়াশীল সেখানে। সৃজনশীল মনের অনুরাগ মিশ্রিত বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার সূত্রে ছেলেভুলানো ছড়া-কে কবি অপরূপ রসের জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ছড়াগুলি 'শিশুসাহিত্য' এবং তার রস বাল্যরস। লিখেছেন—"আমাদের অলংকারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদ্‌বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্পচন্দন গোলাপ জল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে; সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তি সংগতিহীন।"[৬]

অথচ বিস্ময়কর এই সাহিত্যস্বাদমোদিত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকেই গড়ে উঠেছে লোকসাহিত্য রূপ ছড়ার শিল্পচরিত্র। মানব-প্রয়াসসম্ভূত বড়ো বড়ো সাহিত্য-কীর্তি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেও, 'মোহমন্ত্রের' মতো মাধুর্যময় ছড়াগুলি তাদের 'অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত' রূপ নিয়ে চিরকাল প্রবাহিত হচ্ছে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে ছড়াগুলির প্রকৃতি শিশুর মতন, এর মধ্যে একটা চিরত্ব আছে। একদিকে তা চিরপুরাতন, সেই সঙ্গে চিরনবীনও। তাই এগুলি সৃষ্টির কোন সালতামামি নেই, 'তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।'

ছড়ার দুটো দিক—দুটোই চিত্তাকর্ষক। এক. এর মধ্যে প্রতিদিনের ছোটখাটো সব ঘটনার ছবি; এটা বাস্তবের দিক। দুই. মুক্ত কল্পনার পাখায় ভর করে অবাস্তবের রাজ্যে ভ্রমণ। অবনীন্দ্রনাথ খুব সুন্দর করে বলেছেন, 'এই আছি চোখে দেখা জগতে, এই গেছি মনে ভাবা কল্পনার রাজ্যে'।[৭] ছড়ার রাজ্যে বাস্তব-অবাস্তবের লুকোচুরি খেলা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে ছড়ার এই প্রধান বিশেষত্ব দুটি বিশ্লেষণ করেছেন গুরুত্বসহকারে।

ছড়াগুলি স্বপ্নের মতো একটি সূত্রে বাঁধা। আমাদের মানসাকাশে হাল্কা মেঘের মত ভেসে বেড়ায়। রবীন্দ্রনাথ যখন এসব কথা বলেছেন, অবচেতন মন সম্পর্কে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত তখনও স্পষ্টরূপ পায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার হদিশ খুঁজেছেন ছড়ার গহনে। আমাদের 'মগ্ন মনোলোকের' সামনে বিচিত্র ধ্বনি ও চিত্রের চঞ্চল লীলা সর্বদাই প্রবাহিত। তার যৎসামান্যই আমাদের গোচর হয়; এর কারণ, 'ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যজাল ফেলিয়া একেবারে এক ক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে, সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকি সমস্তই তাহাকে এড়াইয়া যায়।'[৮] সচেতনতার বাইরে মনের কাছ থেকে এই এড়িয়ে

যাওয়া অংশটুকুই ছড়ার রাজ্যে ভেসে ওঠে। অবচেতন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার জন্ম। সজ্ঞান মনের বাইরে নৈষ্ঠিক শিল্পকুশলতা ব্যতিরেকে এক তির্যক প্রক্রিয়ায় তার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধার করা যাক—'সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মতো যে সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন্ অলক্ষ্য বায়ুপ্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো সংলগ্ন কখনো বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ-পরিবর্তন পূর্বক ক্রমাগত মেঘরচনা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্বপ্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত-পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেইজন্যই বলিয়াছিলাম, ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।"[৯] আমাদের স্মরণে রাখতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বৈজ্ঞানিক তথ্যনিরপেক্ষভাবে হলেও কবির উপলব্ধিগত সত্য হিসেবে অভিনব।

অন্যপক্ষে ছড়ার একটা প্রধান দাবী তার ছন্দ মিল। সেই মিল রক্ষা করতে গিয়েও কবি বলেছেন, অসংলগ্নতা এসে যায়। বস্তুত ছন্দের মিলে পা ফেলতে গিয়ে প্রতিপদেই যে 'মিরাক্‌ল' ঘটে, তাতেই তার চমৎকারিত্ব। সেখানে কবিতা হিসেবে তার বাঁধুনি যতই আলগা হোক না কেন। শিশু-সাহিত্য হিসেবে ছড়ার রূপচরিত্র আবেদন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আরও একটা কথা বলেছেন—"প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্নজগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সত্য। এইজন্য অনেক সময় সত্যকেও আমরা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করি এবং তাহারা অসম্ভবকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।"[১০] শিশু মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞান-সম্মত এই যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করেছেন তার মূল্য একালেও বিবেচ্য।

ছড়ার ছন্দঝংকারে শিশু যেমন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তেমনি ছড়ার অসংলগ্ন ছবিগুলি ছোটবড়ো নির্বিশেষে সকল শ্রোতা বা পাঠকের মন তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। ছবিগুলি কখনও টুকরো, কখনও সম্পূর্ণ। একটার ঘাড়ে যেন আর একটা লাফিয়ে পড়ছে—এটাই ছড়ার আর্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ছড়ার মধ্যে সেগুলি 'পাখির ঝাঁকের মতো উড়িয়া চলিয়াছে'। স্বপ্নের ছবির মধ্যে যেমন পারম্পর্য থাকে না, ছড়ার ছবিতেও তাই। শ্রোতা 'মনশ্চক্ষে স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষবৎ ছবি দেখিয়া যায়।' অবনীন্দ্রনাথ এই ছবির মধ্যেই দেখেছেন ছোটখাটো নাটকের করণকৌশল। কেননা ছড়ার দৃশ্যগুলি চরিত্র ও সংলাপকে একসঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে চলে।[১১] অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ছড়ার অসংগতির অপূর্বতার মধ্যেই আছে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। এক একটি রেখায়, এক একটি কথার টানে সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে শ্রোতার মানসপটে ভেসে ওঠে। ছড়ার দৃশ্যমালা রবীন্দ্রনাথের চিত্তপটে এমনই গেঁথে গিয়েছিল যে, সেগুলি 'তুলি দিয়া না আঁকিলে মনের ক্ষোভ মেটে' না বলে আফশোস করে লিখেছেন—"যেমন মিষ্ট ছন্দ শুনিলেই তাহাকে গানে বাঁধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে তেমনি এই-সকল ভাষার চিত্র দেখিলেই ইহাদিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হায়, এ-সকল চিত্রের রস নষ্ট না করিয়া ইহাদের বাল্য সরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভবতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে এমন চিত্রকর আমাদের দেশে কোথায় এবং বোধ করি সর্বত্রই দুর্লভ। ....এ-সমস্ত চিত্র সুনিপুণ সহৃদয় চিত্রকরের প্রত্যাশায় বহুকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।"[১২]

শুধু ছবি নয়, ছন্দ ও ভাবের ব্যঞ্জনা, সব মিলিয়ে ছড়ার শ্রোতা খুশি হয়ে এক স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে। সেই কারণে ছড়া লৌকিক হলেও তাতে অলৌকিক অবাস্তব ঘটনার ছড়াছড়ি। ছড়ার মধ্যে 'অর্ধসংহত আকারবদ্ধ কবিত্বের মূর্তি'ও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি রবীন্দ্রনাথের। তিনি দেখেছেন:— এর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় কল্পনার জটিলতা নেই। প্রথম বয়সের শিশু-পৃথিবীর মতো তা এখনো 'কিঞ্চিৎ তরলাবস্থায়' আছে, কঠিন হয়ে জমাট বাঁধার অবকাশ পায়নি। ছড়ার সাহিত্যগুণ সাধুসাহিত্যেব থেকে স্বতন্ত্র, সে কথা বোঝা গেল 'এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু' ছড়ার ব্যাখ্যায়। আবার ছড়ার সৃজন প্রকরণের উৎস যে 'ভালো কাব্যের'ই সদৃশ তারও উল্লেখ করেছিলেন 'সাধনা' পত্রিকায় লেখাটির এক বর্জিত অংশে—

"ছড়ার মধ্যেই কি, আর উচ্চতম কাব্যের মধ্যেই কি, সৃজনকার্য্য অচেতন ভাবে ঘটিয়া থাকে। সচেতন ভাবে যাহা করা যায় তাহা নির্ম্মাণ। ভাল কাব্য মাত্রই কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া আপনি রচিত হইয়া ওঠে। ভাল মন্দ কোন প্রকার উদ্দেশ্য সে সম্মুখে খাড়া করিয়া রাখে না, অথচ উদ্দেশ্য স্বতই সাধিত হয়। ভালো কাব্যের সেই লক্ষণটি ছড়ার মধ্যে আছে।"[১৩]

ছড়ার অন্তর্লোকে তার সৃজনকালের ইতিহাস, তার স্মৃতি ছড়িয়ে—অথচ অধরা আকারে সেও চোখ এড়ায়নি রবীন্দ্রনাথের। অর্থাৎ লোকসাহিত্য হিসেবে ছড়া লোকজীবন-ঐতিহ্যেরই বাহন। "অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই-সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।"[১৪]

বস্তুত কবির অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সেই ইতিহাসকণাকে সংকেত হতে স্বরূপে আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর দক্ষতায় ঃ—'বাল্য বিবাহে বালিকা কন্যার শ্বশুর বাড়ি যাত্রা', বুড়ো বরের সংসার, বৌ-কাঁটকী শ্বাশুড়ীর অত্যাচার, মাতা-পিতার বিচ্ছেদ বেদনায় বালিকা বধূর ব্যাকুল অশ্রুপাত ইত্যাদি 'বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর বেদনার কথা' যেমন আছে, তেমনি আছে পুঁটুর শ্বশুর বাড়ি যাত্রা, জামাতৃসমাগমপ্রত্যাশিনী পল্লীরমণীগণের ঔৎসুক্য ও আনন্দ উৎসব, 'সঙ্গী'র সঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে সরলা কন্যার সরলতম পাঁচটি সর্ত, সর্বোপরি খোকাখুকুকে ভোলাবার অজস্র 'ছড়ার ছবি'। বাঙালির আঙিনায় শিশু দেবতার এই 'অদ্ভুত অসংগত অর্থহীন চালচিত্র' থেকেই ফুটে উঠে একটি সামগ্রিক ছবি। রবীন্দ্রনাথের মতে—"প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।"[১৫]

অন্যপক্ষে ছড়াগুলি যতই পুরাতন কালের হোক না কেন, শ্রোতা কিংবা আবৃত্তিকারের জীবনউত্তাপে লালিত হয়ে চির অজর বর্তমানকেই তা সজীব করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিক পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন। তাহা আপনার আদিম সরলতাগুণে মানবরচনার সর্বপ্রথম। সে এই উনবিংশ শতাব্দীর বাষ্পলেশশূন্য তীব্র মধ্যাহ্নরৌদ্রের মধ্যেও মানবহৃদয়ের নবীন অরুণোদয়রাগ রক্ষা করিয়া আছে।"[১৬] আর এই কারণেই নিত্যনূতন সৌন্দর্যবৈচিত্র্যে এবং আনন্দউচ্ছ্বাসের ধারায় চিরন্তন 'শিশুস্তব'গুলি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চির পুরাতন নববেদ' হয়ে উঠেছে।

ছড়ার জীবনাবেদনকে রবীন্দ্রনাথ মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন,—মেঘের মতই সে মুক্ত, মেঘেরই মত সহজে জীবনপ্রদায়ী। "মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশুশস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতাগুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিতেছে, এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য-বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।"[১৭] প্রবন্ধের আরম্ভেও বলেছিলেন, স্বপ্ন রচনা করা যেমন কঠিন, মেঘ সৃষ্টি করা যেমন অসম্ভব, ছড়াও তেমনি। মনে হতে পারে বোধহয় 'যেমন তেমন' করে লিখলেই 'ছড়া' হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়নিষ্ঠ বিশ্বাস 'সেই যেমন-তেমন ভাবটি' পাওয়া সহজ কথা নয়। কেননা, 'সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।'

'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া-২' শীর্ষক রচনার ছোট 'ভূমিকা'টি বর্তমান আলোচনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি' হিসেবে ছড়াগুলি সংগ্রহের কথা বলে, একই ছড়ার বিভিন্ন পাঠের সংরক্ষণও যে কত প্রয়োজনীয় তার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তসহ। লিখেছেন—"একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কোনটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ার বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোনো একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সংগত হয়না। কারণ, এই কামচারিতা কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশকালপাত্র-বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। সেই নিয়তপরিবর্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।"[১৮] এই বক্তব্যের উৎস লোকসাহিত্য বিশ্লেষণের বিশেষজ্ঞজনোচিত দায়িত্ববোধের সঙ্গে কবির সহজ অনুভূতিশীলতার মিলনে।

'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে ছড়ার ছবির কথা বিস্তারিতভাবে বলা হলেও ছড়ারছন্দ ও ভাষা নিয়ে আলোচনা নিতান্ত প্রাসঙ্গিক কাব্যভাষা বিধুনিত। যেমন দেখিয়েছেন ছড়ার ছন্দ মায়ের কণ্ঠে কেমন দোলনায় দুলে ওঠে, ভাই হয় 'গুণবতী'—জুতো হয়ে যায় 'জুতুয়া'। বলার ঢঙেই বক্তব্য ছড়ার মতই নেচে চলেছে এসব ক্ষেত্রে সর্বত্র। কিন্তু পরিণত বয়সে প্রসঙ্গান্তরে রবীন্দ্রনাথ ছড়ার ছন্দ ও ভাষা নিয়ে মননশীল আলোচনাও করেছিলেন; 'ছন্দ' গ্রন্থে এবং 'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এর আলোচনায়। এই সব লেখায় ছড়ার রূপশৈলীর তাত্ত্বিক দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে। ছড়ার ছন্দকে তিনি 'প্রাকৃত ভাষার ছন্দ' বা 'লৌকিক ছন্দ' বলে অভিহিত করেছেন। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দপ্রকৃতি যে এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে, তাও ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন 'ছন্দ' গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধে। অক্ষর গণনা করে নয়, চিরকাল বাঙালি কানের সাহায্যে এর উচ্চারণ করে এসেছে বলে শ্রুতিমাধুর্যে তা অনুপম। স্বরধ্বনির প্রাণবান্ স্বচ্ছন্দতা নিয়ে হসন্তযুক্ত এই ছন্দ-প্রবাহের শক্তি যে কত, প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে তার বহুল ব্যবহার দেখেই বোঝা যায়। এতে হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছড়ার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ।

এই ছন্দরীতির যেটা প্রধান গুণ, তা হল কিছুটা ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছুটা আদায় করে কণ্ঠের কাছে—এই দুয়ে মিলে তার পূর্ণতা। 'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এ (১৩৪৫) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"চলিত ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্ত সংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। ....ছড়ায় প্রায় দেখা যায় মাত্রার ঘনতা কোথাও কম কোথাও বেশি, আবৃত্তি কারের উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝোঁক আছে তার তাড়ায় কণ্ঠ আপনি প্রয়োজনমত স্বর বাড়ায় কমায়।"[১৯] ছন্দের বিচার আমাদের সন্ধানসীমার বাইরে, কেবল ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সর্বায়ত ভাবনার বিবরণসূত্রেই এই উল্লেখ।

'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া-২' শীর্ষক রচনার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এক একটি ছড়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত। সেই সব উপভাষা (dialect)-এর পাঠ ছড়াব আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও ছড়ার সবিশেষ মূল্য তাঁর কৌতূহল আকর্ষণ করেছিল।

অন্যপক্ষে ছড়ার ভাষা যে বিজ্ঞানের ভাষা নয়, তা যে কাব্যের ভাষা, 'বাংলা ভাষা পরিচয়' প্রবন্ধে তারও আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অনির্বচনীয়তাকে প্রকাশ করতে সীমাবদ্ধতার বেড়া ভেঙে ভাষা সেখানে আপনা থেকে অস্পষ্ট, অদ্ভুত হয়ে ওঠে। "ছেলে ভোলাবার ছড়া শুনলে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, এতে অর্থের সংগতির দিকে একটুও দৃষ্টি নেই। যুক্তির বাঁধন-ছেঁড়া ছবিগুলো ছন্দের ঢেউয়ের উপর টগ্‌বগ্ করে ভেসে উঠছে, ভেসে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতো একটা আকস্মিক ছবি আর-একটা ছবিকে জুটিয়ে আনছে। একটা শব্দের অনুপ্রাসে হোক বা আর-কোন অনির্দিষ্ট কারণে হোক, আর একটা শব্দ রবাহূত এসে পড়ছে। ....সুদূর কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই কাব্য যারা আউড়িয়েছে এবং যারা শুনেছে তারা একটা অর্থের অতীত রস পেয়েছে; ছন্দতে ছবিতে মিলে একটা মোহ এনেছে তাদের মনের মধ্যে। সেই জন্যে অনেক নামজাদা কবিতার চেয়ে এর আয়ু বেড়ে চলেছে। এর ছন্দের চাকা ঘুরে চলেছে বহু শতাব্দীর রাস্তা পেরিয়ে।"[২০]

ছড়ার এই চিরন্তনতার গুণটিও রবীন্দ্রনাথকে সর্বাধিক বিস্মিত করেছে। শুধু বাংলা ছড়া নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ছেলেভুলানো ছড়াগুলি সংগ্রহ করে তার তুলনামূলক আলোচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।[২১] কাজটি যে 'বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষণীয়' হবে তাতে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। এর থেকে 'ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মূলগত সামঞ্জস্য' যে অনেকটা অনুধাবন করা যাবে সে দূরদৃষ্টিও তাঁর ছিল।

গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল

'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'গ্রাম্যসাহিত্য' (১৩০৫) প্রবন্ধের বিষয় খাঁটি লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। লোকসাহিত্য মাত্রই গ্রাম্য সাহিত্য বা পল্লীসাহিত্য, কিন্তু সব গ্রাম্যসাহিত্যই লোকসাহিত্য নয়। আমরা আগেই বলেছি পারিভাষিক অর্থে লোকসাহিত্যকে গ্রহণ করেননি রবীন্দ্রনাথ। যদিও সদ্য সমাপ্ত ছড়ার আলোচনাতেও দেখা গেছে, মৌলিক মূল্যমান একটাও রবীন্দ্রনাথের শিল্পানুভবকে এড়িয়ে যায়নি।

পদ্মাতীরে জমিদারী পরিচালনা করতে গিয়েই গ্রামবাংলার সঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়। তখন থেকেই তিনি জেনেছিলেন, গ্রামের জীবনেই নিহিত রয়েছে দেশের প্রাণশক্তির উৎস।

গ্রামবাংলার দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সহজ সরল জীবনচরিত্র, তার সাহিত্য, সংগীত কবিকে ভেতর থেকে আকর্ষণ করেছে। 'গ্রামসাহিত্য' রবীন্দ্রমনের সেই অপরূপ আবিষ্কারের ফসল।

একদিন ভরা শ্রাবণে পাবনা-রাজশাহির জলপথে ভ্রমণ করতে করতে স্থানীয় পল্লীসংগীতের দুটি পংক্তি গ্রাম্যগায়কের কণ্ঠে শুনে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, 'গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল'।[২২] গানের কথাগুলি নেহাতই আটপৌরে। কিন্তু 'ছন্দেবন্ধে সুরে-তালে' সেই গ্রাম্যকবির রচনা যেন সমগ্র মাঠ-ঘাট-জলস্থলে চরাচরের মধ্যে জেগে উঠল। কবির মনে হয়েছিল, "প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে সাহিত্য তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রতিদিনের বিচিত্র কাজও চলিতেছে এবং তাহার ছিদ্রে ছিদ্রে চিরদিনের একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পাইতেছে। ....গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক্ বা না-থাক্ সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে।"[২৩]

লোকসাহিত্যের স্বভাবধর্ম সম্পর্কে সেই পুরানো কথা আবার জেগে উঠেছে কবির অনুভবে, গ্রাম্যসাহিত্য একক কবির রচনা হলেও, তা তার নিজের নয়; সমস্ত গ্রামের সমস্ত লোকসমাজের। এখানেই ব্যক্তিমুখ্য ভদ্র মার্জিত সাহিত্যের সঙ্গে তার তফাৎ। একথাও বলেছেন তিনি আবার— "কল্পনার সংকীর্ণতা দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে, কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।"[২৪]

গ্রাম্যসাহিত্যে ব্যক্তির রচনার মধ্যে দিয়ে পুরো 'গ্রামের ছবি, গ্রামের স্মৃতি'র সম্পদ উৎসারিত হয়ে ওঠে; ঐখানে তার আবেদনের বিশিষ্টতা। তাই রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে বিচিত্র প্রকৃতির গ্রাম্য-সাহিত্যকে কাব্য হিসেবে আস্বাদন করতে গেলে, পল্লীর সমস্ত লোকালয়কে মনের গভীরে জড়িয়ে নিতে হবে—তাতেই তার ভাঙাছন্দ ও অপূর্ণ মিল দূর হয়ে প্রাণের আবেগে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

পরিভাষা-ভাবনার বন্ধনমুক্ত কবির সহজ অনুভবে গ্রাম্যসাহিত্যের গভীরে লোকসাহিত্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষিত লক্ষণ কেমন আপনা থেকে উঠে এসেছে দেখে বিস্মিত হতে হয়। —"গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য; সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশ অধিকার পায় না।"[২৫] এই তো লোকসাহিত্যের সেই গোষ্ঠীসম্ভব গোষ্ঠীবদ্ধতার কথা।

রবীন্দ্রনাথ আরো ভেবেছেন—প্রাদেশিক এই নিম্নমানের সাহিত্যের সঙ্গে সার্বভৌমিক উচ্চসাহিত্যেরও একটা নিবিড় সংযোগ রয়েছে। প্রাচীন বাংলার বৃহৎ কাব্যগুলি যে উদ্দেশ্যেই রচিত হোক না কেন, অন্তঃচরিত্রে তা গ্রাম্যসাহিত্যের সঙ্গেই যুক্ত। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভদ্রছাপ পড়লেও দেশীয় লোক-প্রচলিত সাহিত্যকে তা বেশিদূর ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। আসলে প্রতিভাবান কবি গ্রাম্যসাহিত্যের স্থূল অপরিণত রূপকে অবলম্বন করে কোনো এক বিশেষ উপলক্ষে বৃহৎকাব্য

রচনায় ব্রতী হন। সেই কারণেই গ্রাম্যসাহিত্যের সঙ্গে তার মূলগত দূরত্ব অল্পই। তাই, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় পল্লীর প্রাকৃত সাহিত্যের পরিচয় পেলেই প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের বৃহৎকাব্যগুলির অনুধাবন সহজতর হয়।

'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে যে উপাদান অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সবচেয়ে নিটোল রসমূর্তি ধরেছিল সেগুলি হল ছোট ছোট কয়েকটি গ্রাম্য গীতিকা; প্রবন্ধে এগুলিকে তিনি 'ছড়া' বলে অভিহিত করেছেন। প্রচলিত ছড়া (ছেলেভুলানো ছড়া বা মেয়েলি ছড়া) বলতে আমরা যা বুঝি এগুলি তা নয়, বরং তা পাঁচালি গানের অনেক সমীপবর্তী। আমাদের অনুমান গীতিকাগুলির ভগ্নরূপ এবং আবৃত্তিযোগ্যতার জন্যই বোধ হয় সেগুলিকে 'ছড়া' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুটি স্বতন্ত্র বিষয়ে 'গ্রাম্যসাহিত্য'কে ভাগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'হরগৌরী' এবং 'রাধাকৃষ্ণ'— এই দুই ভাবের গীতিকাই তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লিখেছেন, "ছড়াগুলির বিষয়কে মোটামুটি দুই ভাগ করা যায়। হরগৌরী-বিষয়ক এবং কৃষ্ণরাধা-বিষয়ক। হরগৌরী বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা বিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। এক দিকে সামাজিক দাম্পত্যবন্ধন, আর এক দিকে সমাজবন্ধনের অতীত প্রেম।"[২৬]

হরগৌরীর গানে বাংলাদেশের যে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে তাতে দাম্পত্যসম্পর্কের মঙ্গলময় ভাবই ব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"হরগৌরীর কথা ছোটোবড়ো সমস্ত বিঘ্নের উপরে দাম্পত্যের বিজয়কাহিনী। হরগৌরীপ্রসঙ্গে আমাদের একান্ন-পারিবারিক সমাজের মর্মরূপিণী রমণীর এক সজীব আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামী দীন দরিদ্র বৃদ্ধ বিরূপ যেমনই হউক, স্ত্রী রূপযৌবন-ভক্তিপ্রীতি-ক্ষমাধৈর্য-তেজগর্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারির অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্মানলক্ষ্মী।"[২৭] বাংলার গ্রাম্যকবি এই আর্দশকেই উচ্চ আসনে বসিয়েছেন, একালের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের এ ব্যাখ্যা যতটাই মান্য হোক বা না হোক।

হরগৌরীর কথার যে অংশটি আগমনী-বিজয়ার গানে প্রাধান্য পেয়েছে, তাতে বাঙালিগৃহের মর্মকথাটিই প্রকাশিত। সুখ-দুঃখ, বেদনা-বিচ্ছেদ, বিরহ-মিলনের সেই সংগীত 'বাস্তব ভাবের' ব'লে সঙ্গতভাবেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। অপরপক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের মহাযোগীশ্বর শিব বাংলার কাব্য-গাথায় যে 'দুর্গতিপ্রাপ্ত' হয়েছেন তাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। 'শিবায়ন' কাব্যে এবং অন্যান্য শিব-বিষয়ক ছড়া-পাঁচালিতে নেশাখোর, অসভ্য উন্মত্ত শিবের কোচ রমণীদের প্রতি আসক্তির কথাও কিভাবে নির্বিকার চিত্তে প্রচার করেছেন বাঙালি কবি, তার উল্লেখও আলোচ্য প্রবন্ধে আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান।"[২৮] বস্তুত রাধাকৃষ্ণের সমাজ-বহির্ভূত প্রেমকাহিনী বৈষ্ণবসাহিত্যে ধর্মতত্ত্ব ও রূপকের আবরণে প্রকাশিত হলেও বাহ্যরূপে সেই ভালবাসার কথা সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করে। নবনারীর সৌন্দর্য প্রেমই সেখানে প্রধান ব্যাপার। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন প্রেমের সর্বত্রগামী বিচিত্র গতিবিধিতে সমাজ কিভাবে একটা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেমের প্রকৃতি সমাজের মধ্যে এক রকম, সমাজের বাহিরে তার অন্যরূপ। এই দ্বিতীয় রূপটিই রাধাকৃষ্ণের কাহিনীতে যেভাবে রূপায়িত হয়েছে, তাতে শুধু নরনারীর চিরন্তন বিরহ-মিলনের কথাই নয়, প্রেমের মোহিনীশক্তির

যাদু মানুষকে কিভাবে ভগবৎব্যাকুলতার পথেও নিয়ে যায়, তাও আভাসিত হয়েছে। সমাজে যে প্রেম অবৈধ, গুপ্তভাবে বিরাজ করে, যুগ যুগ ধরে আমাদের কাব্য সাহিত্যে তাকেই আবাহন করা হয়েছে প্রকাশ্য মর্যাদায়। বৈষ্ণব শাস্ত্রের পরকীয়া অনুরক্তির গৌরব উজ্জ্বল বর্ণনার উল্লেখ করে বৈষ্ণবসাহিত্য রসপিপাসু কবি লিখেছেন যে, সমাজ-নীতির হিসাবে তা ক্ষতিকর হলেও নিছক প্রেমের শক্তির দিক থেকে তা অতুলনীয়। পার্থিব সমাজে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে তীব্রতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এতে সমাজের বিপদ কতকটা লাঘব হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস। "হরগৌরী কথায় দাম্পত্যবন্ধনে যেমন কতকগুলি বাধা বর্ণিত হইয়াছে, বৈষ্ণবগাথার প্রেমপ্রবাহেও তেমনি একমাত্র প্রবল বাধার উল্লেখ আছে, তাহা সমাজ। তাহা একাই এক সহস্র। বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই সমাজবাধার চতুর্দিকে প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।"[২৯]

এই কারণেই গ্রাম্যকবির হাতে হরগৌরীর কাহিনীর মতো বাস্তব ভাবের বাঙালি ঘরের মর্মকথা কৃষ্ণরাধা বিষয়ক গীতিকায় প্রস্ফুটিত হয় নি। সে গুলি স্বতন্ত্র জাতের। রবীন্দ্রনাথের মতে, "এ সমস্ত ভাবের সৃষ্টি। কৃষ্ণরাধার বিরহ মিলন সমস্ত বিশ্ববাসীর বিরহ মিলনের আদর্শ, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণসমাজ বা মনুসংহিতা নাই; ইহা আগাগোড়া রাখালি কাণ্ড। ....সেখানে চিরপ্রচলিত সমস্ত সমাজপ্রথাকে অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবনের রাখালবৃত্তি মথুরার রাজত্ব অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। আমাদের দেশে, যেখানে কর্মবিভাগ শাস্ত্রশাসন এবং সামাজিক উচ্চনীচতার ভাব সাধারণের মনে এমন দৃঢ় বদ্ধমূল, সেখানে কৃষ্ণরাধার কাহিনীতে এইপ্রকার আচারবিরুদ্ধ বন্ধনহীন ভাবের স্বাধীনতা যে কত বিস্ময়কর তাহা চিরঅভ্যাসক্রমে আমরা অনুভব করি না।"[৩০]

হরগৌরী এবং কৃষ্ণরাধা বিষয়ক কয়েকটি গীতিকার রস বিশ্লেষণ এবং তাদের ভাবগত পার্থক্যের তুলনামূলক আলোচনা করে প্রবন্ধশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই দুই শ্রেণীর গীতিকা ছাড়াও বাংলার গ্রাম্যসাহিত্যে সীতা-রাম ও রাম-রাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তুলনায় তা স্বল্প। এর কারণ হিসেবে তাঁর মনে হয়েছে, রামকথা যেখানে সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, সেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক'। অন্যপক্ষে স্ত্রীপুরুষ এবং নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধযুক্ত হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ কথায় 'সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের' খাদ্য অপ্রতুল, তার প্রসার রামকথার থেকে সংকীর্ণ বলে তিনি মনে করেছেন। আমাদের দেশে প্রচলিত উক্ত কাহিনীকাব্যদ্বয়ে হৃদয়বৃত্তি ও সৌন্দর্যবৃত্তির যে চর্চা হয়েছে তাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা তেমন হয়নি। রামসীতার দাম্পত্যকে কেন্দ্র করে 'বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগ স্বীকারে'র যে শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি পরিস্ফুট, হরগৌরীর দাম্পত্যে তার অভাব লক্ষ্য করে তিনি আফশোস করেছেন—"বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধা কৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।"[৩১] রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে বিতর্ক হতেই পারে; এমনকি বাংলাদেশে রাম-সীতার আখ্যান পাঁচালির আকারে একটা গ্রামীণ রূপ যে পেয়েছিল তার প্রমাণও কম নেই। তাহলেও মানতে হয়, বাঙালির পল্লীজীবনে হরগৌরীর কথা, কিংবা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী যেরকম প্রাধান্য পেয়েছে, তুলনায় রামায়ণ কথা তেমন নয়। এ প্রবণতা আঞ্চলিক চরিত্রগত—আর অঞ্চলভেদে তার দোষগুণের তারতম্য আছেই।

ব্রতকথা ও রূপকথা ঃ বাঙালি সমাজের সুধাভাণ্ডার

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে বিশেষ এক স্বাদেশিক বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বিলীয়মান পল্লীসাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে ছেলেভুলানো এবং মেয়েলি ছড়ার সঙ্গে ব্রতকথা ও রূপকথা সংগ্রহেও ব্রতী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এগুলিকে তিনি 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি' বলেই মনে করতেন। ফলতঃ সেগুলির সংগ্রহই শুধু নয়, পল্লীবাংলার 'জীবনযাত্রার সঙ্গী সাহিত্য' হিসেবে তার মূল্য নির্ধারণেও তিনি পথিকৃৎ ছিলেন বলা যায়। ছড়ার মতো মেয়েলি ব্রতকথা এবং রূপকথাকে খাঁটি লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা হয় এই কারণেই যে, এগুলো চিরন্তন 'শ্রুতি সাহিত্যে'র মধ্যে পড়ে। অপর পক্ষে এই শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে ব্যক্তি অপেক্ষা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনের স্বভাব লক্ষণের প্রভাব চিহ্নই বেশী; এবং মেয়েদের ঘরোয়া আবেগ ও কণ্ঠস্বর ঘিরেই এদের নিবিড় আবেদন।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রত' (১৩০৩) গ্রন্থটির একটি সুলিখিত 'ভূমিকা' ছাড়া ব্রতকথা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন আলোচনা রবীন্দ্রনাথের নেই। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্যে এ নিয়ে যে সব মতামত প্রকাশিত হয়েছে, তার সাহায্যে অবশ্য ব্রতকথা সম্পর্কে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ার একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া অসম্ভব নয়। অঘোরনাথের গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য ছিল, মেয়েলি ব্রতকথাগুলি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে। এ-সব সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করতে শিক্ষিত বাঙালিরা কেবল সংকোচ বোধ করতেন না, এই ধরনের মেয়েলি সাহিত্যের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞাও ছিল চূড়ান্ত। অথচ রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ 'দর্শনবিজ্ঞান ইতিহাসের' চর্চায় ছড়া-রূপকথা-ব্রতকথার মত লোকসাহিত্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এর মধ্যে যে সব মূল্যবান উপকরণ আছে তাকে কাজে লাগাতে তাঁদের উৎসাহ ছিল। তাছাড়াও নিজের দেশকে চেনা ও বোঝার পক্ষে এই সব নাড়ির সম্পদ এক অপরিহার্য উপাদান। অবশ্য 'সাধনা' পত্রিকায় ব্রতকথাগুলি যখন একটি একটি করে প্রকাশিত হচ্ছিল, এই ধরনের 'মহৎ উদ্দেশ্যে'র কথা রবীন্দ্রনাথের মনে স্পষ্টভাবে উদয় হয়নি তখন। "সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহার প্রতি স্বাভাবিক মমত্ব বশত আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী-কন্যা সহোদরাদের কোমল হৃদয় পালিত মধুর কণ্ঠ লালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র" করার চেষ্টাতেই তখন উৎসাহ বোধ করেছিলেন।[৩২] এবারে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, এই আপাততুচ্ছ, হাস্যকর ব্রতকথাগুলিতেই একদিন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারবে। আজ উচ্চতম পর্যায়ে সামাজিক নৃতত্ত্বের চর্চায় এই ব্রতকথাগুলিও আকর উপাদানরূপে সমাদৃত। কবির দূরদৃষ্টি ব্যর্থ হয়নি।

মেয়েলি ব্রতগুলি যখন 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু করে (চৈত্র ১৩০১) তখনই এ-সবের উৎপত্তি, ইতিহাস, বাংলার নারী সমাজে তার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয়। বাংলাদেশে অন্তঃপুর নারীদের মধ্যেই বিচিত্র ধরনের বারব্রত প্রচলিত। ছোট বড়ো সকলেই কোনো না কোনো ব্রত পালন করে থাকে। "বয়স এবং সধবা কি বিধবা ইত্যাদি অবস্থাভেদে ব্রতেরও অধিকার ভেদ আছে। স্বামী কামনা, পুত্র কামনা, স্বামী ও পুত্রের কল্যাণ কামনা, ঐশ্বর্য্য কামনা ইত্যাদি রূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্যে এই সকল ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।"[৩৩] ব্রতের মূলেই আছে ঐহিক মঙ্গলকামনা। অবনীন্দ্রনাথ খুব সহজ করে বলেছেন—"কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।"[৩৪] বিভিন্ন ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজে যে

দশাবিপর্যয় ঘটে তাকে ঠেকাবার তাগিদ থেকেই ব্রত ক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠান, আচার পদ্ধতি, মন্ত্র উপাখ্যানের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ। প্রাচীন ব্রতকথাগুলি মেয়েদের মহলেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে, কেননা বাইরের জগৎ যত তাড়াতাড়ি বদলায়, মেয়েদের অন্তঃপুরে সময় ঠিক ততটাই স্তব্ধ হয়ে থাকে। ব্রতকথাগুলি রক্ষণশীল নারী জাতির ধর্ম ও গার্হস্থ্য জীবন-চর্যার চিহ্ন বহন করে। ব্রত-অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে নানাবিধ আখ্যায়িকা, উপদেশ মন্ত্র ছড়া আকারে প্রচলিত আছে—সেগুলিই ব্রতকথা। এগুলি পর্যালোচনা করলে শুধু সামাজিক ইতিহাস, বা ভাষা তত্ত্বের রহস্যই উন্মোচিত হবে না, এর মধ্যে 'কিঞ্চিৎ কাব্যরস' পাওয়া যাবে বলে 'সাধনা' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়।[৩৫] অবনীন্দ্রনাথও মনে করেন, ব্রতকথায় নাট্য নৃত্য ও গীতকলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।[৩৬]

বাংলাদেশে দু'ধরনের ব্রত আছে। ১. শাস্ত্রীয়, ২. যোষিৎ প্রচলিত বা মেয়েলি ব্রত। এই দ্বিতীয় ধরনের ব্রতকথাগুলির প্রতিই রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন; কেননা এর ছড়ায়, আল্পনায়, ক্রিয়াকলাপে 'একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ'ই শুধু পরিলক্ষিত হয় না, পল্লীবাংলার 'মহৎ জীবন যাত্রা'র একটি উজ্জ্বল ছবিও উঠে আসে। একদিকে পল্লীনারীর শিক্ষাসংস্কৃতির জীবন্ত প্রবাহ, অপরদিকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিয়মাবলী ব্রতকথাগুলিকে এক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ রূপ দিয়েছে। ভগ্নী নিবেদিতা ব্রতকথার এই বিশেষত্বটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়—"....Some of these Bratas—like that which teaches the service of the cow, or the sowing of seeds, or some which seem to set out on the elements of geography and astronomy have an air of desiring to impart which we now distinguish as secular knowledge."[৩৭]

একই সময়ে ব্রতকথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এই সাহিত্য যে স্বতঃসূত নদীর ধারার মত সুচিরকাল হইতে বাংলার পল্লী গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, শিক্ষা এবং আনন্দ ঘরে ঘরে বহন করিয়া দিবার এমন সহজ বিহিত, সুন্দর, এমন চিরন্তন ব্যবস্থা যে আর কিছুই হইতে পারে না, এই সাহিত্যের মধ্যেই আমাদের পল্লী জীবন-যাত্রার সরল মূল নীতিগুলি যে নানা আকারে সন্নিবেশিত হইয়া আছে এবং কালের পরিবর্তন বশতঃ এগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেশের পুরাবৃত্তের একটি প্রধান উপকরণ নষ্ট হইয়া যাইবে।"[৩৮] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সতর্ক করেছেন, যেহেতু মেয়েলি ব্রতকথাগুলি দেশ এবং অঞ্চল ভেদে নানাপ্রকার, তাই তাদের ভাষা যেন ছাপা গ্রন্থের ভাষার মতো বিশুদ্ধ করা না হয়, তাহলে সেগুলির রস তো নষ্ট হবেই, ভাষাতত্ত্বের আলোচনাতেও বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা থেকে যাবে। ব্রতকথার খাঁটি রূপ সম্পর্কে তিনি এতই সচেতন ছিলেন যে সেগুলিকে মুখের কথাতেই লিপিবদ্ধ করা উচিত বলে মনে করতেন।

রূপকথা কেবল রবীন্দ্রনাথের শিশুমনকে নয়, পরিণত বয়সের সৌন্দর্যভাবনাকেও নানাস্তরে নানাভাবে বিভোর করেছে।[৩৯] রবীন্দ্ররচনায় রূপকথা বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত (ফাল্গুন ১২৯৯) একটি গ্রন্থসমালোচনা। সমালোচিত বইটিও বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় সৃষ্টি—রূপকথার কঙ্কাবতী-গল্প অবলম্বনে লেখা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'উপকথার উপন্যাস' 'কঙ্কাবতী'। স্মরণ রাখতে হবে এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়ার সঙ্গে ছেলেভুলানো গল্প 'রূপকথা' সংগ্রহেও ব্রতী হয়েছেন। রূপকথা বিষয়ে তাঁর ধারণাটিও ততদিনে একটা স্পষ্ট রূপ পেয়ে গেছে। উক্ত গ্রন্থসমালোচনায় সেই ভাবনাই উন্মোচিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে।

'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের রূপকথা অংশে লেখকের কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো অসম্ভব রসের অফুরন্ত ধারায় লেখাটি ভরপুর। তিনি লিখেছেন, ".......গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভালো করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোন বাঁধা নিয়ম, কোন চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়ম পথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ, রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসঙ্গত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।"[৪০]

ত্রৈলোক্যনাথের আলোচ্য উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে কিছু আপত্তি প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে 'রোগশয্যার স্বপ্ন' বলে যা চালাবার চেষ্টা হয়েছে তাতেই অকৃতকার্য হয়েছেন লেখক। রবীন্দ্রনাথের মতে অদ্ভুতরসের কাহিনীতেও প্রকার ভেদ আছে—রূপকথাধর্মী ও স্বপ্নধর্মী। কঙ্কাবতীর গল্প রূপকথা; রূপকথায় স্বপ্নের স্থান নেই। সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে তিনি লিখেছেন, "ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে।"[৪১] রূপকথার সঙ্গে ছড়ার মূল পার্থক্যও এখানেই। ছড়ায় স্বপ্নের অসংলগ্নতা আছে, কিন্তু রূপকথায় অদ্ভুত ঘটনাগুলিও অচ্ছিন্ন কাহিনীর সূত্রে আগাগোড়া সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপন্যাসটির দোষগুণনিরপেক্ষভাবে রূপকথার রসই বিশেষভাবে টেনেছিল কবিকে, আলোচনায় তারই নানা প্রসঙ্গের প্রকাশ। সেই সূত্রেই রূপকথামূলক শিশুপাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তার কথা। কিন্তু আলোচনার সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হল রূপকথার সর্বায়ত সাহিত্যগুণের উন্মোচন। পরবর্তীকালে এ নিয়ে অনেক ভাবনাই রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন, তার সূচনা এই আলোচনায়:-"সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, তাহা নহে, পৃথিবীতে বিস্তর বাজে কথা, মজার কথা, অদ্ভুত কথা থাকাতেই দুটো চারটে কাজের কথা, তত্ত্বকথা, আমরা ধারণা করিতে পারি। ....সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা নহে; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব করিয়া রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানব-হৃদয় জলধির বিচিত্র উত্থান পতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়।"[৪২] সাহিত্যের ভাবের জগতে রূপকথার অদ্ভুতরসের মূল্যও এইখানেই।

রূপকথার কাহিনী আমাদের চোখের সামনে রূপ সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে তা রূপকাশ্রিত কথাও—যদিও তা আজগুবি কল্পনায় আপাতঅর্থহীন। কিন্তু রূপকথার গভীরে সামগ্রিকভাবে নিহিত আছে এক তাৎপর্যময় জীবনবাণী। 'দেশহীন ও কালহীন' বলেই বোধহয় তা অলীকরসে পূর্ণ—বাস্তব জীবনের তাল লয় কিছুই তাতে খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু তা সত্য। 'সাহিত্যের পথে' (১৩৪৩) গ্রন্থের 'সাহিত্য তত্ত্ব' (১৩৪০) এবং 'সাহিত্যের তাৎপর্য' (১৩৪১) প্রবন্ধ দুটিতে রূপকথার এই মৌল প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছেন, "শিশুকাল থেকে মানুষ বলছে 'গল্প বলো'; সেই গল্পকে বলে রূপকথা। রূপকথাই সে বটে, তাতে না থাকতে পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যক

সংবাদ, সম্ভবপরতা সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনো কৈফিয়ত নেই। সে কোন-একটা রূপ দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শূন্যতা দূর করে; সে বাস্তব।"[৪৩]

শিশুর কল্পনায় রূপকথার আজগুবি, অলীক কাহিনী একান্ত আপন বলে মনে হয়। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে বলেই কোনো অসম্পূর্ণতা তার কাছে ধরা পড়েনা—সে খুশি হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন, 'মনের লীলা, কিছু না নিয়েই তার সৃষ্টি, তার আনন্দ।"[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন, রূপকথার "গল্পে তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো-একটা মানব পরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে। রূপের মোহিনী শক্তি, বিপদের পথে বীরত্বের অধ্যবসায়, দুর্লভের সন্ধানে দুঃসাধ্য উদ্যম, মন্দের সঙ্গে ভালোর লড়াই, ভালোবাসার সাধনা, ঈর্ষায় তার বিঘ্ন, এসমস্ত হৃদয়-বোধ নানা অবস্থায়, নানা আকারে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে; এর কোনোটা সুখের কোনোটা দুঃখের এদের সাজিয়ে গল্পের ছবিতে রূপ দিয়ে রূপকথায় ছেলেদের জন্যে জোগানো হচ্ছে আদিকাল থেকে। এর মধ্যে আছে অলৌকিক জীবের কথাও, কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক। আছে দৈত্য-দানব, বস্তুত তারাও মানুষ; ব্যঙ্গমা-বেঙ্গমি, তারাও তাই। এই সব গল্পে মানুষের বাস্তব জগৎ কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে শিশুমনের জগৎ রূপে দেখা দেয়, শিশু আনন্দিত হয়ে ওঠে।"[৪৫] রূপকথার 'রূপক' (Symbol) এর চরিত্রটিকেও এখানে ধরে দিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

রূপকথারসের উন্মেষ ঘটে নবীনমনের অপার বিস্ময়বোধ থেকে। শৈশব-বাল্যেব যাবতীয় রোমান্সের উপকরণ লুকিয়ে থাকে তার মধ্যে। কোন রিয়ালিজমের চাপ নেই বলে ভাষাও যায় বদলে। রূপকথার ভাষা 'জ্ঞানের ভাষা নয়—হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষ'; শিশুমনের উপযোগী। রূপকথার ভাষায় ধ্বনিস্পন্দন এমনই যে গদ্যেও তা সংগীতের মূর্ছনা আনে। অন্যান্য গল্পের ভাষার সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য।

আগেই বলা হয়েছে, রূপকথা সংগ্রহ ও তার আলোচনায় এক স্বাদেশিক বোধ কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। 'বাঙ্গালির জাতীয় চিত্তরস'-এ সঞ্জীবিত রূপকথাগুলিকে 'চিরকালের সামগ্রী' বলে মনে করতেন তিনি। দক্ষিণাঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগৃহীত রূপকথা কাহিনীর সংকলন 'বঙ্গোপন্যাস ঃ ঠাকুরদার ঝুলি' গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারে পাঠ করে একটি চিঠিতে (১৪ চৈত্র ১৩১৪) তিনি লেখককে সোৎসাহ প্রশংসা করেছিলেন; মুদ্রিত গ্রন্থটি পড়েও আর একটি চিঠিতে (২ কার্তিক ১৩১৫) তার পুনরাবৃত্তি করেন।[৪৬]

তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি ঃ বাংলার রূপকথা' গ্রন্থের যে 'ভূমিকা'টি কবি লেখেন (২০ ভাদ্র ১৩১৪) রূপকথা সম্পর্কে তা একটি মূল্যবান সমালোচনা;—অবশ্য তাতে রবীন্দ্রনাথের মন্ময় (Subjective) বিচারবোধই প্রকাশ পেয়েছে সমধিক। তাঁর মতে রূপকথার মতো 'স্বদেশী জিনিস' বাংলাদেশের বিশেষ সম্পদ, আর এই সম্পদের আধার এদেশের নারীসমাজ। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য মানসিকতার প্রভাবে এই সুললিত শিশুস্বপ্নের জগৎ—দিদিমা-ঠাকুমা-মাসিমার কণ্ঠনিঃসৃত গল্পের ঝুলিটি ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে দেখে কবি আক্ষেপ করেছেন। শঙ্কিত হয়েছেন অন্যান্য অনেক কিছুর মতোই ইংরেজি রূপকথাও (Fairy Tales) বিলেত থেকে আমদানী হচ্ছে দেখে। সব মিলিয়ে আলোচ্য ঐ ভূমিকায় তিনি আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন রূপকথা তথা অপরাপর মূল্যবান স্বদেশী

সম্পদ—"পাল পার্ব্বণ যাত্রাগান কথকতা এ সমস্ত ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"[৪৭] বাঙালি শিশু 'মাতৃদুগ্ধ'সম রূপকথার 'আনন্দ রস' থেকে বঞ্চিত হলে মানসিক দিক থেকে প্রাণহীন হয়ে পড়বে তো বটেই, উপরন্তু বিপরীতক্ষেত্রে স্নেহপ্রস্রবণের উৎস বন্ধ হয়ে গেলে 'বয়স্ক লোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত' হয়ে যাওয়ার ভয়ও দেখা দিয়েছে তাঁর মনে।

রূপকথার আবেদন আবহমান কালের; কালে কালে তার কত রূপান্তর ঘটেছে। আজ তার উৎস খুঁজে পাবার উপায় নেই, হয়ত কোনো কালেই পাওয়া কঠিন হত। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত এখানেও সৃষ্টিকর্তা সমগ্র জাতির পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যক্তি নয়, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের স্বভাব লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছে তাতে। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"রূপকথা কে প্রথমে লিখলেন। রবিকাকা, আমি, না দক্ষিণা বাবু! আমাদের আগেও একজন কঙ্কাবতী লিখেছিলেন। তারও আগে কারা লিখেছিলেন তাদের নামও আমরা জানিনে। ইতিহাসের বাইরে গেলেও তার খোঁজ পাবে না।"[৪৮]

রবীন্দ্রনাথও সহজে আবিষ্কার করেছেন, স্বীকার করেছেন সেই সত্য—রূপকথার সৃষ্টিকর্তা নামহীন। যুগ যুগ ধরে 'স্নেহময়ীদের' কণ্ঠ-নিঃসৃত 'দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা' সে—"আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালি বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুন্ন চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃ স্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্য্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল-সন্ধ্যায় আকাশের চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গ দেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।"[৪৯]

রূপকথার গল্পরস সর্বজনীন। একেই বলা যেতে পারে বাংলার খাঁটি জাতীয় সাহিত্য; ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা সকলেই অভিসিঞ্চিত হয়েছে এই রসে। এক অর্থে তা 'গণসাহিত্য'ও বটে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাঙালি ছেলে শুধু রূপকথার গল্প শুনেই সুখী হয় না, তার মধ্য দিয়ে 'সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।'[৫০]

রূপকথার যে বিশেষ একটা সুর এবং রূপ আছে, আধুনিক 'কেতাবী ভাষায়' তা বজায় রাখা বেশ শক্ত। সেখানে রূপকথার 'কথা' টুকু থাকলেও 'রূপ'টি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দক্ষিণারঞ্জন এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রশংসা করেছেন।

শ্রুতি সাহিত্যকে ছাপার অক্ষরে ধরতে গেলে সমস্যা অনেক। লোকসাহিত্যের মৌখিক চরিত্রটি তাতে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। রূপকথার ভাষা এবং ভঙ্গি যাতে মূলের অনুরূপ হয়, সে ব্যাপারে লোকসাহিত্য সংগ্রাহকদের সতর্ক করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে। পরিণত বয়সে বিভূতিভূষণ গুপ্তের রূপকথা-সংকলন 'বেড়াল ঠাকুর ঝি' (১৩৩০) গ্রন্থের 'ভূমিকা' লিখতে গিয়ে তিনি বলেন, রূপকথা মেয়েদের মুখে যেমন শোনায়, তেমনি ভাবেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা দরকার। তা না হলে তার আসল রস যাবে হারিয়ে। কেননা—"এ সমস্তই অখ্যাত নাম্নী মেয়েদেরই রচনা, তাহাদেরই প্রতিদিনের ঘরকরনার হাঁড়ি কুঁড়ির অন্তরের কথা। তাছাড়া ইহার মধ্যে মানব মনের যে প্রকৃতি পরিচয় পাওয়া যায় তাহারও আধার এই বাংলাদেশের গ্রামের অন্তঃপুরে।"[৫১] রূপকথার গল্পের যে বিশেষ রস,

তার যথাযোগ্য আলোচনা হওয়া উচিত বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। এমনকি সমালোচিত গল্পগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় কিছু রূপান্তরিত আকারে পাওয়া যায়, তাও কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি, আলোচ্য 'ভূমিকা'য় তার উল্লেখও করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যসন্ধানীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটিও রবীন্দ্রনাথের চেতনায় সহজসিদ্ধ ছিল।

যাত্রা ও কথকতা ঃ ভাবুকের চিত্তে রঙ্গমঞ্চ

প্রাচীন বাংলার নিজস্ব নাট্যসাহিত্য-শিল্প যাত্রা রবীন্দ্রনাথের নাট্যসৃষ্টির ধারাকে প্রভাবিত যে করেছিল, অন্যত্র সে সম্পর্কিত আলোচনায় তার সন্ধান করে দেখেছি।[৫২] তাঁর মনে ঐ দেশজ শিল্পরূপের নানামুখী নিবিড় আকর্ষণ তাঁর ভাবনা-রচনাতেও রূপ ধরেছে।

পারিভাষিক বিচারে যাত্রার পরিণত রূপ লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কতটা কি ভাবে হতে পারে, সে বিবেচনা বিশেষজ্ঞের। কিন্তু পুরাকাল থেকে প্রবাহিত পল্লী-বাঙালির নাট্যরস-বাসনা থেকেই এর কলারূপের জন্ম; পল্লীমানুষের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার বিবর্তনের সঙ্গে এর রূপ ও বিষয়গত ক্রমবিকাশও সংলগ্ন। আসলে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে নূতনতর নাগরিক গোত্রান্তরের আগে অবধি যাত্রা পল্লীজীবনের গোষ্ঠীমানুষের সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষারই পরিবাহক ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রা'র প্রতি আগ্রহ ঐ বিশেষ ভূমিকাটির আকর্ষণেই।

অবনীন্দ্রনাথ যাত্রাকে 'খাঁটি ঘরাও মাল' বলে অভিহিত করেছিলেন।[৫৩] আর পাশ্চাত্ত্য অভিনয় কলা-প্রভাবিত আধুনিক বাংলা নাটকের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "যে মন বৈজ্ঞানিক, নাটকের জমি সেইখানে। আমাদের দেশে যে যাত্রা ছিল সেইটেই খাঁটি দিশী। অর্থাৎ ভাবুকতাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা, বাস্তবিকতাকে নয়।"[৫৪] স্পষ্টতঃ ইন্দ্রিয়গোচর 'বাস্তবিকতার' চাহিদা নেই বলেই দৃশ্যপট, রঙ্গমঞ্চ, সাজসজ্জা—এসবই অবান্তর হয়ে গেল। বদলে জোর পেল "ভাবুকতা"র পরিমণ্ডল—খোলা আসরে অভিনেতা-দর্শকের পরস্পর যোগাযোগে সুর এবং আবেগের আবহ ভরে মনের আদাপ্রদানটাই তাতে মুখ্য হয়ে উঠত। রবীন্দ্রনাট্য-কল্পনাতেও তেমনি মঞ্চের কৃত্রিম 'চিত্রপট' অপেক্ষা দর্শক বা শ্রোতার 'চিত্তপট'-ই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। 'রঙ্গমঞ্চ' (১৯০২) প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ—"ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবি কল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।"[৫৫] দেশীয় যাত্রাশিল্পে 'নাট্য প্রয়োগ কলার বিশিষ্টতার অনুসরণে'ই কবির এ সিদ্ধান্ত। পাশ্চাত্ত্য থিয়েটারে কৃত্রিম দৃশ্যপট, ড্রপসীন ইত্যাদি উপকরণ অভিনয়শিল্পে যে বদ্ধতা সৃষ্টি করে, তাতে অভিনেতা, তথা নাট্যরস ও দর্শকের মধ্যে অকারণ দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে পড়ে। যাত্রা সেই কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত—সেকথা বোঝাতেই ঐ একই প্রবন্ধে আবার লিখলেন—"আমাদের দেশের যাত্রা আমার এই জন্য ভাল লাগে। যাত্রার অভিনয়ে, দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মত চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে—

একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া ওঠে। তাই যদি না হইবে, তবে মালিনীরই বা কী গুণ, আর দর্শক গুলোই বা কাঠের মূর্তির মতো কী করিতে বসিয়া আছে?"[৫৬]

যাত্রায় সংগীতের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য—দৃশ্যপট ইত্যাদি উপকরণের অভাব পূরণ করে দেয় যাত্রার গান। জুড়ি, দোহার এরাই হচ্ছে একাধারে যাত্রার 'সিন্, কনসার্ট এবং নানা তোড় জোড়'। পালাকার গানের পর গান জুড়ে 'দর্শকের মনোরথ'কে এগিয়ে নিয়ে যায় দ্রুতগতিতে। তার 'চিত্তপটে' নানা বর্ণের মধ্য দিয়ে ভেসে ওঠে দৃশ্যপরম্পরা সহজ উপায়ে। যাত্রার এই বিশেষত্ব সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যাত্রার অর্থই হচ্ছে চলাচল। পুরো পালাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুহূর্তের বিশ্রাম দিলে সেখানে কাজ চলেনা।"[৫৭] সুতরাং গান দিয়ে সেই সচলতা বজায় রাখতে হবে। এইভাবে যাত্রা সাহিত্যের একটা প্রধান অংশ হয়ে উঠেছে গান। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন — "বিদেশী অলঙ্কার শাস্ত্র পড়বার বহুপূর্ব থেকে আমাদের নাট্য, যাকে আমরা যাত্রা বলি, সে তো গানের সুরেই ঢালা। সে যেন বাংলাদেশের ভূসংস্থানের মতো, সেখানে স্থলের মধ্যে জলের অধিকারই বেশি। ....মনে তো পড়ে একদিন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলুম "[৫৮] অলঙ্কার শাস্ত্রমতে নাটক 'দৃশ্যকাব্য'; অন্যপক্ষে গান শ্রব্যরসের ঝরণা। যাত্রার শিল্পে নাটকের গুণ গানের আবেশে মোহময় হয়ে ওঠে, তাই সাধারণ বাঙালির কাছে যাত্রা হল 'যাত্রাগান'।

যাত্রার উদ্ভব কত পুরাণো সেকথা বলা কঠিন; কিন্তু জন্মাবধি সে ছিল পল্লীসাহিত্য। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের নবজাগ্রত নাগরিক পরিবেশে 'নুতন যাত্রা'র 'পুনর্বিকাশ' ঘটে। প্রচলন হয় 'শখের যাত্রা'র। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে নিজের বাল্যকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শখের যাত্রা দেখার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে স্মৃতিচারণ রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তাতে সেকালের যাত্রাদলের প্রায় পূর্ণাঙ্গ একটি পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তখন 'মিহিগলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল।'[৫৯] 'ধনীদের ঘরপোষা' যেমন এই শখের যাত্রা, তেমনি 'ব্যবসাদারী যাত্রা'ও বাংলাদেশে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল তখন। পাড়ায় পাড়ায় নামজাদা পালাকার ও অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠেছিল। এরা যে শিক্ষিত বা উচ্চ সম্প্রদায় থেকে আসত এমন নয়। "বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারি দিকে উঠছে তামাকের ধোঁয়া। ছেলেগুলো লম্বাচুলওয়ালা, চোখে-কালি-পড়া; অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙকরা টিনের বাক্সোয়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিল পিল করে ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চার দিকে টগবগ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়।"[৬০]

রবীন্দ্রনাথের কথা থেকেই বোঝা যায় ধনী ঘরের অনুষ্ঠান হলেও সাধারণ দর্শক-শ্রোতার প্রবেশ ছিল সেখানে অবাধ। যাত্রা শুরু হত সাধারণত রাত্রি দশটা-এগারটা নাগাদ, শেষ হত রাত ফুরোবার মুখে। ঝাড়লণ্ঠন এবং বিছানো সাদা চাদরে অনুষ্ঠান চত্বর ঝলমল করত। একদিকে বসতেন বাড়ির কর্তা ও অভ্যাগতরা, বাকি অংশ পরিপূর্ণ হয়ে যেতো বাইরের সাধারণ লোকে। যাত্রায় গানের সঙ্গে যুক্ত ছিল নাচ। টাকা ছুঁড়ে বাহবা দেওয়ার রীতিও ছিল। 'এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা, আর গৃহস্থের ছিল খোশনাম'।[৬১]

গ্রামীণ যাত্রা যখন শহুরে 'শখের যাত্রা' হল, তখনও তার দেহে মনে গ্রাম্যভাব গ্রাম্যভাষা—গ্রামীণ মানুষের জীবনের স্পন্দন রইল অন্তরঙ্গ হয়ে। বিদেশী থিয়েটার রসের আবেদন এবং রসিক

দলের থেকে তার মৌলিক পার্থক্যটির ছবিও ধরে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঃ— "থিয়েটারে এসেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্দরলোকেরা যাদের বলে 'বাজে লোক'। তেমনি আবার পালাগানটা লেখানো হয়েছে এমনসব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মক্‌শো করেনি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেন নি পালিশ করে।"[৮২] শখের যাত্রার মধ্যেও দেশীয় অভিনয়শিল্পের গ্রামীণ চরিত্রটিকেই আবিষ্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পল্লীর আপামর জনসাধারণ তার মধ্যেই পেত মনের খোরাক। বাঙালি লোকসাধারণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা কবি বচনে উজ্জ্বল হয়ে আছে ঃ— "শহরে আজকাল আমোদ চলে নদীর স্রোতের মতো। মাঝে মাঝে তার ফাঁক নেই। রোজই যেখানে-সেখানে যখন-তখন সিনেমা, যে খুশি ঢুকে পড়ছে সামান্য খরচে। সেকালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ-দুকোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘন্টা কয়েক তার মেযাদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভরে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।"[৮৩]

এই তৃষ্ণা মেটানো শুধু মনের পিপাসার নয়, জ্ঞানশিক্ষারও। অবসর বিনোদনের সামগ্রী হিসেবে যাত্রার কদর থাকলেও লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তার গুরুত্ব এদেশে প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। 'ইতিহাস কথা /(প্রস্তাব)' প্রবন্ধে (ভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩১২) যাত্রার এই বিশেষত্বটি পর্যালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পুরাণ কথা, ধর্মজ্ঞান, ইতিহাস খুব সরল ভাবে কল্পনার সাহায্যে সহজ উপায়ে সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতায় যাত্রাগান ভরপুর। জ্ঞানের সামগ্রী সেখানে হৃদয়ের সামগ্রী হয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলকেই মানসিক পুষ্টি জুগিয়েছে। পুঁথিগত বিদ্যা নয়, উপদেশ নয়, সজীব আকারে সাধারণ মানুষের জ্ঞান-শিক্ষা লাভ করার এমন উপায় আর নেই বলেই তিনি মনে করেছেন। আমোদের উপকরণ হয়েও মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছিল যাত্রা-শিল্প।

উত্তরবঙ্গে নিজের জমিদারী অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রা দেখার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত সহযোগে তার পরিচয় দিয়েছেন 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৩৪০) প্রবন্ধে ঃ— অজ পাড়াগাঁয়ে জমিদারের অভ্যর্থনা উপলক্ষে গ্রামের চাষিরা ব্যবস্থা করেছে যাত্রা গানের। চাঁদোয়ার তলায় লণ্ঠনের আলোয় ছেলে বুড়ো সকলেই স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছে সেই পালা। যাত্রাগানের মূল বিষয় গুরুশিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা;— 'দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব'। আবার তার মধ্যেই আছে 'নাচ গান কৌতুকের দ্রুত মুখরিত ঝংকার'। এই পালার যে অংশটি রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল তা হল—"যাত্রী প্রবেশ করতে চলেছে বৃন্দাবনে, পাহারাওয়ালা আটক করলে তার পথ; বললে, 'তুমি চোর, ভিতরে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না।' যাত্রী বললে, 'সে কী কথা, কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল?' দ্বারী বললে, 'ঐ যে তোমার কাপড়ের নিচে লুকানো, ঐ যে তোমার আপনি, ওটা ষোল আনা আমার রাজার পাওনা, ফাঁকি দিয়ে রেখেছ নিজেরই জিম্মায়'। এই বলতে বলতে মহা ঢাক ঢোল বেজে উঠল, চলল পরচুলো ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন ঐখানটা পাঠের প্রধান অংশ। ....রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে, শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সবকথা স্পষ্ট বুঝুক না বুঝুক, এমন একটা কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের

দিকে।"[৬৪] কঠিন তত্ত্বজ্ঞানকে 'রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে' সঞ্চারিত করে দেওয়ার এই দেশীয় পদ্ধতিটি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি।

অনেকটা অভিনেয়শিল্পের মতোই **কথকতা** প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত। তবে সেখানে একক অভিনয়, —যাত্রার মতো একাধিক কুশীলব, সাজসজ্জা-মেক্‌আপ, যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার ইত্যাদি যৌথশিল্পের করণকৌশল অনুপস্থিত। কথক ঠাকুর তাঁর নির্দিষ্ট বেদী বা আসনে বসে কোনো পৌরাণিক কাহিনী বা ইতিহাসের গল্প শ্রোতাদের কাছে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন, যা এক অপরূপ শিল্পরূপ ধারণ করে। কথকতার মধ্যে পাঠ আবৃত্তি বর্ণনা ব্যাখ্যা অভিনয় সংগীত সব মিলেমিশে এক হয়ে যায়—আসর জমে ওঠে। যাত্রার মত দেশীয় এই শিল্পটির প্রতিও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নানা প্রসঙ্গে টুকরো-টুকরো ভাবে তার আলোচনাও করেছেন।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্য মূলত গেয়কাব্য। কীর্তন, রামায়ণ-পাঁচালি কিংবা মঙ্গলকাব্যের পালাগানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার গায়ককে সহায়তা করত। কিন্তু কথকতার প্রকৃতি ভিন্ন। "ইহা একজন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত হয়, ইহাতে নৃত্য বাদ্য নাই। মধ্যে মধ্যে সুস্বর সংযোগে, তাল মান লয়ের সহিত বিবিধ রাগরাগিণীতে গান সকল গীত হয়। বক্তাকে বহুবিধ অভিনয় করিতে হয়। তিনি কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও দীনহীন কাঙ্গাল, কখনও রাণী, কখনও দাসী, কখনও সাধু, কখনও চোর, কখনও মাতাল, কখনও লম্পট, কখনও ভাঁড় কখনও নট, কখনও নর্ত্তকী, কখনও বেশ্যা, কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও চন্ডাল, এই রূপ বহুরূপীর সাজে সজ্জিত হইতে হয়। অথচ তিনি কখনও বেশ পরিবর্তন বা নেপথ্য গমন করেন না। বেদীতে বসিয়া এক বেশে একভাবে থাকিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করা বড় সহজ কাজ নহে।"[৬৫]

কথকঠাকুর একই সঙ্গে সবচরিত্রে অভিনয় করেন। বক্তাই এখানে সব, শুধু কণ্ঠের জাদুতে সব কিছু অভিনয় করে যাওয়া। কখনও বীররস, আবার পরক্ষণেই হয়তো করুণরস কিংবা হাস্যরস। ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র রসের অবতারণায় কথককে সিদ্ধ হতে হত।

সংস্কৃত পুরাণপাঠের অনুকরণে কথকতার উৎপত্তি হলেও প্রাচীন কাল থেকে গুরুশিষ্য পরম্পরায় তা চলে আসছে। এই শিল্পটি পুরোদস্তুর গান বা অভিনয় না হলেও কথককে সুকণ্ঠের অধিকারী এবং সংগীতের তাল মান লয় সম্পর্কেও অভিজ্ঞ হতে হত। কথার মধ্যে হৃদয়াবেগের সঞ্চার ঘটলে তাতে কিছু না কিছু সুর লেগে যায়। এই সুরের উৎকর্ষ সাধন করে সংগীতকে পেয়েছে মানুষ। কথকতাও অনেকটা এই শ্রেণীর। সেখানেও মনের ভাব প্রকাশে যখন হৃদয়াবেগের সঞ্চার ঘটাতে হয়, তখন সুরের আশ্রয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কথকতার এই সাংগীতিক চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তাল মান সংগত রীতিমত সংগীত নহে।"[৬৬]

কথকতায় কথা, সুর ও নাট্যপ্রবণতার বিমিশ্রতা, বিশেষ করে এই কথার সঙ্গে জড়ানো সুরের আবহ সম্পর্কে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' (১৯৩৬) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "কথকতা যেন অলঙ্কার শাস্ত্রমতে ন্যারেটিভ শ্রেণীভুক্ত, তার কাঠামো গদ্যের হলেও স্ত্রীস্বাধীনতা যুগের মেয়েদের মতোই গীতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অসংকোচে প্রবেশ করত। মনে তো পড়ে

একদিন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলুম।"[৬৭] কথকতা-শৈলীর আর একটা বৈশিষ্ট্যও রবীন্দ্রনাথের মনে ধরেছিল। তা হল, সাধারণ মানুষের কাছে অনেক তত্ত্ব, গভীর জ্ঞানের গুরুগম্ভীর কথা আভাসে খুব সহজেই কথক ঠাকুর অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে পারতেন। লিখেছেন, —"আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলেই চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেই জন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে।"[৬৮]

'জীবনস্মৃতি'তে (১৩১৮) এই কথা বলার অল্প কিছু কাল পরে বাংলা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জে.ডি. এন্ডারসন্‌কে একটি চিঠিতে (৬ ফাল্গুন ১৩২০) পুনরায় বিষয়টির অবতারণা করেছিলেন—"আমাদের দেশে কথকতা যদিচ জনসাধারণকে শিক্ষা এবং আমোদ দিবার জন্য তথাপি কথক মহাশয় ক্ষণে ক্ষণে তাহার মধ্যে ঘনঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃত সমাসের আমদানি করিয়া থাকেন। সে সকল শব্দ গ্রাম্য লোকেরা বোঝে না। কিন্তু এই সমস্ত গম্ভীর শব্দের আওয়াজে তাহাদের মনটা ভালো করিয়া জাগিয়া ওঠে। বাংলাভাষার শব্দের মধ্যে আওয়াজ মৃদু বলিয়া অনেক সময় আমাদের কবিদিগকে দায়ে পড়িয়া অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।"[৬৯] কথকতার উপস্থাপনাপদ্ধতির এই কৌশল ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো, তা হল জনসাধারণের শিক্ষা ও আমোদের একটা প্রধান উপকরণ হিসেবে তার স্বীকৃতি। এ নিয়ে বহু পূর্বেই 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় 'ইতিহাসকথা (প্রস্তাব)' প্রবন্ধে লোকশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কথকতার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে লিখেছিলেন—"আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে দুটি সহজ উপায় অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যাত্রা এবং কথকতা। একথা স্বীকার করিতেই হইবে প্রকৃতির মধ্যে কোনো শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিয়া দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই।"[৭০]

বস্তুত লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কথকতা একসময়ে জনপ্রিয় ছিল বাংলাদেশে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অজ্ঞ-নিরক্ষর নির্বিশেষে তার রস আস্বাদন করত। পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মকাহিনী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কথকঠাকুর সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সীমানা প্রসারিত করে দিতেন। তাতে একই সঙ্গে অবসরবিনোদনের কাজও হত, জ্ঞানশিক্ষাও সমগ্রদেশে সঞ্চারিত হয়ে যেত। 'লোকহিত' (১৩২১) প্রবন্ধেও কথকতার এই গুণটির কথা খুব জোরের সঙ্গেই উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।[৭১] প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে এই কারণেই কথকদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম—ছোট-বড়ো রাজা, ভূস্বামীদের কাছে তারা সম্মানও লাভ করত। আধুনিক কালে মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবে প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের এই প্রকরণটি প্রায় লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে দেখে রবীন্দ্রনাথ আফশোস করেছেন।[৭২] ছাপা বইয়ের সঙ্গে এই বিদ্যাটি পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি। কথকদের গল্প শোনানোর ব্যবসা প্রায় বন্ধ।

ময়মনসিংহ গীতিকা : ধানের মঞ্জরী

চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র গাথা (ballad) গুলি দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হলে (১৯২৩) তার উচ্চ সাহিত্যমূল্য স্বীকার করে অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই গাথাগুলি তাঁর গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। 'বাংলা কাব্য পরিচয়'-এ সেগুলি অংশত স্থান পেয়েছে। লোকসাহিত্য হিসেবে গীতিকাগুলির অকৃত্রিমতা

সম্পর্কে সেকালে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল; একালেও তার মীমাংসা হয় নি। তাহলেও সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় পল্লীর সাধারণ মানব-হৃদয়ের সুখ দুঃখ, বিরহবেদনা ময়মনসিংহ গীতিকার আখ্যানগুলিকে যথার্থ পল্লীসাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে। আর প্রধানত সেই গুণেই রবীন্দ্রমনকে সে আকর্ষণ করেছিল।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে শহর কলকাতার নাগরিক বাবু সমাজের ফরমায়েশি ফসল হিসেবে কবিওয়ালা-পাঁচালিকারদের রচনায় দেশ-কালের যে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই কৃত্রিমতা ময়মনসিংহ গীতিকায় নেই। এই দুই শ্রেণীর সাহিত্য ভিন্নকোটির শুধু নয়, বিপরীত মেরুর। ময়মনসিংহ গীতিকার চিরকালীন রসাবেদনে তিনি শুনেছিলেন 'বিশ্বসাহিত্যের সুর'। 'জাভাযাত্রীর পত্র' (১৩৩৪)-এ লিখেছেন—"মৈমনসিংহ থেকে যে-সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যের সুর। কোনো শহুরে পাব্লিকের দ্রুত ফরমাশের ছাঁচে ঢালা সাহিত্য তো সে নয়। মানুষের চিরকালের সুখ দুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা। যদি বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও থাকে, তবু এ ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই, এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে বটে তবুও তা বিশ্বেরই ফসল—তা ধানের মঞ্জরী।"[৭৩] যে মানবিক রসাবেদন এই গাথাগুলির প্রাণ সম্পদ, বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশের হলেও, তা বিশ্বের চিরকালীন সাহিত্যধারার অংশীদার।

ময়মনসিংহ গীতিকার রসময় ভাষারূপ, এই গাথাগুলির এক প্রধান আকর্ষণ। অথচ এক সময়ে অভিযোগ উঠেছিল গাথাগুলির সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে এই সব পল্লী কবিদের শিল্পসৃষ্টিতে 'নানা রচনাকার্যের বুনট পরিয়ে'ছেন এবং দীনেশচন্দ্র সেনও তার উপর কলম চালিয়েছেন।[৭৪] এ অভিযোগ হয়ত সম্পূর্ণই গ্রাহ্য হবার নয়। চন্দ্রকুমার গাথাগুলির ভাষা কিছু পরিবর্তন করলেও তার মূল রূপের ইতর বিশেষ হয়তো অনেকটাই হয়নি। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন লোকজীবন-উদ্ভূত সাহিত্যের ওপর আধুনিক কলমের পরিমার্জনা চালালে তাতে 'জোড় লাগে না।' প্রথমনাথ বিশী এক সময়ে 'মহুয়া' পালা অবলম্বনে 'প্রাচীন গীতিকা হইতে' (১৩৪৪) গ্রন্থটি রচনা করলে, তা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন (১৮ মে ১৯৩৭), "ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়াকে তুই রূপান্তরিত করেছিস। ঐ গল্পের মধ্যে যে নিছক রোমান্স আছে আধুনিকের যুগে তার অকৃত্রিম সরল রূপ পাওয়া অসম্ভব। বর্তমান বাস্তবকে নেপথ্যে সরিয়ে রাখবার জন্যে এই গল্পটিকে তুই যেন পর্দার মতো ব্যবহার করেছিস। ....ভাষায় উপমায় রচনাটা ঝলমলিয়ে উঠেছে, ঘটনাটা পড়েছে ঢাকা। যে ভাষায় মূল গল্পটি পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল সেই ভাষার সঙ্গে তার প্রাণের যোগ, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে অন্য ভাষায় তার কলম বাঁধলে জোড় লাগে না। এটাকে উপলক্ষ্য করে তুই যা ফুটিয়ে তুলেছিস তাকেই মেনে নেওয়া যাক।"[৭৫] বস্তুত ময়মনসিংহ গীতিকার বিষয়বস্তুতে যে অকৃত্রিম 'প্রণয় কথার রোমান্টিক মাধুর্য', সেই পরিশীলন প্রভাবমুক্ত unsophisticated সহজ সরল রোমান্স জটিলতাক্রান্ত আধুনিক জীবনে পাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তার ভাষার পরিবর্তন করলেও সেই রোমান্স রসের নিজগুণের হানি হওয়ার সম্ভাবনা।

পরবর্তীকালে 'বাংলাকাব্য পরিচয়'-এর জন্য প্রাচীন পর্বের কবিতা বাছাই করতে গিয়ে পুনরায় একই কথা মনে এসেছে রবীন্দ্রনাথের। বাউল গানের মধ্যে যে 'অকৃত্রিম বিশিষ্টতা' আছে তাকে তিনি

'চিরকেলে আধুনিক' বলে অভিহিত করেছেন। সেইসঙ্গে একথাও বলেছেন, তথাকথিত আধুনিকের কলমে তা যেমন আসবে না, তেমনি তার জাল করাও অসম্ভব। এই ভাবনাসূত্র ধরে নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে একটি চিঠিতে লিখেছেন (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫), —"ময়মন সিংহ গীতিকাও অনেকটা তাই। প্রচলিত লোকসাহিত্যে গ্রন্থসত্ত্ব [?] থাকে না, মুখে মুখে তার ব্যবহার চলে, নানা হাতের ছাপ পড়ে তবু মোটের উপর তার ঐক্যধারা নষ্ট হয় না। ওর মধ্যে যে একটা আশ্চর্য কবিত্ব আছে, ইতিপূর্বে তার এমন দুর্যোগ ঘটেনি যাতে একেবার তার সুর কেটে যায়, তাল কেটে যায়। ওর ভিতরকার জিনিস রয়ে গেছে, সেটা নষ্ট করার সাধ্য কারো নেই—বাইরে দুটো একটা জায়গায় একটু আধটু চুনবালির পলাস্তারা লাগালেও ইমারৎটা বাতিল হয়ে যায় না। ময়মনসিংহ গীতিকার কালনির্ণয় চলে না, জাত নির্ণয় চলে, ওটা আবহমান কালের, কেবল ওটা কলেজি কালের বাইরে। এই কাল ওতে রিফু করতে যায় যদি সেটা তখনই ধরা পড়ে এবং সেটাতে সবটার দাম নষ্ট হবে না।"[৭৬]

ময়মনসিংহ গীতিকায় আধুনিকতার প্রক্ষেপ ঘটেছে বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের এই সুচিন্তিত অথচ দৃঢ় বক্তব্য তার উত্তর। রবীন্দ্রনাথের উক্ত পত্রাংশ 'বাউল সঙ্গীত' শিরোনামে ১৩৪৬ সালের 'বাতায়ন' (পৃষ্ঠা ৩৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হলে দীনেশচন্দ্র সেন তা পাঠ করে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ খণ্ডন হয়েছে দেখে কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি কবিকে লেখেন (১৭ অক্টোবর ১৯৩৯), —"পূজাসংখ্যা বাতায়নে আপনি অতি অল্প কয়েকটি ছত্রে মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে রূপ সমালোচনা আপনি ভিন্ন অন্য কেহ করিতে পারিতেন বলিয়া আমার মনে হয় না, আপনার অর্ন্তদৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ও সত্যাশ্রিত যে তাহাতে যে কোন বিষয়ের জটিলতা ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপ উজ্জ্বল করিয়া দেখায়। ....আপনার মন্তব্য ক্ষুদ্র একটি মণির ন্যায় বহু মূল্য ও উজ্জ্বল।"[৭৭]

এই চিঠির উত্তরে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ময়মনসিংহ গীতিকার পার্থক্য নির্ণয় করে দীনেশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন (বিজয়া দশমী ১৩৪৬), —"বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে করা পুষ্করিণী; কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লী হৃদয়ের গভীরস্তর থেকে স্বত উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রস সৃষ্টি আর কখনো হয় নি। এই আবিষ্কৃতির জন্য আপনি ধন্য।"[৭৮] রবীন্দ্রনাথ নিজেও ধন্য মেনেছিলেন ঐ সহজরসে অবগাহন করে।

আগেই দেখেছি এই গীতিকা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন 'বিশ্বসাহিত্যের সুর'। এর মধ্যে এমন একটা চিরকালীন আবেদন আছে, যে তা বাঙালির হয়েও বিশ্ববাসীর হতে বাধা নেই। এর কবিত্ব এতই খাঁটি যে তা দেশকালের শ্রেণীরুচিগত বৈষম্যেরও উর্ধ্বে। অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি অপকটে লিখেছিলেন (১৭ মার্চ ১৯৩৯) —"যখন ময়মনসিংহ গীতিকা হাতে পড়ল খুব আনন্দ পেয়েছিলুম। ....আমি তো জাত-বুর্জোয়া, আমার ভাল লাগতে একটুও বাধেনি।"[৭৯] রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকৃতিতেই খাঁটি কাব্য হিসাবে ময়মনসিংহ গীতিকার যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে আরও একবার।

ছড়া রূপকথা ব্রতকথা প্রভৃতি বাংলা লোকসাহিত্যের প্রধান শাখাগুলির ভাষারূপে মেয়েলি প্রাধান্য স্বীকৃত। ময়মনসিংহ গীতিকা সমশ্রেণীর সাহিত্য, কিন্তু তার রচয়িতা পুরুষ। রবীন্দ্রনাথ গাথাগুলির এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করে লিখেছেন, —"এ পর্যন্ত অলিখিত প্রাকৃত বাংলা ভাষায়

রস জুগিয়ে এসেছে মেয়েরাই, ছেলেবেলায় যখন রূপকথা শুনেছি তখন তার প্রমাণ পেয়েছি প্রতি সন্ধ্যাবেলায়। ব্রতকথার বাংলা ভাষার প্রতি লক্ষ করলেও আমার কথা স্পষ্ট হবে। এটা জানা যাবে প্রাকৃত বাংলা যেটুকু সাহিত্যরূপ নিয়েছে সে অনেকটাই মেয়েদের মুখে মুখে। অবশেষে সত্যের অনুরোধে ময়মনসিংহ গীতিকা উপলক্ষে পুরুষের জয় ঘোষণা করতে হবে। এমন অকৃত্রিম ভাবরসে ভরা কাব্য বাংলা ভাষার বিরল।"[৮০]

রবীন্দ্রনাথের কাছে পল্লীসাহিত্য গ্রাম্যসাহিত্য লোকসাহিত্য বা প্রাকৃতসাহিত্য অনেকটা সমার্থক। বাংলা প্রাকৃতসাহিত্যের রসরূপে মেয়েলি ভাষাভঙ্গির বিশেষ প্রাধান্যের কথা যেমন তিনি বলেছেন, তেমনি পুরুষের সৃষ্ট ময়মনসিংহ গীতিকার অকৃত্রিম ভাবসম্পদও যে প্রাকৃত সাহিত্যেকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাও মুগ্ধ দৃষ্টিতে আস্বাদন করেছেন তিনি।

বাউল গান : বন্ধনমুক্ত আত্মার মহাকাব্য

চর্যাগীতি লোকজীবন-নির্ভর সাহিত্য; কৃষ্ণকীর্তনকে অনেক সরাসারি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু চৈতন্য-প্রভাবিত মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে অভিজাত এবং লোকসাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য পার্থক্য অনেকটাই মিলেমিশে গিয়েছিল। পরে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বিনষ্টিকালে অভিজাত চেতনা নাগরিক অহমিকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে পল্লীগ্রামগুলিতে লোকসাহিত্যের পুনরুন্মেষ বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাহিত্যরসপিপাসা অনেকটাই মিটিয়েছিল।[৮১] নব-উদ্ভুত এই লোকসাহিত্যের একটি প্রধান শাখা ছিল বাউলদের গান।

বাউলদের সাধনার ধারা এবং সংগীতাবলীর প্রাচীন ঐতিহ্য পণ্ডিত গবেষকদের দ্বারা ইদানীং স্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু বাউলগান অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোযোগ এবং প্রশ্রয় পায় নি। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাউল সংগীতের গুরুত্ব শিক্ষিত সমাজের সামনে তুলে ধরেন; এর ভাব এবং সুর সম্পর্কে জাগ্রত করেন তাঁদের রসবোধ। লোকসাহিত্য হিসেবে এই গান যে আজ তার প্রাপ্য মর্যাদা পাচ্ছে, তা রবীন্দ্রনাথেরই কল্যাণে। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—"বাউল গানের রীতি আমাদের দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র-শিক্ষিত সমাজে সে গানের কোন মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। বাউল গান রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার বলিলে বেশি বলা হয় না। ....তাঁহার অনুভব দিয়াই আমরা যেন বাউলগানের মর্মের পরিচয় পাইয়াছি।"[৮২] সাহিত্যের ঐতিহাসিকের এই অভিমত যথার্থ। অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন—"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন একসময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।"[৮৩] রবীন্দ্ররচনায় বাউল গানের প্রভাব ও ব্যবহার কত গভীর ও ব্যাপক, অন্যত্র সে পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৮৪] লোকসাহিত্যের এই শাখাটি তাঁর চিন্তা জগৎকেও বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। বর্তমান প্রসঙ্গে 'বাউল-পদাবলী' সম্পর্কে কবির সেই সুচিন্তিত অভিমতের পর্যালোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

নবীন বয়সে গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটি শুনে বাউল গানের প্রতি

প্রথম আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ। আর 'সঙ্গীত সংগ্রহ/বাউলের গাথা' গ্রন্থের দুটি খণ্ড সমালোচনার জন্য যখন বাইশ বছরের তরুণ কবির হাতে এসে পড়ে, তখন এর মধ্যে 'বাংলার ভাব ও ভাবের ভাষা'র সন্ধান পেয়ে চমকে ওঠেন তিনি। 'বাউলের গান' শিরোনামে উক্ত সংকলনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা দুটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় যথাক্রমে বৈশাখ ১২৯০ এবং আশ্বিন ১২৯১ সংখ্যায়। পরে, দুটি সমালোচনারই কিছু অংশ বর্জিত হয়ে একত্রে 'বাউলের গান' নামে 'সমালোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রবন্ধের প্রথমাংশে বাউল গানের সহজ সরলভাব ও প্রকাশ রীতির প্রশস্তি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক সাহিত্যিকের লেখায় নয়, পণ্ডিতী সংস্কৃতবাগীশের রচনাতেও নয়, তাঁর মতে বাঙালির প্রাণের যথার্থ ভাব ও ভাষার সন্ধান পাওয়া যাবে এই শ্রেণীর পল্লীসাহিত্যে। সমালোচ্য গ্রন্থ থেকে 'আমি কে তাই আমি জানলেম না' ইত্যাদি বাউল গানটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন—"আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা আমরা যদি আয়ত্ত করতে চাই, তবে বাঙ্গালী যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।"[৮৪] এই 'হৃদয়ের কথা'র সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বাউলের সহজ সরল কাব্যসৌন্দর্যে।

প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে 'বাউল প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা' করেছেন কবি দৃষ্টান্ত সহযোগে। বাউলের গান তাঁর তরুণ হৃদয়কে অনুরণিত করেছিল। তাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত সংগীতেই মানব প্রেমের বৃহৎ তত্ত্বকথার আবিষ্কার করেছেন নবীন সমালোচক; ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালিরা যা পারেন নি। ভাবমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন—"Universal Love প্রভৃতি বড় বড় কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়ই ভাল শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছায় না কেন?"[৮৫] রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের এই দৃঢ় বক্তব্যেই নিহিত আছে পরবর্তী কালে বাউলতত্ত্ব নিয়ে লেখা অনেক ইংরেজি-বাংলা প্রবন্ধের অঙ্কুর।

সংকলনে ধৃত 'অশিক্ষিত অকৃত্রিম হৃদয়ের সরল গান'গুলির রসমূল্য নির্ধারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের বিচারে। বাউল গানের সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বনিরূপণের পথে না গিয়েও বাউলদের প্রেমসাধনার ব্যাপারটি রস-সম্ভোগের আলোকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'সে প্রেম করতে গেলে মরতে হয়/আত্মসুখীর মিছে সে প্রেমের আশয়। কিংবা 'যে প্রাণ ক'রে পণ পরে প্রেম রতন/তার থাকে না যমের ভয়' ইত্যাদি বাউল বাণী উদ্ধৃত করে বলতে চেয়েছেন অহং এর বিনাশেই যথার্থ প্রেমলাভ করা যায়। লিখেছেন, "গোড়াতেই মরা চাই। আত্মহত্যা না করিলে প্রেমকরা হয় না। ....যে মরে তার আর মরণের ভয় থাকে না। ....অপ্রেমিকে বলিবে, এ প্রেমে লাভ কি? ....তেমনি প্রেমিক বলিবে মরণই আমার ধর্ম, না মরিয়া আমার সুখ নাই।"[৮৭] বাউলের ভাষা উদ্ধৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ—'প্রেমের মর্ম কি অপ্রেমিকে পায়?' প্রেমের তারেই জগতের প্রাণের সঙ্গে মানুষের সংযোগ। বাউলের গানে সেই 'প্রেমের মহিমাই' ব্যক্ত হয়েছে।

বাউলদের 'মনের মানুষে'র প্রতীকটি পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে উদ্‌বোধিত করেছিল। উপনিষদ ও নিজের জীবনদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে তার ব্যাখ্যাও করেছিলেন নানা প্রসঙ্গে। আলোচ্য প্রবন্ধের সাময়িকপত্রে বর্জিত অংশে সেই 'মনের মানুষ'-এর ভাবনাও বীজাকারে রয়েছে দেখতে পাই। দেখেছি 'রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা' গানটি উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে—

"আধুনিক ইংরাজি কবিতায় মনের মানুষের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা প্রায়ই পড়িতে পাওয়া যায়। আমরাও সেই আদর্শে উক্ত ভাবের কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে একটি গান আছে, সেও ঐ ভাবের। ....ইহার বাঙ্গলা কেমন সহজ, ভাব কেমন সরল; ইহাকে দেখিলেই এমনি আত্মীয় বলিয়া মনে হয় যে, কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়া ইহাকে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করতে দিই।"[৮]
এর থেকেই বোঝা যায় বাউল সাধকদের গীতিকর্ম প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের মনকে অনায়াসেই স্পর্শ করতে পেরেছিল।

'সঙ্গীত সংগ্রহ/বাউলের গাথা' গ্রন্থ সমালোচনার পর বাংলা ১৩২০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন বাউল গীত সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বড়ো কোন আলোচনা রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি। এই মধ্যবর্তী সময়ে শিলাইদহ অঞ্চলে লালন-শিষ্যধারার বাউলদের ব্যক্তিগত সাহচর্যে অভিসিঞ্চিত করেছিলেন নিজেকে। তাঁদের গান, তাঁদের সাধনা নিয়ে দিনের পর দিন আলাপ-আলোচনা করেছেন, সংগ্রহ করেছেন তাঁদের গীত বাণী। বাউলদের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট মনোভঙ্গি এই সময়েই তৈরী হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের। এর ফলও দেখা গেল 'বঙ্গভঙ্গ' বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫) সময় লেখা তাঁর স্বদেশী গানগুলিতে, কাব্যকবিতায়, নাটকের বাউলধর্মী চরিত্রে এবং গদ্যরচনায় বাউল গান ব্যবহারে। এই গীতিকর্ম তাঁকে যতটা প্রভাবিত করেছিল, আধুনিক যুগের আর কোন কবি সাহিত্যিককে ততটা নয়। এর ভাব সুর ভাষাভঙ্গি রূপক প্রতীক সংকেত ইত্যাদি দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহিত হয়েছিলেন। এর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন উচ্চভাব-সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরস। বাউলদের যে ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, তা হল যাবতীয় সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় আচার বিচারের ঊর্দ্ধে আত্মকর্ম-সমাহিত উদার জীবনচর্যা ও তাদের গানের বাণী ও সুরের মর্মস্পর্শী মাধুর্য। তাদের গুরুবাদ এবং গুহ্যসাধনার দিকটি ছাড়া, জাতপাতহীন যে মানবধর্মের অভিব্যক্তি, তার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। সর্বোপরি তাদের 'আত্মমনের রস-বিভোরতা এবং গানের সুরের মাধ্যমে অন্তরতম সত্তার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রকাশ' মুগ্ধ করেছিল কবিকে।

অন্যপক্ষে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-সম্পৃক্ত ধর্ম ও দর্শনের স্বকৃত ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব তৈরী করে নিতে দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথকে নানা প্রসঙ্গে। পণ্ডিত-গবেষকদের মতের সঙ্গে সেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মিল খুঁজে পাওয়া ভার। অথচ সেই 'প্রতিভা প্রসূত মৌলিক ব্যাখ্যায়' প্রতি মুহূর্তে আশ্চর্য হতে হয় আমাদের। বাউলদের মানব ধর্মের—বিশেষত মানুষকে জানার সাধনার প্রতিও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল কবির। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালার কয়েকটি রচনায় তার প্রথম প্রকাশ দেখা গেছে।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মবোধ যদি কিছু থাকে তবে তা হল মানবধর্ম। থিয়োলজি-নির্ভর কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদের সঙ্গে তাঁর ঈশ্বরভাবনাকে ছকে মেলানো যাবে না। ধর্মের নামে প্রচলিত আচার, বিচার কুসংস্কারের গণ্ডিতে মনুষ্যত্বের অবমাননা কবিকে বেদনাহত করেছিল প্রতি মুহূর্তে। সেদিক থেকে ধর্মভাবনায় বাউলদের মতই একটা নিজস্বতা ছিল তাঁর। বাউলদের সংস্কারহীন জীবনচর্যায় মানবধর্মকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আবিষ্কার করেছিলেন মানবসত্যকে তাঁদের সংগীতময় আনন্দকর জীবনের ছন্দে। লালন ফকির এবং তাঁর শিষ্যধারার অন্তর্ভুক্ত গগন হরকরার দুটি গান অবলম্বনে 'মনের মানুষ'-এর তত্ত্বকে অস্ফুট রকমে প্রকাশ করলেন প্রথম 'ছোটো ও বড়ো' (১৩২০) প্রবন্ধে। গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে/আমার মনের মানুষ যেরে' গানটিকে উপলক্ষ

করে লিখেছেন—"এই গানের কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয়, কিম্বা একথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয় নি যে যারা গাচ্ছে তারা সাম্প্রদায়িক ভাবে এর ঠিক কী অর্থ বোঝে। কেননা, অনেক সময় দেখা যায় মানুষ সত্য ভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যা ভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু একথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই তো, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠছে? ....তিনিই ভিতর থেকে আপনাকে দিয়েই তো মানুষকে তৈরি করে তুলেছেন। সেই জন্যে মানুষ আপনাব সবকিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি কাকে অনুভব করছে।—

সেই জন্যেই ওই বাউলের দলই বলেছে—

খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি
কমনে আসে যায়।

আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা ঃ—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ' যেরে।

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিটক-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্য ধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলটুকু রয়ে গেছে।

"অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ। তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না।"[৮]

বাউলের মনের মানুষ এই অস্ফুট কবিভাবনায় ঈশ্বরের প্রতিরূপ হলেও পরবর্তী কালে রবীন্দ্রচিন্তায় তা আরও ব্যাপক মাত্রা লাভ করেছিল। যথাস্থানে সে আলোচনা করা হবে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল বেদের মন্ত্রে বাউলের এই মনের মানুষের কথাই একটু অন্যভাবে বলা হয়েছে বলে আলোচ্য প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে পূর্ণতার পথেই অনন্ত পিতাকে লাভ করার যে ব্যাকুলতা সেখানে প্রকাশিত, পল্লীবাংলার অশিক্ষিত বাউল-বৈরাগীর মুখের বাণীতেও তাই।

বাউল এবং তাদের গীতকর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর আগ্রহ তাঁর ইংরেজি লেখাগুলিতেই বেশি স্পষ্ট হয়েছে। বিশ্ববাসীর সামনে বাংলার পল্লী কবিদের[১০] যথার্থ বাণীটুকু তুলে ধরার আগ্রহে বাউল গানকে শুধু ইংরেজি ভাষায় রূপান্তর করে দিয়েই[১১] দায়িত্ব শেষ করেন নি, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রেক্ষাপটে তাঁদের জীবন ও বাণীর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি একাধিক প্রবন্ধে। বাউল তাৎপর্যের আধুনিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রথম ইতিহাস রূপে সেই সব লেখার

গুরুত্ব অপরিসীম। কালানুক্রমের দিক থেকে 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধের পর বাউলদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'Creative Unity' (১৯২২) গ্রন্থের 'An Indian Folk Religion' প্রবন্ধে। বলতে গেলে বাউল সম্পর্কিত এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তাঁর। বাউলদের পরিচয় ও তাদের জীবনদর্শনের ব্যাখ্যায় আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যতটা সিদ্ধিলাভ করেছেন, কোন বাংলা লেখায় ততটা নয়। বাউলদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংসর্গের অনেক কথাও খুব সহজভাবে উল্লিখিত হয়েছে এখানে।

বাংলাদেশের 'Popular religious sect' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রবন্ধের প্রথমেই কবি লিখেছেন—"The members of the religious sect I have mentioned call themselves 'Baūl'. They live outside social recognition, and their very obscurity helps them in their seeking, from a direct source, the enlightenment which the soul longs for, the eternal light of love."[১২] বাউলদের এই পরিচয় আরও বিশদ করে অন্যত্র লিখেছেন:-
" .. .who have no images, temples, scriptures, or ceremonials, who declare in their songs the divinity of Man, and express for him an intense feeling of love. Coming from men who are unsophisticated, living a simple life in obscurity, it gives us a clue to the inner meaning of all religions For it suggests that these religions are never about a God of cosmic force, but rather about the God of human personality."[১৩]

নানা বৈপরীত্য সত্ত্বেও মূলগত ভাবনায় বাউলদের সাধনার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সাযুজ্য অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'An Indian Folk Religion' প্রবন্ধে তার ব্যাখ্যাও করেছেন :- "Both of them believe in a fulfilment which is reached by love's emancipating us from the dominance of self. In both these religions we find man's yearning to attain the infinite worth of his individuality, not through any conventional valuation of society, but through his perfect relationship with truth. They agree in holding that the realisation of our ultimate object is waiting for us in ourselves."[১৪]

আমাদের দেশে বাউলেরা সাধারণভাবে যে 'বৈরাগী' বলে অভিহিত হয়ে থাকে তার উল্লেখ করে, তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাহচর্যের অভিজ্ঞতালব্ধ ফল এবং প্রথম বাউল গান শোনার আশ্চর্য অনুভূতির কথাও পর্যালোচনা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। গগন হরকরার বিখ্যাত সেই গান, 'আমি কোথায় পাব তারে/আমার মনের মানুষ যেরে' অনুবাদে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করে গগনের বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন কবি। বাউলের 'মনের মানুষ' ('The Man of my Heart') প্রতীকটির অর্থ নির্ণয় করেছেন সংক্ষেপে নিজের মতো করে। "It means that, for me, the supreme truth of all existence is in the revelation of the infinite in my own humanity."[১৫] গগন হরকরার গান এবং তার পরিচয় প্রসঙ্গে বাউলদের জীবনদর্শনও বিশ্লেষিত হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষার আলোক থেকে দূরে সমাজের নীচের তলাকার এই সাধকেরা অর্থ ও সম্মানকে তুচ্ছ করে প্রতিদিনকার সহজ সরল জীবনচর্যায় কি ভাবে প্রেম ও সৌন্দর্যের পথে নিজের অন্তরের মধ্যে সত্যের অন্বেষণ করে ফিরছে, সে রহস্য রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করেছে। বাউলদের ঈশ্বর ভাবনা সম্পর্কে লিখেছেন, "Those people have no special incarnations in their simple theology, because they know that God is special to each individual. They say

that to be born a man is the greatest privilege that can fall to a creature in all the world. They assert that gods in paradise envy human beings. Why? Because God's will, in giving his love, finds its completeness in man's will returning that love. Therefore Humanity is a necessary factor in the perfecting of the divine truth. The infinite for its self-expression, comes down in to the manifoldness of the Finite, and the Finite, for its self-realisation, must rise into the unity of the Infinite Then only is the Cycle of Truth Complete "[৯৬] রবীন্দ্রনাথের মতে বাউলদের বিশেষত্ব হল, এই ভাব যেখানে রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে বৈষ্ণব ধর্মে, সেক্ষেত্রে সেই একই উপলব্ধির কথা বাউলেরা বলেছে সোজাসুজি সহজ সরল ভাষায় সংগীত মাধ্যমে।

আগেই বলা হয়েছে, বাউলদের সংস্কারহীন শাস্ত্র-বহির্ভূত জীবনচর্যা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে সে কথাও বলেছেন তিনি—"The Baul poet, when asked why he had no sect mark on his forehead, answered in his song that the true colour decoration appears on the skin of the fruit when its inner core is filled with ripe, sweet juice; but by artificially smearing it with colour from outside you do not make it ripe. And he says of his Guru, his teacher, that he is puzzled to find in which direction he must make salutation For his teacher is not one, but many, who, moving on, from a procession of wayfarers.

"Baüls have no temple or image for their worship, and this utter simplicity is needful for men whose one subject is to realise the innermost nearness of God. The Baül poet expressly says that if we try to approach God through the senses we miss him."[৯৭]

বাউলদের একাংশের যে মতবাদ, ধর্মীয় আচার, সংস্কার, ক্রিয়াকলাপ, সে সম্পর্কে অবহিত থেকেও যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ সে দিকটা। বাউলদের দেহতাত্ত্বিক গূঢ় সাধনায় যে দুর্বলতার দিক, সে সম্পর্কে বলেছেন—'একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধু-সাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত; তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। তাদেরই কাছে শুনেছি, এই প্রশ্রয় সুরঙ্গপথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত।'[৯৮] সহজিয়া আউল-বাউল, কর্তাভজাদের এই সাধন প্রক্রিয়াকে 'পৌরুষ-নাশী ধর্মনামধারী লালসার লোলতা'[৯৯] বলে অভিহিত করেছেন। অন্যপক্ষে যথার্থ বাউল সাধকদের 'সাধনায় 'দেহ' উপায় মাত্র;—পরিণাম নয়। 'মরম পরশ' তথা 'মনের মানুষ'-এর সংস্পর্শই এঁদের একমাত্র পরিণামী কাম্য।'[১০০] তাঁরা বলেন, মানুষের অন্তর্যামী হল তার সত্যরূপ। সেই সত্যকে লাভ করতে 'মনের মানুষে'র সন্ধান করতে হবে—মানুষের নিজের মধ্যেই যার বাস। এই মনের মানুষই তাঁদের গুরু, তাঁদের উপাস্য;—সহজ সত্যের মধ্য দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। এই জন্যেই মানব দেহকে বাউলেরা এত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের জীবন চর্যায় যে দর্শন প্রতিফলিত তাতে দেহতত্ত্বের সেই বিশেষ ভূমিকার কথা স্বীকার করে 'An Indian Folk Religion' প্রবন্ধে তার ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ : "These Baüls have a philosophy, which they call the philosophy of the body; but they keep its secret; it is only for the initiated. Evidently the underlying idea is that the individual's body is itself the temple, in whose inner mystic shrine the Divine appears before the soul, and the key to it has to be found from those who know. But as the key is not

for us outsiders, I leave it with the observation that this mystic philosophy of the body is the outcome of the attempt to get rid of all the outward shelters which are too costly for people like themselves. But this human body of ours is made by God's own hand, from his own love, and even if some men, in the pride of their superiority, may despise it, God finds his joy in dwelling in others of yet lower birth. It is a truth easier of discovery by these people of humble origin than by men of proud estate."[১০১]

বাউলদের মতে 'জীব ব্রহ্মস্বরূপ'। উপনিষদেও সেই কথা। তাই ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বরের হাতে নিজেদের সর্বস্ব সমর্পণ করে তাঁরা নিশ্চিন্ত হন—কোন দুঃখ-বেদনা-ভয় তাঁদের থাকে না। বাউলদের এই কথাই রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় নূতন মাত্রা পেয়েছে ঃ—"Our joys and sorrows are contradictory when self separates them in opposition. But for the heart in which self merges in God's love, they lose their absoluteness. So the Baül's prayer is to feel in all situations—in danger, or pain, or sorrow — that he is in God's hands. He solves the problem of emancipation from sufferings by accepting and setting them in a higher context."[১০২]

'An Indian Folk Religion' প্রবন্ধে এইভাবে বাউলদের একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের গানের 'ব্যাপক অনুবাদ উদ্ধার ও বিচার ব্যাখ্যা'র দ্বারা। বস্তুত এই লেখায় কোন 'ethnological standpoint' থেকে বাউলদের বিচার করেননি তিনি। মূল আকর্ষণ ছিল একটা ধর্মান্দোলন কি ভাবে জীবন্ত স্রোতের মত আমাদের দেশের লোকজীবনে ক্রিয়াশীল ছিল, তারই অন্বেষণ করা। সমাজ-বহির্ভূত অথচ যাবতীয় শাস্ত্র ও আচার সংস্কারের উর্ধ্বে থেকে এমন গভীর মর্মস্পর্শী বাণী যাঁরা বহন করে নিয়ে যেতে পারেন, সেই বাউলদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা ছিল—"unsophiscated aspiration of the loving soul."[১০৩] বাউলদের সম্পর্কে এই ধরনের আলোচনা এদেশের অভিজাত সমাজকেও কি ভাবে নাড়া দিয়েছিল সেকালে, তার বিবরণ দিয়েছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বাউলদের সম্বন্ধে 'Mysore Mythic Society'-তে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের (৮ মার্চ ১৯১৯) প্রত্যুত্তরে সভাপতি হিসেবে মাইসোরের যুবরাজ বলেছিলেন—'আজকের বক্তৃতা হইতে দুইটি জিনিস শিখিলাম; প্রথমটি এই যে, আমরা দেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। আমাদের লোক-সাহিত্যের আলোচনা প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি কোনো 'জাত' বা সম্প্রদায় নীচ নহে।'[১০৪]

পরবর্তী যে প্রবন্ধটিতে বাউল গানের বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাও ইংরেজিতে লেখা একটি বক্তৃতা; 'The Philosophy of our People' (The Modern Review, January, 1926) 'ভারতীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ' শিরোনামে প্রবন্ধটির একটি বাংলা তর্জমা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (ফাল্গুন ১৩৩২) অব্যবহিত পরেই। প্রবন্ধটিতে বাংলার বাউলদের সুগভীর দার্শনিক উপলব্ধির পরিচয় যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার তুলনা মেলা ভার। ইতিমধ্যে শ্রীহট্টের মরমী কবি হাছন রাজার (১২৬১-১৩২৯) গানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আনুষ্ঠানিক বাউল না হলেও হাছনের মন ছিল বাউলের একতারায় বাঁধা। এই গ্রামীণকবির জীবনদর্শন ও গানের সুরে যে কথাটা বার বার প্রকাশ পেয়েছে, তা হল, 'ভগবৎ প্রেম ও সেই প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সঙ্গে' তীব্র মিলনাকাঙ্খা। এক অধরার সন্ধানে তাঁর অস্থির অনুভূতি ব্যথা-বেদনায় কাতর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'অতি প্রিয় বাউল গীতিকার'-এর বাণী ও প্রসঙ্গ ধরেই

প্রবন্ধের সূচনা করেছেন। হাছনের গানে দর্শনের যে বড়ো তত্ত্বটি তিনি অনুভব করেছিলেন তা হল 'ব্যক্তি স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্বসত্য'।[১০৫] এই সাধক কবি দেখেছেন 'শাশ্বত পুরুষ তাঁহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইলেন।'[১০৬] বৈদিক ঋষি-বাণীর সঙ্গে এই সব আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই সম্প্রদায়ের মরমী গীতাবলীর আশ্চর্য মিল দেখে প্রবন্ধকার বিস্মিত হয়েছেন। এই গানগুলির বিশেষত্ব, তা শুধু সাধারণ গ্রাম্যভাষায় লিখিত নয়, নিতান্ত অমার্জিত বলে 'উচ্চসাহিত্য' দ্বারা অবজ্ঞাতও বটে। নিরক্ষর বাউলদের সেই কথা ও 'বাণী'কে উচ্চশিক্ষিত দার্শনিকদের সভায় তুলে ধরলেন কবি। কেবল হাছন রাজা নয়, লালন ফকির, সেখ মদন, বিশা ভূঞিমালি, পদ্মলোচন প্রমুখের সংগীতের উদ্ধৃতি ও আলোচনায় সমগ্র প্রবন্ধটি পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। বাউলদের দর্শন শাস্ত্রসম্মত ধর্মতত্ত্ব নয়। শাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যার কোনো ধার ধারেন না তাঁরা এবং তাঁদের গানে সে কথা ঘোষণা করতেও সংকোচ বোধ করেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'বাউল সম্প্রদায় আমাদের বাংলার সেই শ্রেণী হইতে আসিয়াছে যাহারা প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত নয়। ...এই সব কবি বাউলদের সাধন-পদ্ধতি মানব দেহতত্ত্বের যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জটিল ও দুরবগাহ।'[১০৭] বাউলবাণীতে দেহতত্ত্ব, সাধন তত্ত্বের কথা থাকলেও বেশির ভাগ গানের মূল ভাবটি হল 'হৃদয়ের সহজ অনুভূতি ও সহজ সত্য এবং শাশ্বত মানব-ধর্মের অনুপম উপলব্ধির কথা'[১০৮]— উচুদরের কাব্যভাষায় যা প্রকাশিত। বস্তুত গানই বাউলদের শাস্ত্র, তাঁদের বাণী, পথ তাঁদের আশ্রয়—পথে-পথে গানগেয়ে আনন্দ স্বরূপকে খুঁজে ফেরেন তাঁরা। ভূমার অন্বেষণে, অসীমের অভিসারের দুঃসাহসিক ব্রতে তাঁদের সার্থক জয়যাত্রা।

'শাস্ত্রভার মুক্ত' এক মানবধর্ম দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের দেশের লোকসমাজে প্রচলিত। বাউলদের মধ্যে তারই পূর্ণ প্রকাশ। তাঁরা মুক্তপুরুষ বলে সমাজের কোনো বাঁধন যেমন মানেন না, তেমনি এঁদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সূফী বৈষ্ণব সবেরই সমন্বয় ঘটেছে এক মহামিলনের মন্ত্রে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাউলগানকে এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করেছেন 'বন্ধন মুক্ত আত্মার মহাকাব্য' বলে। বাংলা দেশের এইসব সাধক কবিরা সংখ্যায় প্রচুর। পার্থিব সম্পদকে তুচ্ছ করে মুক্তির ভিখারী তাঁরা, সত্যের অভিমুখী। এই মুক্তি 'অহম্'-এর বিচ্ছিন্নতা থেকে। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় ঃ—'তাহারা জানে যে কেবল মাত্র বন্ধন অস্বীকার করিলেই মুক্তি আসে না, সম্পদের হ্রাস হইলেও নয়—মুক্তি আসে আস্তিক্য বোধের সাধনে, তাহার সিদ্ধি প্রাণে বিশুদ্ধ আনন্দের প্লাবন বহাইয়া দেয়, তাই গান ওঠে ঃ—'যে জন ডুবল সখী তার কি আছে বাকি গো।'[১০৯]

রবীন্দ্রনাথের মতে মানব জীবনের যাবতীয় দুঃখকষ্টের কারণ পার্থিব সম্পদের অভাবে নয়,— 'জীবনের সত্য তাৎপর্য সম্বন্ধে চেতনার অভাব।' দেহ-মনোভূমিতে আমাদের যে দ্বৈতের লীলা, তার এক সত্তা বাইরের বৈচিত্র্যের রাজ্যে নানা বস্তু খুঁজে ফেরে, আর এক মন ছোটে 'ভিতরে ঐক্যের স্বপ্ন মূর্তির সন্ধানে'—মনের এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বটি যখন মিটে যায় তখনই উপলব্ধি করা যায় অনির্বচনীয়কে—বাউলের ভাষায় 'আজব'কে। বাউল গানের মধ্যে এই তত্ত্ব-দর্শনের সন্ধান পেয়ে অনুভবের ব্যাকুল আন্তরিকতায় কবি লিখেছেন, '...এই সব বাউল গায়কদের মতে সত্য ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মুক্তি ঐক্যের সাধনে। ... এই মুক্তি একমাত্র সত্যেই আছে, সত্যাভাসে নাই।'[১১০]

বিশা ভূঞিমালীর কাব্যবাণীতেও ('হৃদয় কমল চল্‌তেছে ফুটে কত যুগধরি' ইত্যাদি গানে)

সেই মুক্তিস্বরূপের সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—"The poet sings of the eternal bond of union between the infinite and the finite soul, from which there can be no 'Mukti', because it is an interrelation which makes truth complete, because love is ultimate, because absolute independence is the blankness of utter sterility. The idea in it is the same as we have in the Upanishad, that truth is neither in pure 'Vidya' nor in 'Avidya', but in their union."[১১১]

শেখ মদন ফকিরের একটি গান অবলম্বনে ('নিঠুর গরজী, তুই কি মানস মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে' ইত্যাদি) বাউলদের সত্যের ঐক্য ও মুক্তি স্বরূপের স্বভাব নির্দেশ করে পুনরায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"The poet knows that there is no external means of taking freedom by the throat. It is the inward process of losing ourselves that leads us to it."[১১২] এই ভাবেই বাউলদের 'কাব্য-পক্ষপুটে ভর করে' আমাদের অন্তরাত্মা ঊর্ধ্বে উড়ে যায়। বাউলরাও বলেন, তাঁরা 'পাখীর জাত', 'হেঁটে চলার ভাও' জানেন না, তাঁদের তাই 'উড়ে চলার ধাত'। সত্যই তাঁদের গানের বাণী ও সুর মুক্ত-প্রাণ পাখির মতোই উড়ে চলে।

বস্তুত বাউলদের এই গভীর বাণী থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে বাংলা দেশের অতি নগণ্য পল্লীমানুষদের জীবনচর্যায় 'Poetry and philosophy have walked hand in hand, only because the latter has claimed its right to guide men to the practical path of their life's fulfilment. What is that fulfilment? It is our freedom in truth."[১১৩] বাউল গানের সহজ-সরল বাণীতে তত্ত্ব ও দর্শনের মূল্য এই ভাবেই পরিস্ফুট হয়েছে 'The Philosophy of our People' প্রবন্ধে।

'The Creative Ideal' শীর্ষক রচনায় বাংলার বাউলদের 'Village mystic in Bengal'[১১৪] বলে অভিহিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজি 'Mysticism' ও 'Mystic' শব্দের বাংলা প্রতিরূপ হিসেবে যথাক্রমে 'মরমী' ও 'মরমিয়া' কথা-দুটি বিবেচিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'গূঢ় গভীর ভাবুকতার ধর্মকে 'মরমী' বলিয়া থাকে এবং এইরূপ ভাবের ভাবুককে 'মরমীয়া' বলে।যে ধর্মের মূল মর্ম্মগত, যাহা শাস্ত্রগত জ্ঞানগত নহে, তাহাকে কেবল মর্ম্ম দিয়াই বুঝা যায় এই জন্য তাহার ভাষা ও ভাব বাহিরের লোকের পক্ষে অস্পষ্ট।'[১১৫] মরমিয়া কবি ও সাধক হিসেবে বাউলদের যে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন রবীন্দ্রনাথ, তার প্রমাণ রয়েছে পরবর্তী আলোচ্য 'মরমিয়া' (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩২) প্রবন্ধটিতে।[১১৬] তাতে তিনি বলেছেন, যাবতীয় বিভেদের মধ্যে ঐক্যের অন্বেষণকারী মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত মরমিয়া কবি সাধকদের যথার্থ উত্তরসাধক রূপেই বাউলেরা 'আজও বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে একতারা বাজিয়ে গান গায়; তাদের সেই একতারার তার ঐক্যের তার। ভেদবুদ্ধির পাণ্ডা শাস্ত্রজ্ঞের দল তাদের উপর দণ্ড উদ্যত করেছে। কিন্তু এত দিন যারা সামাজিক অবজ্ঞায় মরেনি, তারা যে সামাজিক শাসনের কাছে আজ হার মানবে', একথা তিনি বিশ্বাস করেন না।[১১৭]

রবীন্দ্রনাথের মতে লোকসাহিত্য হিসেবে বাউলদের গানের যে ধারা, তা 'চিরকালই আধুনিক'। এর চিরন্তনতা অন্তরের অনুভবে। সনাতন শাস্ত্রবচনের বইরে অন্তরের মিলনমন্দিরেই প্রাণেশ্বরের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ। নির্দিষ্ট বাঁধাপথের সংসারে যারা বদ্ধ তাদের চোখে এঁদের সবকিছুই 'পাগলের খামখেয়ালি'। অথচ সর্বকালে সর্বদেশে এঁদের অনুভব ও বাণীর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের

সঙ্গে এই মরমিয়া সাধকদের সম্পর্ক 'পুণ্যাভিমানীর নয়, প্রেমের রসে'। এই কারণেই তাঁদের বাণী চিরকালই নবীন, তার রস কখনো শুষ্ক হয় না। বাউলদের প্রতিটি গানের 'মধ্যে সোনার কণা লুকিয়ে আছে' বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাই 'বাংলা ভাষার গুহার থেকে বাউলদের সেই সুবর্ণরেখার বাণী ধারাকে'[১১৮] আবিষ্কার করে নূতন ব্যাখ্যায়, আলোচনায় শিক্ষিতসমাজের কাছে উন্মোচন করেছেন কবি।

বাউলদের মধ্যে যে মানব-ঐক্যের সাধনা অন্তর্নিহিত, বিশেষ গুরুত্বসহকারে তার পর্যালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'বাউল গান' (১৩৩৪) প্রবন্ধে।[১১৯] এই লেখার প্রথমাংশে বাউল ও বাউলগানের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন তিনি। দ্বিতীয়াংশে বাউল গানের সাহিত্যিক ও দার্শনিক আলোচনা অপেক্ষা, তার মধ্যে যে সামাজিক ও ধর্মীয় সমন্বয়সাধনের প্রেরণা আছে— রবীন্দ্র-ব্যাখ্যায় তারই উপর জোর পড়েছে বেশি। বাউল গানের 'ঐতিহাসিক মূল্য' স্বীকার করে তার মধ্যে স্বদেশের চিত্তের ইতিহাসকে খুঁজেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই স্বভাবের বিমিশ্র প্রকৃতিতে এক সমন্বয়ীপন্থা বাউলদের মধ্যে ছিল; হিন্দু-অহিন্দুর ভেদ তাঁদের আচরণে তেমন একটা ছিল না। 'সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধি নিরপেক্ষ' এই ভাবাদর্শ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল, ইংরেজের মতো অসামঞ্জস্য নয়, বহিরাগত হয়েও মুসলমানেরা এদেশকে আপন করে নিয়েছিল। তাদের বেশির ভাগই 'বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান।' তা সত্ত্বেও ধর্ম নিয়ে হিন্দু মুসলমানে যে বিরোধ, উভয় সম্প্রদায়ের মহাপুরুষেরা প্রথম থেকেই সেই পরস্পর বিরুদ্ধতার মধ্যে সমন্বয়সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের জীবনাচরণ ও বাণী প্রচারের মধ্য দিয়ে। যথার্থ ধর্মসংগমের আকাঙ্খায় বিরোধবৈচিত্র্যের মধ্যে একের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় রামানন্দ কবীর দাদু রবিদাস নানক প্রমুখ মধ্যযুগের সন্তকবিদের যে দান, তা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য প্রবন্ধে। বাংলার বাউলেরা ছিলেন তাঁদের যথার্থ উত্তরসূরী।

আধুনিককালে শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অথচ প্রয়োজনের তাগিদে নয়, এদেশের ঐতিহ্যে 'মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনা' চিরদিনই বর্তমান ছিল; সমন্বয়বাদী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি তা। তিনি লিখেছেন—'বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই; একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস।'[১২০] শুধু সাহিত্য দর্শন নয়, সামাজিক ও ধর্মীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাউল সম্প্রদায় ও তাঁদের গানের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বাউলদের সাধনায় হিন্দু, মুসলমান সূফী ধর্ম যে একত্রে মিলেছে, বাউল বিশেষজ্ঞও সে কথা স্বীকার করেন।[১২১] সূফীধর্মের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—'সুফি ধর্মের ... গুরুবাদ পুনশ্চ আমাদের দেশেই বাউল ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ে নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।'[১২২]

বাংলাদেশের চিত্তের অন্তঃস্থলে যাবতীয় প্রথাগত শিক্ষার অগোচরে হিন্দু ও মুসলমানকে এক আসনে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রয়াস বাউলদের গানে আছে, সেকথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ

আশা প্রকাশ করেছেন—'এই জন্য মুহম্মদ মন্‌সুর উদ্দিন মহাশয় বাউল-সংগীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ করেছেন আমি তার অভিনন্দন করি—সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করে না, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যে মানব চিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধরে আপন সত্য রক্ষা করে এসেছে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা করে।'[১২৩]

অন্যান্য সাহিত্যের মতো লোকসাহিত্যেও যে ভালোমন্দের ভেদ আছে 'বাউল গান' প্রবন্ধে তাও নির্ণয় করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অনন্য প্রতিভার উৎস থেকে মন্দাকিনীর মত নির্ঝরিত খাঁটি বাউল গানগুলিও কালের হস্তক্ষেপে তার গভীরতা হারায়—বিশুদ্ধতাও নষ্ট হয়। ক্রমশ তা কৃত্রিম ও বিকৃত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ আফশোস করেছেন, বাউল গানের অধিকাংশই ক্রমশ তাদের অমূল্যতা হারিয়ে হাটের সস্তা জিনিস হয়ে পড়েছে;—বাঁধা বোল, হাস্যকর উপমা, তদুপরি ভবনদী পারাপারের লোভ দেখিয়ে বৈরাগী দলভুক্ত করার প্রচার মহিমায়, সেইসব গান সাহিত্যিক মূল্য তথা সাধনার ঐতিহ্য থেকেও বিচ্যুত হচ্ছে। অন্যপক্ষে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে আবার এও বলেছেন, খাঁটি বাউল গানের এমন একটা 'অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে যা চিরকেলে আধুনিক।' তা জাল করতে গেলেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা।[১২৪] চিরদিন খাঁটি জিনিসের পরিমাণ কমই হয়; তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং তাকে গভীরভাবে চেনার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন—সংসারে তাও বিরল বলে মন্তব্য করেছেন কবি।

এরকমই একটি খাঁটি বাউল গান ('আমি কোথায় পাব তারে') শুনে এক সময়ে চমকে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তর-উপলব্ধি। লিখেছেন—'কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে ঃ তং বেদ্যং পুরুষং বেদমাবো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। ... অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটি শুনলুম তার গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা ...। 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেক কাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না—তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোক সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।'[১২৫]

বাংলা দেশের আউল-বাউল প্রভৃতি মরমী কবিদের লোকসংগীতে যে অপার 'মানবীয় ভাবরস', প্রেমভক্তির যে অপূর্ব সুর ফুটে উঠেছে, সেই রহস্যের তল খুঁজে পাওয়া ভার। অথচ তা প্রাণের মতো 'সর্বভার মুক্ত', কেননা সেই সাধকদের সাধনা কোনদিনই উপকরণের বাহুল্য সহ্য করতে পারে নি। অনেককাল থেকেই 'শাস্ত্রগত সংস্কার মুক্ত' 'মানবপন্থী' একটা স্বাধীন সাধন-ধারা প্রবাহিত ছিল তাঁদের মধ্যে—বাউলদের সংগীতে সেই সহজ সরল ভাব-সম্পদের সন্ধান পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ক্ষিতিমোহন সেনকে বলেছেন, 'তাদের সাহিত্যে ও গানে অলঙ্কার বা শাস্ত্রের গুরুভার তারা কখনও সইতে পারেনি। শাস্ত্রের বিপুল ভার নেই অথচ কি গভীর কি উদার তার ব্যঞ্জনা।'[১২৬]

বস্তুত 'শাস্ত্রের প্রাচীর তোলা দুর্গের বাহিরে' বাস করতেন বলেই, তাঁদের প্রতিভার স্বচ্ছতায়

বিশুদ্ধ সার্বভৌমিক এক আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ ঘটেছিল। অন্ত্যজ বলে সমাজের অনাদর, অবজ্ঞাই তাঁদের মুক্তির সহায়ক হয়েছিল। বলতে গেলে প্রকৃত অর্থে বাউলরাই 'মুক্তিপাগল সংগীত সাধক'— সুরের মধ্য দিয়ে জীবনের অর্থকে উপলব্ধি করা। বাউল গানের বিশেষত্ব হচ্ছে তার 'ছন্দবদ্ধ সহজ গতি'। কাব্য যেখানে ভাবকে ধরে রাখতে পারে না—সেখানে আসে সংগীত। বাউলদের অনুভব তাই গানে প্রকাশিত সংগীতই তাঁদের সাধনার পথ।

বিশা ভুঁঞিমালীর গানে পাওয়া যায় ঃ—

তত্ত্বে ফত্ত্বে মন মানে না
পরম মানুষ চাই-ই চাই।

* * * * * *

মানুষ আমার চায় সে মানুষ
তাই আউল বাউল হয়্যা ধাই।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তা বিকাশ লাভ করেছে যাবতীয় আচার-সংস্কারকে পরিত্যাগ করে স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয় ধর্মের সহজতাকে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে। আগেই বলা হয়েছে, প্রচলিত ধর্মবোধের সঙ্গে তাঁর ঈশ্বরানুভূতিকে মেলানো যাবে না। নানা উপকরণে তা সমৃদ্ধ। ঔপনিষদিক ভাবনা থেকে শুরু করে বৈষ্ণব, সুফী এমন কি মধ্যযুগের সন্ত কবিদের অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন চেতনাও এর সঙ্গে মিলেছিল। জীবনের মধ্য-ভাগ থেকে ধর্মের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা ও লোকাচারের বন্ধনমুক্ত সহজ সরল অনুভূতির প্রেমমগ্ন বাউল-আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন কবি। পরিণত জীবনে 'পত্রপুট'-এর 'আমার পূজা' (১৫ সংখ্যক) কবিতায় নিজেকে 'ব্রাত্য', 'মন্ত্রহীন', জাতিহারা বলে অভিহিত করেছেন।[১২৭] আসলে বাউলদের অনুসৃত পন্থায় ততদিনে 'মানবসত্য' বা 'মানুষের ধর্ম'কে চিনে নিতে পেরেছেন কবি। তাঁদের সাধনায়, গানে আপন ভাবনার সমর্থন পেয়েছিলেন বলেই নানাপ্রসঙ্গে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

'Religion of Man' (১৯৩১) এবং 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) প্রবন্ধাবলীতে সে-পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'Religion of Man'-এ নিজের পরিণত 'কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতাকে' আকার দিতে গিয়ে বাউলদের জীবন দর্শনের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছিলেন কবি। সেই সূত্রেই উক্তগ্রন্থের 'Man's Universe', 'The Man of My Heart' এবং 'Spiritual Freedom'—এই তিনটি প্রবন্ধে বাউলদের পরিচয় বিস্তৃতভাবে উদ্ধার করেছেন। বাউলদের 'মনের মানুষ' বা 'The Man of My Heart'—রবীন্দ্রভাবনায় 'Ideal Man'—কখনও বলেছেন 'Eternal Man' অর্থাৎ পূর্ণ মানুষ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাউলদের সাধনায় 'মনের মানুষ'-এর অর্থ যাই-হোক-না কেন, রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশেই আছেন ঈশ্বর। মনের মানুষে ব্যঞ্জিত হয়েছে 'মনুষ্যত্বের চরম আদর্শের' সেই মূল্য—'পরমাত্মন বা ব্রহ্মণ'। কবির উপলব্ধিতে তা হয়ে উঠেছে 'মহামানব' বা 'বিরাট পুরুষ'-এর প্রতীক।

কথাটা ভালো করে বোঝা যাবে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে; যেখানে 'পরিণততম জীবনদর্শন' প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে।'[১২৮] প্রথমত সে আমাতে বদ্ধ,

তার সত্তা জীবসীমার মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ অন্তরে অন্তরে সে তার জীবনসীমার উর্ধ্বে বিশ্বমানবে প্রসারিত। সেখানে সে সুখকে চায় না, চায় তারও বেশি 'ভূমা'কে। লিখেছেন—'মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি সীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা। এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।'[১২৯] এই 'অন্তরের মানুষ', এই 'বৃহৎ মানুষ'-ই বাউল ভাবনার 'মনের মানুষ'। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন—'মানুষের দেবতা'। এই প্রসঙ্গের আলোচনা করতে গিয়ে উপনিষদের ঋষি বাক্যের ('অথ যোহন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে/অন্যোহিসৌ অন্যোইহম্ অস্মীতি/ নম বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম'।) সঙ্গে বাউল-বাণীর আশ্চর্য মিল অনুভব করে বিস্মিত কবি লিখেছেন—'এই যেমন শোনাগেল উপনিষদে, আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলেছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে, 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।'[১৩০] এই মনের মানুষ হচ্ছে ভূমা, মানুষের দ্বৈধ সত্তার দ্বিতীয়টি। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায়—'সেই মনের মানুষ সকল-মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়।'[১৩১] উপনিষদও সেই কথা বলেছে—'যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো।'[১৩২] কেননা তাঁর মধ্যেই আছে 'মানুষ ও মনুষ্যের পূর্ণ জাগ্রত মূর্তি।' দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বজনীনতার ভাব থাকার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কখনও কখনও বলেছেন 'Universal Man'। 'Universe of Man' এও অনেকটা অভিন্ন ভাবনার সুন্দর অভিব্যক্তি দেখি।[১৩৩]

বাউলগান নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সর্বশেষ আলোচনা করতে দেখা গেছে 'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এ (১৩৪৫)। কোনো তত্ত্ব নয়, নিছক রূপশৈলীর দিক থেকেই তার আলোচনা করেছেন সেখানে। মাতৃভাষার 'রূপের পরিচয়' অন্বেষণে চলিত ভাষা ও প্রাকৃত ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত জগা-কৈবর্তর 'অচিন ডাকে নদীর বাঁকে' গানটি সম্পর্কে কবি মন্তব্য করেছিলেন—'এর মিল, এর মাজাঘষা ছাঁদ ও শব্দ বিন্যাস আধুনিক'[১৩৪] কিন্তু ভাষা চলিত। এখানে 'আধুনিক' শব্দের ব্যবহার কতকটা সংকেতবহ; অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অর্থেও বটে,—বিশেষ 'মর্জি'র দ্যোতক হিসেবেও।

সাহিত্যের নির্মাণশৈলীর ক্ষেত্রে শব্দ বাছাই যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, 'ভাব প্রকাশের বাছাইয়ের কাজ'ও তেমনি; 'বাংলা ভাষাপরিচয়'-এ বাউল গঙ্গারামের একটি পদাংশের ব্যাখ্যা করে বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'বাউল বলতে চেয়েছে, চারদিকে অচিন্তনীয় অপরিসীম রহস্য, তারই মধ্যে চলেছে জীবনযাত্রা। সে বললে—

> পরাণ আমার স্রোতের দীয়া
> (আমায় ভাসাইলা কোন্ ঘাটে)
> আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিসুইৎ-ঢালা।
> আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা।
> তার তলেতে কেবল চলে নিসুইৎ রাতের ধারা,
> সাথের সাথি চলে বাতি, নাই গো কূল কিনারা।

নানা রহস্যে একলা-জীবনের গতি, যেন চারিদিকের নিসুৎ অন্ধকারে স্রোতে ভাসানো প্রদীপের মতো—এমন সহজ উপমা মিলবে কোথায়। একটা শব্দবাছাই লক্ষ্য করা যাক ঃ লহরেরি মালা। 'উর্মি

নয়, তরঙ্গ নয়, ঢেউ নয়, শব্দ জাগাচ্ছে জলে ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, ইংরেজিতে যাকে বলে ripples, অন্ধকারের তলায় তলায় রাত্রির ধারা চলেছে, এ ভাবটা মনে হয় যেন আধুনিক কবির ছোঁয়াচ-লাগা। রাত্রি স্তব্ধ হয়ে আছে, এইটেই সাধারণতঃ মুখে আসে। তার প্রহরগুলি নিঃশব্দ নির্লক্ষ্য স্রোতের মতো বয়ে যায়, এই উপমাটায় হালের টাঁকশালের ছাপ লেগেছে বলেই মনে হয়।"[১৩৫]

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। কিন্তু কোনো বাউল গানের রূপশৈলী নিয়ে এরকম খুঁটিনাটি আলোচনা রবীন্দ্রনাথ আর কোথাও করেছেন কিনা সন্দেহ। বাউলদের সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গির কথা নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। এখানে দেখিয়ে দিলেন, তাঁদের প্রাণের আবেগ কত সহজ উপমায় ও নিখুঁত শব্দ নির্বাচনে প্রথমশ্রেণীর কাব্য হয়ে উঠতে পারে। অন্যপক্ষে লোকসমাজের মতই লোকসাহিত্যের প্রকৃতি হচ্ছে কালের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। আলোচ্য বাউল গানটির কোনো কোনো অংশে তাই আধুনিকতার ছাপ লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এ নিয়ে কোনো অভিযোগ চলে না—রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ অনুভব এই সত্যকেই সংকেতে ধরে দিয়েছে উদ্ধৃত অন্তিম বক্তব্যে।

সাহিত্য যেমন প্রয়োজন মেটাবার জন্য সৃষ্টি হয় না, জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশরূপেই যেমন তার উৎসার, লোকসাহিত্যও তেমনি, ইচ্ছা করলেই তা সৃষ্টি করা যায় না। আধুনিক শিক্ষিত সমাজে লোকসাহিত্যের সৃষ্টি অলীক কল্পনা বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। বাউল গানও তাই। তার নিয়ত পরিবর্তনশীল চরিত্র-প্রকৃতিতে আধুনিক যুগের ছোঁয়া লাগতে পারে, এই জন্যেই তার মধ্যে ভালোমন্দের প্রভেদ, কিন্তু একালের শিক্ষিত ও মার্জিত মানসিকতায় তার সৃজনকার্য অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "চিরদিনই লোক-সাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যের যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা, অর্থাৎ ইহাতে ভালোমন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিস আছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো—জগতের কোনো রসিক সভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব, দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রিধারীকেই লোক সাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না।"[১৩৬]

রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণীর পেছনে সমসাময়িক কালে বাউল গানে আধুনিকতার ভেজাল সম্পর্কিত উত্তুঙ্গ বিতর্কের প্রভাব সম্ভবত ছিল। অধুনাতন কালে এ তর্জনীসংকেত আরো গভীর অনুধাবনের যোগ্য।

লোকসাহিত্যে তথা বাউল গানে খাঁটি বাঙালি হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন কবি। তাঁর সজীব মন সেই সাহিত্যের রসরূপকে শুধু আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হয়নি,—তার বিশুদ্ধতা রক্ষাতেও সচেষ্ট হয়েছিল। আর বাউলেরা তো বাংলার মর্মের কথাই কেবল বলেন নি, এদেশের সাধনার ধারাতেও তাঁদের দান সবিশেষ স্বীকৃত। এঁদের জীবনচর্যা ও সংগীতের ভাব-ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাকেও বিস্মিত করেছিল। তিনি বলেছেন—'এমন সহজ, এমন গভীর, এমন সোজাসুজি সত্য এত অল্প কথায় অপূর্ব ভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই। আমার তো ইঁহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয়।'[১৩৭] রবীন্দ্রনাথের এই অকপট স্বীকৃতিতেই বাউল গানের প্রকৃত মূল্য নির্ণীত হয়ে যায়। ক্ষিতিমোহন সেনের মতো দু'একজন ছাড়া এই ব্রাত্য সংগীতসাধকদের প্রতি তাঁর মতো শ্রদ্ধাবান আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান।' দ্র. কবি-সংগীত, লোকসাহিত্য (১৯৭১ মুদ্রণ) পৃ. ৭৭।

২. Folk—অর্থে লেখা হয়েছে—"An aggregation of people in relation to a superior" দ্র. The shorter Oxford English Dictionary, Vol. I, (Third Edition) p. 727।

৩. সুখময় মুখোপাধ্যায় : ময়মনসিংহ গীতিকা (২য় সং) দ্র. ভূমিকা - পৃ. এক।

৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা চিঠি (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) দ্র. দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৯- পৃ. ২৬।

৪ক. অমিয় চক্রবর্তী-কৃত রবীন্দ্রনাথের 'ছড়া' কাব্যের সমালোচনা, দ্র. প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮, পৃ. ৯৮।

৫. নন্দরানী চৌধুরী ঃ সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ঃ সাহিত্য - পৃ. ১৩।

৬. দ্র. ছেলেভুলানো ছড়া -২, র-র (শতবার্ষিক সং)-১৩, পৃ. ৬৮৯।

৭. দ্র. ছেলেভোলানো ছড়া, ভারতী, বৈশাখ ১৩৩০, পৃ. ১২

৮. দ্র. ছেলেভুলানোছড়া, লোকসাহিত্য, র-র (শতবার্ষিক সং)-১৩, পৃ. ৬৬৭।

৯. তদেব।

১০. ঐ পৃ. ৬৭০।

১১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, ছেলেভোলানো ছড়া, ভারতী, বৈশাখ ১৩৩০, পৃ. ১০।

১২. দ্র. ছেলেভুলানো ছড়া, র-র (শতবার্ষিক সং)-১৩, পৃ. ৬৭৭।

১৩. দ্র. মেয়েলিছড়া, সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১, পৃ. ৪৭০-৭১।

১৪. দ্র. ছেলেভুলানো ছড়া, র-র (শতবার্ষিক সং)-১৩, পৃ. ৬৭১।

১৫. দ্র. র-র (শতবার্ষিক সং)-১৩, পৃ. ৬৭৬।

১৬. ঐ পৃ. ৬৮৫।

১৭. ঐ পৃ. ৬৮৯।

১৮. ঐ পৃ. ৬৯০।

১৯. দ্র. র-র (শতবার্ষিক সং)-১৪, পৃ. ৪৬৫।

২০. ঐ পৃ. ৪৬৬।

২১. শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের রবীন্দ্রনাথকৃত আলোচনা। দ্র. আশ্রম সংবাদ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, চৈত্র ১৩২৮, পৃ. ৩৯।

২২. দ্র. গ্রাম্যসাহিত্য, লোকসাহিত্য, র-র (শতবার্ষিক সং)-১৩, পৃ. ৭১৫।

২৩. ঐ পৃ. ৭১৬।

২৪. তদেব।

২৫. ঐ পৃ. ৭১৭।

২৬. ঐ পৃ. ৭১৮।

২৭. ঐ পৃ. ৭১৯।

২৮. তদেব।

২৯. ঐ পৃ. ৭২০।

৩০. ঐ পৃ. ৭৩১।

৩১. ঐ পৃ. ৭৩৪।

৩২. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ মেয়েলিব্রত (১৩০৩), রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

৩৩. দ্র. মেয়েলি ব্রত, সাধনা, চৈত্র ১৩০১, পৃ. ৪৫৪-৫৫।

৩৪. বাংলার ব্রত (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ১৯৭৬ সং) পৃ. ৫।

৩৫. দ্র. মেযেলি ব্রত, সাধনা, চৈত্র ১৩০১, পৃ. ৪৫৬।

৩৬. বাংলার ব্রত (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ১৯৭৬ সং) পৃ. ৬৫।

৩৭. Sister Nivedita : The place of the Kindergarten in Indian Schools, The Modern Review, August 1908, p. 149.

৩৮. দ্র. পরমেশপ্রসন্ন রায় প্রণীত 'মেয়েলি ব্রতকথা' (১৩১৫) গ্রন্থের মুখবন্ধে সংযোজিত রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

৩৯. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, মৎলিখিত গ্রন্থ ঃ 'রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠ' (২০০৭)।

৪০. দ্র. সমালোচনা, কঙ্কাবতী, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯, পৃ. ৩৫৭।

৪১. তদেব।

৪২. ঐ পৃ. ৩৬০।

৪৩. দ্র. সাহিত্যতত্ত্ব, র-র (শতবার্ষিক সং)-১৪ পৃ. ৩৬১।

৪৪. ঐ পৃ. ৩৬২।

৪৫. সাহিত্যের তাৎপর্য, র-র (শতবার্ষিক সং)-১৪ পৃ. ৩৭১।

৪৬. দ্র. মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৬৩, পৃ. ৭৫৫।

৪৭. দ্র. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ঃ 'ঠাকুমার ঝুলি ঃ বাংলার রূপকথা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'ভূমিকা'।

৪৮. দ্র. রূপকথার আদিকথা, রূপকথা পত্রিকা, রবীন্দ্রস্মৃতি ও শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৮, পৃ. ৩।

৪৯. দ্র. ঠাকুরমার ঝুলি গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'ভূমিকা'।

৫০. তদেব।

৫১. দ্র. বিভূতিভূষণ গুপ্ত ঃ বেড়াল ঠাকুরঝি গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'ভূমিকা'।

৫২. দ্র. মৎলিখিত গ্রন্থ ঃ 'রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠ' (২০০৭) পৃ. ১৮৩-১৮৪।

৫৩. দ্র. যাত্রা ও থিয়েটার, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'জয়ন্তী উৎসর্গ' (১৩৩৮) পৃ. ৪৩৯।

৫৪. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লেখা চিঠি (৩১ আগষ্ট ১৯৩২), দ্র. বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের ফাইল।

৫৫. দ্র. র-র (শতবার্ষিক সং)-১৪, পৃ. ৭৪৫।

৫৬. ঐ পৃ. ৭৪৪।

৫৭. দ্র. যাত্রা ও থিয়েটার, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত জয়ন্তী উৎসর্গ (১৩৩৮) পৃ. ৪৪১।
৫৮. দ্র. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, সংগীত, র-র (শতবার্ষিক সং) ১৪ পৃ. ৯১৩।
৫৯. দ্র. ছেলেবেলা, র-র (বিশ্বভারতী সং)-২৬, পৃ. ৫৯৯-৬০০।
৬০. তদেব।
৬১. তদেব।
৬২. তদেব।
৬৩. ঐ পৃ. ৬০১।
৬৪. দ্র. শিক্ষা, র-র (শতবার্ষিক সং)-১১, পৃ. ৬৯০।
৬৫. শ্রীশর্ম্মা ঃ কথকতা, ভাণ্ডার, শ্রাবণ ১৩১৪, পৃ. ১৫২।
৬৬. দ্র. জীবনস্মৃতি, র-র (শতবার্ষিক সং)-১০, পৃ. ৯০।
৬৭. দ্র. সংগীত, র-র (শতবার্ষিক সং)-১৪, পৃ. ৯১৩।
৬৮. দ্র. জীবনস্মৃতি, র-র (শতবার্ষিক সং) ১০, পৃ. ৩৮।
৬৯. দ্র. ছন্দ, র-র (শতবার্ষিক সং) ১৪, পৃ. ১৩৭।
৭০. দ্র. ভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩১২, পৃ. ১২১।
৭১. দ্র. কালান্তর, র-র (শতবাষিক সং) ১৩, পৃ. ২২৭।
৭২. দ্র. পারস্যে, র-র (শতবার্ষিক সং) ১০, পৃ. ৭৯৬।
৭৩. দ্র. র-র (শতবার্ষিক সং) ১০, পৃ. ৬১৫।
৭৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ ময়মনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড (২য় সং) ভূমিকা পৃ. ২-৪।
৭৫. দ্র. শুভাকাঙ্ক্ষী (প্রমথনাথ বিশীকে লেখা পত্রাবলী) পৃ. ২৭।
৭৬. দ্র. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৯, পৃ. ২৬।
৭৭, দ্র. চিঠিপত্র, দশম খণ্ড, পৃ. ৭০।
৭৮. ঐ পৃ. ৪৯।
৭৯. দ্র. চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, পৃ. ২৫৪।
৮০. দ্র. বানান বিধি (১৩৪৪), বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৩৯১ সং) পৃ. ২৭০।
৮১. দ্র. ভূদেব চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম পর্যায় (চতুর্থ সং) পৃ. ৪৭৮।
৮২. দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ (তৃতীয় সং)-পৃ. ৬৩২।
৮৩. বাউলগান (হারামণি গ্রন্থের ভূমিকা) দ্র. সংগীতচিন্তা (১৩৯২ সং) পৃ. ৩১১।
৮৪. মৎলিখিত গ্রন্থ ঃ 'রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠ' (২০০৭) পৃ. ৫৩১-৫৪৭।
৮৫. দ্র. বাউলের গান, সমালোচনা, র-র (শতবার্ষিক সং) ১৩ পৃ. ৬৪৪।
৮৬. ঐ পৃ. ৬৪৫।
৮৭. তদেব।
৮৮. দ্র. বাউলের গান, ভারতী, বৈশাখ ১২৯০, পৃ. ৩৭।

৮৯. দ্র. শান্তিনিকেতন, র-র (শতবার্ষিক সং) ১২, পৃ. ৪৬২-৬৩।

৯০. রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি লেখায় বাউলদের 'Village mystic in Bengal', 'Village singer of Bengal', 'Village poet of Bengal'-বলে অভিহিত করেছেন।

৯১. দ্র. Fugitive.

৯২. দ্র. An Indian Folk Religion, Creative Unity (1959 Ed.) pp. 75-76

৯৩. দ্র. Man's Universe, The Religion of Man (1963 print) p. 12.

৯৪. দ্র. Creative Unity (1959 ed.) p. 76.

৯৫. Ibid.

৯৬. Ibid p. 80.

৯৭. Ibid p. 85.

৯৮. দ্র. শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষা, র-র (শতবার্ষিক সং) ১১, পৃ. ৬৯৩-৯৪।

৯৯. তদেব।

১০০. দ্র. ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায় (চতুর্থ সং) পৃ. ৪৮৮।

১০১. দ্র. Creative Unity p. 86.

১০২. Ibid, pp. 87-88.

১০৩. Ibid, p. 89.

১০৪. দ্র. রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড (২য় সং) পৃ. ৭।

১০৫. দ্র. ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ. ৪২৪।

১০৬. তদেব।

১০৭. তদেব।

১০৮. ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গ-বীণা' (১৯৩৪) পৃ. ৪৫২।

১০৯. দ্র. ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ. ৪২৯।

১১০. ঐ পৃ. ৪৩০।

১১১. দ্র. The Philosophy of our people, The Modern Review, January 1926, p. 84

১১২. Ibid. pp 79-80.

১১৪. দ্র. Creative Unity (1959 print) p. 40.

১১৫. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সূফীধর্ম্ম' প্রবন্ধের পাদটীকায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। দ্র. তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ ১৮৩৩ শক পৃ. ১৭-১৮।

১১৬. প্রবন্ধটি ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদূ' গ্রন্থের 'ভূমিকা' হিসেবে লিখিত।

১১৭. দ্র. মরমিয়া, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩২ পৃ. ৬০৯।

১১৮. ঐ পৃ. ৬১০।

১১৯. 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশের (চৈত্র ১৩৩৪) পরে প্রবন্ধটি মুহম্মদ মন্‌সুরউদ্দিনের 'হারামণি' গ্রন্থের 'ভূমিকা' রূপে সংযোজিত হয়।

১২০. দ্র. বাউল গান, 'সংগীত চিন্তা' (১৩৯২ সং) পৃ. ৩১৩।

১২১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, 'নিবেদন' দ্রষ্টব্য।

১২২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, (১৩১৮) র-র (শতাবার্ষিক সং) ১১, পৃ. ৪৮৬।

১২৩. দ্র. সংগীতচিন্তা পৃ. ৩১৩-১৪।

১২৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) চিঠি, দ্র. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৯, পৃ. ২৬।

১২৫. দ্র. সংগীতচিন্তা, পৃ. ৩১১-৩১২।

১২৬. দ্র. ক্ষিতিমোহন সেন : বাংলার সাধনা (১৩৫২), নিবেদন পৃ. ৬-৭।

১২৭. বাউলরাও নিজেদের বলেন, 'নিবর্ত্তিয়া অর্থাৎ ব্রত-বিরহিত বা ব্রাত্য'। নিজের অন্তরের দ্বারাই নিজেদের পরিচালিত করেন তাঁরা।

১২৮. দ্র. মানুষের ধর্ম, র-র (শতবার্ষিক সং) ১২ পৃ. ৫৭৬।

১২৯. দ্র. ঐ পৃ. ৫৬৯।

১৩০. দ্র. ঐ পৃ. ৫৯৫।

১৩১. দ্র. ঐ পৃ. ৫৯৬।

১৩২. তদেব।

১৩৩. দ্র. Man's Universe, Religion of Man (1963 print) p. 11.

১৩৪. বাংলাভাষা পরিচয়, র-র (শতবার্ষিক সং) ১৪, পৃ. ৪৬৩।

১৩৫. দ্র. ঐ পৃ. ৪৬৭-৪৬৮।

১৩৬. দ্র. লোকহিত, কালান্তর, র-র (শতবার্ষিক সং) ১৩, পৃ. ২২৬-২৭।

১৩৭. দ্র. ক্ষিতিমোহন সেন : বাংলার বাউল, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ. ২৪১।

বড়ু চণ্ডীদাসের ব্রজলীলা পুনর্দর্শন ঃ প্রতাপের পরিধির বাইরে দাঁড়িয়ে

ছন্দা রায়

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মুদ্রণসৌভাগ্যবঞ্চিত প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্যের এক বিড়ম্বিত জাতক। কয়েকশো বছরের স্মরণীয় ঐতিহ্যের ধারক হয়েও বহুকাল তাকে কাটাতে হল লোকচক্ষুর অন্তরালে— অবাঞ্ছিত অজ্ঞাতবাসে। অনাদরের দুর্গতি থেকে রেহাই পেয়ে আধুনিক পাঠকের দরবারে তার বিলম্বিত আবির্ভাব বিশ শতকের গোড়ায়, ১৯০৯ সালে, প্রত্ন-গবেষক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের উৎসাহী অন্বেষণে। সময়ের হিসেব মিলিয়ে মহামূল্য সেই আবিষ্কারের শতবর্ষ উদ্‌যাপন অযৌক্তিক নয়, যেহেতু তার সূত্রে পুরনো বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমের একটি বড় শূন্যস্থান পূরণ হয়েছে। বিদগ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে জায়গা করে দিয়েছে মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের প্রবেশভূমিতে। প্রায় নিঃসংশয়ভাবে প্রাক্-চৈতন্য যুগাবস্থানে। অনেকেরই ধারণা, তুর্কী-আক্রমণোত্তর তমসাবৃত পর্বের অবসানে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ই বাংলা কাহিনিকাব্যের, বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলাকাব্যের প্রথম দিশারি।

কাব্যটির একটিমাত্র প্রাপ্ত পুথি গবেষকদের যাবতীয় এষণার সম্বল। তাতে একদিক থেকে সুবিধা হয়েছে। পুথিতে পুথিতে পাঠভেদের জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি। কিন্তু সংকট তৈরি হয়েছে ভিন্নতর কারণে। উদ্ধারকালে কাব্যটিকে অক্ষত শরীরে পাওয়া যায় নি। অলক্ষিত অবহেলায় অনুলিপিকৃত পুথির যে অংশ খোয়া গেছে, তার সঙ্গে কাব্যের নাম, রচনাকাল এবং লিপিকালের পুষ্পিকাধৃত সংকেত হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। অঙ্গবিন্যস্ত পদমালার ভণিতাংশ শুধু পৌনঃপুনিক উচ্চারণে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করেছে কাব্যের প্রজনককে। তিনি বাসুলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস।

কিন্তু স্রষ্টার পরিচয়ে সৃষ্টির অভিধা জ্ঞাপিত হয় না। তাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশকালে (১৯১৬) অনামিকা পুথির আবিষ্কর্তা ও পরিচর্যাকারী সম্পাদকের উপর নামকরণের দায় বর্তালো। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক রীতির কোনো ব্যতিক্রম ঘটালেন না। "বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণের ব্রজলীলা", এই যুক্তিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি তাঁর মানানসই মনে হল। একের দ্বারা যে লীলা হয় না, সম্পাদকের ভাবনায় এ বোধ হয়তো নাড়াই দিল না। কবি জয়দেব তাঁর কাব্যসূচনায় "রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ" এই নান্দীপাঠ করেও যুগ্মলীলাত্মক কাহিনিকে আখ্যা দিয়েছিলেন "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্"। তাঁর কৃষ্ণ মানিনী রাধার পদযুগল শিরে ধারণ করলেও কাব্য শিরোনামে রাধা ঠাঁই পান নি। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য আবার আখ্যানগত সাক্ষ্যেই "রাধামুখ্য" বলে গণ্য হল। ছিন্ন পুথির শেষ পর্যায়ে ভাবের উত্তরণে পৃথক তাৎপর্য পেল "রাধাবিরহ"। কাব্যাঙ্কিত সম্ভোগসার কৃষ্ণ আদৌ কীর্তনীয় কিনা, তা নিয়ে রসিকমহলে সোরগোল উঠল। তবু শেষ পর্যন্ত সম্পাদকের দেওয়া নামটাই টিকে গেল। পুথির ভিতরে পাওয়া একটি রসিদপত্রের উল্লেখ থেকে কেউ কেউ "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ" নামটি মনোনয়নের দাবি তুললেন। তাঁদের যুক্তি অপ্রমাণ করার মতো পাল্‌টা তথ্যের অভাব হল না। গ্রাহ্যতা পেলেও সে নামও তো কৃষ্ণৈকসর্বস্বই হত। তাছাড়া শত বিরোধ বিদ্বেষেও পুরুষের ইচ্ছার কাছে নারীর আত্মসমর্পণ যেখানে অনিবার্য, সেখানে শিরোদেশে নামের মহিমা পাওয়া বা না পাওয়ায় কতটুকুই বা আসে যায়।

এত কথার পরেও খতিয়ে দেখা দরকার, রাধাকৃষ্ণের লীলারস উৎসারে বড়ু চণ্ডীদাসের নিজস্ব অভিপ্রায় কী ছিল। কারণ রসজ্ঞ সমালোচকেরা তাঁর কাহিনি পরিকল্পনায় বহু স্ববিরোধ লক্ষ করেছেন। একটি প্রাণবন্ত সামাজিক প্রণয়োপাখ্যানের খাঁজে খাঁজে পুরাণপ্রসঙ্গ যুক্ত করে কেন কবি তাঁর কাব্যের রসাভাস ঘটালেন, কেন কৃষ্ণের লাম্পট্যের উপর মাঝে মাঝে অকারণ ভাগবত কিরণসম্পাত করা হল, তা নিয়ে সহৃদয়ের অভিযোগ প্রায় অভিমানের পর্যায়ে চলে গেছে। কাব্যাঙ্গে 'জন্মখণ্ডে'র সংস্থান কারও কারও কাছে নিতান্ত আরোপিত বা প্রক্ষিপ্ত বলে বিবেচিত হয়েছে।

ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে মনে হয়, জীবনরসাস্বাদী কাব্য পাঠের আগ্রহে একালীন পাঠকের প্রত্যাশা কালানৌচিত্যদোষ অতিক্রম করতে পারে নি। সমাজবাস্তবতার পূর্ণ বোধ সত্ত্বেও মুকুন্দের তুল্য কবি কেন ভেরেণ্ডার খাম আর তালপাতার ছাউনি দেওয়া ঘরে দেবীপ্রদত্ত সাত ঘড়া ধন ঢুকিয়ে আমানি খাওয়ার গর্তটি বুজিয়ে দিলেন, কেন আরণ্যদম্পতির সজীবতা হরণ করে নিলেন অবাস্তব রাজৈশ্বর্যের অধিবাসনে, তা নিয়ে আক্ষেপ করলে মধ্যযুগীয় কাব্যের পরিবেশ ও ভিত্তিভূমিকে অস্বীকার করা হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচয়িতাও হতে পারতেন গোপপল্লীর সমাজনিষিদ্ধ দেহজ প্রেমের ব্যতিক্রমী কবি। কিন্তু সময় তাঁকে তা হতে দেয় নি। সুপরিচিত ঐতিহাসিক ভাষ্য অনুসারে মানতেই হয়, মুসলিম আগ্রাসনের অব্যবহিত পরবর্তীকালে হৃতরাজশক্তি হিন্দুসমাজের পক্ষে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আত্মরক্ষার ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার অন্য উপায় ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা বর্গবিচ্ছিন্নতা লাঘব করার তাগিদে সংস্কৃত শাস্ত্রপুরাণবিদ কবির প্রয়োজন ছিল লোককথার নিতান্ত গ্রাম্য কামবিলাসী কৃষ্ণকে উচ্চবর্গীয় পৌরাণিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার। আর নিম্নবর্গীয় শ্রোতৃবৃন্দের প্রয়োজন ছিল এতকাল অপ্রবেশ্য ব্রাহ্মণ্যবাদী ধ্যানধারণাকে নিজেদের মতো করে বুঝে নেওয়ার। পুরাণ ও লোকায়ত সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রাথমিক উদ্যোগে কাব্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন বিয়োজনের শল্য প্রক্রিয়ায় কবির অনভিজ্ঞ হাতে জোড়ার দাগগুলো সূক্ষ্মভাবে না মিলতেই পারে। তবু 'জন্মখণ্ডে' তিনি কাহিনির যে সূত্র রচনা করলেন, তাকে ধরেই পরবর্তী খণ্ড থেকে খণ্ডান্তরে সংঘাতময় ঘটনার সঞ্চরন ঘটেছে কিনা, আমাদের তা সন্ধান করে দেখা কর্তব্য। কবিনির্মিত কৃষ্ণচরিত্রের সাত্ত্বিকতা প্রতিপাদন করা আমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমরা দেখাতে চাই, 'জন্মখণ্ডে'র পুরাণপ্রাপ্ত উপকরণ থেকেই কবি কীভাবে কৃষ্ণের কামলীলার বনিয়াদটি পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কার কোনো অর্থে অধ্যাত্ম কবি নন। কাব্যে দেবপ্রসঙ্গ থাকলেই আধ্যাত্মিকতা আসে না। বড়ুর কাব্যপাঠের অধিকার পাওয়ার জন্য হরিস্মরণে মন সরস করার নির্দেশনামা ছিল না। মঙ্গলকাব্যের 'দেবখণ্ডে'র মতো কোনো প্রথাগত আঙ্গিকের কাছে বাঁধা পড়তে হয়নি কবিকে। তবু কৃষ্ণের পুরাণসিদ্ধ অবতারত্বের প্রসঙ্গ দিয়ে তিনি কাব্যের প্রস্তাবনা করলেন। পাঠানশক্তির দমনমূলক সন্ত্রাস তখনও স্মৃতি হয়ে যায় নি। কংসের মতো দুর্দম স্বৈরাচারী শাসক সেদিক থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য। অথচ তাঁকে প্রতিহত করার জন্য পলায়নবাদী লক্ষ্মণসেনের দেশে বীর্যবান পুরুষ কোথায়? সুতরাং অধর্মাচারী নিধনের আশ্বাস জাগাতে কবি সূচনায় ঐতিহ্যবাহী অবতারতত্ত্বের আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সেই তত্ত্বের সঙ্গে জনমনের আত্মীয়তা সম্ভব কিনা, কবির নিজের মনেই সংশয় ছিল। মর্ত্যদেহধারী হলেও অসাধারণ মানবিক ব্যক্তিত্বের পরিমাপ

জনমনের অনধিগম্য। রামায়ণ-পাঁচালি লিখতে গিয়ে কবি কৃত্তিবাস সেই কারণেই বাল্মীকির নরচন্দ্রমা রামকে ভক্তের ভগবানে পরিণত করেছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থায় চক্রধারী নারায়ণের নরদেহকে ধূলিধূসরিত করে দিলেন। দৈবকীগর্ভজাত, নন্দ গোপের সন্তানরূপে লালিত কৃষ্ণের উঠতি বয়সের প্রবৃত্তিপরবশ্যতার আভাস দিয়ে 'জন্মখণ্ডে'ই কবি খসিয়ে দিলেন পুরাণ-প্রতিভাত ব্রজলীলার আভিজাত্য।

বাসুলীভক্ত বড়ু চণ্ডীদাস তৎকালীন বৈষ্ণব-শাক্ত উপদলীয় দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের কারণে প্রতিবিধিৎসাবশে "বৈষ্ণবদের আরাধ্য দেবতাকে পঙ্কিল মানবস্তরের দৈনন্দিন প্রাকৃত কামনার মধ্যে টেনে নামিয়ে আনলেন"—মধ্যযুগের কাব্যের "স্বর ও সংকট" বুঝে নিতে উৎসুক সমালোচকের এই আনুমানিক ব্যাখ্যার আমরা সমর্থক নই। এতটা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখলে কবির গভীর সমাজবোধের প্রতি অবিচার করা হবে। বড়ুকে বীরভূমের নান্নুর গ্রামের অধিবাসী বলে গণ্য করলে আমাদের সিদ্ধান্ত সহজ হয়ে যায়। সম্পাদক বসন্তরঞ্জনের দেওয়া তথ্য অনুসারে, নান্নুরের বাশুলীদেবী বীণাহস্তা সরস্বতী, "পণ্ডিতেরা বলেন, বাসলী বাগীশ্বরী শব্দেরই রূপান্তর।" সুতরাং 'বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্ত কবি জয়দেবের মতো বড়ুও বাগ্দেবীর প্রসন্নতা নিয়ে কাব্যরচনা করেছিলেন, এমন যুক্তি দাঁড় করানো যায়। কিন্তু অধিকতর গ্রাহ্য মতান্তরে কবির বাস ছিল বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে, যেখানকার বাসলীদেবী খড়গধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী দক্ষিণাকালী। সে অর্থে বড়ু শক্তি উপাসক। কিন্তু শৈব বিদ্যাপতি যদি স্বয়ং মাধবের উদ্দেশ্যে তিলতুলসী সমর্পণ করতে পারেন, তাহলে শাক্ত কবিরই বা বৈষ্ণবীয় লীলাকীর্তনে বাধা কোথায়? আমাদের ধারণা, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' ব্রাহ্মণ্য পুরাণের কৌলীন্য খণ্ডিত হয়েছিল কোনো সম্প্রদায়গত প্ররোচনায় নয়, লোকপুরাণের সাংকর্যে।

বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যের আদি খণ্ডে কৃষ্ণের আলংকারিক রূপবর্ণনার ফাঁকেই জানিয়ে দিলেন নারায়ণের মর্ত্যে অবতীর্ণ হওয়ার আসল রহস্য—

"সকল দেবের বোলে হরি বনমালী।
অবতার করি করে ধরণীত কেলি।।"

কংসবধের মূল কারণটি যেন এখান থেকেই গুরুত্ব হারাতে শুরু করল। বিলাসকলাকৌতূহল মেটাতে কবি অধিকতর তৎপর। বলা বাহুল্য তা জয়দেবীয় রাজদরবারি বিলাস নয়। লিখিত বাংলাকাব্য পাঠে অনভ্যস্ত জনদরবারের শ্রোতারা রতিকাব্যের রতি যতটা উপভোগ করবে, কাব্যত্ব ততটা নয়। বড়ু তা জানতেন। তাই খুব সচেতনভাবেই তিনি বৈদগ্ধ্যের মার্জিত আবরণ যথাসম্ভব বর্জন করলেন।

নারায়ণের কৃষ্ণরূপ গ্রহণের পাশাপাশি লক্ষ্মীর রাধারূপ গ্রহণের কবিকৃত ব্যাখ্যাটি আরও বেশি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক—

"কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে।।
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার।"

উদ্ধৃতাংশে প্রথম ও শেষ পংক্তি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। মূল বিষয়টি কৃষ্ণের জৈব কামনাকেন্দ্রিক। প্রতাপশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমন করার জন্য ক্রমশ সমর্থ হয়ে ওঠা তাঁর শরীর ভোগবাসনায় প্রমত্ত হলে এবং চাহিদামতো পরিতৃপ্তির সুযোগ না পেলে স্থিতিশীল সংসার টলে উঠবে। স্বয়ং ঈশ্বরের চরিত্র নিয়ে দেবতাদের কী গভীর উদ্বেগ।। অগত্যা কামধারণক্ষম নারীশরীরের প্রয়োজন হল। দেবতাদের অনুরোধে লক্ষ্মীকে জন্ম নিতে হল মর্ত্যে। মঙ্গলকাব্য-কাহিনিতে দেখা যায় বর্গাধিপত্যের অন্য এক রূপ। কোনো বিশেষ দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের তাগিদে নিরীহ দেব বা দেবানুচরদের স্বর্গভ্রষ্ট হতে হয়েছে। তাঁদের বিরহাতুর পত্নীরা কিন্তু স্বেচ্ছায় তাঁদের অনুগমন করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাস নারীর অসহায়তা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। তাই তাঁর লক্ষ্মীকে বিষ্ণুধাম ত্যাগ করতে হল কৃষ্ণের দেহক্ষুধা মেটাবার জন্য। পুরুষের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার অবমাননা থেকে দেবীরও পরিত্রাণ নেই।

শৃঙ্গারাত্মক উপাখ্যানের পটপ্রেক্ষা তৈরি করতে গিয়ে কবির উদ্দেশ্য স্পষ্টতর হল পদ্মা ও সাগরের কন্যারূপে জন্ম নেওয়া রাধার তীব্র কামাকর্ষক বর্ণনায়—

"তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহনী।।"

কৃষ্ণের দৃষ্টিগোচর হওয়ার আগেই মোহিনি কামিনি রাধা নজর কাড়ল যশোদাভ্রাতা আইহনের। পরিণামে বিবাহ। ভাগ্যের প্রবঞ্চনা দিয়েই শুরু হল সদ্যকিশোরী রাধার জীবন। তার স্বামী আইহন নপুংসক। অথচ তাঁর অধিকারবোধ বড় প্রবল এবং সুন্দরী বনিতা সম্পর্কে তিনি বড় সতর্ক। রাধার মায়ের পিসী জরতী বড়াইকে নিযুক্ত করা হল রাধার দেহরক্ষী হিসেবে। পরিণয় নামক সাতপাকের সুরক্ষাবন্ধন সত্ত্বেও যে কোনো মুহূর্তে নারী পরপুরুষের লালসার শিকার হতে পারে, এই প্রতিবেশবাস্তব প্রস্তুত করে তবেই কবি পরবর্তী কাহিনির দিকে অগ্রসর হলেন। কাজেই কাব্য-প্রস্তাবনাটি পুরাণনির্ভর বলে তাকে অবান্তর ভাবার কারণ নেই।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় বড়ু চণ্ডীদাসকে কিছুটা সাবধানী হতে হয়েছিল। কিন্তু পৌরাণিক কার্যকারণ বজায় রেখেও ঘনিষ্ঠ জীবন-অভিজ্ঞতায় সমাজস্বভাবকে নিখুঁতভাবে চিনিয়ে দেওয়াই তাঁর আদত লক্ষ্য ছিল। বৈকুণ্ঠে নারায়ণ নিজের মর্যাদা বাঁচাতে স্বকীয়ায় তৃপ্ত। কিন্তু মর্ত্যে কৃষ্ণ যেন স্বৈরাচারের ছাড়পত্র নিয়ে জন্মেছেন। সামাজিক শিষ্ট নিয়মতন্ত্রের মধ্যে কামুকের উল্লাস পরিতৃপ্ত হওয়ার নয়। স্বকীয়া লক্ষ্মী তাই কৃষ্ণের স্বাদবৈচিত্র্য সম্পাদনের কারণে পরদার। কিন্তু দাম্পত্যে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ লক্ষ্মীর পক্ষে জন্মান্তরেও সজ্ঞানে অন্য স্বামীগ্রহণ অসম্ভব। তাই তাঁর আত্মবিস্মরণ ঘটাতে হল। আবার অজ্ঞাতসারেও অপরের ভোগ্য হওয়ার সংকট থেকে বিষ্ণুপ্রিয়ার দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। দেবতাদের কূটকৌশলে আইহন তাই প্রতিবন্ধী। তাতে লক্ষ্মীর উপর কৃষ্ণের স্বামীত্বের আধিপত্য অটুট রইল বটে। কিন্তু তার মর্মান্তিক মূল্য দিতে হল রাধাকে।

কৃষ্ণ অবশ্য আত্মস্বরূপ সম্পর্কে সচেতন। নইলে তাঁর নিষিদ্ধ দেহবিলাসের আস্বাদন পূর্ণ হবে না। অন্যদিকে কংসবধের অভীষ্ট পূরণের উদ্যমও জাগবে না। তাই মাঝে মাঝে অপরের কণ্ঠে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বকণ্ঠেই তাঁর দেবত্বের ঘোষণা শোনা গেল। অন্তর্নিহিত সামাজিক ব্যাখ্যাটি কবি নিরুচ্চার রেখে দিলেন বোদ্ধা পাঠকের জন্য। অপরাধপ্রবণতাকে আড়াল করার অভিসন্ধিতে

তথাকথিত বংশকৌলীন্যের অহংকার যেমন আত্মপ্রচারে স্ফীত হয়, কৃষ্ণের দৈব পরিচয়ও সেরকমই সারহীন আভিজাত্যের তকমা। তার নির্লজ্জ প্রদর্শনী কৃষ্ণের চরিত্রহীনতাকে আরও প্রকট করেছে। নইলে লোকায়ত সমাজবিবেকে পুরাণের প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জাগবে কেমন করে? আরোপিত মহিমার প্রশস্তি গেয়ে বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর পাঠক বা শ্রোতাদের ভোলাতে চান নি।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" মূল রসলীলা শুরু তাম্বুলখণ্ড থেকে। লীলা-সংঘটক বড়াই। কৃষ্ণের মতো তার বিপক্ষেও সমালোচকদের নালিশ কম নয়। কারণ সে স্বৈরাচারী পুরুষতন্ত্রের সহযোগী। তাম্বুল প্রেরণকারী কৃষ্ণের কুপ্রস্তাব রাধার কাছে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে দানী হিসেবে, মাঝি হিসেবে গোপনন্দনের যাবতীয় কৌশলী অভিনয় এবং রাধাকে কামকবলিত করার উপর্যুপরি ষড়যন্ত্রে বড়াইয়ের চতুর বুদ্ধির ভূমিকা আছে। সংগত কারণে কোনো কোনো পাঠকের মনে হয়েছে, বড়াইরা রুখে দাঁড়ালে পুরুষসমাজ কখনোই রাধার মতো নারীদের স্পর্শ করতে পারত না। সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ প্রেমের দূতিয়ালিতে প্রথাগত সামাজিক ন্যায়নীতিবোধ প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু বড়াইয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রশ্ন যেহেতু বড় হয়ে ওঠেনি, তাই তার দিক থেকে প্রতিরোধ আসা স্বাভাবিক ছিল। তাহলে বয়োবৃদ্ধ বড়াই কেন কৃষ্ণকে প্রশ্রয় দিল?

আসলে বড়াই অনুক্ষণ চোখের সামনে দেখছে তার নাতনী রাধাকে, সারা দেহ যার সেজে উঠেছে ভোগের অনুপম উপচারে। অথচ রসিক ভোক্তা নেই। কৈশোর পেরিয়ে দিনে দিনে বিকশিত রাধার 'নহুলি যৌবন'ও তো ব্যর্থ হয়ে যাবে এক অক্ষম পুরুষের নিরর্থক অধীনতায়। সামাজিক আইন বরাবর নারীর বিপক্ষতা করবে। যন্ত্রণাটা বড়াইয়ের ভিতরে অব্যক্ত ছিল। ঘটনাচক্রে হারিয়ে যাওয়া রাধার অনুসন্ধানে বৃন্দাবনের গোচারণভূমিতে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। "আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি"—দূতীর এই সামর্থ্য যাচাই করার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে অদম্য হয়ে উঠল। কৃষ্ণের মন পরীক্ষা করার জন্য বড়াই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'সুন্দরী নাতিনীর' তাৎপর্যময় ইঙ্গিত দিল। রাধার শোভন ও লোভন রূপের সবিস্তার বর্ণনায় উত্তেজিত করে তুলল কৃষ্ণের পুরুষালি দেহের কামনাকে। রাধার দিক থেকে অবশ্য অবৈধ মিলনের আহ্বানে সাড়া মিলল না। কৃষ্ণের জটিল প্রত্যাখ্যান এবং বড়াইয়ের লাঞ্ছনা। আহত হয়েও বড়াই সহজে হাল ছাড়ল না। অবোধ রাধাকে সে প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করল—

"কিসক যৌবন রাধা করহ নিফল।
কাহ্ন সমে রঙ্গে কর জীবন সফল।।"

রাধার জীবনের বিফলতা মোচনের জন্য পরপুরুষ-সাপেক্ষতা ছাড়া অন্যতর কোনো মার্জিত শুচিতার পথ গ্রাম্য বড়াইয়ের জানা ছিল না। তাই তার বাঁকা পথের প্রচেষ্টাকে কখনও বড় স্থূল, কখনো বা বড় নির্মম মনে হয়েছে।

নরনারীর সম্পর্কের সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে দাম্পত্যের যে আদর্শতত্ত্ব গড়ে তোলা হয়, জৈব অপূর্ণতা সেখানে একটা ফাঁক তৈরি করতে বাধ্য। কেবলমাত্র সমাজ ও পরিবারের স্থিতির স্বার্থে নয়, মানবিকতার খাতিরেই আইহনের দৈহিক অপূর্ণতা মেনে নেওয়া যেত, যদি নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য আইহন বলদর্পী হয়ে না উঠতেন, যদি রাধাকে দিতে পারতেন নিছক বাসস্থান নয়, একটি সম্মানজনক আশ্রয়। কিন্তু আইহনগৃহে অন্নবস্ত্রের অনটন না থাকলেও

মনের আরাম কোথায়? পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক সংগঠনে ক্ষমতার আপেক্ষিক স্তরভেদে নারীরাও নারীর শোষক হয়ে ওঠে। রাধার জীবনে শুধু দুর্বার আইহন নন, শাশুড়ি ননদীর কর্তৃত্বের পীড়নও কম নয়। ঘরে বাইরে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেও অহরহ তাকে শুনতে হয়েছে গঞ্জনা। পিছনে ফিরেছে সন্দেহের দৃষ্টি। পরিবারের গণ্ডির মধ্যে রাধা তাই শঙ্কিত, নির্বাক। হঠাৎ করেই যেন মনে পড়ে 'পদ্মানদীর মাঝি'র কপিলাকে। বেগবতী নদীর মতো প্রাণোচ্ছলা সেই নারী স্বামীগৃহের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে কুবেরকে বলেছিল—"দিদিরে কইও মাঝি, পরের শাসনে কপিলার মুখে রাও নাই।" পরিবেশভেদে বড়ুর রাধারও ভিন্ন রূপ। দধিদুধের পশরা নিয়ে হাটে যাওয়ার পথে সে আশ্চর্য কলস্বনা। আভীর পল্লীর প্রথা অনুসারে গো-পালনের দায়িত্ব পুরুষের। হাটে পশরা বহন ও বিকানোর কাজ মেয়েদের। শ্রম-বিভাজন থাকলেও অর্থনৈতিক অধিকার অবশ্য নারীরা পায় নি। শুধু অন্দর থেকে মুক্তির একটা সুযোগ অন্তত ছিল। তার উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি হত না এমন নয়। শাশুড়ির কড়া নির্দেশে সাময়িক কালের জন্য হলেও রাধা ঘরবন্দী হয়েছিল।

তবু, অবদমনের যাবতীয় যন্ত্রণা সত্ত্বেও বড়ুর রাধা কৃষ্ণের নাগরালির বিরুদ্ধে তীব্র রোষে জ্বলে উঠেছে। কণ্ঠের উষ্ণ ভঙ্গিটি গ্রামীণ কিশোরীর নিজস্ব। কিন্তু তার আগ্নেয় তেজের উৎসে রয়েছে মজ্জায় মিশিয়ে দেওয়া পিতৃতন্ত্রের অনুশাসন। বুঝে হোক, না বুঝে হোক, রাধা খাঁচার দাঁড়ে বাঁধা ময়নার শেখানো বুলিই বলে—

> "সেসি নারী যে হত্র সতী।
> যাক উপভোগে নিজ পতী।।
> রস নাহিঁ পরার পুরুষে।
> যার উপভোগে কুল নাশে।।"

একাদশী কন্যা রাধা জানে না, সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখালেও রসনীয় স্বামীসঙ্গ থেকে সে বঞ্চিত হয়েই থাকবে। সে বোঝে না, কত শূন্যগর্ভ শোনায় বাইরের বিক্রমমাত্র সম্বল আইহনের পুরুষত্বহীন দেহগৌরব নিয়ে তার দম্ভ—

> "ঘরের স্বামী মোর সর্বাঙ্গে সুন্দর
> আছে সুলক্ষণদেহা।"

সমাজবিহিত দাম্পত্য সম্পর্কে জৈব বিফলতার ধারণা রাধার কাছে তখনও স্পষ্ট নয়। একেবারেই নয় কি? অন্তত বড়াইয়ের দিক থেকে নিশ্চয়ই তাকে সচেতন করে তোলার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তা নাহলে বারবার কেন রাধা নিজের দেহকে 'মুদিত ভাণ্ডার' বলছে? কেন অনভিজ্ঞতাজনিত অজ্ঞাত আশঙ্কায় বারবার সে আত্মরক্ষার একটাই দোহাই দিচ্ছে—"না জানো সুরত কেলী"। কেনই বা 'তাম্বুলখণ্ডে' কৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদে সরব হয়েও বড়াইকে আশ্বাস দিচ্ছে—

> "সুরতি জানিলে বড়ায়ি পাঠাইবো তোরে।
> বৃন্দাবন মাঝে আনাইবো দামোদরে।।
> তবে হৈবে তার সাথে মোর দরশনে।
> তোষিব তাহাক আহ্মে সংপুন্ন যৌবনে।।"

হতে পারে অনাগত পূর্ণ যৌবনকে বরাত দিয়ে রাধার আপাতত পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা। তবু দেমাকী সতীর মুখে এমন উচ্চারণ কি তার পাপবোধকে নিবৃত্ত রাখতে পারে? মনে হয়, রাধার অজ্ঞাতসারে তার অবচেতনে যে অনিবার্য জীবনাকাঙ্খা ক্রমশ ক্ষেত্র বিছাতে চাইছে, সেখানে অপ্রাপ্তদেহ আইহনকে সরিয়ে অদেখা নন্দের নন্দন চকিতে এসে দাঁড়াচ্ছেন। রাধার এই নির্জ্ঞান বাসনাকে চেতনায় ব্যাপ্ত করে দেওয়ার জন্য কবি যথোচিত সময় নিয়েছেন। তারই ফাঁকে আভীরপল্লীর লোকরঞ্জক কাহিনি উচ্চবর্ণীয় পুরাণের প্রভুত্বকে শিথিল করে কাব্যে জাঁকিয়ে বসেছে। বহুকাল ধরে অবহেলিত ব্রাত্য সংস্কার ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে ব্রাহ্মণ্য শুচিবাগীশ নীতিকে।

বড়ু চণ্ডীদাসের সমাজদর্শন নির্ভুল। রাষ্ট্রিক বিপর্যয়জনিত সামাজিক বিপন্নতার মুহূর্তে দায়ে পড়ে সংস্কৃতি সমন্বয়ের চেষ্টা যে আকস্মিক কল্পবৃক্ষের জন্ম দিতে পারে না, কাব্য পরিকল্পনার পরতে পরতে কবি তার প্রমাণ রেখেছেন। কাহিনির অন্তর্দেশ অন্বেষণে ক্রমশ এ ধারণা বদ্ধমূল হয়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' অভিজাত ও অনভিজাত উপকরণের জোড়াতালি নিছকই কবির শৈল্পিক অক্ষমতার ফল নয়। তা অলঙ্ঘ্য সময়-সংকটের লক্ষণ এবং তার মূল রয়ে গেছে বহুকালের শুশ্রূষাহীন সমাজব্যাধিতে।

পুরাণের প্রাজ্ঞ পাঠক বড়ু চণ্ডীদাস ভক্তিবিহ্বলতার প্রলেপ দিয়ে সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ক্ষতচিহ্ন ঢেকে দিতে চান নি। বরং প্রাতিষ্ঠানিক পুরাণের দুর্বল গ্রন্থিগুলি তিনি চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। নারীপুরুষের সম্পর্কের বৈধতা বিচারে পুরাকথার সাক্ষ্য কত স্ববিরোধী, তা নিয়ে "দানখণ্ডে" তিনি জমিয়ে তুললেন রাধাকৃষ্ণের বিতর্ক। রাধার আনুকূল্য পাওয়ার জন্য অবৈধ সম্ভোগের সপক্ষে কৃষ্ণ তাঁর ঝুলি থেকে বের করেছেন একটির পর একটি দৃষ্টান্ত। যেমন—

১) মহাতপস্বী হয়েও পরাশর মীনকন্যাগামী হয়েছিলেন, যার ফলে বেদব্যাসের জন্ম।

২) পঞ্চ পাণ্ডবের জননী হওয়ার গৌরব কুন্তী অর্জন করেছিলেন বহু মুনির সংসর্গে।

৩) বহুকীর্তিত দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর জায়া।

৪) দেবতাদের ভোগে লাগে বলেই রম্ভা প্রমুখ বারাঙ্গনার সুরলোকে স্থান।

৫) স্বয়ং শিব গঙ্গাকে শিরে ধারণ করা সত্ত্বেও গঙ্গা শান্তনুর সঙ্গে সহবাসে দ্বিধা করেননি।

সুতরাং কৃষ্ণের সাফ কথা—"নিজ পরনারী দোষ নাহিক সংসারে"। অন্যদিকে রাধাও হারতে রাজি নয়। তার কাছেও মজুত ছিল বিপরীত যুক্তির বহু আখ্যান। রাধা জানিয়েছে—

১) গুরুপত্নী তারাকে হরণ করার অপরাধে আজও চন্দ্রের কলঙ্ক ঘোচেনি।

২) অহল্যার সঙ্গে মৈথুনক্রিয়ার পাপে দেবরাজ ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে সহস্রযোনি প্রকট।

৩) তিলোত্তমার রূপে আত্মহারা হয়ে সুন্দ-উপসুন্দ দুই ভাই এবং পার্বতীর মোহে বিভ্রান্ত হয়ে সুম্ভ ও নিসুম্ভাসুর অকালে নিজেদের বিনাশ ডেকে এনেছিল।

৪) সীতার প্রতি রাবণের অন্যায় প্রলোভনই তাঁর লঙ্কাধ্বংসের কারণ।

সুতরাং পরদার গ্রহণকে রাধা কোনো মতেই উচিত কাজ বলে মানতে পারে নি। মুকুন্দের ফুল্লরার মতো রাধার মুখেও পুরাকথা শোভা পায় কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবশ্যই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা লক্ষ করতে চাই রাধার অনমনীয় ভঙ্গিটি। দৈহিকভাবে বলশালী কৃষ্ণের কাছে রাধা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সুবিধাবাদী নীতিকে কখনও সমর্থন করে নি এবং কোনো অবস্থায় স্বীকার করে নি কৃষ্ণের অলৌকিক মাহাত্ম্য। অথচ কৃষ্ণের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। "শঙ্খ চক্র গদা আহ্মো শারঙ্গ ধরী" অথবা "পুতনার প্রাণ লৈলো আতি শিশুকালে/সকট আসুর মোর্ত্রঁ দলিলো হেলে" এমন আত্মপ্রতাপের ঘন ঘন বিজ্ঞাপন তো ছিলই। বেকায়দায় পড়ে পরকীয়া প্রেমবিমুখ রাধাকে তার স্বকীয়া স্বরূপ স্মরণ করানোর জন্যও মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণ। কিন্তু দেহে মনে যার গোপপল্লীর রং পাকা হয়ে বসে গেছে, সে নারী হঠাৎ অবিশ্বাস্য অমর্ত্য বিভায় প্রলুব্ধ হবে কেন? নিত্য প্রবঞ্চনা করা যাঁর অভ্যাস, সেই কৃষ্ণের মুখে "তোহ্মো লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মো হরী কাহ্নে" এমন বচন কেমন করে রাধার আস্থা জাগাবে? স্বকীয়ার দেহ লুণ্ঠনে কোনো পুরুষ কি এত নির্মম হতে পারে? সুকুমার হৃদয় রাধা কোনো মতেই কৃষ্ণের পরনারী-লোলুপতার সঙ্গে দেবত্বের সংস্কারকে অভেদে মেলাতে পারে নি।

অসংগতিকে জোর করে সামঞ্জস্য দিতে কবির নিজেরই তো সায় ছিল না। 'ভারখণ্ড' আর 'ছত্রখণ্ডে'র অপৌরাণিক বৃত্তান্তে তাই তিনি কৃষ্ণকে নিয়ে পরিহাসে মাতলেন। অনিচ্ছায় ভুক্ত, বারংবার ধর্ষিত রাধা কৃষ্ণের দর্পের তলে লুকিয়ে থাকা দুর্বল লালসার জায়গাটি টের পেয়ে হাটের পথে তাঁকে দিয়ে দধিদুধের ভার বহালো, মাথায় ধরালো ছাতা। ভগবান ভেঙে খানখান। কবি বলছেন—"দেখি সব দেবগণ খলখল হাসে ল।" কবি তো এটাই চেয়েছিলেন। যে-দেবতারা অবতার পুরুষের যথেচ্ছ সম্ভোগের প্রশ্রয়দাতা, তাঁদের কাছে কৃষ্ণকে হাস্যাস্পদ করে তোলাতেই বড়ু চণ্ডীদাসের পরম কৌতুক।

"বৃন্দাবনখণ্ডে" আগ্রাসক কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রত্যাখ্যানের তীব্রতা অন্তর্হিত। রাসলীলার উদ্যানে সে সুসজ্জিত সানন্দ অভিসারিকা। দেহসর্বস্ব মিলনের মধ্যে এবার মনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। হয়েছে বলেই কৃষ্ণ সম্পর্কে জেগেছে অভিমান ও অধিকারের বোধ। লোকলজ্জা এখনও যায় নি। ঈর্ষাপরায়ণ সখীরা পাছে নিন্দাবাদ রটায়, রাধা তাই নিজেই কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিল ফুলের বাগানে তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুযোগ দিতে। কিন্তু বড়ুর কাব্যের রসতৃষ্ণ গোপীবৃন্দ রীতিমতো আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিপরায়ণ। তারা কামার্ত হয়েই কৃষ্ণকে চাইল। কৃষ্ণ উপরি পাওনার মওকা ছাড়বেন কেন? মায়াবী ক্ষমতায় তিনি 'বিবিধ তনু' ধারণ করে সর্বগোপীজনের অভিলাষ চরিতার্থ করলেন। পুরাণের ব্যাখ্যা যেমনই হোক, রাধা কিন্তু কৃষ্ণের বহুগামিতার আসল মর্মটি বুঝেছিল। বুঝে ফেটে পড়ল ক্ষোভে। মুখ ফেরাল অভিমানে। মানভঞ্জনের জয়দেবীয় পন্থা বড়ু চণ্ডীদাসের মনে ধরেছিল। উদ্ধত কৃষ্ণকে দিয়ে তিনি রাধার চরণপল্লব মস্তকে ধারণ করালেন। কাঙ্ক্ষিত পুরুষের কাছে রাধার দাবি কিন্তু আরও বেশি—

> "বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
> একই পরাণ এক দেহে।।
> সে নেহ তিঅজ নাহিঁ সহে।"

রাধা যতদিন আইহনের সঙ্গে তার দাম্পত্য সম্পর্ককে যথার্থ মান্যতা দিয়েছিল, ততদিন তার জীবনে সে পরপুরষের অনধিকার প্রবেশ সাধ্যমতো প্রতিহত করেছিল। আবার সেই পরপুরুষের

সঙ্গেই বাধ্যতামূলক সান্নিধ্যে যখন ক্রমে ক্রমে তার দেহমন বাঁধা পড়ে গেল, তখন সেখানেও তৃতীয়ের অস্তিত্ব তার কাছে অসহনীয়। দেবত্বের অলীক ছলনায় পরকীয়া প্রেমের একনিষ্ঠতা থেকে সরে আসাকেও সে প্রতারণা বলেই মনে করেছে। ঐশ্বরিক প্রেমলীলার নামে কৃষ্ণের বহুবল্লভা হওয়ার যুক্তি সে সমর্থন করতে পারে নি।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রায় সব কটি খণ্ডেই কোনো না কোনো ভাবে কৃষ্ণের দৈবসত্তার ইঙ্গিত মেলে। তবু প্রণয়ের আকর্ষণ বিকর্ষণের মাঝখানে "কালীয়দমনখণ্ডে" পৌরাণিকতাব অতিরেক পাঠকদের বিরাগ জাগিয়েছে। নাগদমন করতে গিয়ে কৃষ্ণের প্রাথমিক ব্যর্থতা পুরাণের যুক্তিতে অবশ্যই একটি প্রতীকী ঘটনা হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। লালসাপ্রমত্ত কৃষ্ণ কংসবধের মূল কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে অবতারের স্বধর্মচ্যুত। বলরাম এসে তাই দশাবতার স্তোত্র শুনিয়ে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন। তারপরেই ভয়াল নাগকে পরাস্ত করা কৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব হল। এত ঘটনাতেও রাধা কিন্তু মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণের দৈব বিক্রমে অভিভূত হয়নি। যমুনাতীরে এসে নাগের বিষে নীলবর্ণ কৃষ্ণের অচৈতন্য দেহটি দেখার পর রাধার কণ্ঠের ভাষাই বদলে গেছে। সে ভুলে গেছে লজ্জা সংকোচ। সমবেত গোপপালকদের সামনে সে প্রিয়বিধুরা নারীর মতোই ভেঙে পড়েছে আর্ত কান্নায়—

"কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।
কাহ্ন তোহ্মা বিণি সব নিফল মোরে।।"

"রাধাবিরহ" পর্যায়ে স্থায়ী বিচ্ছেদের আগে "কালীয়দমনখণ্ডে" ক্ষণবিচ্ছেদের শঙ্কিত যন্ত্রণার মধ্যে রাধা প্রথম অনুভব করেছে, কৃষ্ণ তার জীবনে কতটা অচ্ছেদ্য। আইহন যা পারেন নি, কৃষ্ণ তাই পেরেছেন। অহংকারে ঘৃণায় বারংবার তাঁকে ফিরিয়ে দিলেও তাঁর মাধ্যমেই রাধার যৌবনসরসীনীর টলমল করে উঠেছে। নিঃস্পন্দতার চেয়ে দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝড়ের মাতন যেন ভাল। না, সাধ্বীতার মোহে রাধার পক্ষে তার প্রতিবন্ধী জীবনের পুরনো অবস্থানে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই গোপবাসীরা যখন অরিন্দম কৃষ্ণের জয়ধ্বনিতে মত্ত, যখন কালনাগের মৃত্যুভয়ে কাতর নাগিনী "ত্রিভুবননাথ তোহ্মে হরী" বলে সর্বময় ঈশ্বরের স্তুতিগান করে, রাধা তখন কৃষ্ণের সংজ্ঞালাভের আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁকে দেয় পরকীয় প্রেমের গাঢ় আলিঙ্গন। অবতারতত্ত্বের সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করার।

আশ্চর্য দুঃসাহসী বড়ু চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা। ব্রাহ্মণ্য পুরাণ ও লোকপুরাণকে পরস্পরের সহযোগী করে তোলার ঐতিহাসিক কালানুগ চাহিদা মেটাতে গিয়ে কবি মর্মান্তিকভাবে অনুভব করলেন উভয়ের ধাতুপ্রকৃতির ব্যবধান। উচ্চবর্গীয় আদর্শ অপরকে শাসন করতে উৎসাহী, কিন্তু আত্মশাসনে পরাঙ্মুখ। ধর্মচ্যুতি, চরিত্রচ্যুতির সব অপরাধ সাধারণের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় অলৌকিক তত্ত্বে আবৃত করে রাখাই তার স্বভাব। প্রয়োজনমাফিক বদলাতে পারে তার নীতি। পুরাণপ্রাজ্ঞ বড়ু চণ্ডীদাস স্ববর্গের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করার অনুকূল পরিবেশ পাননি। তাই বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়েই তাঁকে বৃত্ত ভাঙার গোপন কৌশল নিতে হল।

কৃষ্ণকে কবি নির্মাণ করলেন এমন এক জরাসন্ধ চরিত্ররূপে যাতে একটু টান দিলেহ পৌরাণিক আর লৌকিক অংশকে পৃথক করে চেনা যায়। অধর্ম বিনাশের সাত্ত্বিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে ব্যভিচারের

তামসিকতা যে কোনো সুবাদেই মিলতে পারে না, দেবতাদের তথা শাস্ত্রীবর্গের সমর্থন পেলেও নয়, তা কবি প্রকট করে তুললেন দুটিকে পাশাপাশি রেখে। বিপরীত দিকে আনলেন রাধাকে, যার মন থেকে সুরলোকের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছে গেছে, যার শিরায় শিরায় অনভিজাত রক্তের সচল প্রবাহ, যে পাপপুণ্যের প্রথাগত বোধ অতিক্রম করেছে জীবনের প্রতি আন্তরিক সংরাগে।

বাংলা ভাষাসাহিত্যের শৈশবলগ্নেই ব্যতিক্রমী এক পরিণত সমাজবোধ অধিগত করেছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস। নিজের সময়ের তুলনায় যেন বেশ খানিকটা এগিয়ে ছিল তাঁর ভাবনা। নারীর উপর সর্বস্তরের সামাজিক অনুশাসন ও পুরুষতন্ত্রের হৃদয়হীন আগ্রাসন তাঁর মতো কবে কজন কবি বুঝেছিলেন এবং বুঝে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন, সেকালে অথবা আজকের কালে, ভাবতে প্রশ্নের বদলে কয়েকটি বিস্ময়চিহ্ন এঁকে দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানেই কবি থেমে যান নি। শিষ্ট সমাজের কাঠিন্যের পাশে প্রাকৃত সমাজের অপেক্ষাকৃত প্রশ্রয়ের শিথিলতায় কবি প্রাণের অপচয় রোধের সুযোগ দেখেছিলেন। কৌলীন্যের অহংকারী উৎকর্ষের মুখোশে প্রবৃত্তির প্রলোভন ঢেকে রাখার অযুক্তিকে আঘাত করতেই তাঁর কাব্যে পরম বন্দনীয় পুরুষের বর্বরতা অনাবৃত। আর শাস্ত্রবিহিত সতীত্বের আদর্শবচন দিয়ে সেই বর্বরতাকে প্রতিহত করতে করতে সুস্থ প্রাণের সঞ্চারিত আবেগে বৈধতার বঞ্চনাকে চিনতে শেখে রাধা। দেবত্বের ভাঙাচোরা বিগ্রহকে নয়, বলিষ্ঠ এক মানুষকে সে আপন করতে চায়। সম্ভোগের মধ্যে আনতে চায় প্রেমের শ্রী। আপন-পরের সমাজনির্ধারিত বিভাজনের অর্থহীনতা বুঝে সে খুঁজে নিতে চায় নিজের বাঞ্ছিত আশ্রয়।

প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে, পরিবর্তনবিমুখ সামাজিক স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে কলম ধরলে কবিকে দণ্ড পেতেই হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যকে হয়তো খুব সচেতনভাবেই নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। লিপিকরেরা একাধিক পুথি নকল করার অবকাশও হয়তো পান নি। শাস্ত্রজ্ঞ কবির হাতের এই আশাস্ত্রীর রচনায় অনাবৃত সম্ভোগের ভাষাও কি শুচিতার পালিশ খসিয়ে দেবার চেষ্টা নয়? কাব্যটির সমাপ্তির পৃষ্ঠাগুলি পাওয়া যায় নি বলে পণ্ডিত ও সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীর মনে যুগপৎ আক্ষেপ ও অনিশ্চিতের সংশয় রয়ে গেছে। কিন্তু 'রাধাবিরহে'র পর অন্যতর কোনো উপসংহারের ভাবনা বড়ুর কল্পনায় আদৌ আসা সম্ভব ছিল না। সাধ্য ছিল না ধ্বস্ত বিচূর্ণ রাধার দিকে তাকিয়ে কংসবিনাশী কৃষ্ণের কীর্তনগান। রাধার আর্তস্বর আসলে ইতিহাসেরই মর্মস্বর। উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতি সেদিন মিলনের আশ্বাস দিয়ে নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নিতে চেয়েছিল। বাধা পেলে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। প্রিয়ভাষে চরিতার্থ অথবা পরাক্রমের মুখে আত্মসমর্পিত নিম্নবর্গ ক্রমে যখন কৌম পরিচিতিকে পিছনে ফেলে উচ্চবর্গের ঘনিষ্ঠ হতে চাইল, আপন হতে চাইল, তখনই এলো বিমুখতা এবং বিচ্ছেদের পালা। রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের জেরে সাময়িক বিপন্নতা সামলে নেবার পরই ব্রাহ্মণ্য পুরাণ আবার নিজের প্রতিপত্তির আসনে ফিরে গেল। আভীরপল্লীর অমার্জিত কাহিনি তার সজীব স্বাস্থ্য হারাল আভিজাতিক রসতত্ত্বের কৃত্রিম ব্যাখ্যানে। এও আধিপত্যেরই আর এক কৌশল। বৈষ্ণবীয় নব প্রেমভক্তির প্রবর্তক স্বয়ং চৈতন্যদেবকেও বাঁধা পড়তে হয়েছিল এমন ব্যাখ্যা বন্ধনে, যেহেতু তিনি পৌরাণিক আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, "বরণ আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন" ভেদ না মেনে গোত্র-নির্বিশেষে সবাইকে বুকে টেনেছিলেন। তাই তাঁর সাহসী পৌরুষকে রূপান্তরিত করা হল "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত" দয়িতার দিব্য সুষমায়। তাঁকে ছিনিয়ে

আনা হল ও পাড়ার প্রাঙ্গণ থেকে। কৃষ্ণপ্রেমাভিভূত চৈতন্যদের যাঁদের রচনা আস্বাদন করেছিলেন বলে কথিত, সেই "চণ্ডীদাস বিদ্যপতি রায়ের নাটকগীতির" তালিকাভুক্ত চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-কার কিনা, তা নিয়ে একটা তর্ক আছে। বিনা তথ্যপ্রমাণে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ নেই। তবে অনুমান করা যায়, বড়ুর আগ্নেয় কাব্যটি ততদিনে লোপাট করা হয়েছিল। অথবা থাকলেও তাকে মহাপ্রভুর হাতে তুলে দিতে তাঁর ভক্ত পরিকরেরা সাহস বা স্বস্তি পাননি।

সমকালের সমাজবাস্তবের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের" কবি হয়তো অজ্ঞাতসারেই অনাগতের আগাম বার্তা দিয়েছিলেন। যুগান্তরেও সামাজিক বর্গব্যবধান আজও অটুট। নির্মমভাবে অনাদৃত, প্রত্যাখ্যাত এবং প্রতিমুহূর্তে প্রতারিত অন্ত্যজ সংস্কৃতি আজও বড়ুর রাধার মতোই যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়ে চলেছে। আমরা সুনিশ্চিত, মঙ্গলকাব্যের কবিদের মতো বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর রাধাকে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর কমলাসনে পুনরধিষ্ঠিত করেন নি। 'বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনীর' বিলাপই "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের" শেষ কথা। ইদানীন্তন নিম্নবর্গচর্চাকারীদের কাছে একবার জানতে ইচ্ছে করে, উচ্চবর্গীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যের বিপক্ষে এক আদি-মধ্যযুগীয় কবির অসমসাহসী বিদ্রোহী চেতনা নিয়ে তাঁরা ভেবেছেন কিনা। আরোপিত তত্ত্বের প্রয়োজন নেই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পুথি আবিষ্কারের শতবর্ষে সহৃদয় পাঠকের কাছে আমাদের একটাই দাবি। সমাজপ্রেক্ষিত মনে রেখে কাব্যটির পুনর্পাঠ। অমার্জিত আবরণ ভেদ করে হয়তো সেখানে ইতিহাসের নতুন নতুন তাৎপর্যের সন্ধান মিলতে পারে।

**কোনো কাব্যকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়ে তার অন্তর্গূঢ় ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে গেলে সবার আগে তার রচনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিতি প্রয়োজন। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"কে বাংলাসাহিত্যের আদি-মধ্য যুগপর্বে স্থাপন করার ক্ষেত্রে কোনো কোনো পণ্ডিতের আপত্তি আছে। আমরা অধিকাংশের দ্বারা অনুমিত এবং স্বীকৃত ধারণার উপর ভিত্তি করেই অভিমত ব্যক্ত করেছি। কাব্যটির জন্মকাল সম্পর্কে কোনো পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হলে আলোচকের দৃষ্টিকোণেরও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য।*

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য ঃ একটি আধুনিক সমীক্ষা

তরুণ মুখোপাধ্যায়

> .....ব্রাহ্মণ্যধর্মের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম যখন ক্রমে সংকুচিত হইয়া আত্মগোপন করিতেছিল, তখন বৌদ্ধেরা নিজেদের দেবদেবীর উপর ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর নাম আরোপ করিয়া নিজেদের দেবতাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। .... এই সকল আগন্তুক দেবতাদিগকে মঙ্গলকারী এবং প্রবল ও জাগ্রত দেবতারূপে প্রতিপন্ন করার একটা চেষ্টাও এই যুগে পরিলক্ষিত হয়। ফলে এক শ্রেণীর বাঙ্গলা পুরাণ রচিত হইতে থাকে—তাহাই মঙ্গলকাব্য।
>
> (বাঙ্গলা কাব্য সাহিত্যের কথা)

অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বীক্ষা অগ্রাহ্য করার কোনো হেতু দেখি না। কিভাবে বৌদ্ধদেবদেবী মঙ্গলকাব্যের প্রণোদনায় নামান্তর ও রূপান্তর লাভ করেছে তাও তিনি বলেছেন। যেমন, বৌদ্ধদেবতা ধর্ম বা দক্ষিণ রায় হয়েছেন। বৌদ্ধ শক্তিদেবী হারিতি হয়েছেন শীতলা; তবিতা বা তরিতা হয়েছেন মনসা এবং বজ্রতারা হযেছেন বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবী। মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে আছে প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ, মহাকাব্যের আদর্শ। যেজন্য মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই খণ্ড—দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডে সৃষ্টিরহস্য, নানা দেবদেবীর বন্দনা ইত্যাদি পাই, এক্ষেত্রে কবিরা পুরাণপন্থী। কেননা পুরাণে আছে—

> সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ।
> বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।

"বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস" রচয়িতা আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত "বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলার সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।"

সাধারণত আটদিন ধরে মঙ্গলরাগে মঙ্গলকাব্যের পালা গাওয়া হতো। উদ্দেশ্য মানুষের ও সমাজের তথা পরিবারের মঙ্গলসাধন, মুখ্যত এইজন্যই কাব্যের নাম 'মঙ্গলকাব্য' প্রচলিত নায়ক, লাচাড়ী, ত্রিপদী ছন্দে মঙ্গলকাব্য যেমন লেখা হতো, তেমনি এর মধ্যে কতকগুলি বিষয় সুনির্দিষ্ট ছিল যেমন—

১. গণেশ সূর্য ইত্যাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা

২. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ তথা স্বপ্নাদেশ

৩. সৃষ্টিরহস্য বর্ণনা

৪. হরগৌরীর কথা

৫. নারীদের পতিনিন্দা

৬. বারোমাস্যা ইত্যাদি।

সমস্ত বিষয়টি ছকে বাঁধা। তবে শেষকথা দেবদেবীর মহিমাকীর্তন ও মঙ্গল প্রার্থনা। আশুতোষবাবু মঙ্গলবাক্যের যে তিনটি পর্যায় দেখেছেন—বৈষ্ণব (গোবিন্দমঙ্গল), পৌরাণিক (অন্নদামঙ্গল), লৌকিক (চণ্ডীমঙ্গল); তার মধ্যে "মনসামঙ্গল" লৌকিক পর্যায়ভুক্ত।

সত্যের খাতিরে মানতেই হবে, যে উদ্দেশ্যেই মঙ্গলকাব্য লেখা হোক না কেন, তার মধ্যে তৎকালীন আর্থিক, সামাজিকও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা তথ্য পাওয়া যায়, মধ্যযুগের মানুষের সংস্কার, আচারবিচার, প্রথা, ধর্মচর্চা, রাজনীতি ইত্যাদি সবই এখানে মেলে। তবে তুর্কী আক্রমণেব ফলে মানুষ যেভাবে দিশাহারা ও মনোবলহীন হয়েছিল, তার ফলে দেবতা, নিয়তি, দৈবে বিশ্বাস প্রবল হয়েছিল। তার প্রভাব মঙ্গলকাব্যে পাই। একথা আশুতোষ ভট্টাচার্যও জানিয়েছেন। কবিদের গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ বা আত্মপরিচয়ে সেকালের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্যচিত্রিত চরিত্র ও বর্ণিত ঘটনায় কিছু অতিরঞ্জন থাকলেও, তুষের মধ্যে শস্যকণা পাওয়া অসম্ভব নয়। মনসামঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে আশুতোষবাবুর অভিমত প্রণিধানযোগ্য—

> মনসামঙ্গলে বেহুলার দুর্ভাগ্যের জন্য মনসাকে কেহই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করিবে না—ইহার নিরবচ্ছিন্ন করুণরসের প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া মানুষের চিরন্তন দুর্ভাগ্যের কথাই স্মরণ হইবে, মনসার কথা মনেও হইবে না,.....চাঁদসদাগরের লাঞ্ছনার মূলে বিশেষ কোন দেবতার প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত আক্রোশ বলিয়া যদি বিবেচিত হইত, তাহা হইলে মনসামঙ্গল বাঙালীর জাতীয় কাব্য হইতে পারিত না। চাঁদসদাগরের মধ্যে দৈব-লাঞ্ছিত সমাজের প্রত্যেক পুরুষই আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছে।
>
> (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস)

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার ভিতরে আছে ক্ষমতার দম্ভ নিয়ে দেবদেবীর দৃষ্টিকটু লড়াই। স্পষ্টই বলেছেন,

> বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর এক দেবতার অভ্যুদয়।

তিনি দেখেছেন, তৎকালীন ইউরোপে যে জোরের কারবার চলেছিল, যেন তারই জেরে দেবী চণ্ডী বলেন, ভয় দেখাও, দুঃখ দাও, মারো এবং অনুগত দাস করো। 'নইলে আমার প্রেস্টিজ যায়'। ধর্মবোধ, ন্যায়বোধ, বিচারবুদ্ধি, যোগ্য-অযোগ্য নির্বাচন নয়, চণ্ডীর 'প্রেস্টিজ হচ্ছে ক্ষমতার প্রেস্টিজ'। এই বঙ্গদেশে আমরা কি দলতন্ত্রের এমন মূর্তি দেখি না? একালের গল্পকার ও কবিরা তো নব মঙ্গলকাব্য সেইভাবে লিখে দেবদেবীর প্রচ্ছদে যা ছিল, আধুনিক কালে তাই অনাবৃত, অলজ্জিত ভাবে ঘটে চলেছে—হায়, সেই ট্র্যাডিশন চলছে।

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলই যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও পরিচিত ছিল, এ নিয়ে বিতর্ক নেই। জলজঙ্গলসর্প অধ্যুষিত বঙ্গদেশে মনসা পূজাই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা, বিশেষত পূর্ববঙ্গে সর্প-উপদ্রব বন্ধে মনসা পূজা ও বন্দনায় সকলেরই সায় ছিল। এরি পাশে অনুন্নত চরিত্র চাঁদ সদাগরের পৌরুষ এই কাব্যকে আলাদা শ্রী ও মহিমা দিয়েছিল, তুর্কীনাচন যে ভয় দেখিয়েছিল, যে মার দিয়েছিল সেখানে মারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো মানুষকে পেয়ে মানুষের মনে হিরোশিপ

ও হিরো-ওয়ার্শিপ জন্ম নিয়েছিল। কবিশেখর কালিদাস রায় চমৎকার ভাবে সেই চাঁদ চরিত্রের মহিমা বর্ণনা করেছেন—

তুমি দেবতারো বড়, আমার এ অর্ঘ্য ধরো,
শৈব সাধু চন্দ্রধর বীর।
এ বঙ্গের সমতলে তৃণ-লতা-গুল্মদলে
বজ্রজয়ী তুমি বনস্পতি
শিখাইলে এই সত্য, তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব,
দেব নয়, মানুষই অমর,
মানুষই দেবতা গড়ে, তাহ'রই কৃপার পরে
করে দেব-মহিমা নির্ভর। (চাঁদ-সদাগর)

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবকাল ঈষৎ বিতর্কিত। তবে 'পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীই মঙ্গলকাব্যের সৃজনযুগ', আশুতোষবাবুর এই অনুমান গ্রহণযোগ্য। পঞ্চদশ শতকের শেষে বিজয় গুপ্ত পূর্ণাঙ্গ মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, যা গ্রন্থাকারে পাওয়া গিয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে জলজঙ্গল বেষ্টিত তৎকালীন বঙ্গদেশে সর্পভীতি যেমন স্বাভাবিক, মনসাপূজাও তেমনি স্বাভাবিক ছিল। পাশাপাশি সিজ বা মনসাগাছও দেবীর প্রতীকরূপে পূজিতা হতো। বৌদ্ধ মতে যে জাঙ্গুলী দেবীর নাম পাওয়া যায়, তিনিই মনসা। পূজামন্ত্রে বলা হয়েছে, "বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্।" কালোত্তরে বিষহরী 'মনসা' নামে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, কেন মনসা? এ নিয়ে নানা মত। কেউ বলেন, " মনসা সৃষ্টা ইতি' বা 'কশ্যপেন মনসা সৃষ্টা'—অথচ তিনি মনসঞ্জতা, কারো মতে দাক্ষিণাত্যের মঞ্চাম্মা-ই মনসা। মহাভারতে মানস নেই; উপপুরাণে আছে। ফলে মহাভারতীয় জরৎকারু ও মনসা যুগান্তরে অভিন্নাত্মা হয়ে গেছে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন একাদশ শতকে বাংলাদেশে নানা স্থানে সর্পমূর্তি ও ভাস্কর্য পাওয়া যায়; যা প্রমাণ করে এই সময় থেকেই মনসাদেবী পূজিতা ও প্রচারিতা হয়েছেন। মনসাকে যথাক্রমে শিবের ও কশ্যপের কন্যারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দুই মতই প্রচলিত। যদিও মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মনসা শিবের কন্যা, জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

মনসামঙ্গলের কাহিনীর রূপরেখা একই। বিভিন্ন কবির হাতে তাই বিস্তারিত ও ব্যাখ্যাত হয়ে বৈচিত্র্য লাভ করেছে। শৈব চাঁদ সদাগরকে ভয় দেখিয়ে, তাঁর অর্থ, পুত্র ধ্বংস করে মনসা পূজা আদায় করেছেন দেখা যায়। বেহুলার সতীত্ব ও লখিন্দরের পূর্ণজীবন সকলেই সযত্নে বর্ণনা করেছেন। চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা-র নামের উৎস 'স্বর্ণরেখা'—পাওয়া যায় "ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী" গ্রন্থে। আশুতোষবাবু মনে করেন, মনসা কাহিনীর সঙ্গে তেলেগু অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের কাহিনীও মিশে গেছে। এছাড়াও রাঢ় অঞ্চলের ছায়া মনসামঙ্গলে পড়েছে। যেজন্য পূর্ববঙ্গনিবাসী বিজয় গুপ্তর কাব্যে নেতার যে জন্মবিবরণ আছে, তা শূন্যপুরাণ বা ধর্মমঙ্গলের সঙ্গে মিলে যায়। ধর্মপূজা পূর্ববঙ্গে অপ্রচলিত, অজ্ঞাত।

মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? এ নিয়ে মতান্তর আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষে

বিজয় গুপ্ত যখন কাব্য লেখেন, তিনিই জানান তাঁর পূর্ববর্তী কবি হরি দত্ত। যদিও অগ্রজ কবি সম্পর্কে শ্রদ্ধা ভক্তি দেখান নি।

প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত।
মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।।
হরিদত্তের যতগীত লুপ্ত হইল কালে।
জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাল্ডে বোলে চালে।।
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুন্দর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর।।

হরি দত্তের সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া যায় না। নানা জনের লেখায় যেটুকু উদ্ধৃতি মেলে, তাতে তিনি মূর্খ ও অকবি ছিলেন, বলা যায় না। বরং পরবর্তী কবিরা হরি দত্তের লেখা আত্মসাৎ করেছেন (বিজয় গুপ্ত পর্যন্ত), গবেষকরা বলেছেন।

চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি রূপে বিজয় গুপ্তের নাম সকলেই বলেছেন। তাঁর কাব্যে যেসব স্থান, সন তারিখের উল্লেখ আছে, তাতে স্পষ্টভাবে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়।

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক।।
* * * * * * * * *
পশ্চিমে রাঘব, নদী পুবে ঘন্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।।
* * * * * * * * *
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়।।

কবি যে গ্রামে জন্ম নিয়েছেন, তা শিক্ষিতজনের স্থান। এই গর্বে কবি বোধ হয় অগ্রজ কবিকে 'মূর্খ' বলেছিলেন। তাঁর গ্রন্থরচনার কাল ১৪০৬ অর্থাৎ ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ (ঋতু শূন্য বেদ শশী অনুসরণে) কিন্তু হুসেন শাহ যেহেতু ১৪৯৩ থেকে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়েশ্বর ছিলেন, তাই হিসেব মেলে না। পাঠান্তরে পাওয়া যায় "ঋতু শশী বেদ শশী"—যার অর্থ "বিজয় গুপ্ত ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া মনসামঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।" (দ্র. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস)। রাঘবগঞ্জ জেলার গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে কবির জন্ম। তাঁর মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তিনি উঁচুদরের কবি না হলেও মনসার কাহিনীর বারুণ্য জনগনকে স্বভাবতই আকর্ষণ করেছিল। সামাজিক ও বস্তুবাদী বিশ্লেষণে কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিজয় গুপ্তর কবিকৃতি সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য।

> বিজয় গুপ্তের দৃষ্টি ব্যষ্টি-চরিত্রের অন্তস্তল অপেক্ষা সমষ্টি-চরিত্রের বহির্ভাগের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট ছিল। ভাবপ্রবণতা অপেক্ষা তাঁহার মধ্যে বস্তু বিশ্লেষণ প্রবণতা অধিক ছিল। সেই জন্য তিনি এই করুণ রসাশ্রিত কাহিনীর উদ্দাম ভাব প্রবাহে ভাসমান

না হইয়া ইহার এক একটি বিচ্ছিন্ন খণ্ড বস্তু আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার ফলে বিচ্ছিন্ন সামাজিক চিত্রগুলি তাঁহার কাব্যে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার পরিকল্পিত দেবচরিত্রগুলিও তৎকালীন সমাজের এক একটি জীবন্ত মানবচরিত্ররূপেই অঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে দেবত্বের লেশমাত্র নাই।

(বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস)

করুণ-রস ব্যবহারে যে কোনো কবি সরল তরল পয়ারে মেতে উঠতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বিজয় গুপ্ত সংযমের পরিচয় দেখিয়েছেন। সস্তা জনপ্রিয়তা বর্জন করেছেন। কালনাগিনীর দংশনে লৌহবাসরে অকালে লখিন্দর মারা গেলে মা সনকা হাহাকার করে ওঠেন। পুত্রহারা মায়ের বিলাপ কবির কলমে এইরকম—

দুই হস্তে ধরি রাণী লখাই নিল কোলে।
চুম্বন করিল রাণী বদন-কমলে।।

বিজয় গুপ্ত স্বভাব-কবি নন, শিক্ষিত কবি। এজন্য প্রচলিত পয়ার, লাচাড়ী, ত্রিপদীর পাশে স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্তের ব্যবহার করেছেন।

প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি।।

আশুতোষবাবু বিজয় গুপ্তের কাব্যে অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের ভঙ্গি ও ভাবনার প্রতিধ্বনি পেয়েছেন। যেমন, দেবী অন্নদার ভবানন্দ গৃহে যাত্রা ও ঈশ্বরী পাটনীর খেয়া দেওয়া প্রসঙ্গ। বিজয় গুপ্ত অনেক আগে লিখেছেন দেবী চণ্ডী খেয়া পারাপার করতে সরযূতীরে এসেছেন। ব্যাজস্তুতি ধরনে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে পাঁচে।
হাসিতে খেলিতে গেলা ডোমনীর কাছে।।
কপট করিয়া সাঁচা মিছা কথা কই।
এক নাম জানিয়া তাহারে বলে সই।।

কবিতা বা কাব্য শুধু শব্দার্থময় কথাবস্তু নয়, তাকে অলঙ্কৃত হতে হয়। এ ব্যাপারে বিজয় গুপ্ত সচেতন কবি। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে তাঁর সহজাত দক্ষতা চোখে পড়ে। সংস্কৃত কাব্য বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব থাকলেও, তাঁর নিজস্ব বাচনভঙ্গি অস্বীকার করা যায় না।

এছাড়াও মানবচরিত্র ও মানবমনের গভীরে প্রবেশের দক্ষতাও বিজয় গুপ্তের ছিল। কবিকঙ্কণের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই, মুকুন্দরাম যা দেখেন, তাই লেখেন। বিজয় গুপ্ত চোখের দেখা-র সঙ্গে মনের দেখাও মিলিয়ে দেন।

১. পরেরে মারিতে পরের কিবা ব্যথা।

২. আমার কপালে বিধি
এমন লিখিলা নিধি
কলমে না ছিল কালি।

৩. নৌকাঘাটে সোনারাণী একদৃষ্টে চায়।
মা বল লখিন্দর তোমার মায়ের প্রাণ যায়।

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনা ভরা প্রাণ''। তখন যে মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তার দোসর হয়ে ওঠে বিজয় গুপ্তের উপলব্ধি ঃ 'পরেরে মারিতে পরের কিবা ব্যথা'। ভারতীয় অদৃষ্টবাদিতার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন কবি দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর ''অন্নদামঙ্গল'' কাব্যে ব্যাস চরিত্রের নানা মাত্রা যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি অন্নদার প্রতি ক্ষোভ ও অভিমানে চরিত্রের অন্যরূপ প্রকাশ পেয়েছে। অন্নদা কর্তৃক ছলনায় ব্যথিত ব্যাস বলেন—''কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া''। বিজয় গুপ্তের চাঁদ সদাগর মনসাকর্তৃক প্রহৃত হয়ে বলে,

চান্দ বলে, কাণী তুই অসতীর সীমা।
চরণপ্রহারে দিলি গুরুর দক্ষিণা।।

প্রবাদ প্রবচনেও তিনি সিদ্ধহস্ত। কিছু দৃষ্টান্ত দিই—

১. বিধির নির্বন্ধ কভু না যায় খন্ডন।

২. সহজে ঘটক জাতি বড়ই চতুর।

৩. কাল পুরিলে তার কার বাপে রাখে।

৪. কার্য করিলে ভাত আছে সর্ব ঠাঁই।

৫. পণ্ডিতের বুদ্ধি টোটে আপদ সময়।

৬. ঊর্ধ্ব আঙ্গুলে কভু বাহির না হয় ঘি।

উপমা ও চিত্রকল্পগুলিও তাঁর কবিকৃতির পরিচয় দেয়।

১. কলার বাকাল হেন পদ্মার প্রাণ কাঁপে।

২. অকালের মেঘ যেন গর্জয়ে মৃদঙ্গ।

৩. জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল।।

৪. বেহুলা যেন কন্যা লখাই তেন দারা।
পাতিল জুখিয়া যেন কুমারে গড়ে শরা।।

৫. আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কতকাল।।

৬. বুড়ী বলে মোর গা করে টস্‌টস্‌।
পাকা জামিরে যেন উপাধিক রস।।

৭. সঘনে নাচে বেহুলা যেন উড়ে পাখী।
বিরষ বদন দেখি পদ্মা অধোমুখী।।

তবে বিজয় গুপ্ত চাঁদ সদাগর চরিত্রে পৌরুষ নয়, বাঙালি পিতার কোমলতা দেখিয়েছেন,

যেজন্য লখিন্দরের মৃত্যুসংবাদে তিনি হতচেতন হন। পুত্র পুনর্জীবিত হলে 'জোড় হাতে মনসার করয়ে স্তবন'। ডঃ ভট্টাচার্যের মতে, সনকা চরিত্রটি অধিক বস্তুগত ও জীবন্ত এবং "পুত্রশোকোন্মাদিনী এমন সজীব নারীমূর্তি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আর বড় সৃষ্ট হয় নাই।" তাঁর এই মন্তব্য তাই মেনে নিতে আপত্তি নেই, "তাঁহার কাব্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়া উঠে নাই, মানুষেরই বিজয় ঘোষিত হইয়াছে।"

একথা সত্য, বিজয় গুপ্তের "মনসামঙ্গল" কাব্য আজ পাঁচশ বছর পরে আধুনিক ও আধুনিকোত্তর বাঙালি পাঠকের কাছে তেমন আস্বাদ্য ও মনোরম মনে হবে না। দেব দ্বিজ ভক্তিরসাত্মক কাহিনীও একালে কেউ পছন্দ করেন না। কিন্তু, মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে যে সাধারণ সত্য আছে তা নির্দিষ্ট দেশকালের নয়। সেইজন্যই মঙ্গলকাব্য এখনো পড়া হয়; পাঠ্যতালিকা থেকে তাকে বাদ দেওয়া যায় না। কি সেই সত্য? মনসামঙ্গল পাঠে (নানা পাঠান্তর সত্ত্বেও) আমরা দেখি, সেখানে আছে—

১. দেবতার সঙ্গে মানুষের অসম দ্বন্দ্ব
২. দেবতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ
৩. বাঙালি জীবনচর্চা ও সংসারের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ
৪. দাম্পত্য প্রেমের জয়গান

আর তাই, তার আবেদন মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগেও সচল থাকে। রামায়ণ মহাভারতের আদর্শের পর বাঙালি পেয়েছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আখ্যান কাব্য। যার মুখ্য বিষয় অবৈধ ও সমাজ অননুমোদিত প্রেম। বৈষ্ণব পদাবলী তারই রসকাব্য। একমাত্র মঙ্গলকাব্যে এসে বাঙালি খুঁজে পেলো তার চেনা সমাজ, সংসার ও জীবনযাত্রাকে। প্রেম ভালোবাসা নিয়ে স্বেচ্ছাচার নয়, একনিষ্ঠা, পাতিব্রত্য (যা সীতার মধ্যে ছিল) তাদের অনুপ্রাণিত করল। অন্যদিকে, দৈবাহত মধ্যযুগে প্রাণ যা চায়, তা করতে না পারার যন্ত্রণা শান্তি পেলো চাঁদ সদাগরের ক্ষোভ প্রতিবাদ ও অসম যুদ্ধে। ইচ্ছাপূরণের এই কাহিনী পাঠককে উজ্জীবিত করেছিল। যার চরম পরিণতি পাই ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে। যেখানে দেবতার গায়ে ধুলো মাটি ছাই নিক্ষিপ্ত হয়। রচিত হয় নতুন যুগের 'নূতন মঙ্গল' কাব্য।

আধুনিক দৃষ্টিতে যদি বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্য পড়ি, তো দেখব, সেখানে স্ট্রাকচারালিজম বা গঠনবাদ/আকরণবাদের ভূমিকা আছে। ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর ভাষার মধ্যে যে দ্বিবাচনিকতা ও দ্বিস্তর দেখেছেন, তার একটি Surface Structure; অন্যটি Deep Structure। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রচলিত কাহিনীর অন্তরালে আছে সেই গহন গ্রন্থনা, যার নাম : মানব মহিমা। আপাতভাবে মনসা বিজয়িনী; কিন্তু তা Surface মাত্র। গভীরে আছে চাঁদ সদাগরের জয় তথা মানুষের গৌরব। এরি পাশে আমরা ভাবতে পারি বিশিষ্ট আখ্যানতত্ত্ববিদ্ টোডোরভের পাঁচটি বিকল্প-র কথা। যেখানে তিনি দেখান ১) সবাই শান্তিতে আছে, ২) শত্রুর আক্রমণে/আগমনে সেই শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে ৩) ফলে যুদ্ধ, সংঘাত শুরু হয় ৪) শত্রু পরজিত ৫) পুনরায় ফিরে আসে শান্তি ও সমতা। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য পাঠেও আমরা দেখি সপরিবারে চাঁদ সদাগর সুখে শান্তিতে আছেন। কোন একদিন মনসার পুষ্প বনে চাঁদ গেলে সাপেরা ভয় পায় ও পালিয়ে

যায়। সর্পাভরণ ভূষিতা দেবী মনসা বিবস্ত্রা হন ও ক্রোধে শাপ দেন। এরপরই শুরু হয় চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্ব। মনসার শত্রুতায় বিপর্যস্ত হন চাঁদ। শৈব চাঁদকে তবু বশীভূত করা যায় না। অবশেষে বেহুলার উদ্যোগে লখিন্দর প্রাণ ফিরে পেলে, চাঁদ মনসা পূজায় রাজি হন। সঙ্ঘাত ও বিরোধ থেমে যায়। ফিরে আসে শান্তি, সুখ। অপহৃত সম্পত্তি, সপ্তডিঙা ও মৃত পুত্রদের ফিরে পান চাঁদ, সনকা। সনকা বলেন বেহুলাকে—

তোমার গুণে হইল মোর সকল উদ্ধার।
তোমার কারণে হইলাম শোকসাগর পার।।

আর চাঁদ সদাগর জানান—"তোমার প্রসাদে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ"। কাজেই, মধ্যযুগীয় কাব্য বলে "মনসামঙ্গল" আর পাঠযোগ্য বা আলোচনা যোগ্য নয়, এমন ধারণার আমি প্রতিবাদ করি।

অনুচিন্তন

১.

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা 'মনসামঙ্গল' কাব্য পাঠে আমরা কবির যেসব বৈশিষ্ট্য, কবিকৃতি লক্ষ করি তার উল্লেখ বাঞ্ছনীয় মনে হয়। সমালোচকেরা লক্ষ করেছেন, বিজয় গুপ্ত যতই কানা হরি দত্ত বলে গালি দিন না কেন, তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। তাই ভণিতায় দুটি নাম দুভাবে পালা-গায়করা গেয়ে থাকেন—

১. কবি কহে হরিদত্ত
যে জানে পরম তত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান।

২. কবি কহে বিজয় গুপ্ত
যে জানে পরমতত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান।

কারো মতে, কবির উপাধি কবি কর্ণপুর। কিছু ভণিতার লক্ষ্যও পাওয়া যায়—

১. কবি কর্ণপুর ভণে
২. ভণে কবি কর্ণপুর
৩. ভণে বৈদ্য কবি কর্ণপুরে।

২.

জরৎকারু ও নেতা ধোপানী নাম দুটি আমাদের ভাবায়। বাসুকির বোন জরৎকারুর সঙ্গে তপস্বী জরৎকারুর বিবাহ হয়েছে ও তাঁদের পুত্র অস্তিক ('অস্তিক মহামুনি পদ্মার নন্দন')। ড. সুকুমার সেন মনে করেন জরাগ্রস্ত বিশ্বকর্মা যাঁকে তৈরি করেছিলেন তিনিই জরৎকারু। মনসাকেও জরৎকারু বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে জগৎ করেন যিনি, বা জগৎস্রষ্টা রূপে কি 'জরৎকারু' নামের ব্যুৎপত্তি ভাবা যায়? মনসাও তো নিজস্ব জগৎ তৈরি করে ছিলেন। সর্পদেবীরূপে পূজা আদায় করেছিলেন।

নেতা ধোপানীর নামের উৎস ঃ মোছার জন্য টুকরো কাপড় ন্যাতা বা নেতা। শিবের চোখের জল থেকে নেতার জন্ম। জল মোছার জন্য ন্যাতা ব্যবহৃত হয়েছিল। যেমন শিবের ঘাম থেকে ধামুর জন্ম। ড. সুকুমার সেন মনে করেন, নেতার কাপড়কাচা রূপক— দেহসাধনার বিষয়। যেমন, চর্যাপদে আছে। যে হিন্দী ছড়ার সূত্রে ড. সুকুমার সেন এমন ভেবেছিলেন, সেখানে পাই, 'অহর্নিশি ধোবী ধোবই ত্রিবেণীকা ঘাটি'। সেখানে চন্দ্র খুঁটি, সূর্য পাটা। কাপড়কাচা মানে দেহকে শুদ্ধ করা। মনসা যেহেতু শিবের মনসঞ্জাত, তাই কায়াসাধনার ব্যাপারটি অগ্রাহ্য করা যায় না। আমি মনে করি, সাপ প্রতীক শুধু লিবিডো নয়, কুলকুন্ডলিনীও। যা আড়াই প্যাঁচে মূলাধারে সুপ্ত থাকে। যোগ ও প্রাণায়মের দ্বারা তাকে জাগানো হয়। সে যখন সহস্রারে পৌঁছায়, সাধক পরমানন্দ লাভ করেন। সিদ্ধ হন। শিবের শিরোভূষণ সর্প (মনসা)—এই পদ্ধতি সমর্থন করে। বিষ মনসার বরে অমৃত হয়। মরা মানুষ বাঁচে। শিবও বিষমুক্ত হন। এই সব ঘটনার অন্য তাৎপর্য তো এই, কাম ও কামনার বিষ সংসারী বা বিষয়ী মানুষকে চিদানন্দহীন করে রাখে। সেই বিষমুক্তি ঘটলে মানুষ চিদামৃতপানে অমর হয়।

৩.

বিজয় গুপ্ত স্বপ্নাদেশে কাব্য লিখলেও (যা প্রথানুসারী) বিশৃঙ্খল লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তাঁর দেবী মনসা বলেন 'শিকলির মধ্যে গাইও পয়ার লাচাড়ী''। কি এই শিকলি? যা ছিকলি ও বলা হয়েছে। শিকল বা রীতিপদ্ধতি। কাব্যটিকে ধাপে ধাপে সাজাতে হবে। অগ্রজ হরিদত্তের মতো তিনি বোলেচালে ভাঁড়াতে চান না। 'কথার সংগতি নাই' কিংবা 'এক গাইতে আর গায়', এমন কান্ড তিনি ঘটাবেন না। তাই তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে থাকে ১) দেবদেবী বন্দনা, ২) মনসার কথা, ৩) ইন্দ্র বা মনসার বাগানের বর্ণনা ৪) রান্নার অনুপুঙ্খ বিবরণ ৫) ডিঙ্গা ও নৌকাযাত্রার বর্ণনা ৬) বেহুলার ভাসানযাত্রা ৭) প্রত্যাবর্তনের বিবরণ ইত্যাদি। এছাড়াও আছে ছন্দের ব্যবহার। পয়ার ও লাচাড়ী। যা আবার ত্রিপদীও। পয়ারে মিশ্রবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) ব্যবহৃত। লাচাড়ীতে কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তের প্রয়োগ দেখা যায়।

বনবাস পালা-য় মনসার সিংহাসনারূঢ়া মূর্তি ও জয়ন্তীনগর বর্ণনা পড়লে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের রাজসভা 'ভূতলে অতুল শোভা' মনে পড়ে। বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—

কনক সিংহাসন মনসার আসন অলঙ্কার অপূর্ব নির্মাণ।
মাণিক্য রত্নহার সুবর্ণের অলঙ্কার রক্ত পট্টবস্ত্র পরিধান।।
গাইনেতে গাহে গীত নাচে তাল সুললিত নানা পুষ্পগন্ধ আমোদিত।

মধুকবি এক্ষেত্রে অধমর্ণ অসংশয়ে বলা যায়। সেই সঙ্গে বিজয় গুপ্তের কবিত্ব ও কল্পনাশক্তিকে অভিনন্দন জানাতেই হয়।

৪.

যথাযথ শব্দের বিন্যাসই কবিতা এমন কথা কেউ কেউ বলেন। ভারতীয় আলংকারিকরা মনে করেন, শব্দার্থসহিতৌ কাব্যম্। আইরিশ কবি Seamus Heany মনে করেন, প্রকৃত কবিতা 'Half guessing, half expression'। যার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত পাই চর্যাপদে—সন্ধ্যাভাষায়। বিজয় গুপ্ত

আঞ্চলিক বহু শব্দ ব্যবহার করেছেন, কথ্য শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যা সেই মধ্যযুগ পেরিয়ে পাঁচশ বছর পর আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অর্থবান হয় না। বরং তার কিছু বুঝি অনুমানে এবং অভিধানে। তবু শব্দ প্রয়োগে জনজীবনের কাব্যকে জীবন্ত করে তোলার এই প্রতিভা আমাদের মনোযোগ ও সম্ভ্রম দাবি করে। কিছু দৃষ্টান্ত প্রাসঙ্গিক হবে।

> অথান্তর (গোলমাল); আচাভুয়া (অদ্ভুত); আটোপ (আচ্ছন্ন); আভ (আকাশ); উগিনগি (উঁকিঝুঁকি); উজাগর (রাত্রিজাগা); উপাধিক (অত্যধিক); উফরীফাফরী (আর্তনাদে ভরা); এড়া (গোমাংস); ওলা (নেমে আসা); কাছলা (তোরণ); কাপ (ছল); ক্ষে (ক্ষয় পাওয়া); খাখার (অপমান); গাবর (গ্রাম্য); ঘোনা (কাছে আসা চুকা (টক); ছেড়া (একধরণের নৌকা); জৌঘর (নৌকার ছইয়ের উপর ঘর); ঝিকট (গর্ভ); টেটন (বদ লোক); ঠেটা (জেদী); ডালুয়া (যে ডালে ডালে ঘোরে; বাঁদর); তখিত (পরীক্ষা); দেয়ান (সভা); নেউট (ফেরত আসা); পাঁতি (চিঠি); পাকানী (রাঁধুনি) ফাসাফুসী (ফাঁক ফোকর); বাক্যালি (কথালাপন); ভাও (ভাব); ভুনি (কাপড়); মালিম (প্রধান মাঝি) মিরাশ (দেশ); মেলানি (বিদায় গ্রহণ); সাহসালী (সাহসী); হড়পা (ছোট পেটিকা); হাতসান (হাতছানি) ইত্যাদি।

বাঙালি কবিরা পরবর্তীকালে যেসব বিচিত্র শব্দ প্রয়োগে বাংলা কবিতার পুষ্টি ঘটিয়েছেন, বিজয়গুপ্তের কাব্য তার উৎস। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল"-এ মধ্যযুগীয় এইসব শব্দ যেমন পাই, রবীন্দ্রোত্তর যুগের জীবনানন্দ দাশের "রূপসী বাংলা" কাব্যে (নীল মৃত্যু উজাগর) তেমনি লৌকিক শব্দ পাই। আবার চল্লিশের কবি রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীও এই ধরনের শব্দ ব্যবহারে উৎসাহী ছিলেন দেখা যায়। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' তাই নিছক মধ্যযুগীয় কাব্যছাঁদে বন্দী থাকে নি। তার প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য, শব্দচয়ন, অলংকরণ, ছন্দভাবনা—সবই পরবর্তী বাংলা কাব্যকে অনুপ্রাণিত করেছে। সম্ভবত কবি হিসেবে তাঁর সার্থকতা ও সিদ্ধি এখানেই নিহিত।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. বিজয় গুপ্তর মনসামঙ্গল/পদ্মাপুরাণ (বসুমতী সংস্করণ)।

২. বিশ্বাস, অচিন্ত্য সম্পাদিত 'বিজয় গুপ্তর মনসামঙ্গল' (ফেব্রুয়ারি ২০০৯, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা)।

৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (ষষ্ঠ সং ১৯৭৫, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা)।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, কনক— বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যের কথা (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৪, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং কলকাতা)।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—কালান্তর (বাতায়নিকের পত্র দ্র.)/রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯০।

৬. রায়, কালিদাস—চাঁদ সদাগর (বৈকালী কাব্য) ইউনিভার্সিটি বেঙ্গলি সিলেকসন্স্ (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৭. মুখোপাধ্যায়, তরুণ সম্পাদিত—অন্নদামঙ্গল (১ম খণ্ড)/দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৫, (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা)।

৮. মুখোপাধ্যায়, তরুণ সম্পাদিত—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী' (১ম খণ্ড), ২০০০ (সাহিত্যলোক, কলকাতা)।

৯. সেন, সুকুমার—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭০/ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা)।

১০. সেন, সুকুমার—ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থঃ বাংলা কোষ (মে, ২০০৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা)।

১১. ভট্টাচার্য, তপোধীর—প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব (আকরণবাদ)/দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০২ (অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর)।

১২. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন সম্পাদিত মেঘনাদ বধ কাব্য (২০০৮, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা)।

১৩. স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'রাজযোগ', পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৩৭০ (উদ্বোধন)।

১৪. এলমার, অ্যান্ড্রুজ/দি পোয়েট্রি অফ্ সীমাস হীনি, ১৯৮৮ (ম্যাকমিলান প্রেস, লন্ডন)।

১৫. গুয়েরিন, উইলফ্রেড, এল অ্যান্ড আদার্স/এ হ্যান্ডবুক অফ ক্রিটিকাল অ্যাপ্রোচেস টু লিটারেচার (দি প্লে অফ মীনিংস্)/ভারতীয় প্রথম সংস্করণ, ২০০৬ (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)।

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্য ঃ মেয়েরা যেখানে 'সাবঅলটার্ন' (নিম্নবর্গের মানুষ)

ঊর্মি রায়চৌধুরী

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা চিরকালই 'সাবঅলটার্ন' (Subaltern)। সংসারে পুরুষ তার 'প্রিয়' নয়, 'প্রভু'। মেয়েরা সকাতরে প্রার্থনা জানায়, "পুরুষবন্ধুটি যাতে সংসারের প্রভু হয়ে না বসে কখনও, সেই বর দাও।" (ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা গ্রন্থের 'নাচ' কবিতা/সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়) অথবা, বলতে চায়, 'পরের জন্মে অর্জুনগাছ হয়ে কৃষ্ণচূড়াকে বন্ধুর মত দেখো' (মন্দাক্রান্তা সেন) কারণ, 'বন্ধু-বন্ধু থাকা বেশ ভাল, কোনও টেনশন হয় না, যেমন দ্রৌপদী আর কৃষ্ণ। সখী দ্রৌপদীর জন্য যেভাবে যান লড়িয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ, সেরকম রাধার জন্য তো করেননি।' (কথামানবী, পৃ. ১৬/মল্লিকা সেনগুপ্ত)। 'সিমন দ্য বোভোয়ার' তাঁর 'The Second Sex' গ্রন্থে লেখেন—'The ultimate goal of love is we' তেমন কোন 'Goal'-এ নারী সাধারণত পৌঁছতে পারে না। কারণ, পুরুষ তো বলে, 'মুঠির মধ্যে আয় বালিকা, আয়রে মুঠিভর/মুঠির ভিতর স্বপ্নের বীজ মুঠির মধ্যে ঘর'। (প্রণয় প্রস্তাব/কৃষ্ণা বসু) পুরুষ কখনও নারীকে বানিয়েছে 'দেবী' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়), কখনও 'ডাইনী' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী), কখনও বা 'প্রতিমা' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)। নারী সর্বতোভাবে তার অধীন, Subaltern। তার সঙ্গে যেমন খুশি ব্যবহার করা যায়। তাকে নিজের মর্জি অনুযায়ী হাসানো যায়, কাঁদানো যায়। তাকে নিয়ে যেমন খুশি খেলা করা যায়। নারীকে হতে হবে লজ্জাশীলা, পরনির্ভরশীলা। রাসসুন্দরী দেবী তাঁর কর্তার ঘোড়াকে দেখে লজ্জা পেতেন। যেহেতু সে কর্তার ঘোড়া, তাই তার সামনে বেরোতে চাইতেন না। (আমার জীবন/রাসসুন্দরী দেবী)।

মেয়েদের প্রগতিশীলতাকে সমাজের কোন স্তরের মানুষই সহ্য করতে পারতো না। বিলেত থেকে ফেরার পর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে গবর্নমেন্ট হাউসের পার্টিতে নিয়ে যান। সরলাদেবী চৌধুরাণী জানান—কর্তাদাদামশায় বাধা দেয়নি....দেউড়ি দিয়ে হেঁটে মেজমামী যখন গাড়িতে চড়ছিলেন, বাড়ির পুরাতন ভৃত্যদের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছিল। (জীবনের ঝরাপাতা, সরলাদেবী চৌধুরাণী।) গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভক যখন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের নাম দেন, 'Can the subaltern speak?' তখন সেই বহুব্যবহারে জীর্ণ হয়ে আসা প্রবাদপ্রতিম পংক্তিটিই আমাদের মনে পড়ে যায়—"বদন থাকিতে বলিতে না পারে/তেঁই সে অবোলা নাম।"

এবার 'Subaltern' শব্দটিকে সামান্য বিশ্লেষণ করা যাক। 'Subaltern' শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। রণজিৎ গুহ এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'নিম্নবর্গ'। অ্যারিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্রে 'Subaltern'-এর অর্থ 'এমন একটি প্রতিজ্ঞা যা অন্য কোনও প্রতিজ্ঞার অধীন, যা বিশিষ্ট, মূর্ত, সার্বিক নয়। সাধারণ অর্থে ইংরেজিতে এর সমার্থক শব্দ হল 'সাবর্ডিনেট''।

ইতালির কমিউনিষ্ট নেতা ও দার্শনিক 'আন্তোনি ও গ্রামশি'-র (১৮৯১-১৯৩৭) 'কারাগারের নোটবই' গ্রন্থে 'Subaltern' শব্দটির দুটি ব্যাখ্যা আছে। সাবলটার্ন (ইতালীর সুবলতের্ণো) শব্দটির প্রথম অর্থ 'প্রলেটারিয়াট'। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাবলটার্ন শ্রেণী হল শ্রমিকশ্রেণী। এই অর্থটিকে

আমরা আমাদের প্রবন্ধে গ্রহণ করছি না। দ্বিতীয় অর্থটিকে গ্রহণ করছি। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ছাড়াও শ্রেণী বিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বে ও 'সাবলটার্ন' শ্রেণীর কথা বলেছেন গ্রামশি। ''স্পষ্টতই এখানে 'সাবলটার্ন'-এর অর্থ শিল্পশ্রমিক শ্রেণী নয়। বরং যে কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবিন্যাসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উঠছে এখানে। এই বিন্যাসকে গ্রামশি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণী, অপর মেরুতে যারা অধীন সেই 'সাবলটার্ন' শ্রেণী।''[২] এখানে বলে রাখা ভালো, অনেকসময় গ্রামশি কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, শাসন প্রভৃতি শব্দকে সমার্থক শব্দের মত ব্যবহার করেছেন।

ডমিন্যান্ট শ্রেণী বা উচ্চবর্গ হিসাবে আমার প্রবন্ধে পুরুষকে দেখা হয়েছে এবং সাবলটার্ন শ্রেণী বা নিম্নবর্গ হিসাবে মেয়েদেরকে দেখা হয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'পুরুষশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ।''[৩]

তিনি আরও বলেছেন, 'কিন্তু উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ সম্পর্কের মধ্যে দুটি চেতনার স্বাতন্ত্র্য ও যেমন সত্য, উচ্চবর্গের প্রভুত্ব ও নিম্নবর্গের অধীনতাও তেমনি সমানভাবে সত্য। অর্থাৎ নিম্নবর্গের চেতনা স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন। অধিকাংশ সময়ই নিম্নবর্গকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই যেন সে চলে।''[৪] আমাদের সমাজে পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের মধ্যে এই জিনিষটিকেই আমরা ধরবার চেষ্টা করবো। অবশ্যই মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যের জগতে। প্রসঙ্গত একটি কথা জানিয়ে রাখা দরকার। 'Subaltern Studies'-এ 'Absence of Gender question'-এর কথা প্রথম বলেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভক এবং ও. হ্যানলন (O. Hanlon)।[৫]

মেয়েরা সংসারে Marginised। তারা আমাদের সমাজের প্রান্তিক মানুষ। মূলত, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই বলেই মেয়েরা Subaltern হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক কারণেই সমাজে পুরুষের আধিপত্য (Hagimony) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছিরু পাল, শ্রী হরি ঘোষ হয়ে যায়, যখন তার অর্থনৈতিক আধিপত্য বাড়ে। (গণদেবতা/তারাশঙ্কর)। মেয়েদেরকে সতী করা হয় তার সম্পত্তির জন্য। নানা সামাজিক প্রথার মূলে আছে সম্পত্তি (Property)। নারী তো আজন্ম Subaltern। ''জাত যে পিঞ্জরে, আকাশে ভয় তার/খাঁচাতে ফিরে যেতে রাজি সে সুতরাং।'' (নবনীতা দেবসেন) নারীকে Subaltern বানিয়েছে পুরুষতন্ত্র। "One is not bcm but rather becomes, a woman... it is civilization as a whole that produces the creature." (সিমন দ্য বোভোয়ার/The Second sex)।

মহিলা বিমানচালিকা, মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড় আমরা বহুদিন আগেই পেয়েছি। পেয়েছি মহিলা লেফটেন্যান্ট। চালু হয়েছে 'Nightclub Culture'। কিন্তু মেয়েরা আজও ভোগ্যপণ্য, বিজ্ঞাপনে শোষিত, প্রধানত নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজে ও নিম্নবিত্ত সমাজে নারী আজও সাবঅলটার্ন। এবার আমরা মহাশ্বেতাদেবীর হাত ধরে তাঁর আঁকা Subaltern মেয়েদের জগতে প্রবেশ করি। মহাশ্বেতা আমাদের কখনও নিয়ে গেছেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে, আবার কখনও নিয়ে গেছেন মধ্যযুগে, আবার কখনও বা নিয়ে এসেছেন আধুনিক যুগে। কখনও উচ্চবিত্তের সংসারে, কখনও নিম্নবিত্তের সংসারে। পরিচিত করিয়েছেন নানা অঞ্চলের নানারকম প্রথার সাথে। কামিয়ৌতি বা বন্ডেড লেবার,

রুদালি, ভেঙ্কটাসনী ইত্যাদি নানা প্রদেশের নানা রকম প্রথা। একসময় আমাদের দেশে আতুরঘরে মেয়েদেরকে নুন খাইয়ে মেয়ে ফেলা হত। চীন দেশে মেয়েদের পায়ের পাতা ছোটবেলায় বেঁধে দেওয়া হত, তার সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে। তার রূপ উপভোগ করবে পুরুষ। সে ভালোভাবে চলতে নাই বা পারলো। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলি পড়তে পড়তে এসব কথা মনে আসে।

প্রথা

প্রথার নাম 'ভেংকটাসনী'।

স্থান — অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র সীমান্ত।

গল্পের নাম — 'ভেংকটাসনী ও নারীয়োঁ'।

এক আদিবাসী সম্প্রদায় (ডোমবারি)-এর বড় মেয়ে 'ভেংকটাসনী' হয়। ভেংকটেশ্বর দেবের সঙ্গে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তার বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পর মেয়েটি সাতদিন মন্দিরে থাকে। সেই সাতদিনে সে কৌমার্য খোয়াবে অর্থাৎ পুরোহিতরা ঐ সাতদিন তাকে ভোগ করবে। তারপর তাকে 'বাপের ঘরে' পৌঁছে দেওয়া হবে। 'তখনো ও ভেংকটসনী। ঘরে ফিরলে প্রথম দিন ওর স্বগোত্রের, পিতৃকুলের কেউ ওকে ভোগ করবে তারপর থেকে ও আলাদা ঘরে থাকবে। গ্রাহক নেবে। রোজগার দেবে বাপকে। তারপর বুড়ো হতে সুরু করলে, 'বাজারে ঘর নেবে। বাজারু মেয়ে হবে।'

লেখিকার মনে হয়েছে, এ প্রথা আজকের পৃথিবীর নয়। এ যেন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর। "ছিলাম সেই সময়ে, যখন পৃথিবীতে মানুষ মশাল জ্বেলে অন্ধকার তাড়াত। এ ছাড়া ছিল চাঁদ, সূর্য, তারার আলো। আমি একটা গভীর গহনে ঢুকে পড়ি।

যাকে ভেংকটাসনী করা হবে, তাকে বলে কনকাম্মা। তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়েটি, যার বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা। মাথায় তেল জবজবে চুলে বেণী। রাঙা চেলী কাছা দিয়ে পরা। তাকে দেখে লেখিকার মনে হল, নাকে দড়ি বেঁধে কেউ মোষের বাচ্চাকে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। ওর চাহনি এমন বোবা, এত অসহায়। তখনি আমার মনে কি যেন বিঁধে যায়। অসীম সহানুভূতি সম্পন্ন লেখিকার অন্তর নিঙড়ে কথাগুলি উঠে এসেছে।

যার মেয়ে ভেঙ্কটাসনী, সমাজে তার খুব সম্মান। "এই কনকাম্মাই সমাজেও সম্মান পাবে। দশ বছরে ছিবড়ে হয়ে যাবে। যে কোন লোক ওর ঘরে ঢুকবে। কনকাম্মা পয়সা কামাবে, ওর বাপ ভাই নেবে।" সরস্বতী দাম্‌লের বকলমে লেখিকার ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে।

গল্পের নায়িকা সরস্বতী দাম্‌লের মুখে লেখিকা স্বয়ং যেন সমাজের সমালোচনা করেন। "না হেমাজী, শুধু ধর্ম নয়। প্রতি কনকাম্মার পিছনে থাকে ব্যবসা, মুনাফা, টাকা বানাবার রাজনীতি। মেয়েরা সেখানে কাঁচামাল।"

লেখিকার এই প্রথার প্রতি প্রতিবাদ লক্ষ্য করি। গল্পের নায়িকা এক না-বালিকা না-কিশোরী কনকাম্মার সারা গায়ে কালসিটের দাগ দেখে তাকে মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পরেছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব এ গল্পেও উপস্থিত। কাহিনীর শেষে তাই গল্পের নায়িকা হেমাবতীজীকে জানিয়ে দেয়, "আপনি আমার রোলমডেল থাকলেন না, দেখব উত্তর ভেঙ্কটাসনী পর্বের সামান্য সূচনাও করতে পারি কি না।"

এত আইন, জাতীয় মহিলা কমিশন, সে কাদের জন্য? তা ডোমবারি আর মহারাষ্ট্রের কোলাটি মেয়েদের জন্য নয়। এ প্রথা তুলে দিতে চাইলে বিশাল দাঙ্গা যুদ্ধ বাধবে। এতো লক্ষ বছরের প্রথা। পত্রিকা যার, সেই হেমাজী অবিচলিত। বিচলিত নয় কনকাম্মা। প্রতিবাদে সোচ্চার এই দুই এর মধ্যে অবস্থিত মধ্যশ্রেণীর সরস্বতী দামলে। সে আর হেমাজীর পত্রিকার সাংবাদিকতা করবে না। কনকাম্মার খবর আনতে সুদূর অন্ধ্রে পাড়ি জমাবে না।

মহারাষ্ট্রের কোলাটি অধিবাসীদের কথাও এ গল্পে আছে। কোলাটি মেয়েরা ফর্সা, সুন্দরী। পারতপক্ষে বাবা তাদের বিয়ে দেয় না। "নাচ, গান শেখায়। ঋতুস্রাবের পর পাঁচজনকে ডেকে মেয়েকে নিলামে তোলে। বাপকে এত এত টাকা দাও। সর্বোচ্চ দর দেবে যে, সে মেয়েকে নিয়ে যাও। যখন ক্রেতার মন উঠে যায়, অথবা মেয়ের মন বসে না বাপ তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। আবার তাকে তোলো নিলামে। কোলাটি মেয়েদের চাহিদা খুব।" কোলাটি মেয়েরাও তো Subaltern. মেয়েকে নিলামে তোলে বাবা। মেয়েদের মনের অবস্থা কেমন হয়?

"আত্মজনের চোখেও পণ্যছায়া
জল কাটে বুকে নিলাম, নিলাম ডাকে।"

(অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)।

যশবন্তী

এই 'যশবন্তী' গল্পে আমরা রাজস্থানের একটি প্রথার কথা জানতে পারি। রাজার ঘরের সঙ্গে প্রজার যোগাযোগ হওয়া এবং রাজার সঙ্গে প্রজার স্ত্রীর সন্তান হওয়ার এক অদ্ভুত প্রথার কথা বলেছেন লেখিকা। এইসব সন্তানদের বলা হয় ক্ষেত্রজ পুত্র আর তার ফলে মেয়েটির পতিকুল উচ্চ সম্মান পায়। শ্যামগড়ের রাজা কুঁয়ার সাহেব রাঠোর। নবলের পিতৃবংশ শ্যামগড়ের প্রজা। নবলের স্ত্রী যশবন্তী অসাধারণ সুন্দরী। নবলের বাবা কুঁয়ার সাহেবকে নেমন্তন্ন করে নিজের বাড়িতে আনলেন। কুঁয়ার সাহেব সরাসরি জানান, যশবন্তীকে তাঁর খুব ভালো লেগেছে। তিনি যশবন্তীকে অজস্র সম্পদ ও সম্মান দিতে চান। তার শ্বশুর রাজী না হওয়ায় যশবন্তীকে জোর করে ধরে নিয়ে যান কুঁয়ার সাহেব। এরপর যখন যশবন্তী শ্বশুরবাড়ি ফিরে এল, তখন শ্বশুর তাকে সামান্য ভর্ৎসনাও করলেন না। "তারপর কয়দিন ধরে নাকি হাজারটা যাগযজ্ঞ, পূজা হোম চলল। দলে দলে সবাই দেখতে এল যশবন্তীকে। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল যশবন্তী। কাঁদতেও ভুলে গেল সে। একটা জান্তব কৌতূহলে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল মেয়েরা। বৌরা জিজ্ঞাসা করল রাজা সাহেবের ঘরকন্না কিরকম? এরপর শ্যামগড় থেকে প্রচুর অলঙ্কার এল। এত জমি মিলল যে নিজেই ছোটখাটো সরদার বনে গেলেন ঠাকুর সাহেব।"

এরপর জানা গেল, যশবন্তী সন্তানসম্ভবা। স্বামী নবল কিন্তু তাকে ক্ষমা করল। স্নেহে, প্রেমে, সেবায় সমস্ত সময় নবলের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিল যশবন্তী। কিন্তু, মধ্যরাত্রে নবলের চোখে জেগে ওঠে এক বিজাতীয় বিদ্বেষ। আচমকা জেগে উঠে যশবন্তী দেখে, নবল তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। "দেখে চাবুক খেয়েছে মনে মনে যশবন্তী। তাদের সযত্নে গড়ে তোলা সুখশান্তির দিন কটা ভেঙে গিয়েছে এক নিমেষে।"

এই দ্বন্দ্ব আর বিদ্বেষের মাঝে সন্তান জন্মাল। নবজাত ছেলের জন্য কুঁয়ার সাহেব এক লাখ টাকা দিলেন। মাসে পাঁচশো টাকা করে বৃত্তি দিলেন। নবল এবার পরিপূর্ণভাবে যশবন্তীকে ঘৃণা করতে শুরু করল। দাম্পত্য সম্পর্ক গেল বিষিয়ে। নবল যখন অতিমাত্রায় মরফিয়া খেয়ে আত্মহত্যায় ঝুঁকেছে তখন যশবন্তী স্বামীর মৃত্যুতে মুক্তি খুঁজছে। ডাক্তারের সঙ্গে যশবন্তী পালাতেও চেয়েছে।

গল্পের অন্তিম অংশে নবলের চৈতন্যের উদয় হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, "কী যন্ত্রণা পেয়েছে যশবন্তী, কটা বছর ধরে। কুঁয়ার সাহেব অত্যাচার করেছে, তার কলঙ্ককে জয়ধ্বনি দিয়ে পুজো করেছে সমাজ-বলেছে ক্ষেত্রজ পুত্রের মায়ের সৌভাগ্যের শেষ নেই। আর আমি? আমি করেছি অবিচার।" কাহিনীর শেষে দেখি, কুঁয়ার সাহেবের দেওয়া টাকায় যশবন্তী একটি হাসপাতাল খুলেছে। লেখিকা যশবন্তীর সারা জীবনের দহন চিত্র দেখালেন। যশবন্তী তো Subaltern. এভাবে অজস্র যশবন্তীই আমাদের সমাজে দগ্ধে মরে। তারা কি কখনও বলতে পারে, নিজের সমস্যার কথা। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভক যথার্থই বলেন, "Can the Subaltern Speak?"

দৌলতি

'দৌলতি' গল্পে যে প্রথাটির কথা বলা হয়েছে, তার নাম 'কামিয়ৌতি' বা 'বন্ডেড লেবার'। এ গল্পের পটভূমি পালামৌ।

কামিয়া, সেও কিয়া, বেঠবেগার—এ সবই দাসমজুরদের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

'দৌলতি' সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী বলেন—"কাহিনির উৎস ১৯৮০-র দশকে, যখন আমি বন্ডেডলেবার বা ঋণবদ্ধ দাসমজুর প্রথার কথা জানি, পালামৌয়ে তা দেখে সংগঠন ও প্রতিবাদের ব্যাপারে জড়িয়ে পাড়ি।"[৬]

দাসমজুর প্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৭৬-এ পাশ হয়েছে, কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। "মূল ঘটনায় ওই ঋণবদ্ধ মেয়েটির শরীর ব্যবহার করে ঋণের টাকা তোলার রীতি—তখন ছিল হিমালয়ের পাদদেশে জৌনসার বাওয়ার অঞ্চলে। সে অর্থে ওই যৌনতার শিকার করে ফেলার কাহিনি সর্বৈব সত্য"।[৭] (মহাশ্বেতা দেবী)।

'দৌলতি' নামের একটি হরিজন মেয়ের যন্ত্রণাময় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'দৌলতি' গল্পে। মেয়েটি মাত্র তিনশো টাকায় বিক্রি হয়ে যায় এক ব্রাহ্মণের কাছে। ব্রাহ্মণটির নাম পরমানন্দ মিশ্র। সে দৌলতির বাবাকে জানায় যে, সে দৌলতিকে বিয়ে করবে। দৌলতির মা ভাবে, "খেতখামার থেকে আমাদের বউ মেয়ে তুলে নিয়ে যায় মালিক মহাজন চিরকাল। বামুন কবে আমাদের মেয়ে বিয়ে করে? বিছানায় ওঠায়, তাও তো ঘরের বাতি নিভিয়ে। মুখ দেখলে পাপ হবে। বিয়ে। এ যে আশ্চর্য কথা হয়ে গেল মা।" হরিজনের মেয়েকে ব্রাহ্মণ কেন বিয়ে করবে? ৩০০ টাকার বিনিময়ে দৌলতির বাবা কামিয়ৌতি দলিল ফেরৎ পেল মুনাবর সিং চন্দেলার কাছ থেকে। দৌলতির বাবা ছিল মুনাবরের কামিয়া। এখন সে কামিয়ৌতির হাত থেকে মুক্তি পেল। পরমানন্দ দৌলতিকে নিয়ে তুলল একটি খাপরার ঘরে। বিয়ের স্বপ্ন বুকে নিয়ে দৌলতি এল। এরপর, সে হয়ে গেল এক যৌনকর্মী। লাটিয়া নামক ধনীব্যক্তির বাঁধাধরা রক্ষিতা।

রামপিয়ারী বলে—"এ জানোয়ার বলে, সাদি করব, সাদি করবে দুসাদ, গঞ্জু, ধোবি, চামার,

পারহাইয়া, মেচাকে? ব্রাহ্মণ? যারা হরিজন পুড়ায়? কামিয়া করবে বলে ধরে আনে ....তোদের কামাই খাবে এখন ....কাঁদছিস কেন? কাঁদিস না। ....আমাকেও তো ধরে এনেছিল একদিন। ....কামিয়ৌতি এর নাম। তোরা সবাই পরমানন্দের কামিয়া।" এখানে ধীরে ধীরে উদঘাটিত হল কলাবতী, সোমনীদের করুণ জীবন কাহিনী। "যে সমাজব্যবস্থা টেড়া নাগাসিয়াকে কামিয়া বানায়, সে তো পুরুষের তৈরি। তাই দৌলতিকে, সোমনিকে, রেওতীকে পুরুষের মাংসের ক্ষুধা মেটাতে হয়। নইলে পরমানন্দ টাকা পায় না।"

রামপিয়ারীর কথা ভয়ার্ত চিত্তে শোনে দৌলতি। লাটিয়ার নাকি কলাতীর উপর খুব মন পরেছিল। "তাও দুমাসেই পেট হল। ওষুধও দিলাম। কিন্তু ওষুধ ছিল কড়া। তিনদিনের দিন জলের মতো রক্তস্রাব, আমি ছুটলাম কবিরাজের কাছে। এর মধ্যে লাটিয়া মদ খেয়ে বেহোঁশ হয়ে ঢুকে গেল কলাবতীর ঘরে।

— তারপর?

— মরে গেল মেয়েটা। থানা পুলিশও হল। লাটি য়াজি টাকা দিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেলল।

— মরে গেল?

— হ্যাঁ হ্যাঁ ভয় পাস না। সবাই কি মরে?

নারীর প্রাণের কোন মূল্য নেই। পুরুষের দুদন্ডের প্রমোদ জোগাতে গিয়ে তার অপমৃত্যু হল। এই মেয়েটা কি Subaltern নয়?

এরকম অজস্র অত্যাচারের কাহিনী পেরিয়ে আসি আমরা।

দৌলতি ভাঙা মেলা দেখতে গিয়েছিল বলে তাকে ভীষণ মেরেছিল লাটিয়া। লাটিয়া তাকে একচেটিয়া করে রেখেছে।

পরমানন্দ বলে—'টাটকা আনকোরা হরিজন ছুঁড়ি চেয়েছিল, তাতেই দুমাসে দেড়হাজার টাকা দিয়েছে। বেচাল বজ্জাতি করে ওকে ভাগাবি?

দেড় হাজার টাকা?

দৌলতি চমকে উঠেছিল। দেড় হাজার টাকা কত টাকা?

সোম্‌নী বলেছিল তিনশো টাকা পাঁচবার শোধ হয়ে গেছে ও টাকায়। এক হাজার টাকায় দশবার একশো টাকা থাকে।"।

দৌলতি পরমানন্দের পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে বলেছিল, "দেওতা। তোমার সে তিনশো টাকা তো পাঁচবার উসুল হয়ে গেছে। তুমি আমাকে খালাস করে দাও তবে?" দৌলতি জানে "কামিয়ৌতি ধার তো কখনও মিটে না।" পরমানন্দ জানায়, "সময় হলে খাসাল পাবি।"

লাটিয়ার হাত থেকে সিংজির হাতে। এভাবে অনেকবার হাত বদল হতে হতে আর গাহক নিতে নিতে একদিন দৌলতি যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হল। মাটির হাঁড়িতে সে খায়। সকলে তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে। এরপরেও গাহক নিতে হবে না, সেই নিশ্চিন্ততায় তার শরীর ঝেঁপে জ্বর এল। হাসপাতাল তাকে ফেরৎ দিল। বলল, শহরের বড় হাসপাতালে যেতে। দৌলতি ভাবল, সে মা

বাপের কাছে 'সেওরা' যাবে। যক্ষায় ঝাঁঝরা শরীর, যৌন ব্যাধির ক্ষত সর্বাঙ্গে, স্রাবে বিকট দুর্গন্ধ। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত দৌলতি এক জায়গায় শুয়ে পড়ল।

'দৌলতি কাহিনীর শেষে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। স্বাধীনতা দিবসে মাটিতে আঁকা ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর শুয়ে 'কামিয়া রেন্ডি' চোখ বুঁজলো। ঘটনার প্রতীকী ব্যঞ্জনা 'বিরাট প্রশ্ন হয়ে আসে অনবদ্য গদ্যে'। ''আঙিনায় গত বিকেলে সযত্নে প্রথমে লাইন কেটে, তারপর চকগোলা ঢেলে যে ভারতের ম্যাপ আঁকা হয়েছিল—সেটা ঘিরে বেশ কিছু লোকের ভিড়। স্বাধীনতা দিবস আজ,....

আসমুদ্র হিমাচল ভারত-উপদ্বীপের সবটুকু জুড়ে হাত-পা চিতিয়ে পড়ে আছে বনডেড লেবার, কামিয়া রেন্ডি দৌলতি নাগেসিয়ার নির্যাতিত, যৌনব্যাধিগলিত শব, ঝাঁঝরা ফুসফুসের সবটুকু রক্ত বমি করে।

আজ পনেরোই আগষ্ট, স্বাধীনতা পতাকাদন্ড প্রোথিত করার একটু জায়গাও দৌলতি মোহনদের ভারতবর্ষে রাখে নি। মোহন এখন কি করবে? ভারত জোড়া হয়ে দৌলতি।''

সতী

মহাশ্বেতা দেবী এ উপন্যাসে 'সতী' Image টিকে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন। মাত্র চার বছর সংসার করেছিল মলিনা। তার কম্যুনিষ্ট স্বামী বিজয় মিশ্র কি মানুষ ছিল? স্ত্রীকে সে কখনও মর্যাদা দেয়নি।

বামপন্থী আদর্শ যে ভারতীয় পুরুষকে তার দম্ভ ও কর্তৃত্বের অহঙ্কার থেকে টলাতে পারে না, তার নিদর্শন বিজয় মিশ্র।

সীতেশের কথায়—

''কম্যুনিষ্ট পরিবার, আলোর নিচে এত অন্ধকার। বিজয়বাবুর চেয়ে কাকাবাবু অনেক মুক্তমনা। আর তোমার আছে তিলে তিলে আত্মদানের মোহ।''

''চিরন্তন....ভারতীয়....সতী! তোমাকে দেখেই বুঝেছি এদেশের মনের অন্ধকার, প্রাচীনত্ব দূর করা কত কঠিন।'' মলিনা, অর্থাৎ বিজয় মিশ্রের স্ত্রী বিবাহিত জীবনের চারটি বছর শুধু কষ্ট পেয়ে এসেছেন। যক্ষায় বিজয় মিশ্র মারা যান। চার বছরের বিবাহিত জীবনে তাঁদের তিনটি মেয়ে। বিজয় পরপর তিন মেয়ের নাম রেখেছেন বিজয়া, বিজিতা, বিজয়িনী। ''বিজিতা''-র নাম 'অমলিনা' রেখেছিলেন মলিনার বাবা। বিজয় আপত্তি জানিয়েছিল। পুরুষতন্ত্র, আধিপত্য, স্ত্রীকে দাবিয়ে রাখা, সমস্ত কিছুই বিজয়ের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। অথচ, সে লেখক ছিল এবং নারী দরদী লেখক। কিন্তু, ব্যক্তিগত জীবনে বিজয় বিশ্বাস করত, প্রতিভার ক্ষেত্রে দুনম্বরের স্থানটা নারীর জন্যে নির্দিষ্ট। রাজনৈতিক মতাদর্শ তাকে টলাতে পারেনি। একটি পত্রিকায় মলিনার গল্প ছাপা হয়। 'বিজয়ের সে রুদ্র মূর্তিটাই মনে আঁকা আছে। বিজয় লেখাগুলো ছিঁড়ছে আর বলছে, কার প্রশ্রয়ে গল্প লিখেছ? কেন ছাপিয়েছ? আমার অনুমতি নিয়েছিলে? না মলিনা, এক বাড়িতে দুজন লিখবে তা হতে পারে না।'' মলিনার প্রতিক্রিয়া—''আমি জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেলাম। বললাম, নিশ্চিন্ত থাকো। আমি আর লিখবো না। তুমিই লেখক থাকো।''

স্বামীর আদেশে সতী রমণীর মতো মলিনা কিন্তু লেখাগুলি ছেঁড়েননি। তিনি বলেন "বিজয় সেদিনই আমাকে চূড়ান্ত ভাবে হারায়।" "আমার জীবন আমার হতে দেয়নি বিজয় মিশ্র।"

আজ মলিনা ক্যান্সারে আক্রান্ত। তিনি বলেন, "আজ বুঝতে পারছি, চাপানো সতীত্বের আগুন কত ভয়ঙ্কর।" তিনি নিজেকে বলেছেন, "স্বেচ্ছা শহিদ সতী।" কিন্তু, আসলে তিনি স্বামীর ছায়ানুগামী নন। মলিনা নিজের আত্মজীবনীতে নিজেকে বিজয়ের অনুগত স্ত্রী বলে লেখেননি। "অজিত জানান, নিজের আত্মজীবনীতে মলিনা বিজয়কে ছেড়ে কথা বলেনি।" এবং "ও চায় না ওর সতী ইমেজটাই থাকুক। যা ওর নিজের তৈরি সেটা নিজেই ভেঙে দিয়েছে, ভাবতে পারো"?

পিতৃতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থাকে মহাশ্বেতা এ বইতে আঘাত করেছেন। এক আশ্চর্য চরিত্র মলিনা। জীবনের প্রথমদিকে ত্যাগের পথ মাড়িয়েও তিনি ব্যক্তিত্বের আলোকে ভাস্বর। "আদর্শ? তার নিজের আদর্শ? চাপিয়ে দেওয়া আদর্শ। চাপিয়ে দেওয়া সতীত্ব।"

এ বইটিতে সতীদাহের এক অন্যরকম ব্যাখ্যা পাচ্ছি। মলিনা বলেন, "আমার মতো যারা কেউ অভিমানে, কেউ স্বামীর ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্যে লেখা, অভিনয়, গান, সব ছেড়ে দিয়ে বিশ্বস্ত স্ত্রী হয়ে থেকে নীরবে ফুরিয়ে যায়? এরকম স্বেচ্ছাশহিদ অনেক সতী আছে।"

যারা সন্তান নিয়ে স্বামী পরিত্যক্ত, উপার্যনক্ষম নয়, সাহায্য পায় না পরিবার বা সমাজ থেকে, তারা সতী জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। জীবিত আছে, অথচ দগ্ধ হচ্ছে, এমন সতীর সংখ্যা অনেক। সারা জীবন যে সতীরা কষ্ট করে গেলেন, তারা 'আজীবন সতীদাহ হয়ে গেলেন।'

নাতনি অমার জীবনও মলিনার মত সমস্যাকন্টকিত। কালো মেয়ে অমা, মেয়ে জাতের উপর অমার বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির লোকের কি বিদ্বেষ।

অমার স্বামী দীপ্র তাকে সহ্য করতে পারে না। "অমা ওর চেয়ে বেশি উপার্জনক্ষম। ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছে দীপ্র আর রক্তের প্রাচীন সংস্কার বেশি করে জেগে উঠছে।"

মহাশ্বেতা এ কাহিনীতে পাঠকের সামনে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, ভারতে সাম্যবাদী মতাদর্শের দুর্বলতা কোথায়?

সতীরাণির ঘাট

'সতীরাণির ঘাট' গল্পেও পুরুষতন্ত্রের প্রাধান্য। ভাইপো তরুণ ভবানীশঙ্করের ভালোবেসে পছন্দ করা পাত্রীকে দেখতে গিয়ে বিয়ে করে ফেললেন কাকা প্রতাপ রায়। তারপর, সেই মেয়েটি হাসতে ভুলে গেল।

"প্রতাপ কোনদিন পুরুষ হয়ে ওঠেন—তুমি হাসতে পারো না? হাসতে পারো না, কথা কইতে পারে না? এত কি দম্ভ তোমার? এত এনে দিয়েছি, তবু তুমি খুশি না?" মনে পড়ে যায় সিমোন দ্য বোভোয়ার উক্তি—'She is her husband's prey'।

ভাইপো ভবানী যখন 'সতী' নামক ঐ মেয়েটির সাথে আবার প্রণয়ে লিপ্ত হল, তখন তা কাকার নজরে পড়ল। সড়কি এনে দুজনকেই শেষ করে দেবেন বলে ঘর থেকে বেরোলেন তিনি। পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালেন প্রতাপ। মৃত্যুকালে বলে গেলেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ভবানী পাবে এবং তাঁর সঙ্গে সহমরণে যাবেন ছোট বৌ সতী। ভবানী দারোগাকে ডেকে আনতে গেলে সেই

ফাঁকে সতীকে জোর করে চিতায় তোলা হল। ঐ ঘাট আজ সতী রাণীর ঘাট। মহা সমারোহের সঙ্গে ঐ পুণ্যঘাট পূজিত হয়। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও সামান্য অলৌকিকতা মিশিয়ে লেখিকা এক Subaltern-এর কাহিনী পরিবেশন করলেন।

ময়নাসতী অথবা একটি অলৌকিক কাহিনী

এ গল্পে শ্বশুর বৌমাকে হত্যা করে সতীর মন্দির স্থাপনের স্বপ্ন দেখেন। প্রথম থেকেই গোপনে তিনি সতী রূপ কানোয়ারের ছবি দেখেন।

কাহিনীর শেষে দেখি পিতা পুত্র ও পুত্রবধূ দুজনকে একই দিনে হত্যা করতে সক্ষম হন। মহা সমারোহে সতীদাহ হয়। শ্বশুর সতীর মন্দির বানান। অর্থাৎ বৌমাকে পণ্য করেছেন শ্বশুর। তাকে হত্যা করে, সতী বানিয়ে প্রচুর টাকা লুটেছেন। গ্রামের চেহারাই বদলে যায়, ময়না সতীর কারণে। সমাজের যূপকাষ্ঠে একটি নারীর নীরব আত্মদান।

'সতী' Image নিয়ে মহাশ্বেতার অনেকগুলি কাহিনী পাওয়া যায়।

দেওয়ান খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনী

এ গল্পেও খইমালাকে সতী করার চেষ্টা হয়। সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করা জন্য। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত খইমালা পালায়।

শৃঙ্খলিত

এ উপন্যাসে সতী সম্পর্কিত কিছু কথা আছে। 'শৃঙ্খলিত' উপন্যাসে রামমোহন বিদ্যাসাগর নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, এমন এক প্রগতিশীল ঔপন্যাসিকের মেয়ে বুবুর কাহিনী পাই। বুবু রবীন্দ্র সংগীতের জগতে একটি প্রিয় নাম। কিন্তু, তাকে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা পুড়িয়ে মারে।

বুবুদের বাড়িতে একটি ফলক ছিল। অষ্টাদশ শতকে সহমৃতা এক নারীর। এ উপন্যাসে দেখি, বিনয় সেন, বুবুকে অতনুর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী নন। আবার, বড় মেয়ে শুধু মুসলমান ছেলে বিয়ে করেছে বলে বাবা বিনয় সেন মানতে পারেন নি। যদিও তিনি প্রকাশ্যে বলেন, জাতপাত মানি না।

বিনয় সেনের ঘরে সতীদাহের যে ফলকটা আছে, সেটা ভাঙলে নাকি দেয়ালটা ধ্বসে পড়বে। অর্থাৎ বাইরে আধুনিক ভাব দেখালেও বিনয় সেন মনে প্রাণে সেকেলে ও সংস্কারাচ্ছন্ন। শ্বশুর বাড়িতে বুবুর মত শান্ত, নরম মেয়ের উপর নেমে আসে অত্যাচার। চিরাচরিত Subaltern-এর কাহিনী।

রুদালী

অভাবে, দারিদ্রে শনিচরীর চোখের জল শুকিয়ে যায়। শাশুড়ির মৃত্যুতে, স্বামীর মৃত্যুতে, ছেলের মৃত্যুতে সে কাঁদতে পারে না। কিন্তু, চোখের জলকে সে রুজি রোজগারের উপায় হিসাবে বেছে নেয়। অন্যের মৃত্যুতে সে কাঁদে। পয়সা নিয়ে কাঁদে। 'রুজির কান্না' তার রুদালীর দলের নানা রেট। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদলে বেশী রেট। মাটিতে মাথা ঠুকে কাঁদলে আরও উঁচু রেট। শনিচরী বুঝলো, কান্না বেচে খেতে হবে বলেই চোখের জল তোলা ছিল।

শনিচরীর সখী বিখনি। বিখনি মারা গেলে শনিচরী—ভয় পায়। কারণ, ওর পেশায় চোট পড়ল। "স্বামী মরল, ছেলে মরল, শনিচরী কি দুঃখে মরেছিল? দুঃখে মানুষ মরে না। প্রচন্ড শোকের পরও মানুষ ক্রমে স্নান করে, খায়। কিন্তু না খেতে পেলে মানুষ মরে যায়। শনিচরী এত শোকে যখন মরেনি, বিখনির শোকে মরবে না। দুঃখ আছে খুব, কিন্তু কাঁদবে না শনিচরী। পয়সা, চাল নতুন কাপড় না পেলে কাঁদাটা বিলাসিতা" মহাশ্বেতার এই পংক্তিগুলি অবিস্মরণীয়। কি আশ্চর্য বাস্তবতাবোধ এই শনিচরীর।

কাহিনীর শেষে দেখি, গ্রামের পতিতাদের নিয়ে তারা জনৈক জোতদারের মৃত্যুতে কাঁদতে যায়। এবং প্রচুর পয়সা উসুল করে নেয়। কারণ, ঐ জোতদার ও তার দালাল ঐ মেয়েদের অনেককে পতিতা করেছে। তাদের ক্রোধকে আজ তারা এভাবেই মেটায়। এভাবেই তারা প্রতিবাদ করে। তারা জানে, পেটের জন্য সব কাজ করা যায়। কাহিনীর শেষে রুদালীর দলের যে কান্না, তা এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ। আশাপূর্ণা দেবী, বা জ্যোতির্ময়ী দেবীর মেয়েদের মত মহাশ্বেতার মেয়েরা অন্দরমহলে আবদ্ধ থাকে না। সমাজে সর্বত্র তাদের যাতায়াত।

বাঁয়েন

'বাঁয়েন' গল্পে একটি ডোম (গঙ্গাপুত্র) মেয়ের করুণ কাহিনী পাই। তার নাম চণ্ডী। ঘটনাচক্রে তাকে বাঁয়েন অর্থাৎ ডাইনি অপবাদ কুড়োতে হয়। স্বামী ও সন্তানের কাছে না আসতে পেরে তার যে যন্ত্রণা, তার একা থাকার যে যন্ত্রণা, তাকে লেখিকা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। 'বাঁয়েন কারো মা হয়! বাঁয়েন কি মানুষ! বাঁয়েনের দৃষ্টিতে একটা গোটা গাছ অব্দি চড়চড়িয়ে শুকিয়ে যেতে পারে।" Subaltern-এর প্রতি লেখিকার সমবেদনা ঝরে পড়ে—"বাঁয়েনের চোখে জল, বাঁয়েন চোখ মুছল,....."।

কাহিনীর অন্তিমে দেখি, বাঁয়েন একটি বড় দুর্ঘটনা থেকে একটি ট্রেনকে বাঁচায়। তখন, অর্থাৎ মৃত্যুর পর গ্রামবাসী তাকে স্বীকার করে নেয়। তার ছেলে ও তাকে স্বীকার করে নেয়। তারাশঙ্করের 'ডাইনী'-র মত সমাপ্তি নয়। মহাশ্বেতা আরও এক ধাপ এগিয়ে বোধ হয় কুসংস্কারকে জয় করতে চান।

মহাশ্বেতার 'ডাইনী' গল্পেও তিনি দোষীকে পরিষ্কার চিনিয়ে দেন।

মাতৃইমেজ/শোষণ

'স্তনদায়িনী' কি মাতৃইমেজ ভাঙার গল্প? ঘরে বাইরে সবাই যশোদাকে শোষণ করেছে। দুধ-মা সে। কিন্তু, সামাজিক সম্মান পায় না। সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার' গল্পের ধনিয়াকে মনে পড়ছে।

ধনিয়ার পরিণতি বোধহয় আরও মর্মান্তিক। যশোদা ও কম যায় না। 'পঁচিশ বছরে, থুড়ি তিরিশ বছরে, যশোদা কুড়ি বার আঁতুড়ে ঢুকেছে।' যশোদা পঞ্চাশ জনকে 'ফিড' করেছে। 'যে ডাক্তার দেখছে সে, যে ওর মুখে চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নামাবে সে, যে ওকে চুল্লিতে দেবে সে ডোম, সবাই তার দুধ ছেলে। বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না। পঞ্চাশ জনকে স্তন্যদুগ্ধ খাইয়ে শেষ পর্যন্ত ডোমের হাতে দাহ হল যশোদা।

'জাহ্নবী মা' গল্পে দেখি ছেলেরা মাকে দেবী সাজিয়ে কুৎসিত ব্যবসা চালায়। মা মরে গেছেন, তবু ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য তারা সে কথা স্বীকার করতে চায় না। এটিও মাতৃইমেজ ভাঙার গল্প। 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পেও মা ছেলেকে অন্ন জোগাতে ভেক ধরতে বাধ্য হন।

যৌন নির্যাতন

চোলি কা পিছে—চটুল একটি হিন্দী গানের নাম থেকে এক গভীর সমাজ ভাবনায় আমাদেরকে উত্তীর্ণ করেন লেখিকা। এ গল্পে মহাশ্বেতা 'যৌনতা দেখান না—ওই নিপীড়নটাই দেখাবার চেষ্টা করেন কিছুটা।'[৮]

উপীন একজন পেশাদার ফটোগ্রাফারে। সে ছবি তোলে। তার স্ত্রী শীতল বিখ্যাত হিমালয় চড়িয়ে।

'গাঙ্গোর' নামক একটি আদিবাসী মেয়ের দেহসৌষ্ঠব উপীনকে আকৃষ্ট করে। সে মেয়েটির প্রচুর ছবি তোলে ও বিক্রী করে। মেয়েটি তার অনবদ্য দেহ সৌষ্ঠবের জন্য রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যায়। উপীন এরপর অন্য শহরে চলে যায়। মেয়েটি ঝরোয়াতেই থেকে যায়। এরপর পুলিশ তার উপর যৌন নিপীড়ন করে এবং মেয়েটি থানায় পুলিশের নামে নালিশ করে। এরপর মরীয়া উপেন গাঙ্গোরকে খুঁজে তার কাছে যায়। কিন্তু, আশ্চর্য উপীন দেখে,—"গাঙ্গোর চোলি খুলে ফেলে সেটা উপীনকে ছুঁড়ে মারে। দেখ, দেখ, দেখ, খড়—ভূষি নেকড়া—দেখ কী আছে। স্তন নেই। দুটি শুকনো ঘা, কুঁচকানো চামড়া, একেবারে সমতল। আগ্নেয়গিরির ক্রুদ্ধ ক্রেটার দুটি গাঙ্গোরের গলায় উপীনকে গলন্ত লাভা কুঁড়তে থাকে,—গ্যাংরেপ....কামড়ে....."ছিড়ে গ্যাংরেপ.... পুলিশ....আদালত কেস.....আবার লকাপে গ্যারেপ.....''।

"চোলির পিছনে কোনো নন্ ইস্যু নয়, পিছনে গ্যাংরেপ থাকে,—কোনো নন্ ইস্যু নয়, গণধর্ষণ থাকে, উপীন জানতে চাইলে জানতে পারত, জানতে পারত।"

সমাজে মেয়েরা সাব অলটার্ন, আর, আদিবাসী সমাজের গরীব ঘরের মেয়েরা আরও সাবঅলটার্ন। কজেই, এসব গণধর্ষণের কোন বিচার হয় না।

তেতরি কহ্যনি

'তেতরি কহ্যনি'-ও আর একটি গণধর্ষণের কাহিনী। হরিজন যুবতী তেতরি ভুইন দেখতে ভালো। জোড়া ভুরুর মধ্যে উলকি। তারই করুণ কাহিনী। তেতরি কিন্তু অত্যন্ত সংগ্রামী। তার সূর্যসম ক্রোধ। "তেতরি কোন মাপ মানতে না, সামনে মাপ ছাড়িয়ে বড় হচ্ছে।"

দ্রৌপদী

'দোপদি মেঝেন, বয়স সাতাশ স্বামী দুলন মাহি।' দৌপদি পুলিশের হাতেধরা পড়ে। নকশাল কর্মী দোপ্দি মেঝেনের ওপর প্রশাসন পাশবিক অত্যাচার চালায়। দোপদিকে জেরা করে ব্যর্থ হয়ে সেনানায়ক বলেন, "ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল'। এরপর দোপ্দি মেঝেনকে যখন নিয়ে আসার হুকুম হয়, তখন জেলে পাগলাঘন্টি পড়লে যেমন হয়, ছুটোছুটি লেগে যায়। বিস্মিত সেনানায়ক দেখেন, "সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দ্রৌপদী সোজা মাথায় হেঁটে তাঁর দিকে আসছে।"

দ্রৌপদী সামনে এসে দাঁড়ায়। 'উলঙ্গ, উরু ও যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত। দুটি স্তন দুটি ক্ষত।'

দ্রৌপদী সেনানায়ককে প্রশ্ন করে, ''বানিয়ে আনতে বলেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?''

দ্রৌপদীর হাসি সেনানায়কের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। আকাশচেরা, তীক্ষ্ন স্বরে দ্রৌপদী বলে, 'কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?''

দ্রৌপদী সেনানায়কের বুশশার্টে রক্তমাখা থুতু ফেলে। 'হেথা কে ও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লে কঁউটার কর লে কাঁউটার কর...?

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।''

ব্যঞ্জনায়, ভাবে, ভাষায় দ্রৌপদী চরিত্রটি অসাধারণ হয়ে উঠেছে। সে নিম্নবর্গের মানুষ (Subaltern) ছিল। কিন্তু, তার প্রতিবাদ, তার সাহস তাকে শেষ পর্যন্ত আর 'সাব অলটার্ন' রাখতে পারেনি। অশিক্ষিত এই দ্রৌপদি মেঝেন যেন সেনানায়ককে 'ডমিনেট' করছে। মহাভারতের 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' মিথের নবভাষ্য রচনা করেছেন মহাশ্বেতা।

শেষ কথা

'শৃঙ্খলিত' বা 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে বুবু বা ব্রতীর মা সুজাতা হলেন উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। শ্বশুরবাড়িতে তারা নির্যাতিতা। আবার, সমাজের সব থেকে নিচুতলার হরিজন মেয়ে দৌলতি কিংবা ডোমের মেয়ে 'চণ্ডী'র নির্যাতিত হবার ছবিও পাই 'দৌলতি' ও 'বাঁয়েন' গল্পে। 'সতী' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত রমণী মলিনার ছবি পাই। সমাজের সর্বস্তরের 'দাবিয়ে রাখা' নারীর ছবি মহাশ্বেতা তুলে ধরেছেন। পরিশেষে তাই বলা যায়, মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে মেয়েরা 'সাবঅলটার্ন'।

উল্লেখ পঞ্জী

১. ভূমিকা—'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস' প্রবন্ধ — পার্থ চট্টোপাধ্যায়।
গ্রন্থ—নিম্নবর্গের ইতিহাস, সম্পাদনা—গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়। (আনন্দ পাবলিশার্স) চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০৪।

২. তদেব, পৃ: ৩।

৩. তদেব, পৃ: ২০।

৪. তদেব, পৃ: ৮।

৫. P.N. 17 Chapter one— A small history of Subaltern studies.
Part–Subaltern Studies Since 1988; Multiple Circuits.
Book–Habitations of Modernity. Essays in the wake of Subaltern Studies.

৬. মহাশ্বেতা দেবী—ভূমিকার পরিবর্তে, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ১৩ খণ্ড, (দেজ পাবলিশিং) জানুয়ারি, ২০০৪।

৭. তদেব।

৮. সুমিতা চক্রবর্তী—'মহাশ্বেতা লেখক ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব' প্রবন্ধ/ছোটগল্পের বিষয় আশয় গ্রন্থ। পৃ: ২৯১ (পুস্তক বিপনি ২০০৪)।

ফিডলারের দৃষ্টিকোণে জনপ্রিয় সাহিত্য ঃ রবীন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্রের জনপ্রিয়তা

সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন থেকে আজ সারল্য সরে গেছে। মননশীল পাঠক হিসেবে আমরা মুখে জনপ্রিয় সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা করলেও অবসরে অবসাদে এর থেকেই নিই বেঁচে থাকার রসদ। বহু আগেই লেসলি ফিডলার এই বিতর্কিত বিষয়টির প্রতি আমাদের মনস্ক করেছিলেন। নির্মম সমালোচনা সত্ত্বেও আবেগঋদ্ধ মেধাবী এই অধ্যাপক জনপ্রিয় আমেরিকান সাহিত্যের নতুন পাঠে আগ্রহী ছিলেন।

'Popular Literature'-এর 'popular' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'populus' থেকে, যার অর্থ 'people' বা মানুষ। সুতরাং জনপ্রিয় সাহিত্য বা সংস্কৃতির সঙ্গে বেশি সংখ্যক মানুষের যোগ। আমরা সাধারণত মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, পেশা, আর্থসামাজিক অবস্থানের সঙ্গেই তার সাহিত্য সংস্কৃতির পছন্দ-অপছন্দকে সম্পর্কিত করি। ধরেই নিই উচ্চশিক্ষিত কোনো মানুষ সস্তা বিনোদনধর্মী সিনেমা থিয়েটার বা বই-এ আগ্রহী হবেন না। তাঁর মননকে মন্ত্রমুগ্ধ করবে কেবল বাছাই করা সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক ভাবনার ফসল। কিন্তু উল্টোটাও তো হয়। জীবনে চলার পথে এমন মানুষ-ও তো চোখে পড়ে, যে সামাজিক অবস্থান আর ব্যক্তিগত রুচির ক্ষেত্রে সমানুপাতি নয়। নীল ছবির নগ্নতায় বুঁদ হয় কোনো অধ্যাপক, আবার হরিপদ কেরাণীর মন হরণ করে কেবলই কবিতা কল্পলতা। সুতরাং জনপ্রিয় সাহিত্য আর সস্তা বিনোদনধর্মিতা কখনোই সমার্থক নয়, বরং এই সাহিত্যেই আছে জীবনের সকল উপকরণ। আমাদের সাহিত্যধারার দুই প্রান্তে আছে ঋদ্ধ সাহিত্য আর লোকসাহিত্য, মধ্যবর্তী স্থানে আছে সুবিপুল জনপ্রিয় সাহিত্য। এর বিস্তৃতি ও গভীরতা দুইই সীমাহীন, তাই আজ একে আর ভালো বা মন্দ, উঁচু বা নিচু বিশেষণে সবিশেষ করার চেষ্টা অবান্তর। সাধারণের হাসি কান্নাকে দেখিয়ে শুনিয়ে বরং এই সাহিত্যই আজ প্রদান করে কোনো জাতির অডিও ভিডিও প্রোফাইল।

শুধু তাই নয়, জনপ্রিয় সাহিত্যের আছে উপযোগবাদী মূল্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে একে সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—অশিক্ষা দূরীকরণে, স্কুলছুটদের স্কুলমুখীনতায় এবং সামগ্রিকভাবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো সঞ্জীবিত করে তোলায়। এতেই থাকে সামাজিক মানুষের যাবতীয় অভিজ্ঞতার, চিন্তার এবং জীবনধারণার সম্মিলিত যোগফল। এখানেই প্রতিফলিত হয় আমাদের পরিবেশ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। জনপ্রিয় সংস্কৃতির অঙ্গ হল আমাদের পছন্দসই সিনেমা থিয়েটার, টিভি শো, গান, খাবার, পোষাক ইত্যাদি সহ আমাদের গোটা এই সমাজব্যবস্থা। জনপ্রিয় সংস্কৃতি হল সেই আন্তর্জাতিক বিশ শতকীয় স্টাইল যা পূর্ববর্তী ক্লাসিক, গথিক, রোমান্টিক বা আধুনিক স্টাইল থেকে স্বচ্ছন্দ ও ব্যাপক এবং এটি জাতিগত, শ্রেণীগত, ভাষাগত, বর্ণগত ব্যবধান অতিক্রম করতে সমর্থ। তাই জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য আজ বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃত। এর আছে শৈল্পিক ও বাণিজ্যিক মূল্য। সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করলে বলা যেতেই পারে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি স্বল্প মানুষের ভাবনাবহ আর জনপ্রিয় সংস্কৃতি বৃহত্তর মানুষের অবসরের আনন্দ।

আজকের ভাবনায় জনপ্রিয় কোনো কিছুই তিনটি বৈশিষ্ট্যসূচক—

প্রথমত,—যা চলছে 'in', যা মান-ধাবনকারী 'pace-setter'।

দ্বিতীয়ত,—যা সাধারণ ভাষায় সহজ বিষয়কে তুলে ধরে সাধারণ মানুষের জন্য অর্থাৎ যা অ-বুদ্ধিজীবী সুলভ।

তৃতীয়ত,—যা বিশেষত বৈদ্যুতিন মাধ্যম দ্বারা সর্বত্র প্রচারিত।

আজকের জনপ্রিয় সংস্কৃতি হল আমাদের যান্ত্রিক নাগরিক সমাজের হুবহু প্রতিলিপি। যার শিকড়ের সন্ধান আছে সামাজিক চলমানতায়, অস্থিরতায় এবং উৎপাদনশীলতায়। ফিস্‌উইক কথিত জনপ্রিয় সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যগুলির আলোকেই আমরা ফিডলারের জনপ্রিয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিনে নেব।

ফিডলারের মতে জনপ্রিয় সাহিত্য হল আধুনিক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই তাঁর মতে গল্প উপন্যাসেই ছড়িয়ে আছে জনপ্রিয় সাহিত্যের সারসত্য। আসলে 'popular' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সেই সাহিত্যকে যা সকলের বোধগম্য। তাই জনপ্রিয় সাহিত্য কখনোই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং নিজের যোগ্যতাতেই এটি সাধারণের মনে রেশ রেখে যায়। এলিট সমালোচককুল অবশ্য প্রায়শই এই সাহিত্যের সহজতার কারণেই এর প্রতি বিরূপ। মনে পড়ে জাপানের জনপ্রিয় শিল্প Ukiyoe-র কথা। রঙীন কাঠের ব্লকের সাহায্যে এতে পরিচিত পণ্যাঙ্গনা ও অভিনেত্রীদের ছবি তুলে ধরা হয়। এলিটদের মনপসন্দ শিল্পকলা এটি নয়, তবে সাধারণ জাপানীদের কাছে এর আদর বেশ বেশি। মিথের প্রয়োগে সমৃদ্ধ সাহিত্যের চেয়ে পিছিয়ে নেই জনপ্রিয় সাহিত্য। অর্থাৎ এই মিথক্রিয়া উভয় ধরনের সাহিত্যের সীমানাকে সচেতনভাবেই অস্বীকার করে। মিথের আবেদনের কারণেই জনপ্রিয় সাহিত্যের মাধ্যমে সাধারণ অবুদ্ধিজীবী সমাজ-ও পুরাণপ্রসঙ্গ জেনে যায় বিশেষ কিছু শিখে ফেলার তাগিদ ছাড়াই। যেমন করে টিভির রামায়ণ মহাভারত ভারতের অশিক্ষিত সমাজকেও আমাদের পৌরাণিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সুপরিচিত করে তুলেছিল। একইভাবে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বিজ্ঞানের জটিলতা থেকে বহু দূরে থাকা মানুষকেও আকর্ষণ করে। মনে পড়ে Star Wars সিনেমাটির কথা। এর বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আমাদের স্মৃতিমেদুর করেছিল, আমরা ফিরে গিয়েছিলাম হারানো শৈশবে, যখন আমাদের সঙ্গী ছিল পৌরাণিক রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনি। Close Encounters of the Third Kind এও আছে সাম্প্রতিক বিজ্ঞান বিশ্বের সূত্রেই প্রায় ধর্মীয় ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়। এভাবেই জনপ্রিয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি একাধারে পুরাণকথা ও বৈজ্ঞানিক কল্পকথার মিশ্রণ ঘটায়।

জনপ্রিয় সাহিত্যে থাকে সাম্প্রদায়িক স্বপ্ন, পুরাকথা, কল্পকথা ও আদিরূপ। একারণেই এটি সহজে সাধারণের মনে দাগ কাটে। মনে পড়ে পিকউইক, ডনক্যুইজো, শার্লক হোমস্ ও ডেভিড কপারফিল্ডের কথা। লক্ষণীয় সমৃদ্ধ সাহিত্যের রচয়িতারা আমাদের মন জুড়ে থাকলেও, তাঁদের সৃজিত চরিত্রদের আমরা প্রায়ই ভুলে যাই (হেমিংওয়ে বা ফকনার)। কিন্তু জনপ্রিয় সাহিত্যের চরিত্র দীর্ঘজীবী (হোমস্ বা টারজান), অথচ অনেকেই জানেন না এঁদের সৃষ্টিকর্তাদের নাম (কোনান ডায়াল বা এডগার রাইস বারো)। আবার এরা প্রথম পাঠের সময়েও পাঠকের কাছে খুব যে অচেনা থাকে, তা নয়, অন্য কোনো মাধ্যমে এরা হয়তো আগেই পরিচিত হয়ে গিয়ে থাকে (সিনেমা, থিয়েটার, টিভিশো)। এভাবেই জনপ্রিয় সাহিত্যের চরিত্ররা প্রায়শই সৃষ্টিকর্তার হাত ছাড়িয়ে স্বাধীন

হয়ে ওঠে। কারণ লেখকের চেয়ে ভিন্নমাত্রায় চরিত্রটিকে বিন্যস্ত করতেই পারেন চলচ্চিত্রকার বা নাট্যপরিচালক। মনে পড়ে 'হ্যামলেট' বা ('নষ্টনীড়'/'চারুলতা')-র কথা। জনপ্রিয় সাহিত্য এভাবেই মানুষকে মিলিত করে। এর বিষয় অতি সহজে যেমন ব্যক্তিকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করায় তেমনি গোটা সমাজকেও আলোড়িত করে। তাই সিনেমার নায়ক একাই দশজন দুষ্টলোককে খালি হাতে দমন করলেও আমরা অবাস্তবতার দোষ দেখি না, বরং নায়কের অসম্ভব, সেই প্রায় অমানুষিক ক্ষমতাকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করি। করি কারণ বাস্তবের শয়তানদের শায়েস্তা করতে পারি না—সেই অক্ষমতায় পর্দায় নায়কের ক্ষমতাকে বিশেষ ভাবে সাধুবাদ জানাই।

জনপ্রিয়তার সঙ্গে এভাবেই জড়িয়ে আছে বাজারসর্বস্বতা ও বিনোদনধর্মিতার ধারণা। অনেকেই 'বেস্টসেলার' কে পাঠক্রমভুক্ত করতে চান না, কারণ তাঁদের মনে হয় যা সকলের দ্বারা গৃহীত তাকে বিশেষ অভিনিবেশসহ পাঠের প্রয়োজন নেই। তাই পাঠক্রম অন্তর্ভূক্তির সঙ্গে বাজার সাফল্যের সর্বদাই অহিনকুল সম্পর্ক। ফিডলারের মতে এইসব এলিট সমালোচক তাঁদের অভিভাবক সুলভ মানসিকতায় জনপ্রিয় সাহিত্যকে প্রায়শই ব্রাত্য করে রাখেন এবং নিজেরাই হয়ে ওঠেন সুসাহিত্যের একমাত্র বোদ্ধা। অনেক সময়ে গ্রন্থাগারগুলিও জনপ্রিয় সাহিত্যকে নানান বিশেষণে চিহ্নিত ('Juveniles', 'Teenage Fiction' etc.) করে থাকে। আর এভাবেই অচ্ছুত করে দেওয়া জনপ্রিয় সাহিত্য কতিপয় বুদ্ধিজীবীর কলমের খোঁচায় যে কোনো বড় সম্মান বা পুরস্কারলাভে বঞ্চিত হয়েও পায় পাঠকলক্ষ্মীর অকৃপণ কৃপা। ফিডলারের মতে ডিকেন্স, টোয়েনরা হলেন সেই 'borderline writers' যাঁরা জনপ্রিয় হলেও তাঁদের লেখার শক্তিকে খরিজ করতে পারেন নি এলিট ক্রিটিককুল। তাই আমাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়-ই একমাত্র 'রুচি' ও 'মান'-এর নিয়ন্ত্রক হতে পারে না, বরং সংখ্যাধিক্যের বিচারেই সাহিত্যগুণ নির্ধারিত হওয়া উচিত।

সাধারণের মন জুড়ে আজ যখন অবদমিত যৌনতার যন্ত্রণা, তখন আজকের সাহিত্যে সৎভাবেই তার প্রতিফলন জরুরী। জনপ্রিয় সাহিত্য তাই বিশ্বস্ত থাকে মানব মনের পশু প্রবৃত্তির প্রতি। আধুনিক মানুষ আজ অপরের ব্যথায় কালো মুখ দেখে আলোকিত হয়ে ওঠে, আবার সামাজিকতার স্বার্থে সেই মুখ লুকিয়ে ফেলে ছদ্ম সহানুভূতির মুখোশে। আমাদের সকল শয়তানী প্রবৃত্তির পাওনা মিটিয়ে তাই ফিডলার তাঁর প্রবন্ধের নাম দেন 'Giving the Devil his Due'। আমাদের সকলের মধ্যেই তো গুহায়িত আছে গোপন আমির বৃত্তান্ত (Seret Self)! শো' পিসের মতো করে বাইরেটা আমরা সাজিয়ে রাখি, কারণ ভিতরটা যে বড়ই বীভৎস। শ্রেণীসচেতন আধুনিক মানুষ 'আমরা বনাম ওরা'-র ব্যবধান গড়ে আজ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন (alienated), মুখে ভালো ভালো কথা বলেও ভিতরে ফাঁপা (Hollow) এবং স্বার্থসচেতনতায় শুধুই খেয়ালসর্বস্ব (Freaky)। যেমন মুখে বলি পরিবারধর্ম, ন্যায়ধর্ম, সত্যধর্ম, সভ্যতা, নারীকল্যাণ ইত্যাদি বড় কথা, কিন্তু কাজে ঠিক এর উল্টো পথে চলে পারিবারিক স্বপ্নরাষ্ট্রের মিথকে (Utopia) অচিরেই পরিণত করি দুঃস্বপ্ন রাষ্ট্রে (Dystopia)। মনে পড়ে তো পরিবারের মধ্যে থেকেও কেমন করে নির্যাতিতা হয়েছিল সূর্যমুখী, ভ্রমর, আশালতা বা কুমুদিনীরা। তাদের স্বর্গীয় সুষমা ভরা গৃহপ্রাঙ্গণ শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণার কাঁটায় নারকীয় হয়ে তো উঠেছিল। জীবনেও দেখা যায় পরিবার কেমন করে বৃদ্ধ বাবা মাকে ব্রাত্য করে, অবিবাহিতা বা বিধবা বোনকে সরকারি হোমের সুব্যবস্থা দান করে, কন্যার অপছন্দের

প্রেম কেমন করে তাকে পারিবারিক সম্মানরক্ষার দায়ে অকালে লাশকাটা ঘরে পৌঁছে দেয়! এসব খবরেই তো আমাদের দিন শুরু হয়। মুখে নারী কল্যাণের কথা বলা হলেও আজকের বা চিরকালের পুরুষতন্ত্র নারীকে নষ্টই করে বারবার। তাই জঞ্জালের স্তূপে মেলে কেবল শিশুকন্যা। ফলে জনপ্রিয় সাহিত্যে এই বিষয়গুলিই বারেবারে উঠে আসে। আবার নারীর মধ্যেও আছে কালো সাদার ধাঁধা, রবীন্দ্র সাহিত্যেও তাই আছে রাজলক্ষ্মী, বিনোদিনী, বরদাসুন্দরী, শ্যামা, রেবতী-রা। জীবনে যেমন আছে আলো কালোর বিন্যাস, সাহিত্যেও তেমনি আছে মন্দ ভালোর পরিপূরক প্রতিন্যাস।

তাই জনপ্রিয় সাহিত্য আমাদের অবচেতনের বিপজ্জনক প্রবণতাকে তুলে ধরে। বহু কাল ধরেই তুলে ধরছে। আমরা আজো ভুলি নি সোফোক্লিসের অয়দিপাসের কথা বা ইউরিপিডিসের মেডিয়ার কথা বা শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথের কথা। এরা রাতের দুঃস্বপ্নে নয়, দিনের আলোয় কেউ পিতাকে হত্যা করে মাকে বিবাহ করেছে, তো কেউ সন্তানকে নিহত করেছে বা কেউ অতিথি রাজাকে হত্যা করেছে। এই হনন প্রবৃত্তি ছিল তাদের আত্মগত যা বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবজীবনেও আছে এমন হাজারো মর্মবিদারী ঘটনা; সংবাদ মাধ্যমে যাদের কথা জেনে আমরা বিবশ হই, তারাও কিন্তু আমার আপনার মতোই ছিল এই সমাজেরই সদস্য। ফলে জীবন থেকে সাহিত্যে, কখনো সাহিত্য থেকে জীবনে যাতায়াত চলেছে মিথ্যার, লোভের, হনন প্রবৃত্তির।

ফিডলার সৎভাবেই বিশ্বজোড়া জনপ্রিয় সংস্কৃতির পিছনে আমেরিকান সংস্কৃতির প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। মনে রাখা দরকার ফরাসি বা রাশিয়ার বিপ্লবের তুলনায় আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ছিল 'Pop revolution'; কারণ ফরাসি বা রাশিয়ানদের মতো আমেরিকানদের যুদ্ধে নিহিত ছিল না কোনো ভাবাদর্শ, বরং ছিল কেবলই অভিযোগ ও আধিপত্যের স্বার্থসঙ্কীর্ণতা। আজও তাই নন্-আমেরিকানরা নিজেদের সংস্কৃতির বিনাশের মূলে দেখেন 'Vulgar creeping Americanization'-কে। ভুবন জোড়া আজকের Pop culture-এর শিকড় আমেরিকান সংস্কৃতিতেই নিহিত। আসলে এই যুবসংস্কৃতির সঙ্গে বেশির ভাগ আমেরিকান নিজেদের যুক্ত করতে ভালোবাসেন। আবার এও সত্য যে আমেরিকান সংস্কৃতি তুলনামূলকভাবে 'যুবসংস্কৃতি'। এই সংস্কৃতি সংখ্যাগুরু আমেরিকানের সেই অদ্ভুত আধিপত্যবাদী স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ, যে স্বপ্ন আম আমেরিকান আজো শয়নে স্বপনে দেখে চলেছে। এই আমেরিকান সংস্কৃতি আজ এদেশে-ও শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে, যার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে আজকের জনপ্রিয় সাহিত্যে। একে অস্বীকার করার আজ আর উপায় নেই কোনো। একে ভালো বা মন্দ বলার আমরা কেউ নই। ভালো লাগলে আমরা এই জনপ্রিয় সাহিত্য পড়বো, নচেৎ নয়। তবে এই ভালো লাগা বা না লাগার ক্ষেত্রে-ও সৎ থাকাটা আমাদের পক্ষে জরুরী। একে বাজারী সাহিত্য বলে বিদগ্ধ জনেরা ব্রাত্য করতেই পারেন। কিন্তু তাতেও জনপ্রিয় সাহিত্যের ভুবনজোড়া আগ্রাসন ঠেকানো গেল কই?

জনপ্রিয় সাহিত্য আজ আমাদের জীবন-বর্ণালির প্রতিটি রঙের বিচ্ছুরণে যে বিভ্রম সৃষ্টি করে তাকে তুচ্ছ করার আর কোনো উপায় নেই। এটি শোনায় লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষের স্বপ্ন দেখার আর স্বপ্ন ভাঙার ইতিকথা। এ ধরনের বই-এর ব্লার্বে থাকে যৌনতার যথেচ্ছ বিবরণ, আবার হয়তো এরই কাহিনিতে থাকে চরিত্রের সমাজচ্যুত হয়ে জীবনের পথে একা হওয়ার কারুণ্য কথা। এমনটাই তো হতে পারে জীবনেও। যৌবনের যৌন উন্মাদনার অন্তে বিয়ে, বিবাহিত জীবনের

ব্যর্থতায় সব দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে একাকী বেঁচে থাকা। সে জীবন হতে পারে সমকামিতার বা এক রাতের মদিরতার বা নিছকই দিনগত পাপক্ষয়ের। সারস্বতজীবী ফিডলার তাই জীবনধর্মী জনপ্রিয় সাহিত্যের পক্ষ নিয়ে তাঁর সহকর্মীদের কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। তাঁর মতে যে সব পণ্ডিত অধ্যাপক ক্লাসে ক্লাসিক সাহিত্য পড়ান, তুমুল নিন্দা করেন জনপ্রিয় সাহিত্যের, তাঁরা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে পড়েন বেস্ট সেলার ফিক্‌সন, থ্রিলার, রোমান্স, পর্ণোগ্রাফি-ও। এই চেনা দ্বি-চারিতার অবসান চেয়েছিলেন পপ-গুরু ফিডলার, চাই আমরাও। এলিট ক্রিটিকের প্রদর্শিত পথে আমাদের মেধাকে চালিত না করে, আসুন বরং আমরা নিজেদের রুচি বুদ্ধি প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ন করি। পাঠক তাঁর মুক্ত মন আর বিস্তৃত পাঠাভ্যাসের দ্বারা এভাবেই ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ ঘটাতে পারেন। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা সব ধরনের সাহিত্যই পড়ি, তবেই তো ঘটবে চিন্তারাজ্যে বিবর্তন। ক্রমশ আমরা পণ্ডিতমন্য সমালোচকদের (high brow elite critic) প্রদর্শিত পাঠরুচি ছেড়ে পৌঁছতে পারবো সাহিত্যমনস্ক সাধারণ মানুষের জনপ্রিয় পাঠ সংস্কৃতিতে (low brow popular literature of masses)। ঐতিহ্য আসলে বহু প্রণালীবদ্ধ এক সংযোগসাধনক্ষেত্র। তাই সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় উভয় ধরনের সাহিত্যই পারস্পরিক আদান প্রদানে সাহিত্যিক উপকরণ এবং ঐতিহ্যআশ্রিত মূল্যবোধগুলিকে নিজের নিজের ধারণক্ষমতার মধ্যে থেকেও পরিব্যাপ্ত করতেই পারে। আর এই তথ্যপঞ্জি আমাদের সুদূর প্রসারী সহায়তা করতেই পারে জনপ্রিয় সাহিত্যের প্রভাব অনুধাবনে।

দৈনন্দিনের দীনতা নিয়েই গড়ে উঠেছে জনপ্রিয় সাহিত্য। তাই এর অবিনাশী সত্তারে সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের তুমুল মানবিক অস্তিত্ব। চিরচেনা রবীন্দ্রসাহিত্যে এরই প্রকাশ তো আমরা লক্ষ করি। রবীন্দ্রকবিতার শুভবোধকে ঘিরে আম বাঙালির আবেশ তো কেটে যায় যখন তাঁর কবিতাতেও উঠে আসে ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত যন্ত্রণার ক্ষতচিহ্ন। প্রিয়জনের মৃত্যুতে তাঁর অবসাদ কেবলই দীর্ঘয়িত হয়েছে। বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতা আর বহির্বিশ্বে মহাযুদ্ধের পদসঞ্চার তাঁর আজন্মলালিত আস্তিক্যকেও 'প্রশ্ন' করেছে 'পরিশেষ'-এ। ক্রমশ গোধুলি পর্যায়ের কবিতায় তিনি রোমান্টিকতার রোমাঞ্চ ছেড়ে আধুনিক বিষণ্ণতাবোধে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অনিশ্চয়ের আধুনিকতাকেই 'মানবনিয়তি' জেনে অন্তিমে দেখেছেন 'মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে'। তবু নির্বিচার কুশ্রীতার মধ্যেও মানুষের প্রতি বিশ্বাসে জীবনের অন্তিমপর্বেও দেখেছেন আঁধারের অবসানে অনির্বাণ এক আলো। প্রশ্ন ওঠে তাঁর নিজের সৃষ্ট সব চরিত্ররা কি জীবনের পথে আঁধার পেরিয়ে এমন কোনো আলোর সন্ধান পেয়েছিল? দেখে নিই একবার।

'বিসর্জন'-এর জয়সিংহ তার যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব একাকিত্বের অবসানকল্পে অবধারিত ভাবে এগিয়েছিল আত্মহননের পথে, একেবারে অকালে। তার প্রতি সহমর্মী হয়েও বলতে দ্বিধা নেই বাস্তব জীবনে এমন কত শত জয়সিংহদের বিজিত নিস্ক্রমণের কথা আমরা সংবাদ মাধ্যমে প্রায় প্রতিদিন পাই। মৃত্যুর মাঝে জীবনমন্থনের মর্মন্তিকতার সমাধান জয়সিংহ পেলেও, পান নি রঘুপতি। তিনি তো জানতেন সন্তানসম জয়সিংহের অকালমৃত্যুর জন্য আসলে দায়ী কে। মৃত্যুর সেই প্রবল অভিঘাতে আমূল বদলে যাওয়া রঘুপতি নিজের ব্রাহ্মণত্বের উচ্চাসন ছেড়ে সহজেই নেমে এসেছিলেন মানবিক সমতলে। রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির সেই হৃদয়পরিবর্তনকে দেখিয়েছেন অপর্ণার

প্রতি আগের বিদ্বেষের অবসানে পরম স্নেহময় নির্ভরতায় বা গোমতীর জলে আরাধ্য দেবীমূর্তির বিসর্জনে। এমনি করে তো বদলে গিয়েছিলেন 'রক্তকরবী'-র মকররাজ, রঞ্জনের অকালমৃত্যুর প্রেক্ষিতে। শেষ পর্যন্ত তাই নন্দিনীর হাতে হাত রেখেই সর্দারতন্ত্রের, যান্ত্রিকতার, ধনতান্ত্রিকতার অবসানকল্পে লড়াইয়ে সামিল হতে চেয়েছিলেন। যক্ষপুরীর সঞ্চিত সোনার তাল ছেড়ে সোনাঝরা রোদ্দুরে সোনালি ধানের সম্ভারে, মাঠের পৌষপার্বণের গানে তাঁর প্রাণ-ও সেদিন সাড়া দিয়েছিল। এমনি করেই তো রাজার প্রতাপ ভেসে গিয়েছিল নন্দিনীর ভূষণ রক্তকরবীর লালিমার আবেগে। ধনতান্ত্রিকতার ধাক্কায় বদলে গিয়ে ছিলেন মকররাজ, আর 'বিসর্জনে'র গোবিন্দমাণিক্য একার সামর্থ্যেই বদলে দিয়েছিলেন রাজ্যের বলিপ্রথার ধর্মীয় ব্যবস্থাকে। তিনি যুদ্ধের অনাবশ্যক রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন বলেই রাজাসন ছেড়ে রাজর্ষির মতোই স্বেচ্ছানির্বাসনকে নির্বাচন করেছিলেন। মনে পড়ে প্রাসঙ্গিক ভাবেই সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এর যুদ্ধবিরোধী গান—'যুদ্ধ করে করবি কি বা বল্'। গোবিন্দমাণিক্য যাবার বেলায় প্রথমে পান নি প্রেয়সী গুণবতীকেও, কারণ তখনো তিনি রঘুপতির কথা মতো বলিপ্রথার সমর্থক ছিলেন, ছিলেন বহু প্রাণের বিনিময়ে নিজের শূন্য কোলে একটি প্রাণকণা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। অনাগত সেই সন্তানের স্বার্থেই তিনি প্রেমশূন্য হয়ে রাজাকে বিতাড়িত করে নিজেই নিজের জীবনে ডেকে এনেছিলেন প্রেমহীনতার অভিশাপ। তবে শেষে গুরু রঘুপতির মুখেই দেবীহীনতার কথা জেনে তিনি অবশেষে বুঝেছিলেন তাঁর রাজার শ্রেয়বোধকে। একমাত্র রাজাই এই নাটকে প্রথমাবধি মানবিকতায় অবিচল। তাঁর এই স্থিতধী পুরুষকারকে আমাদের মধ্যমেধা অনুধাবন করতে পারে না বলেই, অনেকে তাঁর চরিত্রায়নে বাস্তবতাব অভাব লক্ষ করে থাকেন। কিন্তু রাজা সাজার চাপে তাঁর অন্তরাত্মাও যে ব্যথিয়ে উঠতো তার প্রমাণ আছে নাটকে ভাইকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করার বেলায়। পারিবারিক পরিচয়ে আমরা রাজমুখোশের আড়ালে রাজার ব্যক্তিগত মুখ দেখিনি, তা তো নয়। 'বিসর্জনে'র এই তিনজন জনপ্রিয় চরিত্র; কারণ এদের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, জিজ্ঞাসা-যন্ত্রণার বুনটে আজও আমরা নিজেদের যে দেখতে পাই।

'নষ্টনীড়ে'র চারুলতাকে আরো 'প্যাশনেট' করেছিল সত্যজিতের 'চারুলতা', কুড়ি পরিচ্ছেদের এই বড়গল্পেব প্রধান তিন চরিত্র (ভূপতি-চারুলতা-অমল) সমগুরুত্বে বিন্যস্ত। এদের মনোজগতের বহুস্তরী বিন্যাসকে শাব্দিক সুষমায় তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কেমন করে প্রবৃত্তি আর পরিস্থিতির চাপে চারুর নীড় নষ্ট হয়েছে। ভূপতির সম্পাদকী ব্যস্ততার বিবরণ দিয়ে গল্পের সূচনা হলেও, ক্রমে তা ঘনীভূত হয়েছে চারুলতার একাকিত্বকে ঘিরে। স্ত্রীর 'নিঃসঙ্গতার অভ্যেস'কে নষ্ট করতেই সহমর্মী স্বামী এনেছেন শ্যালক জায়া মন্দাকিনীকে, শ্যালক উমাপতিসহ। আশ্রিত অমলের ইতিবৃত্ত লেখক না জানালেও, অনুপুঙ্খের অনুসন্ধানে সত্যজিৎ অমলের নাটকীয় আবির্ভাব ঘটিয়েছেন চলচ্চিত্রে। ভূপতি চারুর শান্ত নীড়কে নষ্ট করতেই যেন ঝড়কে সাথী করে ঝড়ের গতিতে এসে পড়েছে অমল। তার কারণেই নিষ্কর্মা গৃহবধূটির সাহিত্যপ্রতিভা ও প্রেম উন্মেষিত হয়েছে। বাগানবিলাসের সূত্রে সত্যজিৎ অন্তত দেখিয়েছেন চারুর চোখের ভাষার বদলকে। প্রতিযোগিতার ভাবনাতেই চারুর লেখালিখির সূচনা। আর তাই বাঁধাগতের চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ কথা কও ছেড়ে সে লিখেছে কালীতলা গ্রামে ফেলে আসা তার শৈশবের কথা।

ক্রমে গল্পে প্রেমত্রিভুজ তৈরি হয়েছে কখনো ভূপতি চারু অমলকে ঘিরে; তো কখনো চারু অমল মন্দা কে ঘিরে। উমাপতির কারণে যখন অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত ভূপতি, তখন দাদাকে নৈতিক কারণে আর ভেঙে ফেলতে চায় নি অমল। তাই 'গভীর গহ্বরে' পা বাড়াতে গিয়েও সে পা বাড়িয়েছিল বিবাহ প্রস্তাবের সূত্রে প্রথমে বর্ধমানে, পরে বিদেশে। তার এই নীরব নিষ্ক্রমণ কিন্তু গল্পের একটি বড় ইতিবাচক ঘটনা। জীবন যখন অনাবশ্যক জটিল হয়ে ওঠে, তখন আমরাও তো এভাবেই জেতা বাজি ছেড়ে দিই। এই পালানো তাই ভীরুতা নয়, নিন্দনীয় তো নয়ই। আত্মসম্মান আর প্রিয়জনের সম্মান রক্ষার্থেই অমলের এই আত্মনিগ্রহ। চারুর আগ্রাসী অধিকার বোধ থেকে মুক্ত হয়ে সে দাদাকে আরো বড় আঘাত থেকে বাঁচাতেই চেয়েছে। কিন্তু পেরেছে কি? ভূপতি শেষ অবধি সবই জেনেছেন। কিন্তু কর্তব্য বিমূঢ় ভূপতি তখন নিজের থেকেও পালাতে চেয়েছেন, তবু শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুখোমুখি হতেই হয়েছে, তাঁর অন্যাসক্তা স্ত্রীর। দাম্পত্য পরিণতির ক্ষমাসুন্দর অন্তিম বাক্যগুলিকে সত্যজিৎ দুটি অগ্রসরমান হাতের ফ্রিজ শটে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন। অনধিকার প্রবেশের যাতনাময় এমনতরো কত দাম্পত্য ঘরে ঘরে 'ফ্রিজ' হয়ে যে আছে! জীবনের জটিলতা এমনি করে জীবন থেকে সাহিত্যকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

দাম্পত্যের অন্দরমহলে উঁকি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অসঙ্গতির চলচিত্র এঁকেছেন বারবার। বিশেষভাবে মনে পড়ে 'যোগাযোগ'-এর কথা। 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে' পেরিয়ে 'যোগাযোগ'-এ এসে তিনি দেখালেন দাম্পত্যে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যকে; ধর্ম আর আইনের সুরক্ষায় যা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। প্রেমহীন পরম্পরিত প্রথার প্রতারণাময় দাম্পত্য থেকে মুক্তি চেয়েছে কুমুদিনী। তাই গর্ভধারণের সংবাদে যে গর্বিত হয় নি। দাদার কথায় অনিচ্ছুক ভাবে সে ফিরেছে স্বামীর ঘরে, কেবল সন্তানকে জন্ম দিতে। নীচু সুরে দৃঢ় অভিমানে সে উচ্চারণ করেছে আজকের নারীবাদের সারসত্য—"এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোয়ানো যায় না।" স্বামী বা ছেলের জন্য নয়, সে বাঁচতে চেয়েছে নিজের জন্য, নিজের মতো করে। তাই তো দাদা বিপ্রদাসকে সে বলেছে—"দাদা আমি মুক্তি চাই।" এই স্বাভিমানই তো দেখি আজকের শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "মানবজমিন"-এর মণিদীপার-ও মধ্যে। সে মি. বোসকে টাকার বিনিময়ে দাম্পত্য থেকে মুক্তি দিতে না চেয়েই বলেছে—"আই উইল গিভ্ হিম লিবর্টি আউট অফ্ পিটি, আউট অফ্ হেট্রেড, টাকা নয়।" নিজের নিঃস্ব অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মণিদীপা কুমুদিনীর মতোই টাকায় বশ হয়নি। আজকের জীবনে 'টাকা' একটা দরকারি কথা অবশ্যই, তবে কখনোই শেষ কথা নয়। জনপ্রিয় সাহিত্যেও এভাবেই বারেবারে উঠে আসে পারিবারিক জীবনের গোপন রক্তপাতের করুণ কাহিনি। রবীন্দ্রনাথও মধুসূদনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন শত্রু পরিবারের মেয়েকে অঙ্কশায়িনী করার অভিসন্ধিকে। অথচ কুমুদিনীর তো ছিল বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে আর পতি নামক পরমগুরুতে অন্ধ বিশ্বাস। মধুসূদনের টাকার গুমরকে বনেদী ধৈর্যে কুমু অস্বীকার করলেও, স্বামীর শারীরিক জবরদস্তি তার দাম্পত্যকে দমবন্ধকর অস্বস্তিময় করে তুলেছে। বিপ্রদাসের বনেদী ঔদাসীন্যে উত্তেজিত মধুসূদন কুমুকেই করেছিল তার পুরুষালি আধিপত্যের সহজ শিকার। ফলে আত্মাভিমানী কুমু ক্রমে পরিণত হয়েছিল এক কামশীতল নারীতে। এই শীতলতা ভাঙার আয়োজনও আছে উপন্যাসে। রাতে শয়নকক্ষে মধুসূদনের মধুময় মিনতিতে। স্বভাব কর্তৃত্বপ্রবণ

মধুসূদনের অধিকার প্রমত্ত সহবাসের ফলই কুমুর নিরানন্দ গর্ভসঞ্চার। এহেন মধুসূদন সকলকেই ভয় দেখিয়েছে, ভালোবাসে নি; তাই বিনিময়ে ভালোবাসাও সে পায় নি। কখনো কুমুকে তার মারতে ইচ্ছে করেছে, তো কখনো যে শ্যামাকে সত্যি মেরেছে। মধুসূদন বোঝে শুধুই শরীর, তাই তার বাঁচার অনুষঙ্গ ভোজন, পীড়ন এবং রমণ। অহংসর্বস্ব মানুষটি বেনিয়াবৃত্তিতে সকলকেই ভাবতেন পণ্য। তাই বিকল্প যৌনসঙ্গী শ্যামাকে পণ্যের নিয়মেই ব্যবহার অন্তে কোন্ আস্তাকুরে পাঠিয়েছেন—কেউ তা জানে না। আহত অভিমানে স্ত্রী ঘর ছাড়লে পৌরুষকে কিছুটা পরাস্ত করেই মধুসূদন তাকে আনতে গেছেন আর তখনো অরাজি কুমুদিনীকে শেষ পর্যন্ত আইনেব জোরে ফেরাতে চেয়েছেন। এতে যে তার পৌরুষের অক্ষমতাই বিঘোষিত তাও বোঝেন নি তিনি। সুতরাং মধুসূদনের পৌরুষমত্ততা, কুমুদিনীর অপরাজিত অস্তিত্ব, শ্যামার সুযোগসন্ধানী ব্যভিচার—বাস্তবজীবনে খুব কি অচেনা?

'শেষের কবিতা'র প্রেমের পূর্ণতার জন্য প্রেমিক প্রেমিকার অন্যত্র নিষ্ক্রমণের মসৃণ মাধুর্য আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু বিধবা বিনোদিনীর সংরাগতপ্ততা বা বিমলার বেপথু বেপরোয়া হৃদয়বৃত্তির দোলাচলতা বা দামিনীর আত্মবিনাশী আত্মনিবেদনের জ্বালাযন্ত্রণা আমাদের অনেক অনেক বেশি ভাবিয়ে তোলে। জীবনে প্রেম প্রেমহীনতার মীমাংসা যে সহজ নয়। 'যোগাযোগ' বা 'মেঘে ঢাকা তারা'র মতো দাদা বাস্তবে কটা বোন পায়, ভূপতি বা নিখিলেশের মতো স্বামীই বা কজন নারীর ভাগ্যে জোটে? বাস্তবে বরং সহজেই মেলে সন্দীপের মতো লালসাময় প্রেমিক, মধুসূদনের মতো অধিপত্যবাদী বা মহেন্দ্রের মতো প্রবৃত্তিপরায়ণ স্বামী, রাজলক্ষ্মীর মতো ঈর্ষাতুরা শাশুড়ি এবং বিনোদিনীর মতো অবিশ্বস্ত সেবিকা। তাই এদের সঙ্গেই বরং আমাদের সহজ বনিবনার সম্পর্ক। আমরাও মরুভূমির মতো জীবনে বিহারীর মতো বন্ধুর সাহচর্য খুঁজি। মনে মনে আমরাও চারু বা বিমলার মতোই বিভ্রান্ত। এই আত্মপ্রতারণাময় যে জীবন আমরা যাপন করি, তাই তুলে ধরে আজকের জনপ্রিয় সাহিত্য। জীবনযাতনায় পিষ্ট পলগুলিতে আমাদের বিধ্বস্ত সত্তার একমাত্র আশ্রয়—জনপ্রিয় সাহিত্য।

নির্বাচিত গ্রন্থসূত্র ঃ

১. Buddhadeva Bose, 1982, '*An Acre of Green Grass*' (Chapter-1 Rabindranath), Papyrus, Kolkata.

২. Fiedler, Leslie A., 'Towards a Definition of Popular Literature,' *Super Culture. American Popular Culture and Europe*. Ed. CWE Bigsby. London : 1975.

৩. –. *The collected Essays of Leslie Fielder*. New York : Stein & Day, 1971

৪. –. *A Fiedler Reader*. New York : Stein, 1977.

৫. –. *What was Literature? Class Culture and Mass Society* New York : Simon & Schuster, 1982.

৬. Reising, Russell, 'The Apolitical Unconscious : Leslie Fiedler' *The Unusable Past.* New York and London · Mathuen, 1986.

৭. Winchell, Mark Royden, *Leslie Fiedler*, Boston : Twayne Publishers, 1985.

৮. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ১৯৮১, 'আলোচনা : তোমার সৃষ্টির পথ, কবিতা পরিচয় (সম্পা, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী), দে'জ পাবলিশিং কলকাতা।

৯ আবু সয়ীদ আইয়ুব, ১৯৭১, 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১০. —, ১৯৭৩, 'পান্থজনের সখা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১১. 'ধ্রুবপদ' পত্রিকা (সম্পা, সুধীর চক্রবর্তী) প্রসঙ্গ নারীবিশ্ব, ২০০৫।

১২. নীহাররঞ্জন রায়, ১৯৬২, 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা', নিউ এজ।

১৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ১৯৯২, 'কুসুম বন্ধন', মুক্তধারা, ঢাকা।

১৪. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮, 'কুমুদিনীকথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ', রূপসী বাংলা, কলকাতা।

'পোজলার পালা' ঃ পূর্ববঙ্গ গীতিকার এক উজ্জ্বল উদ্ধার

সনৎকুমার নস্কর

বাংলা লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলি বিশেষ রত্নস্বরূপ। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সূচনাভাগ থেকে চতুর্থ দশকের প্রায় শেষাবধি এই পালাগানগুলি সংগৃহীত হয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে ও মুলত আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে। উল্লেখ্য যে, দীনেশচন্দ্র ঐ সময়পর্বে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত ছিলেন। তাঁরই অপরিসীম আগ্রহে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা মৌখিক ও মৃত্তিকাসঞ্জাত গাথাগুলি প্রথম পত্রস্থ হওয়ার সুযোগ পায় এবং তা কেবল বঙ্গ তথা ভারতবাসীর কাছে আপন সৌরভ ও সৌন্দর্য মেলে ধরে না, তা একই সঙ্গে রসিক বিশ্বজনের দরবারেও সমান মর্যাদা আদায় করে নেয়। আচার্য দীনেশচন্দ্রের এ কাজের সর্বপ্রধান সহায় ছিলেন ময়মনসিংহের সুসন্তান চন্দ্রকুমার দে। তিনি এই জাতীয় গীতিকাগুলির আদি ও মুখ্য সংগ্রাহক। কিন্তু চন্দ্রকুমার ব্যতীত আরো কয়েকজন সাহিত্যব্রতী পূর্ববঙ্গের সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পালা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। চন্দ্রকুমার দে'র মতো তাঁরাও ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিভোগী। তাঁদের কাজ ছিল গীতিকাগুলি গায়েনদের মুখ থেকে লিখিত উপায়ে সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা। এমন অনেক সংগ্রাহকের সংগ্রহই দীনেশচন্দ্র সেন সেদিন প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র খণ্ডগুলিতে। কিন্তু সম্পাদকের পক্ষে সংগ্রাহকদের সূত্রে প্রাপ্ত সবগুলি পালা, যে কোন কারণেই হোক, প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। দীনেশচন্দ্রের অবসর গ্রহণের পর বাংলা বিভাগের দায়িত্ব যাঁদের উপর বর্তেছিল তাঁরাও সম্ভবত এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখাননি। ফলস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়োজিত পালা সংগ্রাহকদের দ্বারা সংগৃহীত ও প্রেরিত কিছু পালা বিভাগের পুথিশালায় অমুদ্রিত অবস্থায় রয়ে যায়। সম্প্রতি এমন একটি অগোচরে থেকে যাওয়া পালা বিভাগের স্তূপীকৃত জঞ্জাল থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। পালাটির শিরোনাম—'পোজলার পালা'। সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী। এঁর নিবাস চট্টগ্রাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় পালাটির যতখানি অংশ হাতে এসেছে সেটি তার পূর্ণরূপ নয়। সংগ্রাহক খাতার মলাটে উল্লেখ করেছেন '২য় দফা' বলে। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি হিসাবে এটি খণ্ডিত। তবে কাহিনীর ধারাবাহিকতা তাতে খুব একটা ক্ষুণ্ণ হয়নি। পালাটির ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক গুরুত্ব বিবেচনা করে পাদটীকাসহ এখানে তা প্রকাশ করা হল। সংশ্লিষ্ট প্রারম্ভিক আলোচনাটি এই জাতীয় গীতিকা সংগ্রহের পূর্ব প্রেক্ষাপট ও প্রাপ্ত অংশটির একটি অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা রূপে উপস্থাপিত হল।

পূর্বভাষ ঃ

ঔপনিবেশিক সময়-পর্বে ভারতে প্রথম আধুনিক বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত ঘটে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। উনবিংশ ও বিংশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে এই প্রতিষ্ঠানটির অবদান অসামান্য। একইভাবে আমাদের দেশে বহুমুখী উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যদিও অনেকের ধারণা ব্রিটিশ সরকার এই শিক্ষায়তনটিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁদের প্রশাসন-উপযোগী কেরানীকুল সৃষ্টির অন্যতম আতুঁড়ঘর হিসেবে, কিন্তু তাঁদের সেই

প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে এটি কালক্রমে পরিণত হতে পেরেছিল আধুনিক জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার গৌরবময় এক প্রতিষ্ঠানে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পুরনো ইতিহাসটুকু বোধহয় অনেকেরই জানা। তবুও একবার প্রাসঙ্গিকভাবে ছুঁয়ে নেওয়া যাক মোটা জায়গাগুলো।

১৮২৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্সের অভিপ্রায় অনুসারে গঠিত হয়েছিল 'General Committee for Public Instruction' নামের সংস্থাটি। দেশীয়দের শিক্ষাব উন্নতি কীভাবে ঘটতে পারে সে বিষয়ে সম্যক পর্যালোচনা করে সরকার বাহাদুরকে পরামর্শ দান করাই ছিল এ সংস্থার কাজ। প্রায় দু'দশক চলবার পর এটিকে ভেঙে দিয়ে ১৮৪২ সালে লর্ড অকল্যান্ড এদেশের যাবতীয় স্কুল ও কলেজের ভার তুলে দেন 'Council of Education' নামক সংস্থার উপর। এই সংস্থা সর্বপ্রথম এদেশীয়দের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করে। উক্ত শিক্ষা পরিষদের তদানীন্তন সেক্রেটারি এফ.জে.মোয়াট এই অনুভবের কথা ব্যক্ত করে কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্সের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান ১৮৪৫ সালের ২৫ অক্টোবর, যাতে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা তিনি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। এর আট বছর বাদে ১৮৫৩ সালে শিক্ষা পরিষদের তৎকালীন অধিকর্তা সি.এইচ্.ক্যামার্সন ইংলন্ডের হাউস অফ লর্ডসে আর একটি আবেদনপত্র পাঠান। ঐ বৎসরেই রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের আরো কিছু সদস্য মিলে আর একটি আবেদনপত্র ব্রিটেনে প্রেরণ করেন। একই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ নবীকরণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। এর ফলে পার্লামেন্টের লর্ডস কমিটি এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করার সুযোগ পায়। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর Board of Control-এর প্রেসিডেন্ট চার্লস উড শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব (Education Despatch, যা উডস্ ডেস্প্যাচ নামে বেশি পরিচিত) তদানীন্তন গভর্নর জেনারেলের কাছে প্রেরণ করেন। উড ছিলেন প্রকৃত তাৎপর্যে একজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। তাই তিনি তাঁর রিপোর্টে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন। বস্তুত উড সাহেবের এই প্রতিবেদন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কিছু পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। উক্ত ডেসপ্যাচকে বাস্তবায়িত করার জন্যে গভর্নর জেনারেলের নির্দেশে ১৮৫৫ সালের ২৬ জানুয়ারি এক 'University Committee' গঠিত হয়, যে কমিটি কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। বাকিটা ছিল সময়ের অপেক্ষা। ১৮৫৬ সালের ১২ ডিসেম্বর এডুকেশন কাউন্সিল কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার জেমস উইলিয়ম কলভিলকে প্রস্তাবিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে নিয়োগ করে এবং ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি Legislative Council-এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি পাশ হয়ে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ভিসকাউন্ট ক্যানিং কর্তৃক অনুমোদিত হয়। শুরু হয়ে যায় পূর্ব ভারতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা ও সংস্কৃতির বিদ্যায়তনিক পঠন-পাঠন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবিদ্যাচর্চা ঃ

১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করা হলেও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আধুনিক ভারতীয়

ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়েছিল আরও অনেক পরে। এর পিছনেও রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। অতীতের নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নেটিভ' কর্মকর্তারাই মুখ্যত অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'নেটিভ' উপাচার্য। ঐ পদে তিনি বৃত হন ১৮৯০ সালের ১লা জানুয়ারি। তাঁর কার্যকাল মাত্র দু'বছর। ১৮৯১ সালের বার্ষিক সমাবর্তনে তাঁর ভাষণে তিনি ভারতীয় আধুনিক ভাষাসমূহ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষণীয় বিষয় হতে পারে এ ব্যাপারে প্রথম মন্তব্য করেন। এর প্রায় এক যুগ পর ১৯০৪ সালে ভাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে প্রবেশিকা থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের নিজের নিজের মাতৃভাষা-জ্ঞানের পরীক্ষা নেবার নিয়ম চালু হয়। অবশ্য এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান যাচাই করার সুযোগ থাকলেও ঐ ভাষায় লেখা সাহিত্য সম্পর্কে তাদের ধারণা যাচাইয়ের কোন সুযোগ ছিল না। এরপর ১৯০৬ সালে উপাচার্য হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ১৯০৯ সালে তাঁরই উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হন দীনেশচন্দ্র সেন। ১৯১২ সালে স্যার আশুতোষ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার জন্য রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ বক্তৃতামালার সৃষ্টি করেন। ১৯১৩-তে উক্ত ফেলোশিপ বক্তৃতার বক্তা হিসেবে দীনেশচন্দ্র পুনরায় আমন্ত্রিত হন। এই সময় থেকেই দীনেশচন্দ্র স্যার অশুতোষকে বাংলায় স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যাপারে বারবার অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। উল্লেখ্য যে, এর আগে বাংলায় স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল, যার উল্লেখ মেলে ১৯১৬ সালের সমাবর্তনে উপাচার্য স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর অভিভাষণে। কেবল অপেক্ষা ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. প্রবর্তনের। নানা দিক থেকে চাপ আসার ফলে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার স্নাতকোত্তর স্তরেও ভারতীয় সাহিত্য পড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করে। অতএব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. প্রবর্তনের আর কোন আইনি বাধা থাকলো না। ১৯১৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত 'Indian Vernacular Department'-টি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকারের অনুমোদন পায়, যার অধীনে ভারতীয় ভাষাবিভাগগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল। ঐ বৎসরই ১০ এপ্রিল তারিখে P. G Faculty Council of Arts-এর সভায় বাংলা এম. এ.-র প্রস্তাবিত সিলেবাসটি অনুমোদিত হয়েছিল। আর পাঠদানের প্রকৃত কাজ শুরু হয় ১লা জুন ১৯১৯ থেকে। বিভাগের যাত্রা শুরুর সূচনপর্ব থেকেই যুক্ত ছিলেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। ১৯১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি P G. Faculty Council of Arts যে ১১ জন পণ্ডিত ব্যক্তিকে স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা পড়ানোর জন্য 'লেকচারার' নিযুক্ত করে তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম এবং তিনিই এই বিভাগের নামাঙ্কন করেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বিভাগ। ১৯২১ সালে বাংলা সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট্. উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার 'প্রফেসর' পদে পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত করে। ১৯২৬ থেকে ১৯৩২ সালের ৩১মে পর্যন্ত দীনেশচন্দ্র এই বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ হিসাবে কার্যভার পালন করেছিলেন। ১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিল P. G. Faculty Council of Arts ভাষা ও সাহিত্যকেন্দ্রিক বিভাগগুলির

সম্মিলিত নাম 'Indian Vernacular Department'-এর পরিবর্তে 'Modern Indian Languages Department' এই নামকরণটি অনুমোদন করে। ১৯৪১ সালে বাংলা এম. এ.-র পুরনো পাঠক্রম বাতিল করে নতুন পাঠক্রম গৃহীত হয়।

লোকসাহিত্য সংগ্রহে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ঃ

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত হওয়ার প্রায় দেড় দশক আগে থাকতে সে-তাবৎ কাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত পুরনো বাংলা সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন গবেষণাধর্মী কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিলেন। স্মরণীয় যে, ১৮৯৬ সালে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থ রচনার ভিতর দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার যে-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন অনেকদিন পর্যন্ত সেটাই ছিল অনুসরণযোগ্য এক আদর্শ। রামগতি ন্যায়রত্নের এ সম্পর্কিত প্রাথমিক প্রচেষ্টার ভুল-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও বিশৃঙ্খলতা পরিহার করে আচার্য সেন ইতিহাসবোধের দিক থেকে অনেক বেশি সম্পন্নতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এরপর ১৯০৯ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে আরো পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি হল— History of Bengali Language and Literature, বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (Typical Selections from Old Bengali Literature), চৈতন্য ও তাঁহার পাষদগণ (Chaitanya and His Companions), Glimpses of Bengali Life এবং The Bengali Ramayanas. এভাবে একাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর হাতেই তৈরি হয়ে উঠলো সাহিত্য পঠন-পাঠনের নতুন এক বিদ্যাশৃঙ্খলা। তবে দীনেশচন্দ্র সেন কেবল লিখিত তথা পুথিনির্ভর সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর রসলোকে আরো একশ্রেণীর সাহিত্য প্রখর আবেদন জাগিয়ে তুলেছিল। সেটি হল বাংলার প্রত্যন্ত পল্লীতে ছড়িয়ে থাকা মৌখিক তথা লোকায়ত সাহিত্য। আমাদের দেশে ততদিনে মিশনারী ও কিছু বিদেশীয় বিদ্যানুরাগীদের দাক্ষিণ্যে সাহিত্যের এই শাখাটির চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রবাদ, ছড়া, লোককথা, বাউল গান ইত্যাদির সংকলনগুলি এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের মতো অভিজাত পরিবারের ও নাগরিক সংস্কৃতির প্রতিভূরা তথাকথিত অখ্যাত লোকসাহিত্যের প্রতি দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টিকে আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। দীনেশচন্দ্রও বাংলার লোকসাহিত্যের এই সমৃদ্ধ ভাণ্ডার সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সাহিত্যের শিষ্ট ও লিখিত ধারার পাশাপাশি এই মৌখিক ধারাটিকে নিয়ে নিজস্ব ঘরানায় চর্চা শুরু করেন। এরই ফলশ্রুতি তাঁর বাংলার লোকসাহিত্য তথা 'The Folk Literature of Bengal' নামক বইটি। এটি লেখা হয় ১৯১৭-য়, বের হয় ১৯২০ সালে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক লোকসাহিত্য সংগ্রহের ইতিহাসে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ছাড়া আরো একজনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। তিনি হলেন চন্দ্রকুমার দে। চন্দ্রকুমার ছিলেন মৈমনসিংহের অধিবাসী। দরিদ্রের সন্তান ও রোগজীর্ণ চন্দ্রকুমার বিদ্যায়তনিক পড়াশোনায় বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। কিন্তু তিনি বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন, আর ছিল দেশীয় মৌখিক সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম আগ্রহ। সেই আগ্রহের বশবর্তী হয়ে তিনি মৈমনসিংহের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মৌখিক পালাগান সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেন মৈমনসিংহের আর এক সুসন্তান কেদারনাথ মজুমদার। কেদারনাথ গুণী মানুষ, 'সৌরভ'

নামক একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। এই পত্রিকায় ১৯১৩ সলে চন্দ্রকুমার দে বঙ্গের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী ও তাঁর রচিত রামায়ণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি পড়ে দীনেশচন্দ্র মুগ্ধ হন এবং 'সৌরভ'-সম্পাদককে পত্র দেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে চন্দ্রকুমারের পক্ষে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এর প্রায় ছ'বছর বাদে ১৯১৯ সালে দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় চন্দ্রকুমার দে'র। এই যোগাযোগের ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও চর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

চন্দ্রকুমার ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী গীতিকা-সংগ্রাহক। তিনি পূর্ব বাংলার দুর্গম পল্লী অঞ্চল থেকে যে অবর্ণনীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে লোকগীতিকাগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন তার কিছু লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'Eastern Bengal Ballads'-এর Volume I, Part-I-এ। সেখানে তিনি লিখেছেন : 'Babu Chandra Kumar travelled in many villages of the districts of Mymensing and Sylhet, such as Samaj, Mohongenj, Khorsimul, Pukhuria, Panchkania, Nasir Uljiral, Fatehpur, Beniachong, Mangalsiddhi, Bhatergaon, Dattanoaja, Telighati etc. from each of which he got portions of poems and stray song which he subsequently put in their proper place while compiling a whole ballad. .Sometimes he had to travel on foot 35 or 40 miles a day, conveyances not being available as the village roads are 'Kancha' and unfit for traffic or carriages of any sort. . .Struggling with poverty, ill health and domestic trouble and anxieties he has done for our literature what I consider to be really yeoman's Service.' এই প্রশংসা সত্যসত্যই চন্দ্রকুমারের যোগ্যপ্রাপ্তি। তিনি দীনেশচন্দ্রের আনুকূল্যেই নবগঠিত ভারতীয় ভাষাবিভাগের পুথিশালার কর্মীরূপে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। পরে তাঁর আরো ২৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল। মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্টের নানা প্রান্ত ঘুরে তিনি মোট ২৪টি গীতিকা সংগ্রহ করেন। এগুলি ১৯২০ থেকে '৩২ সালের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। প্রথম দিকে প্রেরিত কয়েকটি পালার উপর ভিত্তি করে ১৯২২-২৪ সালে দীনেশচন্দ্র তাঁর রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপের বক্তৃতা প্রস্তুত করেন। ১৯২৩ সালে দীনেশবাবু চন্দ্রকুমার দে প্রেরিত গীতিকাগুলির মধ্যে মোট দশটি পালা নিয়ে একটি সংকলন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশ করেন। এই সংকলনটি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা নামে মুদ্রিত হয়। বাংলা গীতিকাগুলি যাতে বিশ্বের সাহিত্যরসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে সে ব্যাপারে ভাবিত হয়ে দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত ঐ পালাগুলিকে ইংরেজিতে যথাসাধ্য অনুবাদ করে 'Eastern Bengal Ballads–Mymensing' (Vol. I, Part-I) নামে ঐ ১৯২৩ সালেই প্রকাশ করেন। এর মুখবন্ধ লিখেছিলেন লর্ড রোনাল্ডসে। পরবর্তী ভল্যুমগুলো বেরোয় ১৯২৬, ১৯২৮ ও ১৯৩২-এ। বাংলা বাকি গীতিকাগুলির সংকলন 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নাম দিয়ে বেরোয়, ১৯২৬, ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে। এগুলিতে সংকলিত মোট পালার পরিমাণ ছিল ৪৪টি। এগুলির সবকটির সংগ্রাহক অবশ্য চন্দ্রকুমার ছিলেন না। কেননা ইতিমধ্যেই সংগ্রাহক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরো কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী, বিহারীলাল রায় ও মুন্সী জসিমুদ্দিন। এঁদের নিয়োগের পিছনে এক টুকরো ইতিহাস আছে, যার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছেন সেই দীনেশচন্দ্র সেন ও স্যার আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্যের অন্যতম জহুরী দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত পালাগুলি নাড়াচাড়া করে বুঝেছিলেন বঙ্গপল্লীর আনাচে কানাচে প্রস্ফুটিত কুন্দ ও গন্ধরাজই কেবল এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। তারা বিদেশী গন্ধহীন ফুলের মতো রঙচঙে চটকদার নয়, বরং শ্বেতবর্ণের একরঙা শোভায় সূর্যকিরণে দীপ্তিমান; তাদের সৌরভ ও লাবণ্য ভ্রমররূপী শ্রোতৃগণকে অকৃত্রিম আমন্ত্রণ জানায়। এই গানগুলির মিঠে তান সরল প্রাণ পল্লীবাসীকে তন্ময় করে রাখে। এগুলি বঙ্গভূমির জল-হাওয়া-মাটিতে জন্ম নেওয়া দেশজ ফসল। এসে উদ্ধার করা, রক্ষা করা, প্রচার করা শিক্ষিত দেশবাসীর পক্ষে জাতীয় কর্তব্য। আগেই বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে তিনি পূর্বেই আশ্বাস পেয়েছিলেন মহামান্য উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের, যিনি নাকি মুদ্রণের অর্থ সংকটে ম্রিয়মান দীনেশচন্দ্রের পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'ভয় কি দীনেশবাবু, ছাপিতে দিন, আমি চালাইব।' 'আশুতোষ স্মৃতিকথা' (১৯৩৫) গ্রন্থে আরো কিছু কথা লিখেছেন দীনেশচন্দ্র, যা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে পল্লীগীতিকা সংগ্রহের দ্বিতীয় পর্ব সম্পর্কে কিছু হদিস পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক অংশ একটু উদ্ধার করি : 'এই প্রাচীন পল্লী-গাথা সংগ্রহে আমার কোন স্বার্থ ছিল না, বরং আমি নিজে এই কার্যের জন্য এতটা অতিরিক্ত কর্তব্যের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইলাম, যাহাতে আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। সরকার বাহাদুরের নিকট এই পল্লীগীতি সংগ্রহ ও ছাপাইবার ব্যয়-ভার আংশিকরূপে পাইবার জন্য আবেদন করিলাম। আমি লিখিয়াছিলেন, শুধু ময়মনসিংহ নহে, বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ গাথা অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেগুলি সংগ্রহের জন্য কয়েকটি লোক নিযুক্ত করা দরকার। বহু চেষ্টার পর সরকার বাহাদুর তিন বৎসরের জন্য অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইলেন, প্রতি বৎসর তাহারা এতদর্থে তিন হাজার টাকার কিছু বেশী দিয়াছিলেন।' এই প্রসঙ্গে দুটি তথ্য উল্লেখ্য। প্রথমত, ১৯২৩ সালে দীনেশচন্দ্র যখন মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির সম্পাদনা শুরু করেছিলেন, তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য সুরেশচন্দ্র ধর নামে জনৈক বি.এ. পাশ যুবককে মাত্র ৩০ টাকা বেতনে কেবল তিনমাসের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এ ব্যাপারে ঐ বৎসরের ১১মে তারিখে সুরেশচন্দ্রের নিয়োগ অনুমোদন করে। আর দ্বিতীয় তথ্যটি এইরকম, পল্লীগীতি সংগ্রহ ও সেগুলি প্রকাশ করার ব্যাপারে দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একদা প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁরা যৌথভাবে একটি প্রতিবেদন রচনা করে তৎকালীন রেজিস্ট্রার জে.সি. ঘোষের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। সেই পত্রে সম্ভাব্য খরচের খসড়াও উপস্থাপিত হয়েছিল এবং সেটি ১৯২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় পঠিত ও অনুমোদিত হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য 'পোজলার পালা' গীতিকাটির সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী ও অন্যান্য কয়েকজন পল্লীগাথা সংগ্রাহকের নিয়োগ ঘটে উক্ত প্রতিবেদনের সূত্র ধরে। তাই প্রাসঙ্গিক বলেই সেই ঐতিহাসিক পত্রটির প্রয়োজনীয় অংশ ১৯২৪ সালের সিন্ডিকেটের 'মিনিটস্ বুক' থেকে এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল :

"173. Read the following report from Dineshchandra Sen and Mr. Syamaprasad Mookerjee, embodying a scheme for recovering and publishing the rural ballads of Bengal :—

'To The 12th December, 1924

The Registrar,
CALCUTTA UNIVERSITY

Sir,

With reference to your letter No. 4417-18 dated 2nd December, 1924, forwarding copy of a letter from the Director of Public Instruction and requesting us to submit for the consideration of the Syndicate a scheme for taking early measures to recover and publish the rural ballads of Bengal, we have the honour to report as follows.

The first essential step will be to provide facilities for the appointment of qualified persons, who can undertake the arduous task of collecting ballads from the remote and unknown corners of the province It is clear that the nature of work to be done in this connection is such that it will not be well performed by the employment of graduates. They are, generally speaking, accustomed to the case of town life and to studies principally conducted in libraries or at home. They are hardly capable of undergoing the hardships and privations wich are involved in journeying through the rural districts and in visiting the poor peasants who dwell in mud huts, and are the custodians, so to say, of the songs and ballads of the countryside. ..The collection of ballads does not accordingly require the assistance of persons equipped with high academic qualifications.

It is thus undeniable that we must have our band of special collectors. The question is how to appoint them. We are of opinion that we should have at least three men on our staff who will be kept in charge of collecting ballads and songs. We, however, do not think that it will be dasirable to appoint them on fixed salaries at the very outset We have made enquiries and have found that there are some persons, about eight in number, who are competent to work in this field and are willing to place their service at the disposal of the University Almost all of them have sent us specimens of their collections which, though promising, are not adequate for testing their capacity for work. We should encourage such persons to send in specimens of their collections and should appoint those three amongst them, who will satisfy us that they have the highest aptitude for work in this field.

This was exactly what was done in the case of Babu Chandrakumar De,who had at first sent us a few instalments of ballads for which he was paid remuneration from the University and subsequently appointed in the Department of old Bengali MSS on a fixed monthly salary The University now pays him at the rate of Rs. 60 per month which includes his travelling and other incidental epenses. In consideration of his special merits and high and approved qualities of his work we recommend that his salary be increased to Rs. 85 per month.

We are of opinion that it will be necessary to provide for a fixed annual grant which will enable the University to purchase ballads and songs which may be collected by independent workers, other than the three persons who will be employed by us. A sum of Rs. 250 will, we consider, be adequate for this purpose.

For the smooth working of this department it will be necessary to place at the disposal of the Fellow the services of a competent clerk who will perform such duties as correspondence and making fair copies of texts, commentaries, translations, introductions and notes.

In our opinion such an Assistant should be in receipt of a monthly salary of Rs. 60 At present the University provides for the appointment of a temporary Assistant every year for the performance of such duties as enumated above. We strongly feel that this arrangement should be made permanent....

We may at this stage usefully summarize the actual financial effect of the scheme which we have outlined above. We propose to classify the items of expenditure under two heads, one concerning those for which the University should apply to Government for help, the other dealing with those for which the University itself should be responsible.

Government

1. Propósed increase of salary to Babu Chandrakumar De	300 p a
2. Pay of three persons to be appointed for the purpose of collecting materials at the rate of Rs. 50 a month each and a fixed travelling allowance for Rs. 20 a month each	2,520 p.a.
3 Purchasing materials from different independent sources	250 p a
Total	3,070

University

1. Cost of Printing and publishing a volume of about 500 pgs.	2,000
2 Contingencies	100
3. A clerk on Rs. 60/- per month	720
	2,820
Non-recurring Expenditure : A Typewriter	350
	3,170

Such an arrangement will materially help the cause we are advocating for it will ensure the continuance of an organised school of researchers in this field.

Yours truly,
Syamaprasad Mookerjee
Dineshchandra Sen

RESOLVED–

That the report be adopted and that a copy thereof be forwarded to the D.P.I., Bengal, with a request to approach the Government of Bengal for necessary funds.

(Confirmed)

W.E Greaves — J.C. Ghosh
Vice-Chancellor — Registrar"

[উৎস : Minutes of the Syndicate for the year 1924, No. 53, The 12th December, 1924, Page 411-414].

রিপোর্টটি আরও দীর্ঘ। আমাদের আলোচনায় যেটুকু প্রাসঙ্গিক কেবল সেটুকুই এখানে উদ্ধৃত হল। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একটি সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে গীতিকা সংগ্রহ ও তার সুষ্ঠু প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলা বিভাগের তৎকালীন কর্ণধারগণ এগিয়েছিলেন। সংগ্রাহক নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের ভাবনার খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেয় বাস্তব উপযোগিতার দিকে তাকিয়েই তাঁরা প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। একইভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়কে কতটা আর্থিক দায়ভার বহন করতে হবে সেটা খসড়া হিসাবে সুস্পষ্ট করে দিয়ে কর্তৃপক্ষের আনুকূল্য আদায়ের পথ তাঁরা সুগম করতে চেয়েছিলেন। গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে সহকারী নিয়োগের ভাবনাটিও তাঁদের দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও হয়তো ভেবেছিলেন বাংলাদেশের মৃত্তিকাজাত অযত্নলালিত এইসব অনাঘ্রাত সাহিত্য-কুসুমগুলি অচিরে বিনষ্ট হলে তাতে দেশীয় ঐতিহ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা রক্ষা করার দায় বা দায়িত্ব তাঁদের মতো একটি বৃহৎ সারস্বত প্রতিষ্ঠানেরই হওয়া উচিত। সেজন্য তাঁরা প্রস্তাবটি অনুমোদন করে তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তার কাছে পাঠাতে বিলম্ব করেননি। এরই ফলশ্রুতিতে তিনজন পালা-সংগ্রাহক অচিরে নিযুক্ত হন এবং পূর্ববঙ্গের দুর্গম প্রত্যন্ত পল্লী থেকে গীতিকা সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করেন।

লক্ষণীয়, উপরোক্ত রিপোর্টটিতে কোথাও আমাদের আলোচ্য পালাটির সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরীর নাম উল্লেখিত হয়নি, কিন্তু তিনি যে ঐ 'at least three men'-এর মধ্যে ছিলেন, সেটা দীনেশচন্দ্রের 'আশুতোষ স্মৃতিকথা' গ্রন্থের উল্লেখ-সূত্রে জানতে পারা যাচ্ছে। দীনেশবাবু লিখেছেন ঃ "কোন কাজ খালি হইলে এ দেশে যেরূপ হয়, এই ব্যাপারেও তাহার ত্রুটি হইল না। বহু প্রার্থী জুটিলেন—তাহাদের অনেকে উপাধির বহর দেখাইলেন এবং অনেকে যে সকল পুস্তক বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন, কবিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, কিংবা মাসিক-পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাদের বিস্তৃত বিবৃতিসহ আবেদন প্রেরণ করিলেন। কিন্তু প্রার্থীদের নিকট কেবল একটি জিনিস চাওয়া হইল,— আমরা যেরূপ পালাগান ও পল্লীগাথা ছাপাইয়াছি, সেরূপ কয়েকটি গাথা সংগ্রহ করিয়া নমুনা-স্বরূপ যিনি পাঠাইতে পারিবেন তাঁহারই দাবী অগ্রগণ্য হইবে। বহু প্রার্থীর মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্তী*, আশুতোষ চৌধুরী, জসীমউদ্দীন এবং অপর দুইজন এই পল্লীগীতি সংগ্রহের কার্যের জন্য নিযুক্ত হইলেন।" নিয়োগ-সংক্রান্ত কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উক্ত তিন সংগ্রাহক ১৯২৫ সালের ১ জুন থেকে তাঁদের কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। মূলত এঁদের সংগৃহীত পালাগুলিই পরে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছিল। পালার পরিমাণ ছিল প্রায় চল্লিশটি।

গীতিকা-সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী ঃ

গীতিকা সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে সম্পর্কে যতখানি তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে মিলেছে, আশুতোষ চৌধুরী সম্পর্কে তার এক-চতুর্থাংশও পাওয়া যায় না। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র তিনটি খণ্ডে দীনেশচন্দ্র

* ইনি কি 'চক্রবর্তী' না 'রায়'? কেননা 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় 'বারতীর্থের পালা'র ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র পালা সংগ্রাহকের নাম লিখেছিলেন 'বেহারীলাল রায়'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 'সুবর্ণলেখা' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য গীতিকা সংগ্রহের ইতিহাসে 'বিহারীলাল রায়'-এর নামই উল্লেখ করেছেন।

সেন বিভিন্ন পালার মুখবন্ধে পালা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে গীতিকা-সংগ্রাহকদের সংগ্রহ বিষয়ক কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই প্রদত্ত তথ্যে মুখ্যত জোর পড়েছে পালা সংগ্রহের স্থান ও প্রণালীর ওপর; সেখান থেকে সংগ্রাহক বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। আশুতোষ চৌধুরীর ব্যাপারে দীনেশবাবু মাত্র কয়েকটি বাক্য রচনা করেছেন, কিন্তু সেটা তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় জানার পক্ষে যথেষ্ট নয়। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র ৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যার ভূমিকার শেষাংশে পালা-সংগ্রাহক হিসাবে আশুতোষ চৌধুরীর উদ্যমের প্রশংসা করে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : '..অটুট স্বাস্থ্য, অপূর্ব উদ্যম, পল্লী সাহিত্যের প্রতি অপরাজেয় অনুরাগের সহিত সুলেখক আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রামের বড় বড় নদীর তীরে, সমুদ্রের সিকতায় প্রাণ-সঙ্কল্প করিয়া যে চেষ্টা করিতেছেন—তাহার তুলনা কোথায়? যদি অর্থাভাবে এই স্বার্থ-শূন্য বীর-বিক্রম কর্ম্মীর কাজ বন্ধ হয়, তবে দেশের পক্ষে তাহা ক্ষতি। ইনি চট্টগ্রাম হইতে অনেক পালা সংগ্রহ করিয়াছেন, ইঁহার প্রতি চট্টগ্রামবাসীর একটা গুরুতর কর্তব্য আছে।' এই 'কর্তব্য' কেবল চট্টগ্রামবাসী কেন সমগ্র বঙ্গবাসীর দ্বারা কতখানি পালিত হয়েছে তা বলা দুষ্কর। অনেকেই জানেন যে, বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্ শঙ্কর সেনগুপ্ত ১৯৬৫ সালে বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোকসংস্কৃতি-তাত্ত্বিক ও লোকসাহিত্য-সংগ্রাহকদের জীবন ও কর্মকীর্তি নিয়ে 'Folklorists of Bengal' নামে একটি গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেখানে লোকসাহিত্য সংগ্রাহকদের মধ্যে রেভারেন্ড লালবিহারী দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, গুরুসদয় দত্ত ও চন্দ্রকুমার দে'র প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও আশুতোষ চৌধুরী বিষয়ে কোন কিছুই লেখেননি। একই রকম অনুল্লেখ রয়ে গেছে অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ'-এও, যেখানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, জসীমউদ্দিন প্রমুখ লোকগাথা সংগ্রাহকরা আলোচিত হয়েছেন। অবশ্য এটা হতে পারে যে, তাঁর সম্পর্কে তথ্য-দুর্লভতা এর একটা বড় কারণ। যাইহোক, আমরা নানা স্থান থেকে টুকরো-টাকরা যতটুকু তথ্য পেয়েছি তার সূত্রে দু'চারটি কথা এই ফাঁকে বলে নিতে পারি।

আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। যে অঞ্চলে বাস করতেন সেই জায়গাটির নাম 'নন্দন কানন'। তাঁর আবাস গৃহটির নাম দিয়েছিলেন 'নিভৃত-নিলয়'। পারিপার্শ্বিক নানা প্রমাণ সূত্রে মনে হয় তাঁর বেশ পড়াশুনো ছিল। 'সুজা তনয়ার বিলাপ' নামে যে-গীতিকাটি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, সেখানে একটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আছে। মোগল সম্রাট শাহ্জাহান অশক্ত অথর্ব হয়ে পড়লে তাঁর তৃতীয় পুত্র ঔরংজেব তাঁকে কৌশলে আগ্রার দুর্গে বন্দী করেন। অতঃপর ঔরংজেব তাঁর মধ্যমভ্রাতা বঙ্গদেশের তৎকালীন শাসনকর্তা শাহ্ সুজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। সুজা বাদশাহী সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করে প্রাণ-ভয়ে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে আরাকানে পাড়ি দেন। পথে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় ভাইয়ের দ্বারা রাজ্যচ্যুত ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের। সুজা আরাকানে রাজ-আতিথ্য পেলেও পরে তাঁর কন্যার প্রতি আরাকান-রাজের আচরণে অপমানিত হন। শোনা যায়, রাজা নাকি রাজদ্রোহের অপরাধে সুজাকে বন্দী করে শেষ অব্দি হত্যা করেছিলেন। এই সম্পর্কিত নথিবদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে যে সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরীর পরিচয় ছিল তা পালাটির মুখবন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের দেওয়া উদ্ধৃতির সূত্রে জানতে পারা যায়। আশুতোষবাবু অনেকগুলি পালার সংগ্রাহক। গীতিকার সম্পাদকের সাক্ষ্যমতে এগুলি হল—নিজাম

ডাকাতের পালা, কাফেন চোরা, ভেলুয়া, হাতি খেদা, কমল সদাগর, সুজা তনয়ার বিলাপ, নছর মালুম ইত্যাদি। তিনি যে এগুলির সঙ্গে আমাদের আলোচ্য 'পোজলার পালা'-টিও সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেছিলেন, তার পাথুরে প্রমাণ বাংলা বিভাগের পুরনো জঞ্জালের মধ্যে লুকিয়ে থাকা, অধুনা উদ্ধারপ্রাপ্ত, তাঁর স্বহস্ত লিখিত ও নাম-স্বাক্ষরিত খাতাটি। খাতাটির ভিতর থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ পাওয়া গিয়েছে। একটি, তাঁর লেখা চিঠি ১২৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য); অন্যটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপানো বিল-ভাউচার, যেটি যথাযোগ্য পূরণ করে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ—এই তিন মাসের বেতন বাবদ মাসিক ৫০ টাকা হারে মোট ১৫০ টাকা দাবি করেছেন। এর থেকে কয়েকটি ব্যাপার অনুমান করা যায় : প্রথমত, আশুতোষ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত পালা-সংগ্রাহক হিসেবে অনেকদিন—প্রায় ১৩-১৪ বছর—কাজ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই সময়কালের মধ্যে তাঁর বেতনের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি, যেটা দেখা গিয়েছিল চন্দ্রকুমার দে'র ক্ষেত্রে। (১২.১২.১৯২৪ তারিখের সিন্ডিকেট মিনিটস্ দ্রষ্টব্য)। তৃতীয়ত, শারীরিক রোগজীর্ণতায় যখন তিনি কাতর ও অর্থাভাবে ক্লিষ্ট তখন এই বিল-ভাউচার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তাঁর অর্থ-সংকটের সুরাহা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটি যে কোন কারণেই হোক হিসাব-দপ্তরে (Accounts Dept) আর পৌঁছয়নি। বলা বাহুল্য, তিনি তাঁর প্রত্যাশিত টাকাটি সময়মত পাননি। সঙ্গের চিঠিটিও কয়েকটি কারণে মূল্যবান। সংগ্রাহক কোথা থেকে পালাটি সংগ্রহ করেছিলেন এবং পালার বিষয়বস্তু কী সেটা সংক্ষেপে লিখে জানিয়েছেন। তবে এই পত্রে সমুদ্র-সন্নিহিত জেলে জাতি সম্বন্ধে 'অনেক বৃত্তান্ত' পরে জানানোর কথা থাকলেও তা পাঠানো হয়েছিল কিনা, আমাদের জানা নেই। পাঠালেও তার খোঁজ মেলেনি। চিঠিটি কাকে লেখা সরাসরি তা বোঝা যায় না। এর লক্ষ্য দীনেশচন্দ্র সেন অথবা তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র দুই-ই হতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য যে, দীনেশচন্দ্র ১৯৩৯ সালে মারা গেলেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ১৯৩২ সালের ৩১মে। এখন, যদি দীনেশবাবুর কাছে এটি প্রেরিত হয় তাহলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে মুদ্রণের জন্য তদানীন্তন পরিচালকবর্গের হাতে এটি তুলে দিয়ে থাকতে পারেন। অন্যথায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র যদি এর প্রাপক হন তাহলে যে কোন কারণেই হোক এটি মুদ্রণ-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। মোট কথা, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি, এমন কি আশুতোষ চৌধুরীর লেখা চিঠিটিও। উৎসাহী পাঠকের জন্য প্রাপ্ত চিঠিটি পালাটির পূর্ব-ভূমিকা স্বরূপ এখানে হুবহু মুদ্রিত করে দেওয়া হলো ঃ

নিভৃত-নিলয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম ৯ই এপ্রিল ১৯৩৮

ঐকান্তিক শ্রদ্ধাভাজনেষু—

আপনার প্রেরিত বিল ফরম এবং পত্র যখন এখানে আসে, তখন আমি বঙ্গ-সমুদ্রের মাঝখানে ছিলাম। এই পালা সংগ্রহ করিতে আমি ক্রমাগত একমাসকাল অনেক দ্বীপ ও চড়াভূমিতে ঘুরিয়াছি। নানা দিক দিয়া এ পালাটি অপূর্ব্ব। বালুকাময় চড়াভূমিতে মাছ ধরা, হার্ম্মাদের আক্রমণ এবং নীরিহ (sic) জেলে জাতির প্রতি উপদ্রব এ পালার বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

এই পালার আরও খানিকটুকু বাকী আছে, তাহা আমি পরে পাঠাইতেছি। বাড়ী পৌঁছিয়া আমি পনরদিন পর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলাম। চারদিন গত হইল আমার জ্বর ছাড়িয়াছে। অসুখের মধ্যেও আমি ইহার ফুটনোট ইত্যাদি লিখিয়াছি।

সম্প্রতি টাকার বড় অভাবে পড়িয়াছি। তিনমাসের বেতন একসঙ্গে পাইলে বড়ই বাধিত হইব।

বঙ্গ সমুদ্রের উপকূলবর্তী ভূভাগে এখনও অনেক জেলে জাতি বাস করে। তাহারা একেবারে নিরক্ষর। সমুদ্র তাহাদের লীলাভূমি। তাহাদের মুখে আমি অনেক বৃত্তান্ত শুনিয়াছি। এই পালা সংগ্রহের বিবরিণীতে (sic) তাহাও আমি আপনাকে জানাইব।

আমার সশ্রদ্ধ নমষ্কার (sic) গ্রহণ করুন।

ইতি
স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রী আশুতোষ চৌধুরী

অথ পালারম্ভ।

Audit Register Page..................

Voucher No.

Cheque No.

....

Calcutta University..**Dr.**

To my salary for the month of January, February & [illegible] 1938,
@ the rate of Rs. 50/- per month (L.P.............) Rs.

Less Income Tax ( ) and Surcharge
( ) (L.P..........) ... Rs.
,, Provident Fund (L.P..........) ... Rs.
,, Repayment of loan (L.P.......) ... Rs.
,, Interest on loan (L.P..........) ... Rs.
,, Co-operative Credit Society's dues (L.P.)......... Rs.

Total Rs. Net Rs.

(Rupees One hundred & Fifty only.
....only.)

Signature Ashutosh Chowdhury

Received Payment

Designation......................................

Pay Rupees (Rs.........................)...

.....................................*only.*

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আশুতোষ চৌধুরী প্রেরিত পূরণ করা বেতন-রসিদ

পোজলার পালা

২য় দফা

সংগ্রাহক : শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
নিভৃত নিলয়, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

(৩)

গাঙের ঘাটে

ধুয়া　চৈক্ষেতে[১] অপরাজিতা, গায়ে চাম্বাফুল[২]।
চেংরা-পোলার[৩] মন উতলা দেখি কইন্যার চুল।।

সেই তো গেরামের মাঝে মাগন জালিয়া[৪]।
তার কথা কহি কিছু শুনরে মন দিয়া।।
বয়েস আঠার কুড়ি নবীন যৈবন।
সদাই আনন্দ রস হাসি খুসী মন।।
কোমরে বাঁধিয়া ডুলা হাতে লৈয়া জাল।
গাঙের কিনারে ঘুরে সকাল বিকাল।।

একদিন কি হইল শুন বিবরণ।
পোজলা আইলা ঘাটে সেয়ানের[৫] কারণ।।
গাঙ-সেয়ানে আইলা কইন্যা কলসী কাঁকে লই।
আচ্‌মান[৬] রাঙিয়া সুরুজ ডুপিয়া[৭] যার-গই[৮]।।
পুরাণ্যা[৯] জোয়ার হৈয়ে পানির বলাবল[১০]।
গাঙ-সেয়ানে আইসা কইন্যার অঙ্গ টলমল।।
হাঁটু জলে লামি কইন্যা মুখে কুলি ধরে।
এম্নিকালে মাগন জাইল্যা আইলো ঘাটের পরে।।
বার বচ্ছর গত হৈয়ে, তেরয় দিয়ে পা।
গলা-জলে লামি কইন্যা মাজন করের[১১] গা।।
ডুম্ব দিয়া উডি কইন্যা ঝাইড়া লইল চুল।
কাল ভোমরা দেখিয়ারে ভাবিয়া আকুল।।
ভিজা বসন লাগি গেল্‌-গই[১২] কইন্যার ভিজা গায়।
নতুন ডালম্বের কলি আল্‌গে দেখা যায়।।

---

১. চৈক্ষেতে—চক্ষে, চোখে। ২. চাম্বাফুল—চাঁপাফুল। ৩. চেংরা-পোলা—তরুণ যুবক। ৪. জালিয়া—জেলে, ধীবর। ৫. সেয়ানের—স্নানের। ৬. আচ্‌মান—আশমান, আকাশ। ৭. ডুপিয়া—ডুবিয়া। ৮. যার-গই—যাচ্ছে। ৯. পুরান্যা—পরিপূর্ণ। ১০. বলাবল—জোর। ১১. করের—করছে। ১২. গেল্‌-গই— গেছে।

পারেতে হিজল গাছ নুইয়া পড়ের[১৩] ডাল।
থিয়াই[১৪] দেখিছে মাগন হাতে লৈয়া জাল।।
সেই না কালে ছাম্নে[১৫] যে তার মাছে দিল লড়া[১৬]।
জাল ঘুরাইয়া মাগন পাগ মাইল্ল ত্বরা।।
মাছের উপরে ঘুরি পড়িল সে জাল।
বেগতিক দেখিয়ারে মাছে দিল ফাল[১৭]।।
কেমনে ছিঁড়িবে জাল ভাউ[১৮] সুতার বাণী।
বেহাল্যা[১৯] হইয়া মাছ করের টানাটানি।।
ঘুট্যাতে[২০] বাইজ্জাছে জাল মাছ রাখা দায়।
মনে মনে ভাবে মাগন কি হৈব উপায়।।
কলসী কাঁকে লৈয়া তখন পোজলা সোন্দরী।
তঁয়সা[২১] দেখিতেছিল ঘাটে একাশ্বরী।।
ভিজা বসন দিয়া কইন্যার ফুডি উইট্যে রূপ।
মাগনের বুগেতে পরাণ করের 'ধুপ' 'ধুপ'।।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মাগন কি কাম করিল।
পোজলা কইন্যারে একবার ইসারায় ডাকিল।।
কাছে আইলো সোন্দর কইন্যা, মাগন তাইরে বলে।
"যমুনা[২২] ধরিয়া রাখ ডুম্ব দিব জলে।।"
মাগনের কথা শুনি পোজলা সোন্দরী।
ধরিয়া রাখিল সেই যমুনার দড়ি।।
তার পরে ডুম্ব দিল মাছ ধরিবার লাই[২৩]।
যমুনা ধরিয়া কইন্যা রহিল থিয়াই।।
এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড যায়।
ডুম্ব যে মারিল মাগন ন উডিল হায়।।
সাত পাঁচ ভাবি কইন্যার অঙ্গ কাঁপে ডরে।
গাঙ-সেয়ানে আইসারে আইজ্জ পৈড়াছে ফাঁপরে।।
গা-আঁধারি[২৪] হৈয়ে তখন ঘাডে মানুষ নাই।
এক ধেয়ানে রৈল কইন্যা পানির মিক্যা[২৫] চাই।।

---

১৩. পড়ের—পড়ছে। ১৪. থিয়াই—দাঁড়িয়ে। ১৫. ছাম্নে—সামনে। ১৬. লড়া—নড়া, ঘাই। ১৭. ফাল—লাফ। ১৮. ভাউ—একজাতীয় শক্ত সুতো। ১৯. বেহাল্যা—নিরবলম্ব, অসহায়। ২০. ঘুট্যাতে—জলের ভিতর লুকনো গাছের গুঁড়ি। ২১. তঁয়সা—তামাসা। ২২. যমুনা—জলের উপরিভাগের দড়ি। ২৩. লাই—জন্য (< লাগিয়া)। ২৪. গা-আঁধারি—যে অন্ধকারে গা দেখা যায় না। ২৫. মিক্যা—দিকে।

কারে বা ডাকিবে কইন্যা এই না সৈন্ধা বেলা।
কেমন কইরে ঘাটে থাকে হইয়া একেলা।।
একবার ভাবে কইন্যা যাইতে ছাড়িয়া।
আর বার ভাবে কইন্যা মাগনের লাগিয়া।।
একমন বলে কইন্যার কেমন কৈরে থাকি।
আর মন বলে কইন্যার—'সেই যে গেছে রাখি।।
সেই যে গেছে রাখি—এখন কেমন কৈরে যাই।
আর কতইক্ষণ গাঙের ঘাটে রহিব থিয়াই।।'
ভাবিতে ভাবিতে কইন্যার অলছ তলছ[২৬] মন।
ক্ষাণিক বাদে মাছ লৈয়া উডিল মাগন।।
মস্ত এক রুহিত মাছ জালেতে বেড়াই।
কূলেতে তুলিয়া আনি দিল রে ফেলাই।।
ধড়ফড় করের মাছ মারের লেজাবাড়ি[২৭]।
পোজলারে কৈল মাগন—"শুনলো সোন্দরি।।
শুন লো সোন্দরী কইন্যা আমার মাথা খাও।
এই মাছ লৈয়া এখন ঘরে চইলা যাও।।"
পোজলা বলিল—"আমি কেমন কইরে নিব।
ঘরে আছে শুরুজন তারা গাইল[২৮] দিব।।
গাঙের ঘাটে আইলাম একা করিলাম দেরী।
পছন্দ না করে তারা এইসব তেরি মেরি[২৯]।।"
মাগন বলিল—"সেই যে ঘুট্যাৎ বাজিল্ জাল।
তেকারণে দেরী হৈল ঘটাইলাম জঞ্জাল।।
বুঝাই কইলে তারা তোমায় না দিব যে গাইল্।
আদিগুরি[৩০] সব কথা বুঝাই আইস্যম্ কাইল্।।
আমার মাথা খাওরে তুমি আমার মাথা খাও।
এই মাছ লৈয়া এখন ঘরে চইলা যাও।"
কইন্যা বলে—"ভরা কলসী কাঙ্কেতে লইয়া।
এই মাছ নিব আমি কেমন করিয়া।।"
মাগন বলিল—"চল মুই অ সঙ্গে যাই।
সৈন্ধার আঁধারে নতু উডিবা ডরাই।।"
আগে আগে চলে কইন্যা পাছেতে মাগন।
চমকি চমকি হায়রে উডের তারার মন।।

২৬. অলছ তলছ—এলোমেলো, উদ্‌ভ্রান্ত। ২৭. লেজাবাড়ি—লেজের আঘাত। ২৮. গাইল—গালি, কুকথা। ২৯. তেরি মেরি—বাজে কাজ, অসভ্যতা। ৩০. আদিগুরি—আদ্যোপান্ত।

(৪)

পেলারামের আতিথ্য

ঘরেতে আসিয়া কইন্যা বলে পেলারামে।
"দেরী যে হইল আমার গাঙ-সেয়ানের কামে।।
পেলারাম বলে—"কইন্যা শুন আমার বাণী।
একলা যাইয়া সৈন্ধাবেলা ন আনিও পানি।।
দুরন্ত পাড়ার লোকে দুত্মনি করিবে।
নানান কথা কহি তারা কলঙ্ক রটাইবে।।"
এই না বলিয়া বুড়া বাহিরে আসিল।
মাগনের সঙ্গে তার দেখা যে হইল।।
মাগন বলিল—"জেডা[1], আইজ্ঞ সৈন্ধ্যাবেলা।
এই মাছ ঘাডে[2] আসি কৈস্তেছিল খেলা।।
ছাম্‌নে যে পড়িল লড়া[3] পাইলাম বড় জো[4]।
মাছর উয়রে[5] আমি মাইল্লাম জালর খো[6]।।
ঘুট্যাতে বাজিল জাল মাছ রাখা দায়।
যমুনা ধরিতে তাই দিলাম পোজলায়।।
ধরিলাম মাছ আমি জলে ডুম্ব দিয়া।
এই মাছ আনিয়াছি তোমরার লাগিয়া।।"

বুড়া বলে—"একি কথা কহিলা মাগন।
তোমার মাছ আমার ঘরে রাখ্যম কি কারণ।।"
মাগন বলিল—"জেডা একি কথা কইলে।
মাছ ধরা দায় হইত পোজলা ন হইলে।।"
বুড়া বলে—"কাডিয়ারে[7] কিছু রাইখা যাও।
নেও ঘরে বাকি মাছ খাইবো বাপ ও মাও।।"
মাগন বলিল তখন জোড় করি হাত।
"পোজলা রাঁধুক মাছ আমি খাইয়ম ভাত।।"

বুড়া তখন সেই মাছ কাডিতে লাগিল।
ভালামতে কাডিকুডি রাঁধিতে যে দিল।।

---

১. জেডা—জ্যাঠা। ২. ঘাডে—ঘাটে। ৩. লড়া—নড়া, ঘাই। ৪. জো—সুযোগ। ৫. উয়রে—উপরে। ৬. খো—জাল নিক্ষেপ। ৭. কাডিয়ারে—কেটে।

পোজলা রাঁধিছে ভাত খুসী হৈয়া মনে।
পেডির[৮] মাছ ভাজা করি রাখিল তেলৈনে[৯]।।
মুড়া দিয়া মুড়ি খণ্ড রাঁধিয়া লইল।
তেলালী[১০] ঝোলালী[১১] করি বাকি মাছ রাঁধিল।।
খাইতে বইলো পেলারাম মাগনেরে লইয়া।
বড় ফোয়াদ[১২] পাইলো তারা সেই না খানা[১৩] খাইয়া।।

(৫)

গায়কের নিবেদন

তারপরে কি হইল শুন সভাজন।
কি হালে হইলো তারার পরথম মিলন।।
কি হালে বিরহ হইলো কি যাতনা পাইয়া।
সবার নিকটে এইসব যাইব আমি গাইয়া।।
কালুকা, গাহিয়াছিলাম আইজ্ঞ যে মনৎ[২] নাই।
সরস্বতী সদয় হৈলে দিব রে যোগাই।।
হরপখুন, একটি হরপ[৪] যদি যায় লড়ে।
দোহাই লাগে মা জননী তোমার বরাবরে।।
ডানে আইস সরস্বতী বামে বিদ্যাধর।
অধমের কণ্ঠে দাও নবীন কুইলার স্বর।।
গাহিয়াছি আগে আমি দুখ্খের বারমাসী।
তার অ আগের কথা বলি শুন সবে বসি।।
আগাগোড়ার যত কথা করি এক ধইর[৫]।
একে একে এ আসরে গাহিয়া যে যাইর[৬]।।
কথার পরে কথা আমার হৈয়ে লড়চড়।
তে কারণে ক্ষেমা মাগি সবার গোচর।।
দোহারী ভাই দোহার ধর ঠিক রাখ তাল।
কেহ যদি শোর কর হইবে বেনাল।।

---

৮. পেডির—মাছের পেটের অংশ। ৯. তৈলেনে—এক প্রকার মৃৎপাত্র। ১০. তেলালী—তৈলযুক্ত। ১১. ঝোলালী—ঝোলযুক্ত; 'তেলালী-ঝোলালী' বলতে তেল-মশলা দিয়ে ভালরকম সুস্বাদু রান্না বোঝায়। ১২. ফোয়াদ—স্বাদ। ১৩. খানা—খাবার।

১. কালুকা—কালকে, গতকাল। ২. মনৎ—মনে। ৩. হরপখুন—অক্ষর থেকে। ৪. হরপ—অক্ষর। ৫. এক ধইর—এক শ্রেণীবদ্ধ। ৬. যাইর—যাচ্ছি।

(৬)

আত্মসমর্পণ

ধুয়া কলঙ্কের ভয় রে আমার
কাল কলঙ্কের ভয়।
পিঞ্জরা ছাড়িয়া মন
বাতাসে উড়য়।।
মনে মনে ভাবে সদাই মাগন জালিয়া।
কেমনে করিবে সেই পোজলারে বিয়া।।
কেমনে পাইবে সেই আশকের ধন।
ছলভল[১] হৈল রে তায় উদাস্যা[২] যে মন।।
গাঙের ঘাটে তেঁতই গাছটা তেঁতই বেঁকা বেঁকা।
দুপুর কালে সেই না পন্থে দোনজনর দেখা।।
চলন খঞ্জনের মত কলসী কাঁকে লই।
জল ভরিতে যায় রে কইন্যা আপন ভোলা হই।।
মুখে দিল শিষ্ মাগন, কইন্যা চাইলো ফিরি।
চারি চোগর[৩] কথা আমরা বুঝিতে ন পারি।।
বাঁয়ে উড়ে আঁচলখানি গায়ে বিঁধে কাঁটা।
আজিকে চলিতে পন্থে হইল বিষম লেঠা।।
একাশ্বরী[৪] চলে কইন্যা পিছে ফিরি চায়।
কাউরা-মেউরা[৫] চুল বাতাসে উড়ায়।।
আগ বাড়িয়া[৬] বলে মাগন—"শুনরে পোজলা।
তোমার লাগিয়া আমার মন হৈছে উতলা।।"
কইন্যা বলে—"কথার কন কাজ নাই।
দেরী হৈলে বকা খইয়ম্ পন্থ ছাড় চা-ই[৭]।।"
মাগন বলিল—"কইন্যা শুন খাড়া হৈয়া।
চোগে ঘুম নাই আমার তোমার লাগিয়া।।
শুইলে সপ্পনে দেখি তোমার চান্দমুখ।
জুড়াও জুড়াও কইন্যা আমার খালি বুক।"
মাগনের কথা শুনি পোজলা তখন।
থিয়াই রহিল একটা গাছের মতন।।

---

১. ছলভল—চঞ্চল। ২. উদাস্যা—উদাস, উড়ু উড়ু। ৩. চোগর—চোখের। ৪. একাশ্বরী—একলা। ৫. কাউরা-মেউরা—কোঁকড়ানো। ৬. আগ বাড়িয়া—অগ্রসর হয়ে। ৭. চা-ই—দেখি।

মুখে নাই সরে কথা চোগ নাই লড়ে।
এই না পন্থে যাইতে আইজ্ঞ পৈড়াছে ফাঁপরে।।
পরথম বয়স কইন্যার পরথম যৈবন।
হাতে মানা করে কইন্যার 'না-না' করে মন।।
ছাড়াই দিতে চাহে কইন্যা মন লয় রেডি।
ঘাটের পন্থে আনাগোনায় হইল কিছু দেরী।।
ঘরেতে ফিরিল কইন্যা, ন ফিরিল মন।
কতদিন কৈল্ল কইন্যা গাঙ-সেয়ান বন[৮]।।
বাড়ীর পিছে হিজল গাছে বেড়িয়াছে লতা।
মনে মনে ভাবে কইন্যা মাগনের কথা।।

(৭)

বাধা

এইরূপে কিছুকাল গোজারিয়া[১] যায়।
মাগন মনের ভাব মায়েরে জানায়।।
মায় কৈল বাপের আগে সকল কাহিনী।
জ্বলিয়া উডিল বাপ জ্বলন্ত আগুনি।।
"বাইশটা গোরামের মাঝে আমরা দুর্দ্দার[২]।
পেলার ঘরে বিয়া কৈত্ত লৈজ্জা নাই তার।।
রাড়ীর ঘরে জনম পেলার বাপর ঠিক নাই।
বিয়া কৈত্ত চাহে পুতে তার না ঘরে যাই।।
একঘরিয়া[৩] পেলারাম নাই ছোয়া-ছানি[৪]।
তার ঘরৎ যে কনদিন খাই নাই পানি।।
চাম-রাঙা[৫] মাইয়া দেখি ভুলিল কি পুত।
পরখ করি ন চাইলো রে দুধ আর মুত।।
নিতা নিয়ন্ত্রণে[৬] গেলে আমি সিঁড়ি[৭] পাই।
আমার পুতে বিয়া কৈর্ব্ব পেলার ঘরে যাই।।
এ পুত ছাড়িব আমি কহিলাম আজ।

৮. বন—বন্ধ।

১. গোজারিয়া—গত হয়ে। ২. দুর্দ্দার—সর্দার, মণ্ডল। ৩. একঘরিয়া—একঘরে। ৪. ছোয়া-ছানি—ছোঁয়াছুঁয়ি, স্পর্শ। ৫. চাম-রাঙা—ফর্সা চামড়া। ৬. নিতা নিয়ন্ত্রণে—নিমন্ত্রণে। ৭. সিঁড়ি—উচ্চস্থান।

বিজন্মা[৮] পুতের লাগি পাইলাম বড় লাজ।"
আড়ালে থাকিয়া সব শুনিল মাগন।
পোজলারে ন পাইলে যে বিফল জীবন।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মাগন কিনা কাম করে।
রাতিয়া[৮] চলিয়া আইলো পেলারামের ঘরে।।
আদিগুরি[৯] সব কথা তাহারে জানাইয়া।
মাগন করিতে চাইলো পোজলারে বিয়া।।

(৮)

গোপন-বিবাহ

হানাই[১] কাঁসা ন বাজিলো ন বাজিলো ঢোল।
জয়াদি জোয়ার নাই নাইরে উতরোল।।
নাই হল মাস মঙ্গল অধিবাস আরো।
নিতা নিয়ন্ত্রণ নাই পাড়াল্যা[২] কাহারো।।
ন আইলো বৈরাতী আর কুল-পুরোহিত।
মা-ভৈনে যে ন গাহিল হাঁহলাব[৩] গীত।।
আষাঢ়ে বরিষার পানি ঝরে 'ঝর-ঝর'।
ঝিল্কি-ঠাডারের মাঝে আইলো বিয়ার বর।।
অষ্ট অলঙ্কার নাই নাইরে বিয়ার সাড়ি।
হুদা[৪] হাতে আইস্যে মাগন পোলারামের বাড়ী।।
হাত খালি পাও খালি খালি কইন্যার ঠেং।
লোচা[৫] উয়র[৬] লোচা আইয়ের[৭] ডাকের ভাউয়া[৮] বেং।।
রাইতে করে ঝিম্ ঝিম্ উয়ানালে[৯] ঝর[১০]।
হাতিনাতে[১১] পাডি[১২] বিছাই বইস্যে বিয়ার বর।।

পোজলার বাপ আসি কহে কাঁদি কাঁদি।
"এই কইন্যা দিলাম আমি তোমার গলাৎ বাঁধি।।
জালিয়া বংশের মধ্যে তোমরা পর্‌ধান[১৩]।
একারণে তোমায় কৈল্লাম কইন্যা সম্প্রদান।।

---

৮. বিজন্মা—বেজন্মা, জারজ। ৮. রাতিয়া—রাত্রিতে। ৯. আদিগুরি—আদ্যোপান্ত।

১. হানাই—সানাই। ২. পাড়াল্যা—প্রতিবেশী। ৩. হাঁইলা—পূর্ববঙ্গীয় বিবাহের গান, সখীত্বের গান। ৪. হুদা—খালি, শূন্য। ৫. লোচা—ফসলা। ৬. উয়র—উপর। ৭. আইয়ের—আসের। ৮. ভাউয়া বেং—এক জাতীয় ব্যাঙ। ৯. উয়ানালে—খুব বড়ো বড়ো ফোঁটায় খাড়াভাবে বৃষ্টি। ১০. ঝর—বৃষ্টি, বরিষণ। ১১. হাতিনাতে—ঘরের মধ্যাংশে। ১২. পাডি—পাটি। ১৩. পর্‌ধান—প্রধান।

জনম দিয়াছি সত্য দিই নাই ভাত।"
ইহা বলি বরর হাতৎ দিল কইন্যার হাত।।
পেলারাম আসি বলে—"শুন আমার বাপ।
শত দোষে দোষী হৈলে তাইরে[১৪] কৈরো মাপ।।
অবুঝ অবোধ মাইয়া ছলভল[১৫] মতি।
ন দিও রে দুখ্‌খ তাইরে ন দিও দুর্গতি।।"

তিন সত্য করি মাগন কহিল তখন।
এই কইন্যা হৈল আমার জীবনের জীবন।।
কিছু দিতে ন পারিলাম আমি যে অভাগা।
এই কইন্যারে কন দিন ন দিয়মরে দাগা।।
আচ্‌মান ভাঙ্গি পড়ি যাইব আঠাট্টা[১৬] ঠাডার[১৭]।।

রাইৎ নিশিথে কালা মেঘ বাতাসে উড়ায়।
শুকতারা নাই আইজ আকাশের গায়।।
ডান কানের মদন কড়ি বাঁ কানেতে দিয়া।
মাগন করিল সেই পোজলারে বিয়া।।
সাক্ষী রৈল কালা মেঘ বরিষার পানি।
গোপানে হইল বিয়া নাইরে জানাজানি।।

(৯)

বিদায়

এইরূপে কিছু দিন গত হৈলে পরে।
জোড় হাতে কয় মাগন মা-বাপর গোচরে।।
"কেমনে খাইব ভাত রুজি রোজগার নাই।
বৈদেশে[১] যাইয়া এখন করিব কামাই।।"
বাপেতে বিদায় দিল মায় কৈল্ল মানা।
পুতর মনর[২] যত কথা মায়ের কাছে জানা।।
আধ পিষ্ঠ[৩] খাইলো মায়ের গুয়ে আর মুতে।
আধ পিষ্ঠ খাইলো দারুণ মাঘ মাইস্যা শীতে।।
বৈদেশে বৈপাকে[৪] যদি পুত্র মারা যায়।
কেহ ন জানিবার আগে জানে কেবল মায়।।

---

১৪. তাইরে—তাকে, তারে। ১৫. ছলভল—চঞ্চল। ১৬. আঠাট্টা—কঠোর। ১৭. ঠাডার—বজ্র।

১. বৈদেশে—বিদেশে। ২. মনর—মনের। ৩. পিষ্ঠ—পিঠ। ৪. বৈপাকে—বিপাকে।

মাছে চিনে গহীন পানি পানিয়ে চিনে ধার[৫]।
মায়ে জানে পুতর বেদন যার গর্ভের সার।।

কারো কথা ন শুনিল মাগন জালিয়া।
রাইতর[৬] শেষে পারি দিল ছোড[৭] নুকা লৈয়া।।
গাঙে গাঙে ঘুরি মাগন গাঙে মাছ ধরে।
হাডে হাডে[৮] বেচিয়ারে কিছু পৈসা[৯] করে।।
ঝরে[১০] ভিজে রৈদে পোড়ে দুখ্খের সীমা নাই।
এইরূপে কৈল্ল মাগন শতেক কামাই[১১]।।
তারপরে একদিন চিন্তি মনে মনে।
জালিয়া খালের ঘাটে আইলো গোপনে।।
রাত্র নিশাকালে মাগন কি কাম করিল।
পেলারামের ঘরে আসি উপনীত হৈল।।
বটবালা[১২] আইন্যে ভালা টোপবালা[১৩] আর।
বরইফুইল্যা[১৪] সাড়ি আইন্যে দেইখ্তে চমৎকার।।
বরই ফুইল্যা সাড়ি রে ভাই মধ্যে মধ্যে ফুল।
সেই সাড়ির আইঞ্চলের বায়[১৫] মন বেয়াকুল।।
পোজলা পরিল সাড়ি বালা দিল হাতে।
পরাণ জুড়াইয়া যা-র[১৬] তাইর[১৭] মিক্যা[১৮] চাইতে।।
বেশী রাইত হৈল তারার খাইতে আর দাইতে।
নিশিথ রাইতে আইসা মাগন গেলা নিশিথ রাইতে।।

ঘাটেতে আসিয়া মাগন দিষ্টি করি চায়।
বাঁধা ছিল ছোড নুকা[১৯] নাইরে তথায়।।
খালেতে লামিয়া মাগন হাঁছুরি হাঁছুরি[২০]।
তোয়াইতে[২১] লাগিল নুকা বাঁকে বাঁকে ঘুরি।।
নুকা ন পাইয়া মাগন কি কাম করিল।

---

৫. ধার—নদীর জলসংলগ্ন তটভূমি। ৬. রাইতর—রাত্রির। ৭. ছোড—ছোট। ৮. হাডে হাডে—হাটে হাটে। ৯. পৈসা—পয়সা। ১০. ঝরে—বরিষণে। ১১. কামাই—রোজগার। ১২. বটবালা—রৌপ্যালঙ্কার বিশেষ। ১৩. টোপবালা—রৌপ্যালঙ্কার বিশেষ। ১৪. বরইফুইল্যা—একরকমের শাড়ি। এতে বরই অর্থাৎ কুলের ফুলের ছবি আছে। ১৫. বায়—বাতাসে। ১৬. যা-র—যাচ্ছে। ১৭. তাইর—তার। ১৮. মিক্যা—দিকে। ১৯. নুকা—নৌকা। ২০. হাঁছুরি হাঁছুরি—সাঁতরে সাঁতরে। ২১. তোয়াইতে—তল্লাস করতে, খুঁজতে।

হাঁডি হাঁডি[২২] উতর[২৩] মিক্যা চলিতে লাগিল।।
রঙ্গদিয়ায় আইলো মাগন তিন দিন পরে।
চাকুরী লইল এক টাউঙ্গা[২৪] জাইল্যার ঘরে।।
এখানে থাকিয়া মাগন বচ্ছর গোঁগুায়।
ঘরেতে পোজলা কইন্যা করে হায় রে হায়।।

(১০)

মাছ ধরিবার আড্ডা

কন বিধাতা আনি দিল সায়গরেতে[১] পানি।
জোয়ারে ভরিয়া উডে[২] ভাডাৎ[৩] টানাটানি রে
ভাডাৎ টানাটানি।।
দইনালী[৪] হাবা[৫] তোমার কন সায়গরে বাসা।
কার হুকুমে দেশ বিদেশে কর যাওয়া আসা রে
কর যাওয়া আসা।।
কালাপান্যা[৬] ধলাপান্যার পানি কালা-ধলা।
নোগর[৭] গোড়াৎ[৮] জান লৈয়া সেই না পন্থে চলা।।
বাঘখালির মুখের মতন খণ্ড[৯] আর নাই।
পাঁচ গৈরার[১০] ডাকে কাঁপে পেডর[১১] পিলাই।।
কুতুব দিয়া[১২] আলেপদিয়ার[১৩] মধ্যে একখান খেবা।[১৪]
মৈষখালীর[১৫] পাহাড়ে আছে আদিনাথ দেবা[১৬]।।
লালদিয়া সোনাদিয়া রাঙাবাল্যার চর।
হেই সব জাগা জাইন্য ভাইরে মাছর বাড়ী ঘর।।
পেরাবনর[১৭] গাইট্যা[১৮] গাছ নুনা পানিৎ[১৯] বাড়ে।
জোয়ারে ডুপিয়া আবার ভাডাৎ পানি ছাড়ে।।
মাছ ধরনের সুখ রে ভাই পেরাবনৎ গেলে।

---

২২. হাঁডি হাঁডি—*হেঁটে হেঁটে*। ২৩. উতর—উত্তর। ২৪. টাউঙ্গা—এক ধরনের মাছ ধরার জাল।

১. সায়গরেতে—সাগরেতে। ২. উডে—ওঠে। ৩. ভাডাৎ—ভাটায়। ৪. দইনালী—দক্ষিণ দিকের। ৫. হাবা—হাওয়া, বাতাস। ৬. কালাপান্যা—সমুদ্রের অংশ বিশেষ। এখানে জল কালোবর্ণ। ৭. নোগর—নখের। ৮. গোড়াৎ—গোড়ায়। ৯. খণ্ড—স্থান। বিপদসঙ্কুল স্থান অর্থে। ১০. পাঁচ গৈরা—এখানে পাঁচটি 'গৈরা' বা তরঙ্গ ক্রমান্বয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১১. পেডর—পেটের। ১২. কুতুবদিয়া—একটি ছোট দ্বীপ বিশেষ। ১৩. আলেপদিয়া—একটি চড়াভূমি। ১৪. খেবা—খেয়া। ১৫. মৈষখালী—একটি দ্বীপ বিশেষ। ১৬. দেবা—দেবতা। ১৭. পেরাবন—আগাছা পরিপূর্ণ চড়াভূমি। ১৮. গাইট্যা—এক রকমের গাছ। ১৯. নুনা পানিৎ—নোনা জলে।

আগজোয়ারে[২০] উডি রে মাছ পুর-জোয়ারে[২১] খেলে।।
বাডা[২২] মাছর হুরহুরানী ফান্ডা[২৩] মাছর ফাল[২৪]।
এক্কই[২৫] খোয়ে[২৬] ভরি উডে টেঁইয়া[২৭] টাউঙ্গা জাল।।
পেরাবন ছাড়িয়া গেলে দীঘল চরর বাঁকে।
তুরতুরাইয়া[২৮] ফাইস্যা[২৯] ফাত্রা[৩০] চরে ঝাঁকে ঝাঁকে।।

চরর ঠোঁডাৎ[৩১] বালু জাগা[৩২] নীলা নীলা পানি।
চাঁদা ছুরি[৩৩] ঘুরি বেড়ায় ভাডা[৩৪] আর উজানি।।
ঠোঁডা[৩৫] ছাড়ি গেলে রে ভাই নুনা পানির তলে।
লইট্যা[৩৬] রিশ্যা[৩৭] মরার মতন আস্তে আস্তে চলে।।
কালাপানিৎ কাউইন[৩৮] মাছ মস্ত মস্ত ঠোঁট।
হোঁতর[৩৯] মুয়ৎ[৪০] পাইবারে ভাই লাউখ্যা[৪১] ভোলর[৪২] ভোট।।

(১১)

রাঙাবালির চরে

লালছিতে পড়িলা মাগন ভুতে তারে পাইলো।
জাইল্যার নুকার[১] মাঝি হৈয়া রাঙাবাল্যাৎ[২] আইলো।।
দশ বার জন আইলো তারা বালাম[৩] নুকা লইয়া।
টং[৪] ঘর বাঁধিল এক কূলেতে উডিয়া।।
চাইল আইন্যে ডাইল আইন্যে দু মাসের খানা।
ফেউস্বা[৫] কেথা[৬] আইন্যে আর ঝুলঝুল্যা[৭] বিছানা।।
খাওনের মালমাত্তা[৮] টং ঘরের কোণে।
ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া তারা রাখিল যওনে।।

---

২০. আগজোয়ারে—জোয়ারের প্রথম অবস্থায়। ২১. পুর জোয়ারে—পরিপূর্ণ জোয়ারে। ২২. বাডা—বাটা। এক প্রকারের মাছ। ২৩. ফান্ডা—এক প্রকারের সামুদ্রিক মাছ। ২৪. ফাল—লাফ। ২৫. এক্কই—একই। ২৬. খোয়ে—খোপে। ২৭. টেঁইয়া—একপ্রকারের জাল। ২৮. তুরতুরাইয়া—তর তর করে। ২৯. ফাইস্যা—সামুদ্রিক মাছ বিশেষ। ৩০. ফাত্রা—সামুদ্রিক মাছ বিশেষ। ৩১. ঠোঁডাৎ—অগ্রভাগে। ৩২. জাগা—জায়গা, স্থান। ৩৩. ছুরি—এক প্রকারের সামুদ্রিক মাছ। ৩৪. ভাডা—ভাটা। ৩৫. ঠোঁডা—চরের অগ্রভাগ। ৩৬. লইট্যা—সামুদ্রিক মাছ বিশেষ। ৩৭. রিশ্যা—সামুদ্রিক মাছ বিশেষ। ৩৮. কাউইন—সামুদ্রিক মাছ বিশেষ। ৩৯. হোঁতর—স্রোতের। ৪০. মুয়ৎ—মুখে। ৪১. লাউখ্যা—এক প্রকারের সামুদ্রিক মাছ। ৪২. ভোলর—এক প্রকারের সামুদ্রিক মাছ।

১. জাইল্যার নুকার—জেলে নৌকোর। ২. রাঙাবাল্যাৎ—রাঙাবালির চবে। ৩. বালাম—এক ধরনের নৌকো। ৪. টং—অস্থায়ী লতাপাতা নির্মিত ঘর। ৫. ফেউস্বা—সেলাই-নষ্ট পুরাতন কাঁথা। ৬. কেথা—কাঁথা। ৭. ঝুলঝুল্যা—ঝুলঝুলে, ছেঁড়াখোড়া। ৮. মালমাত্তা—জিনিসপত্র।

পুষ মাস্যা[৯] শীতর কাল উতরালী[১০] বয়।
নানান পদর[১১] মাছ তারা ধরিয়া যে লয়।।
লোল্যাইচা[১২] চাগাইচা[১৩] জুইন্যা[১৪] ইটার টাল[১৫]।
চাঁদা ছুরি ফাঁইস্যা ফাত্রা ঘোঁয়রা[১৬] কোড়াল[১৭]।।
এমন মাছের জাগা তির ভুবনে নাই।
হুদিন মাসে[১৮] জাইল্যা আসে মাছ ধরিবার লাই[১৯]।।
জাল বোসাইলে জাল তোলন না যায়।
রাঙা বাল্যায় জাইল্যারা ভাই মাছর পিডা[২০] খায়।।
কত মাছ ধরিল তারা ন যায় গণন।
ভালা ভালা মাছ দিল শুকাইবার কারণ।।
শুকাইতে দিল তারা বালু চরৎ[২১] আনি।
হুকনি[২২] লৈয়া চিল শুকুনের পৈল্ যে টানাটানি।।
আচ্‌মান করিয়া রাঙা সুরুজ ডুপি[২৩] যা-র[২৪]।
রাঙাবাল্যার চরৎ জাইল্যা বাইসার[২৫] সারি গা-র[২৬]।
খঞ্জনী বাজায় কেহ কেহ ঘোযা[২৭] ধরে।
বড় করি ধুনি[২৮] জ্বাইল্যে ঠোঁডার[২৯] বালুর চরে।।

বাইসার সারি গান

দাঁড়ি ভাইয়া দাঁড় ধরিয়া
হেচ্‌কাই[৩০] মার টান;
ঐ পারেতে বঁধের বাড়ী
ঐ হুনা[৩১] যা-র[৩২] গান।
বঁধু আমার চিকন কালা
বাঁশী বাজায় ভালা ভালারে—
এ কূল ঐ কূল দুই কূল্যার[৩৩] পরাণ।

৯. পুষমাস্যা—পৌষমাসেব। ১০. উতরালী—উত্তর দিকের বাতাস। ১১. নানান পদর—নানা প্রকারের। ১২. লোল্যাইচা—এক ধরনের চিংড়ি। ১৩. চাগাইচা—এক ধরনের চিংড়ি। ১৪. জুইন্যা—এক ধরনের চিংড়ি। ১৫. টাল—স্তূপাকার। ১৬. ঘোঁয়রা—এক রকমের সামুদ্রিক মাছ। ১৭. কোড়াল—এক রকমের সামুদ্রিক মাছ। ১৮. হুদিন মাসে—হুদিন (< সুদিন)। হুদিন মাস বলতে আশ্বিন থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত বোঝায়। ১৯. লাই—জন্য (< লাগিয়া)। ২০. পিডা—পিঠা। ২১. চরৎ—চরে। ২২. হুকনি—শুঁটকি। ২৩. ডুপি—ডুবে। ২৪. যা-র—যাচ্ছে। ২৫. বাইসার—পাড়ি দেওযার। ২৬. গা-র—গাইছে। ২৭. ঘোযা—ধুয়া। ২৮. ধুনি—প্রকাণ্ড করে আগুন জ্বালানো। ২৯. ঠোঁডার—চরের অগ্রভাগের। ৩০. হেচ্‌কাই—জোরের সঙ্গে। ৩১. হুনা—শোনা। ৩২. যা-র—যাচ্ছে। ৩৩. দুইকূল্যার—দুই কূলবাসীর।

বঁধুর ঘরে মধুরে ঝরি
পড়ের[৩৪] টেবা টেবা[৩৫]
দাঁড়ি ভাইয়া দাঁড় ধরিয়া
পার করি দে খেবা[৩৬]।
বঁধু আমার আচ্‌মানেরি চান[৩৭]।
বঁধের বাড়ীৎ মৈষর[৩৮] দই
ছিক্কার[৩৯] উয়র[৪০] রইয়ে।
দিনে দিনে যাইতে পাইল্লে
খাইত দিব কইয়ে।
বঁধু আমার পরাণর পরাণ।
বঁধুর ঘরৎ ফুলর কেতা[৪১]
মাধ্যে মাধ্যে ফুল।
হৈন্ধ্যার[৪২] আগে পার ন হৈলে
হৈব বেয়াকুল[৪৩]।
বঁধু দিব সাঁচিবরর[৪৪] পান।

(১২)

হার্ম্মাদের আক্রমণ

রোসাঙ্গ্যার[১] সঙ্গে হৈল হার্ম্মাদ্যার[২] লড়াই।
হটিয়া হার্ম্মাদ্যার ডাকু[৩] গেল রে পলাই।।
ছুলুপ ছুলুপে[৪] ঘুরে কূলে নাই উড়ে[৫]।
নুকানারা[৬] পাইলে তারা জুইতে জুইতে লুড়ে[৭]।।
সেই দিন না সৈন্ধ্যাকালে কি কাম হইল।
ছুলুপেতে থাকি ডাকু দেখিতে পাইল।।
রাঙাবাল্যাৎ ধুনি[৮] জ্বলের মানুষ যেমন আছে।
চুপ্পে চুপ্পে ডাকুর দল আইলো চরর কাছে।।
রাইতে করে ঝিম্ ঝিম্ উতরালী বয়।

---

৩৪. পড়ের—পড়ছে। ৩৫. টেবা টেবা—ফোঁটা ফোঁটা। ৩৬. খেবা—খেয়া। ৩৭. আচ্‌মানেরি টান—আকাশের চাঁদ। ৩৮. মৈষর—মোষের। ৩৯. ছিক্কার—দড়ির তৈরি শিকে, যাতে হাঁড়ি কুড়ি রাখা হয়। ৪০. উয়র—উপর। ৪১. কেতা—কাঁথা। ৪২. হৈন্ধ্যার—সন্ধ্যার। ৪৩. বেয়াকুল—ব্যাকুল। ৪৪. সাঁচিবরর—এক প্রকারের উৎকৃষ্ট পান। ছাঁচিপান।

১. রোসাঙ্গ্যা—আরাকানী। ২. হার্ম্মাদ্যা—পর্তুগিজ জলদস্যু। ৩. ডাকু—ডাকাত। ৪. ছুলুপ—পর্তুগিজদের তৈরি পালের জাহাজ (< স্লুপ)। ৫. উড়ে—ওঠে। ৬. নুকানারা—নৌকো, জাহাজ ইত্যাদি জলযান। ৭. লুড়ে—লুটে নেয়, কেড়ে নেয়। ৮. ধুনি—কাঠ দিয়ে জ্বালানো বড় আগুন।

জাইল্যার টঙ্গে[৯] আইলা ডাকু এই না সময়।।
হারাদিন খাডি খুডি কেহ যা-র ঘুম।
বৌয়র হাতর ফেউস্বা[১০] কেথা গায়ৎ দিলে উম[১১]।।
কেহ ভাত বাড়ি লৈয়ে কেহ বসি খায়।
'ধর-মার' করিয়া ডাকু পশিল তথায়।।
আতাইক্যা[১২] পড়িল তারার বাড়া ভাতৎ ছালি।
কেহ লৈল বাঁশ গাছ কেহ দিল গালি।।

মাগন করিল ডাঙ্গা হাতে লৈয়া ছেল[১৩]।
এক্কই[১৪] বাড়ি খাইয়ারে তার পালু[১৫] ভাঙ্গি গেল্।।
ডাইলা[১৬] ভুতা[১৭] জাইল্যার জাত ন জানে মাইর মারা।
বহুত লানচান[১৮] পাইলো ডাকুর হাতৎ তারা।।
আসুরা পাসুরা[১৯] কিল চাইল্ল্যা[২০] বরাবর।
গুম্মর গুম্মর[২১] পৈত্তে[২২] লাগিল্ পিডের উয়র।।
মাইর খাইয়া জাইল্যার জাত ধড়ফড় করে।
কি কাম করিল ডাকু শুন তার পরে।।
চাইল লৈল ডাইল লৈল আর লৈল তেল।
মাল-মাত্তা[২৩] লুডি লৈয়া ছুলুপেতে গেল।।
লোক নাই বস্তি নাই রাঙাবাল্যার চরে।
মাইর খাইয়া যত জাইল্যা ভাবি চিন্তি মরে।।
মাল-মাত্তা নাই কিছু কি যে তারা খাইব।
কেমন করিয়া তারা দেশে ফিরি যাইব।।
দেশে আসা বড় দায় মাসেকের খেবা।
বেরাজি[২৪] হইল বিধি আর যত দেবা[২৫]।।
রাঙাবাল্যার কথা এখন থাকুক মজিয়া।
পোজলার কি হইল শুন মন দিয়া।।

---

৯. টঙ্গে—লতাপাতার দ্বারা নির্মিত অস্থায়ী ঘরে। ১০. ফেউস্বা—সেলাই-নষ্ট পুরাতন কাঁথা। ১১. উম—আরাম। ১২. আতাইক্যা—অতর্কিতে, হঠাৎ। ১৩. ছেল্—শেল। ১৪. এক্কই—একটি। ১৫. পালু—কোমরের নিম্নাংশ। ১৬. ডাইলা—দুর্বল বোঝাতে গালাগালি। ১৭. ভুতা—অপদার্থ। ১৮. লানচান—কষ্ট। ১৯. আসুরা পাসুরা—এদিক ওদিক। ২০. চাইল্ল্যা—চালতা। এক প্রকারের ফল। ২১. গুম্মর গুম্মর—কিলের গুম্ গুম্ শব্দ। ২২. পৈত্তে—পড়তে। ২৩. মাল-মাত্তা—জিনিসপত্র। ২৪. বেরাজি—বিরূপ। ২৫. দেবা—দেবতা।

(১৩)

বিপদে রক্ষা

মারা গেল পেলারাম মারা গেল বুড়ি।
কাঁদিল পোজলা কইন্যা গুজরি গুজরি।।
ভাইয়রে আনিল ঘরে একা থাকা দায়।
দুখ্‌খ-ধান্ধা[১] করিয়ারে কন মতে খায়।।
দিন গেল মাস গেল গেল যে বচ্ছর।
কার কাছে ন পাইলো রে সোয়ামীর খবর।।
দুখ্‌খের উপরে হায় দুখ্‌খ পৈল আসি।
মনের সন্তাপে কইন্যা গায় বারমাসী।।
একদিন রাঁধি কইন্যা তিন দিন খায়।
ভাতের গরাস কইন্যার পেডেতে ন যায়।।
ছিঁড়িয়া মৈলান[২] হৈল বরইফুল্যা[৩] সাড়ি।
বৈদেশী[৪] হৈয়াছে বন্ধু অভাগীরে ছাড়ি।।
ঘরে নাই সে প্রাণের পতি ঘর অন্ধকার।
শূন্যবুক ফাডিয়ারে উডের হাহাকার।।
শরীলে[৫] সহিত যত মনে ন সহিল।
বিরহ বিষের জ্বালা পরাণ দহিল।।
নবীন যৈবন কইন্যার হেলি পড়ের গাও।
ফুলেতে থাকিলে মধু ভর্‌মরার রাও।।
নবীন যৈবন কইন্যা কেম্নে রাখে ধরি।
আড়াল্যা পাড়াল্যা[৬] হৈল কাল পরাণর[৭] বৈরি।।
জলের ঘাটে যায়রে কইন্যা মুখে নাই রে হাসি।
কেহ চায় আড়ে ঠারে কেহ বাজায় বাঁশী।।

বুধা নামে ছিল এক লুচ্চা লোয়ন্দর[৮]।
পোজলার উয়রে[৯] তার পৈল্ল বদ্‌-নজর।।
একদিন সেই বুধা কিনা কাম করে।
পানর[১০] বিড়া[১১] লৈয়ারে গেলা পোজলার ঘরে।।
ভাঙা ঘরৎ বসি কইন্যা কুডের[১২] কচুহাক[১৩]।

---

১. দুখ্‌খ-ধান্ধা—দুঃখ যন্ত্রণা। ২. মৈলান—মলিন। ৩. বরইফুল্যা—এক রকমের শাড়ি। এতে বরই অর্থাৎ কুলের ফুলের ছবি অঙ্কিত। ৪. বৈদেশী—বিদেশী। ৫. শরীলে—শরীরে। ৬. পাড়াল্যা—প্রতিবেশী। ৭. কাল পরাণর—দুঃখিত প্রাণের। ৮. লুচ্চা লোয়ন্দর—লোভী বদমাস। ৯. উয়রে—উপরে। ১০. পানর—পানের। ১১. বিড়া—গোছা। কুড়ি গণ্ডা পানে এক বিড়া হয়। ১২. কুডের—কুটছে। ১৩. কচু হাক—কচু শাক।

এ সময়ে বুধা আসি দিল রে এক ডাক।।
বাহিরে চাহিয়া কইন্যা ফিরাইল মুখ।
ভাঙি দিতে আইস্যে বুধা কইন্যার ভাঙা-বুক।।
ন কহিল কথা কইন্যা ন দিল রে পিড়া।
ফিরি গেল-গই[১৪] বুধারাম লৈয়া পানর বিড়া।।

যৈবন হৈল কাল কইন্যার রূপ অ হৈল কাল।
আগুনি দেখিলে হায় রে ফেরুমের[১৫] ফাল[১৬]।।
সোনালী যৈবন কইন্যার রূপালী যৈবন।
এরে দেখি পাগল হৈল চেংরা[১৭] যুবার মন।।
একদিন কয়জনা যুক্তি করি সার।
রাতুয়া[১৮] চলিয়া আইলো ঘরে পোজলার।।
বুধারাম আইস্যে আর যত লুচ্চার দল।
রাজি ন হইলে আজি দেখাইব বল।।
ভাঙা বেড়া ছিড়া ছানি ঠুনি[১৯] লড়ে চড়ে।
ভাইয়রে লইয়া কইন্যা ফুতি[২০] পৈড়্গ্যে[২১] ঘরে।।
আধা রাইতে থরথরাইয়া কাঁপি উডিল্ ঘর।
দুয়ার ভাঙ্গি আইলো বুধা বিছানার উয়র।।
চোগে ঘুম নাইরে কইন্যার চোগে নাইরে ঘুম।
বুধার বজ্জাতি তখন হইল মালুম।।
হিথানে[২২] আছিল কইন্যার এক ধামা[২৩] দাও।
কোপ দিয়া কইল কইন্যা—"কি যে তুমি চাও"।।
হাত কাটা গেল বুধার রক্ত দরদর।
'মা-রে-মা' বলিয়া বুধা উডি দিল লড়[২৪]।।
সঙ্গেতে আছিল যারা তারাও ধাইলো।
দৈবের নির্ব্বন্ধে কইন্যা রক্ষা যে পাইলো।।

---

১৪. গেল-গই—চলে গেল। ১৫. ফেরুমের—ফড়িঙের। ১৬. ফাল—লাফ। ১৭. চেংরা—অল্প বয়সী। ১৮. রাতুয়া—রাত্রিতে। ১৯. ঠুনি—থাম। ২০. ফুতি—শুয়ে পড়া। ২১. পৈড়্গ্যে—পড়েছে। ২২. হিথানে—সিথানে, শিয়রে। ২৩. ধামা—বড়। ২৪. লড়—নড়, পলায়ন।

(১৪)

হার্ম্মাদের হাতে

শুন শুন সভার ভাইরে শুন দিয়া মন।
পোজলার কোপালে ছিল কি যে অঘটন।।
আড়াল্যা পাড়াল্যা[১] সবে কত কথা কইল।
হাঁচা[২] মিছা বানাইয়ারে কলঙ্ক রটাইল।।
কেহ বলে—"বেইশ্যার[৩] ঘর পুড়ি কর ছাই।"
কেহ বলে—"মারি পিডি[৪] দেয়রে ধাবাই[৫]।।"
সকলে মিলিয়া তখন যুক্তি করি সার।
গোপনে করিল এক বিহিত ইহার।।

সেই না সময়ে হায়রে হার্ম্মাদ্যার দল।
বাহের[৬] দরেয়ার[৭] মাঝে ঘুরিত কেবল।।
মগ্যা রাজার[৮] ডরে কেহ কূলে ন উডিত।
নুকা নারা পাইলে তারা লুডি মুডি নিত।।
মাইয়া মানুষ কিন্তু তারা সোনা মোহর দিয়া।
শেষ কাডালে[৯] জোর জোলমে[১০] করি নিত বিয়া।।
সেই তো হার্ম্মাদ্যার গুঁইয়া[১১] আইলো একজন।
বুধার সঙ্গেতে তার হৈল আলাপন।।
দরদস্তুর কথাবার্ত্তার হৈল ঠিকঠাক্‌।
গুঁইয়া বলে এখন একবার কইন্যা দেখা যাক।।

তারপরে কি হইল কহিয়া জানাই।
পোজলারে দেখি গেল হার্ম্মাদ্যারা আ-ই[১২]।।
পানশ[১৩] মোহর পাইলো বুধা খুশী হৈল মনে।
বাঁড়াচোরা[১৪] করি কিছু দিল সঙ্গীগণে।।
জাইল্যা খালর মুয়ৎ আইলো বড় ছুলুপ নুকা।
মা বাপে ঝিয়রে কৈল উহ্যইর[১৫] তলে লুকা।।
বৌয়রে ডাকিয়া কয় শাশুড়ী জননী।

১. আড়াল্যা পাড়াল্যা—পাড়া প্রতিবেশী। ২. হাঁচা—(< সাঁচা) সত্য। ৩. বেইশ্যার—বেশ্যার। ৪. পিডি—পিটিয়ে, মেরে। ৫. ধাবাই—দূর করে দেওয়া। ৬. বাহের—বাইরের। ৭. দরেয়ার—দরিযার, সমুদ্রের। ৮. মগ্যা রাজার—আরাকানী রাজার। ৯. শেষ কাডালে—শেষকালে। ১০. জোলমে—জুলুমে। ১১. গুঁইয়া—গুপ্তচর। ১২. আ-ই—এসে। ১৩. পানশ—পাঁচ শত। ১৪. বাঁড়াচোরা—ভাগ বাঁটোয়ারা। ১৫. উহ্যইর—ঘরের ভিতরকার মাচা।

গাঙের ঘাটে ন যাইও রে ন আনিও পানি।।
ঘরর বাহির ন হইও রে বাহিরে নৈদ্দ্য[১৬] পা।
খালর মুয়ৎ আইস্যে হুনির[১৭] হার্ম্মাদ্যার না।।

ওরে রাইতে করের ঝিম্ ঝিম্ আড়াপাড়ার[১৮] ঘুম।
পোজলার ঘরেতে দলা[১৯] পড়েব[২০] 'ধুম' 'ধুম'।।
ভাঙি যার-গই[২১] ঘর দুয়ার ভাঙি পড়ের ছানি।
সোর গোল করি উডিল পোজলা তখ্খনি।।
চিক্কির[২২] মাইত্য[২৩] লাগিল্ কইন্যা ডাকি পাড়াল্যারে।
কেহ ত ন আইলো তখন ন মাতিল[২৪] হায়রে।।
কেহ উডি ভালা করি ঠেঙ্গা[২৫] দিল ঝাঁপে।
ঘরর ভিতর বৌয়ে ঝিয়ে থরথরাইয়া কাঁপে।।

তারপরে যত ডাকু কিনা কাম করে।
পোজলারে বাঁধি লৈল কাঁধের উপরে।।
কন উপায় নাইরে কইন্যার কন উপায় নাই।
ছোড ভাইয়ে কাইন্ত[২৬] লাগিল গড়াই গড়াই।।
ঘাটেতে আছিল বাঁধা হার্ম্মাদ্যার নাও।
পোজলারে তার উপরে করিল চড়াও।।
দহিনালী[২৭] বয়ারেতে[২৮] পাল দিল তুলি।
চলিতে লাগিল ছুলুপ হেলি আর দুলি।।

(১৫)

নির্ম্মমতার একশেষ

হার্ম্মাদ্যার ডাকুগণে লৈয়া জাইল্যার ঝি।
জোড় কাড়া[১] বাজাই যার-গই[২] বাহার[৩] দর্জ্যা[৪]দি।।
হাত বাঁধা পাও বাঁধা নুকার ডেরায়[৫]।
মরার মতন কইন্যা ফুতি[৬] পৈল হায়।।

---

১৬. নৈদ্দ্য—না দিও < দিও না। ১৭. হুনির—শুনছি। ১৮. আড়াপাড়ার—পাড়া প্রতিবেশীর। ১৯. দলা—ঢিল। ২০. পড়ের—পড়ছে। ২১. যার-গই—যাচ্ছে। ২২. চিক্কির—চিৎকার। ২৩. মাইত্য—মারতে। ২৪. ন মাতিল—শব্দ করল না। ২৫. ঠেঙ্গা—ঝাঁপ খুলে রাখার বাঁশের লাঠি। ২৬. কাইন্ত—কাঁদতে। ২৭. দহিনালী—দক্ষিণ দিকের বাতাস। ২৮. বয়ারেতে—বাতাসেতে।

১. জোড় কাড়া—এক রকম বাদ্য। ২. যার-গই—যাচ্ছে। ৩. বাহার—বাইরের। ৪. দর্জ্যা—দরিয়া, সমুদ্র। ৫. ডেরায়—নৌকার তলদেশস্থ মধ্যভাগ। ৬. ফুতি—শুয়ে পড়া।

ফুতি পৈল পোজলা যে পিশুর মতন হই।
চলিল ছুলুপ জোরে দহিনালী[৭] লই।।

দুপুর বেলা আসি ডাকু আদর করি ডাকে।
কনমিক্যা[৮] ন চায় কইন্যা চুপ করি থাকে।।
হাধাহাধি[৯] কৈল্ল তারা খানাপিনা আনি।
ন খাইলো পোজলা কইন্যা এক ফোডা পানি।।
দিন গেল যেম্নে তেম্নে আইলো কাল রাইত্।
এ সময়ে কি না কাম করিল ডাকাইত।।
ডাকাইত্যার দুর্‌দার[১০] সেই মস্ত পলোয়ান।
এক এক হাত তার ঠুনির[১১] সমান।।
দুই পা দেখিতে যেমন দুইটা গাছর গোড়া।
বুগে কেশ গায়ে কেশ দাড়ি মুখ-জোড়া।।
রাইতর নিশি হৈয়ে তখন ছুলুপ চলের[১২] পালে।
ডেরাতে আসিল দুর্দ্দার সেই না নিশাকালে।।
এক হাতে ধরি ডাকু কইন্যারে তুলিল।
সেই হাত লোহার মতন কইন্যার মনৎ হৈল।।
দুর্দ্দার কহিল—"শুন ওরে হারামজাদী।
জোর জোলমে[১৩] এখ্‌খনি যে তোরে কর্য্যম[১৪] সাদি।।"
ইহা বলি সেই দুর্দ্দার কিনা কাম করে।
পোজলার মুখখান ধরি লাড়ে আর চাড়ে।।
হাতের বাঁধন খসায় ডাকু পায়ের বান্ধন।
দুর্দ্দারের পায়েতে কইন্যা জুড়িল কান্দন।।
"তুমি আমার ধর্ম্মর বাপ রৈক্ষা কর মোরে।"
দুর্দ্দার তখনি কইন্যার হাত ধৈল্ল জোরে।।
কইন্যা বলে—"রৈক্ষা কর, তুমি ধর্ম্মর বাপ।"
বারে বারে পায়ৎ পড়ি কইন্যা চাইলো মাপ।।
দুর্দ্দার কহিল তখন—"শুন হারামজাদী।
সোনা মোহর দিয়া কিন্নি[১৫] কৈর্ত্তাম[১৬] তোরে সাদি।।
পানশ মোহর লৈয়ে তারা যেমন তেমন নয়।
আইজ্জ যে আমি সাদি তোরে করিয়ম নিশ্চয়।।
সোনার মোহর নয়রে জাইন্য তেঁতই[১৭] বীচির দানা।

৭. দহিনালী—দক্ষিণ দিকের বাতাস। ৮. কন মিক্যা—কোন দিকে। ৯. হাধাহাধি—সাধাসাধি। ১০. দুর্‌দার—সর্দার। ১১. ঠুনির—থামের। ১২. চলের—চলছে। ১৩. জোলমে—জুলুমে। ১৪. কর্য্যম—করবো। ১৫. কিন্নি—কিনেছি। ১৬. কৈর্ত্তাম—করতাম। ১৭. তেঁতই—তেঁতুল।

আইজ যে তোরে লৈয়া আমি পুরাইয়ম্ কামনা।"
দুই চোগে ঝরে কইন্যার শাওনের পানি।
দুর্দ্দার তখ্‌খনি তাইরে ছামনে আইন্‌ল টানি।।
কইন্যা বলে—"সারাদিন আমি খাই নাই।
পেডর ক্ষুধায় মরি যাইর-গই[১৮] কিছু খাইতাম চাই।।"
দুর্দ্দার বলিল তখন—"এই যে ভাল কথা।
খাও দাও কাছে আস ন কর অন্যথা।।
আমরা বৈদেশী বন্ধু মোরা ভাল জাত।
আমার সঙ্গে সাদি হৈলে সুখ্‌খে খাইবা ভাত।"
কইন্যা বলে—"আমি একবার বাহিরে[১৯] যাইব।
তারপরে ভালা করি খানা খাইয়া লইব।।"

এইকথা শুনি দুর্দ্দার কইন্যারে লইয়া।
পন্থ দেখাইয়া দিল পাছিলে[২০] আসিয়া।।
ছোড এক দাহর[২১] আছে পাছিলের লাগা।
এ দাহর সক্কলের হাগা মুতার[২২] জাগা[২৩]।।
দাহরে উডিয়া কইন্যা নীচেতে চাহিল।
দরেয়ার কালাপানি দেখিতে পাইল।।
একবার ভাবি লইল মাগনের মুখ।
তারপরে পোজলা কইন্যা দড় কৈল্ল বুক।।
হায়! হায় রে!!
ছাড়ি দিল হাত কইন্যা ছাড়ি দিল পাও।
হায়! হায়রে!!
জোরেতে চলিছে ছুলুপ দইনালী বাও।।
হায়! হায়রে!!
'ঝুপ' করি আবাজ[২৪] হৈল চাহিল দুর্দ্দার।
ন দেখিল সে কইন্যারে ন দেখিল আর।।
হায়! হায়রে!!

পালর জোরে চলে ছুলুপ মাঝি ধৈরর্য্যে হাল।
দুর্দ্দার ডাকিয়া কয়—'ছামাল' 'ছামাল[২৫]'।।
পাল ছামালিতে তারার গেল কিছুক্ষণ।
তারপরে কি হইল শুন দিয়া মন।।

---

১৮. যাইর-গই—যাচ্ছি। ১৯. বাহিরে—পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য সুভাষণ রীতি। ২০. পাছিল—নৌকোর পশ্চাদ্‌ভাগ। ২১. দাহর—মই বা সিঁড়ি। ২২. হাগা মুতার—পায়খানা-প্রস্রাবের। ২৩. জাগা—জায়গা, স্থান। ২৪. আবাজ—আওয়াজ। ২৫. ছামাল ছামাল—সামাল সামাল, সাবধান।

ছুলুপের মুখ তারা ফিরাইয়া নিল।
যেখানে পড়িল কইন্যা সেইখানে আসিল।।
পানিতে লামিল[২৬] তারা দশ বার জন।
ন পাইলো ন পাইলো তারা কইন্যারে তখন।।
পোহাইয়া গেল বাইৎ ভাইট্যাল[২৭] বয়ার[২৮]।
কালাপান্যার পানিৎ ডাকু কইন্যারে তোয়া-র[২৯]।।

এই না সময়ে দুর্দ্ধার দুরমি[৩০] ধরি চায়।
দহিনখুন[৩১] আইয়ের নাও যেন দেখা যায়।।
একশো দাঁড়ে বায় নুকা তার উয়রে পাল।
দুর্দ্ধার ডাকিয়া কয়—"ঘটিল জঞ্জাল।।
মগর নুকা আইয়ের[৩২] বুঝি দেরী নাই কর।
মাঝি মাল্লা আসিয়ারে ছুলুপেতে চড়।।"
ধাইয়া গেল হার্ম্মাদ্যারা পিছমিক্যা[৩৩] ন চাইলো।
খানিক বাদে মগর নুকা কালাপান্যাৎ[৩৪] আইলো।।

(১৬)

জীবনপ্রাপ্তি

আচ্মানে সুরুজ উইট্যে দহিনালী[১] বয়।
মগেরা কইন্যারে দেখে পানিতে ভাসয়।।
কালাপান্যাৎ ভাসে কইন্যা যেমন চাম্বাফুল।
মাঝি মাল্লা দেখে কইন্যার লাম্বা মাথার চুল।।
দেখি হুনি[২] মগের মাঝি কি কাম করিল।
পোজলা কইন্যারে আনি নুকাতে তুলিল।।
কালাপান্যার পানি খাইয়া পেড উইট্যে ফুলি।
মাঝি মাল্লা চাইলো কইন্যার চোগর পাতা খুলি।।
দম[৩] যেন আছে বলি হেন লয় মনে।
তিয়িচ্ছা[৪] করিতে তারা লাগিল যত্তনে।।
ধীরে ধীরে পেডর উয়র দিতে লাগিল চাপ।
পানি বাহির হৈয়া গেল পেড হৈল ছাপ[৫]।।

---

২৬. লামিল—নামিল। ২৭. ভাইট্যাল—মৃদু। ২৮. বযার—বাতাস। ২৯. তোয়া-র—তল্লাস করছে, খুঁজছে। ৩০. দুরমি—দূরবীণ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ৩১. দহিনখুন—দক্ষিণ দিক থেকে। ৩২. আইয়ের—আসছে। ৩৩. পিছমিক্যা—পিছনের দিকে। ৩৪. কালাপান্যাৎ—কালাপানি নামক স্থানে।

১. দহিনালী—দক্ষিণ দিকের বাতাস। ২. হুনি—শুনে। ৩. দম—শ্বাস, প্রাণ। ৪. তিয়িচ্ছা—চিকিৎসা। ৫. ছাপ—পরিষ্কার (< সাফ)।

পরে তারা দেখে কইন্যার চোগর পাতা লড়ে।
মগর মাঝি ভাবি চিন্তি উডিল বালুর চরে।।
বালুচরে উডিয়ারে কি কাম করিল।
ধুনি[৬] একখান জ্বালিয়ারে কইন্যারে ছেগিল[৭]।।
ছেগিতে ছেগিতে কইন্যার গা যে হৈল লাল।
নাগেতে[৮] শোয়াস[৯] পৈল ঘুচিল জঞ্জাল।।
খাইতে দিল ভালা পানি আর লেম্বু ফল।
খাইয়া দাইয়া পোজলার গায়ৎ হৈল বল।।
পোজলারে ডাকিয়ারে কয় মগর মাঝি।
কন দেশেতে বাড়ী তোমার কণ্ডে যাইতে রাজি।।
পোজলা কাঁদিয়া কহে—"ডাকাইত তোমরা।
মরিতে ছিলাম আমি ভালা আছিল মরা।।"
ইহা বলি সেই কইন্যা ঝম্প দিতে চায়।
হাতে ধরি মাঝি মাল্লা আনে তাইরে নায়।।

মগের নুকার মাঝে রোয়াজা[১০] আছিল।
সে আসিয়া পোজলারে হাম্য[১১] যে করিল।।
রোয়াজা কহিল—"তুমি আমার ধর্ম্মর মাইয়া।
রাখি আইস্যম তোমারে যে তোমার বাড়ীৎ যাইয়া।।
ন করিও ডর ভয় মোরা মগর জাত।
তোমার শরীলে কেহ ন দিব রে হাত।"
কইন্যা বলে—"হৈলা যদি তুমি ধর্ম্মর বাপ।
মরিতে দেও রে মোরে পানিৎ দিয়ম ঝাঁপ।।"
রোয়াজা বলিল—"কইন্যা আমার মাথা খাও।
যেই দেশেতে বাপ মা আছে সেই দেশেতে যাও।।
কইন্যা বলে—"সেই দেশেতে মাইন্‌সে মানুষ খায়।
হাত পা বাঁধিয়া মোরে ভাসাইল দৰ্জ্যায়[১২]।।"
রোয়াজা বলিল—"কইন্যা বল দেখি শুনি।
কেমনে লাগিল তোমার কোপালে আগুনি।।"
আগাগোড়া যত কথা কহিল পোজলা।
শুনিয়া রোয়াজার চোগ[১৩] হৈল রে জল্‌জলা[১৪]।।

---

৬. ধুনি—কাঠ দ্বারা আগুন জ্বালানো। ৭. ছেগিল—উত্তপ্ত করলো। ৮. নাগেতে—নাকেতে। ৯. শোয়াস—শ্বাস-প্রশ্বাস। ১০. রোয়াজা—সর্দার, দলপতি। ১১. হাম্য—শান্ত। ১২. দৰ্জ্যায়—দরিযায়, সমুদ্রে। ১৩. চোগ—চোখ। ১৪. জল্‌জলা—অশ্রুপূর্ণ।

গীতিকা—পর্যালোচনা

পুথি-নির্ভরতা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। শিষ্ট, বিদগ্ধ, অপেক্ষাকৃত অভিজাত সাহিত্যের বাহন ছিল পুথি। কিন্তু কাগজ-কলম-কালির জগতের বাইরে যে আরো একটি ভাববিশ্বের অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ মিলেছে মৌখিক সাহিত্যে। আপাত-দৃষ্টিতে যাঁরা ছিলেন অনক্ষর, অপণ্ডিত, বিপুলভাবে কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল, বিদ্যাদাত্রী দেবী যাঁদের প্রতি কোন কৃপাবর্ষণ করেননি, তাঁরা যে পুরোপুরি সাহিত্যরস বিমুখ ও বঞ্চিত ছিলেন—একথা বলা চলবে না। তাঁদের আস্বাদিত সেই রস-সম্ভারের পরিচয় পাওয়া যায় গ্রাম্য ছড়া ও ধাঁধায়, প্রবাদ-প্রবচনে, পল্লীগীতি ও গীতিকায়, লোককথা ও নানা কিংবদন্তীতে। এইসব লৌকিক সৃষ্টির মধ্যে গীতিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গীতিকা আয়তনে সচরাচর এদের মধ্যে সবার বড়ো, প্রকৃতিতে কিছুটা জটিল, বিবরণধর্মিতা ও নাটকীয়তায় তা অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার ঘটায়। আবার ঘটনার একমুখিনতায় তার মধ্যে ছোটগল্পের পূর্বাভাস লক্ষ করা যায়। লোককথায় যেমন আখ্যানের দেখা মেলে গীতিকাতেও তাই। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে একটা জায়গায় সূক্ষ্ম তফাৎ রয়েছে। লোককথায় উপজীব্য হতে পারে রাজা-রাজপুত্র-রাজকন্যা, রাক্ষস-খোক্কস, জিন-পরী, নানা ধরনের পশু-পাখি-প্রাণী, থাকতে পারে অতিলৌকিক অনেক উপাদান; কিন্তু গীতিকা মূলত সামাজিক মানুষ-নির্ভর, বাস্তবতা-সম্পৃক্ত মানবজীবন, সেই জীবনের সংকট ও সংশয়, আনন্দ ও বেদনা কাহিনীর পরিসরে মুখ্য স্থান লাভ করে। কেউ কেউ এমনটাও বলেন, মানব-মানবীর প্রেমই গীতিকার প্রধান উপজীব্য। বস্তুত লোককথার মতো গীতিকা কোনমতেই শিশুতোষ রচনা নয়, এর বিষয়বস্তুতে প্রাপ্তমনস্কের সমস্যাই মুখ্যত প্রতিফলিত।

গীতিকা কেবল এদেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসমাজে মৌখিক সাহিত্যধারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে বর্তমান। তবে সর্বত্র সে একই অভিধায় অভিহিত নয়, এমনকি তার অবয়বগত—কিছু কিছু ক্ষেত্রে চরিত্রগত—তফাৎও দেখা যায়। বাংলা গীতিকাগুলির আবির্ভাব ঠিক কোন সময়ে হয়েছিল তা বলা বেশ মুশকিল। তবে গবেষকরা অনুমান করেন, এর অধিকাংশ কাহিনীর জন্ম নয়া বণিকতন্ত্রের আগেকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে। অধ্যাপক ধীরেন্দ্র দেবনাথ লিখেছেন, 'পূর্ববঙ্গ গীতিকার বেশীর ভাগ পালাই ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে লেখা। বাংলা এ সময়ে মুঘল শাসনাধীনে। কিছু পালা হয়তো আরও আগেকার—চর্তুদশ শতক পর্যন্ত এই পশ্চাৎ-সীমা হতে পারে। ....গীতিকাগুলির অধিকাংশ পালাই—বিশেষত প্রণয় গাথাগুলি মুঘল শাসনকালের রচনা বলেই মনে হয়।' অতএব মধ্যযুগের মৌখিক ধারার সাহিত্য-সামগ্রী হিসেবে বাংলা গীতিকাগুলিকে গ্রহণ করা চলে এবং এ তথ্য স্মরণে রেখে এটাও বলা চলে যে, মধ্যযুগে ধর্মবিমুক্ত সাহিত্যধারা হিসেবে গীতিকা যে-দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে তা সেকালের নিরিখে তুলনারহিত। সে অন্য কিছুর দ্বারা প্রভাবিত নয়, তার কাহিনী সমূহের কোন অভিজাত কেতাবী-উৎস নেই, জীবনচিত্র প্রতিফলনের ক্ষেত্রে সে কোন অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশকেই গ্রাহ্য করেনি। তার অধিকাংশ কাহিনী বিয়োগান্তক, যা সেকালের সাহিত্য-প্রথা-বিরোধী। এই স্বভাব-বিদ্রোহের ধ্বজা উত্থিত করেই অনক্ষর লোক-সমাজের গভীরে অখ্যাত অনাদৃত গীতিকাসমূহের আবির্ভাব।

তত্ত্ব-কথা ঃ

বাংলা গীতিকা ও ইংরেজি ব্যালাড-এর মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও বিদ্যাচর্চার জগতে শব্দদুটি সমার্থক তাৎপর্যেই ব্যবহৃত হয়। বিদেশে ব্যালাড নিয়ে বিদ্বজ্জনদের ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে গীতিকা বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে মাত্র এক শতাব্দী আগে। ব্যালাডের সংজ্ঞা নির্ধারণ বিষয়ে পশ্চিমে যে নানা মুনির নানা মত দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ বিভিন্ন দেশের ব্যালাডে বিভিন্ন ধরনের অবয়ব ও অন্তর-গত বৈষম্য আছে। অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো সংজ্ঞা নির্মাণকারীদের ভাবনার খণ্ডতা সেখানে পদে পদে অনুভূত হয়। কোন কিছুর সংজ্ঞা তো আসলে তার সব স্ফুটমান বৈশিষ্ট্যেরই বীজীভূত সমাহার। ফলে সংজ্ঞা হিসেবে তাকেই আপাতাভাবে গ্রাহ্য করা চলে, যেখানে এই বিশেষ চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend'-এ ব্যালাডের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটা এই রকম : 'A ballad is story of the four elements common to all narratives, action, character, setting and theme–the ballad emphasizes the first. Setting is casual; theme is often implied; Characters are usually types and even more individual are undeveloped but action carries the interest. The action is usually highly dramatic.' আর বাংলায় গীতিকার অনেকগুলি সংজ্ঞা লভ্য হলেও মোটামুটি পূর্ণাঙ্গতার কারণে আমরা নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করছি—'জটিলতামুক্ত মূলতঃ একটি ঘটনাকেন্দ্রিক আখ্যান, সচরাচর যা জনপ্রিয়, নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে কোনো প্রকার নীতি-উপদেশে ভারাক্রান্ত না হয়ে, সারল্যকে রক্ষা করে, অপরিণত চরিত্রকে উপলক্ষ্য করে, ঘটনা ও সংলাপকে আশ্রয় করে গোষ্ঠী বিশেষের মানসিকতা সঞ্জাত হয়ে অজ্ঞাত পরিচয় রচয়িতার আত্মনির্লিপ্তির পরিচয়বাহী, মৌখিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাকৃতির স্তবকে রচিত যে সঙ্গীত, তাই হল গীতিকা।'

উপস্থাপনা প্রকরণের বিচারে গীতিকা সর্বাংশে সংগীতনির্ভর। গীতিকার আখ্যান দীর্ঘ পালাগানের আকারে সংগ্রথিত। এর কাহিনীর মধ্যে স্পষ্ট ঘটনাক্রম লক্ষ করা যায়। পালা সংগ্রাহকরা একাধিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে সমগ্র আখ্যানটিকে গায়েনদের মুখ থেকে উদ্ধার করেছেন। গীতিকার গল্পাংশ খুব দীর্ঘ হয় না। মূল কাহিনীর বাইরে শাখা-কাহিনীরও বিশেষ অস্তিত্ব থাকে না। গল্প মোটামুটি একরৈখিক ও চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে বেশি যত্নবান। সংগীতের সূত্র ধরে ধুয়ার প্রয়োগ রয়েছে গীতিকায়। রক্তমাংসের মানব-মানবীর দেহাশ্রিত ও দেহাতিরিক্ত প্রেমই অধিকাংশ গীতিকার প্রধান উপজীব্য। তবে তার বাইরেও নানা সামাজিক প্রসঙ্গ গীতিকায় অবলম্বিত হতে দেখা গেছে। কোন কোন গীতিকা হয়তো চকিতে স্পর্শ করে গেছে অতীত ইতিহাসের কোন স্মরণীয় অধ্যায়।

প্রতিটি সাহিত্য-সংরূপেরই থাকে কিছু না কিছু নিজস্ব গোত্র-চিহ্ন। বাংলা গীতিকা মৌখিক রীতির সাহিত্য হলেও এই বিশেষত্ব-বর্জিত নয়। সমালোচকেরা দেখেছেন যে, গীতিকার সূচনাতে থাকে বন্দনা অংশ, মাঝের কোন অংশে কখনো-সখনো বারমাস্যা, সবশেষে থাকে পরিসমাপ্তিসূচক কোন বিবৃতি। এছাড়া কাহিনীকে আকর্ষণীয় কিংবা আবর্তময় করে তোলার জন্য গীতিকার রচয়িতারা উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করেন চিঠিপত্র, স্বপ্নদর্শন কিংবা অতিলৌকিক কিছু প্রসঙ্গ।

কোন কোন গীতিকায় চমৎকার প্রকৃতি-চিত্রণের উপস্থিতিও লক্ষ করা গিয়েছে। আর আছে গীতিকার চরিত্রগুলিতে নিপুণ মনস্তত্ত্বের ব্যবহার। 'ছোট প্রাণ ছোট কথা/ছোট ছোট দুঃখ-ব্যথা/নিতান্তই সহজ সরল'— ছোটগল্প সম্পর্কে এই রবীন্দ্র-সুভাষণ খুব খেটে যায় বাংলা গীতিকাগুলির ক্ষেত্রেও। তত্ত্বহীনতা, বর্ণনার অ-বাহুল্য এবং সমাপ্তির পর শ্রোতা বা পাঠকের অতৃপ্তি—এইসব কিছু মিলিয়ে পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলি সত্যসত্যই বাংলা ছোটগল্পের যথার্থ পূর্বসূরী। উপনিবেশ-পূর্ব যুগে বাংলা গদ্যের তেমন সাহিত্যিক চল ছিল না বলেই হয়তো এভাবে আখ্যান রচনার নতুন এক কৌশলের জন্ম দিয়েছিলেন নিরক্ষর গ্রাম্য অপাংক্তেয় লোককবিরা। বাংলা গীতিকাগুলি আর যে-কারণে দেশী-বিদেশী সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ সেটি হল সহজ সরল কাহিনীর মধ্যে তদানীন্তন কালের সমাজচিত্রের সার্থক প্রতিফলনে। বিরুদ্ধ সামাজিক পরিবেশে প্রাণস্পন্দিত নরনারীরা নিজের ইচ্ছা ও মনোবৃত্তির দ্বারা যেভাবে চালিত হয়েছে, বিপরীত শক্তির সংঘর্ষে উন্মথিত হয়েছে, প্রয়োজনে মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করেছে—জগতে তার দৃষ্টান্ত বিরল। পশ্চিমী সমালোচকদের সপ্রশংস অভিনন্দন কুড়িয়েছে প্রেমে নিঃশঙ্কিনী স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকারা। দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২৩ সালে 'Eastern Bengal Ballads, Mymensing' গ্রন্থটি প্রকাশ করলে রসিক ইংরেজ পাঠকবর্গ যে-অভিমত ব্যক্ত করেন তা বাংলা গীতিকাগুলির মূল্যায়নে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। প্রাসঙ্গিকভাবে দু'একটি অভিমত এখানে উদ্ধৃত করছি :

(ক) ১৯২৪ সালের অক্টোবরে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে F.E. Pargiter লিখেছিলেন—'The stories are charming, both happy and tragic and are told generally in simple language fresh with country scenes and feeling and illustrated with pretty sketches by a Bengali artist.'

(খ) William Rochenstein-এর মতে, 'Through every ballad moves that marvellous being–exalted, grave, shy and passionate, reserved and hold–and how nobly beautiful–the Indian Woman, she has remained unchanged through all the phases of Indian culture, religious and social.' একই সঙ্গে এঁর আরো একটি সংযোজন—'It is of the greatest possible interest and full of beauty and of drama.'

(গ) E.F. Oaten লিখেছিলেন—'....these ballads, straight from the unsophisticated people's heart, come fresh and stimulant as the breeze that revives the jaded traveller from Calcutta as he sits in steamer and ploughs accross the monsoon gust of Eastern Bengal.'

(ঘ) ১৯২৪ সালে বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরকে একটি চিঠিতে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত গ্রন্থটি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন—'It is clear from these publications that the line of research now being pursued by Dr. Sen, is of great interest and importance. If as Dr. Sen states these poems range in date from the 16th to the 19th Century they must obviously possess great literary and historical significance. A glance at the poems so far published shows that they throw much light on the social history of that part of Bengal, where they took their rise.'

পালা-সংক্ষেপ ঃ

আমাদের আলোচ্য 'পোজলার পালা' বাংলা গীতিকাগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটি পূর্ববর্তী কোন গীতিকা-সংকলনেই স্থান পায়নি। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় 'অসীম অধ্যবসায়শীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী' এটি যেখান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তার সূত্রে পালাটিকে অবশ্য 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র সংকলনভুক্ত করা যেতো। যে কোন কারণেই হোক তা বাস্তবায়িত হয়নি। আবার, পরবর্তী কালে বাংলার আর এক প্রথিতযশা গীতিকা-সংগ্রাহক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকও অন্য অনেক নতুন গীতিকার সন্ধান পেলেও 'পোজলার পালা' তাঁর সন্ধানী-দৃষ্টির আড়ালে রয়ে যায়। তাই এর আখ্যানটি এখনও পর্যন্ত অনাস্বাদিতপূর্ব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, গীতিকাটি যেভাবে আমাদের হাতে এসেছে তাতে সমগ্র আখ্যানটি পাওয়া যাচ্ছে না। লব্ধ অংশটি সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরীর ভাষায় '২য় দফা'। এ থেকে অনুমান নিশ্চয়ই '১ম দফা' ছিল এবং হয়তো বা সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়েছিল। আবার পত্রের একস্থানে তিনি লিখেছেন, 'এই পালার আরও খানিকটুকু বাকী আছে, তাহা আমি পরে পাঠাইতেছি।' এ থেকে মনে হয় '৩য় দফা' বলে হয়তো আরো একটা অংশ ছিল, যা পাঠানোর কথা এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আদি ও অন্ত কোনটাই না হাতে আসায় অনেকের কাছে এর উপাখ্যানাংশ খাপছাড়া বলে মনে হবে। তবে দ্বিতীয় দফার যতটুকু পাওয়া গিয়েছে তাতে একটা গোটা গল্পের চালচিত্রের আভাস পাওয়া যায়—এইটুকুই যা ভরসা। অলমিতি। গল্পারম্ভ।

কাহিনীর তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে প্রাপ্ত খাতার আখ্যান ভাগের সূচনা। প্রথমেই ধুয়া। পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'গাঙের ঘাটে'। কাহিনীর নায়িকা পোজলা এক ধীবর কন্যা। তার বয়স বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়েছে। ভরন্ত কিশোরী। জল ভরার জন্য নদীর ঘাটে তার আগমন। কবির চোখে পোজলার রূপ অতি প্রগাঢ়—'চৈক্ষেতে অপরাজিতা গায়ে চাম্বাফুল।' মেঘসদৃশ তার কৃষ্ণ কেশরাশি, যা দেখে যুবা পুরুষের মন হয় উতলা। সেই ধীবর পল্লীর সন্তান মাগন জালিয়া। বয়স তার আঠার কি কুড়ি। যৌবনের চাঞ্চল্যে সে নিত্য উচ্ছল। নদীর নির্জন ঘাটে রূপবতী পোজলাকে দেখে মাগন উতলা হয়ে ওঠে। একদিন স্নান করতে আর জল ভরতে পোজলা এল নদীর ঘাটে। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে পাটে বসেছে। হাঁটু জলে নেমে পোজলা গাত্র-মার্জনায় ব্যস্ত। এমন সময় চুপিসাড়ে মাগন এল জাল নিয়ে। পূর্ণ জোয়ারের জল তখন কূলপ্লাবী। নবীন আনন্দে পোজলা ঘরে ফেরার আগে জলে ডুব দিয়ে এল। এ সবই মাগন লক্ষ করছিল নদীর পাড়ে বেঁকে দাঁড়ানো হিজল গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে। গাথাকার স্নানসিক্তা পোজলার ভরা যৌবনের ছবিটিকে মূর্ত করে তুলেছেন মাগনের সেই লোলুপ দৃষ্টির ভাষায়—

> ভিজা বসন লাগি গেল্-গই কইন্যার ভিজা গায়।
> নতুন ডালম্বের কলি আল্‌গে দেখা যায়।।

ঠিক সেই সময়ে জলের বুকে মাছের নড়াচড়া দেখতে পেল মাগন। মুহূর্তে সে জাল নিক্ষেপ করলো তার উপর। জালে মাছ পড়লেও সেটি গিয়ে আটকালো জলের নীচে পড়ে থাকা কাঠের গুঁড়িতে। অভিজ্ঞ জেলে মাগন বুঝলো, গাঠের জোরে জাল টানলে গুঁড়িতে আটকানো জাল ছিঁড়ে গিয়ে মাছ পালিয়ে যাবে। তখন সে ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা সিক্তবসনা পোজলাকে

জালের উপরিভাগের দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললো। তখন পোজলা আর কী করে, সেই নির্দেশ মতো জালের দড়ি ধরে ঠায় তীরে দাঁড়িয়ে রইলো। মাগন এবার দক্ষ ডুবুরির মতো মাছ ধরবার জন্য জলে ডুব দিল। দীর্ঘ সময় চলে গেল তবু মাগন উঠলো না। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার দ্রুত নেমে আসছে। ভীত ও চিন্তিত হল পোজলা। নদীর ঘাট নির্জন। অনেক বিপদই ঘটতে পারে। বিশেষ করে ভয় পেতে লাগল বাড়ির গুরুজনদের—তিরস্কার ও গালি খাবার ভয়। কিন্তু মাগনকে না দেখে, তার হাতে জালের ভার সমর্পণ না করে চলেও আসতে পারছিল না। এই সময়ে তার মনের দ্বন্দ্বটি চমৎকার ফুটেছে এই কয়টি বাক্যে—

এক মন বলে কইন্যার—কেমন কৈরে থাকি।
আর মন বলে কইন্যার—'সেই যে গেছে রাখি।।
সেই যে গেছে রাখি—এখন কেমন কৈরে যাই।
আর কতইক্ষণ গাঙের ঘাটে রহিব থিয়াই।।

পোজলার উদ্‌ভ্রান্ত সেই চিন্তার মাঝে হঠাৎ মাগন জলের উপর ভেসে উঠলো, সঙ্গে বিরাট এক রুইমাছ নিয়ে। কূলে তোলার পর মাগন সেই মাছ পোজলাকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করলো। কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে পোজলা তাতে সম্মত হল না। এমনকি ঘরে ফিরলে সে যে নানা সন্দেহের শিকার হবে একথা বলতে দ্বিধা করল না। একথার প্রত্যুত্তরে মাগন গুরুজনদের বুঝিয়ে বলতে বলে আবার পোজলাকে মাছ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু সেই অনুরোধ পোজলা অমান্য করতে চাইলে তখন মাগন নিজেই পোজলাদের বাড়িতে তার সঙ্গে মাছ নিয়ে যেতে চাইল। এই পরিচ্ছেদের শেষে দুই নরনারীর রঞ্জিত মনের একটু হদিস দিতে চেয়েছেন রচয়িতা একটি মাত্র বাক্যে—'চমকি চমকি হায়রে উড়ের তারার মন।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'পেলারামের আতিথ্য'। পোজলার পিতা পেলারাম। কন্যা দেরি করে ঘরে ফিরলে পেলারাম পোজলাকে সাবধান করে দিলেন আর কখনো সন্ধ্যাবেলায় জল না আনতে। কেননা পেলারাম সমাজকে সমীহ করে চলে। পাড়ার লোকে কন্যার নামে মিথ্যা বদনাম দিলে গাঁয়ে থাকা দায় হয়ে উঠবে। বাড়ির দরজায় পেলারামের সঙ্গে দেখা হল মাগনের। মাগন মাছ ধরার সমস্ত বৃত্তান্ত বলে সেই মাছটি পেলারামকে রাখতে অনুরোধ করে। কিন্তু পেলারাম তাতে সম্মত হয় না। বরং প্রস্তাব দেয় মাছ থেকে কিছু অংশ কেটে রেখে বাকিটা যেন মাগন নিয়ে যায়। মাগন তখন হাতজোড় করে জানায়, সে এ বাড়িতেই আজ রাতের আহার সারতে চায়। তখন পেলারাম মাছ কেটে কুটে দিলে পোজলা তেল-ঝাল-মশলা ইত্যাদি দিয়ে সেই মাছের সুস্বাদু কিছু পদ রান্না করলো ও সবাই মিলে তা ভোজন করলো।

পরের পরিচ্ছেদটি কাহিনীহীন—'গায়কের নিবেদন' নামে নামাঙ্কিত। পরবর্তী ঘটনাক্রমের প্রস্তাবনা হিসেবে এটি মূল্যবান। নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলন, তাদের বিরহ-যন্ত্রণার কথা আছে, আর আছে আগের গাওয়া দুঃখের বারমাসীর প্রসঙ্গ। হয়তো অপ্রাপ্ত প্রথম দফার কাহিনীতে এটি ছিল। এই অংশে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের প্রতি বিনয় প্রকাশ পেয়েছে, আর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী নিবেদিত হয়েছে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর প্রতি ভক্তি।

'আত্মসমর্পণ' নামের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটির মূল বিষয় হল পোজলার রূপে ও প্রেমে উন্মত্ত

মাগনের পোজলার কাছে আত্মসমর্পণের প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ। পেলারামের ঘর হতে ফেরার পর থেকে মাগনের মনে কেবল একটিই চিন্তা—'কেমনে পাইবে সেই আশকের ধন।' নিদ্রাহীন রাত কাটে তার, সামান্য তন্দ্রাবস্থাতেও সে স্বপ্ন দেখে পোজলা-সুন্দরীর। এমনই আবিষ্টতার দিনে এক দুপুর বেলায় তেঁতুলগাছের তলায় আবার দুজনের দেখা। কন্যা এবারেও চলেছে জল ভরতে। মাগন মুখে তীব্র শিস্ দিল। পোজলা তা গ্রাহ্য না করে এগিয়ে গেলে মাগন এসে সামনে দাঁড়িয়ে তার উতলা মনের অবস্থার কথা বললো। সে কথা শুনে পোজলা 'থিয়াই রহিল একটা গাছের মতন।' নিজের ভিতরেও বুক ফাটছে তার, কিন্তু সমাজের দিকে তাকিয়ে নদীতে স্নান বন্ধ করল পোজলা। মন কি তাতে বারণ মানে। লতার বেষ্টনে হিজল মাছ যেখানে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ, সেই নিভৃত প্রকৃতির নির্জনতায় সে নিরন্তর ভাবতে থাকে বেচারী মাগনের কথা।

মনের যন্ত্রণা আর কতদিন চেপে রাখবে মাগন। সে সবকথা জানায় তার মাকে, মা জানালো বাপকে। বাপ শুনে জ্বলে উঠলো আগুনের মতো। মাগনের বাপ জেলে-জাতির সর্দার, আশেপাশের সকলে তাকে মান্যিগণ্যি করে। আর পোজলার বাপ পেলারাম সম্মানে খাটো, সমাজে একঘরে, তার মেয়ের সঙ্গে কিনা ছেলের বিয়ে! ক্ষেপে গিয়ে মাগনের বাপ পেলারামকে যাচ্ছেতাই করে গাল পাড়ে, আর নিজের ছেলের উদ্দেশে ব্যঙ্গ করে বলে—

চাম-রাঙা মাইয়া দেখি ভুলিল কি পুত।
পরখ করি ন চাইলো রে দুধ আর মুত।।

মাগনকে তার বাপ ত্যাজ্যপুত্র করার ভয় দেখায়। আড়ালে থেকে সব শোনে মাগন। তারপর নিজের কর্তব্য ঠিক করে নেয়। বাপ-মাকে না জানিয়ে মাগন কেবল প্রেমের টানেই সেই রাত্রে ঘর ছাড়ে। পেলারামের বাড়িতে এসে সব কথা জানিয়ে পোজলাকে বিয়ে করতে চায়। এই পরিচ্ছেদটির নাম দেওয়া হয়েছে 'বাধা'।

অষ্টম পরিচ্ছেদ 'গোপন-বিবাহ'। এই অংশের বিষয়বস্তু নামকরণেই আভাসিত। মাগন-পোজলার বিয়ে হল নিঃসাড়ে। ঢাক-ঢোল-সানাই-কাঁসর কিছুই বাজলো না, অতিথি-অভ্যাগত কেউই এলো না। আষাঢ় মাসের প্রবল বর্ষণকে উপেক্ষা করে বর এল বিয়ে করতে খালি হাতে। বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করলো পেলারাম চিরাচরিত কেবল এই কটি স্নেহার্দ্র কথা উচ্চারণ করে—

শুন আমার বাপ।
শত দোষে দোষী হইলে তাইরে কৈরো মাপ।।
অবুঝ অবোধ মাইয়া ছলভল মতি।
ন দিওরে দুখ্খ তাইরে ন দিও দুর্গতি।।

এর প্রত্যুত্তরে মাগন তিন সত্যি করে স্ত্রীর ভরণপোষণের অঙ্গীকার করলো এবং সেইসঙ্গে জানালো—'এই কইন্যারে কনদিন ন দিয়মরে দাগা'। এই গোপন বিবাহের সাক্ষী রইল আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ আর বর্ষার অঝোর বর্ষণ।

নবম পরিচ্ছেদের নাম 'বিদায়'। কিছুকাল গত হলে মাগন বাপ-মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে দূরদেশে রোজগার করতে চললো। বিদায়-কালে জননী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যথিত হয়ে

উঠলেন। নদী থেকে মাছ ধরে হাটে হাটে বিক্রি করাই মাগনের কাজ। এইভাবে তার কিছু টাকা-পয়সা জমলো। তারপর সেই টাকায় স্ত্রীর জন্য কিনলো বটবালা, টোপবালার মতো রূপোর অলঙ্কার আর বরইফুল্যা শাড়ি। পোজলার সাধের জিনিসপত্র কিনে একদিন রাত্রে মাগন এল পেলারামের বাড়িতে। মাত্র রাত্রিটুকু যাপন করে আবার রোজগারের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ল মাগন। যে ঘাটে তার ছোট নৌকোটি বেঁধে রেখে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল মাগন, ফিরে এসে সেটা আর দেখতে পেল না। আঁতিপাতি করে সব জায়গায় খুঁজলো। না পেয়ে শেষে হাঁটতে হাঁটতে সে চলল উত্তর দিকে। তিনদিন অবিশ্রান্ত হেঁটে সে পৌঁছল রঙ্গদিয়ায়। সেখানে সে এক টাউঙ্গা জেলের ঘরে কাজ নিল। এক বছর কেটে গেল, স্ত্রীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। তার বিরহে পোজলা বিষণ্ণ হয়ে দিন কাটাতে লাগলো।

দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ দুটি জেলেদের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এতে কবিত্বের তুলনায় বেশি মেলে তথ্য। মৎস্য শিকার জেলেদের একমাত্র বৃত্তি। কোথায় কেমন মাছ পাওয়া যায়, তাদের নাম কী, মাছেদের চলন কেমন, জাল ফেলার মরশুম কখন—এসব নীরস তথ্যই কাহিনীর সূত্র ধরে এই অংশে উঠে এসেছে। 'মাছ ধরিবার আড্ডা'-য় সমুদ্রমধ্যস্থ বিভিন্ন দ্বীপ ও চরভূমির উল্লেখ আছে। শ্রোতৃবর্গের ভৌগোলিক জ্ঞানের দিকে লক্ষ রেখেই এগুলি সংযোজিত। মাগন জেলের দলের সঙ্গে কোন এক রাঙাবালির চরে এসে বাসা বাঁধলো। লতাপাতায় বানানো অস্থায়ী ঘর—স্থানীয় নাম 'টং'। সেই ঘরে তাদের সম্বল অতি নগণ্য—শতচ্ছিন্ন বিছানা আর সেলাই-ছেঁড়া কাঁথা। পৌষমাসে উত্তর বাতাসে তারা নদীর জলে নানা ধরনের মাছ ধরে বেড়ায়। কাঁচা মাছ রোদে শুকিয়ে শুঁটকি বানায়। পয়সার মুখ দেখে ভরপুর আনন্দে ভরে ওঠে ধীবর পল্লী। আর সেই আনন্দের সঙ্গী হয়ে ওঠে তাদের গান—বাইসার সারি গান। এই গান প্রেম-অনুষঙ্গে মাতাল করে তোলে উপস্থিত শ্রোতাদের, গানের সুরে বিরহীর হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে প্রিয় মিলনের গভীর আকাঙ্ক্ষায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'হার্মাদের আক্রমণ'। বিষয়টি সামান্য ব্যাখ্যাযোগ্য। 'হার্মাদ' হল 'পর্তুগীজ' 'আরমাডা' শব্দের অপভ্রংশ। আরমাডা শব্দের প্রকৃত অর্থ হল রণতরী বহর। ইতিহাস বলে, পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম জলপথে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে আসতে থাকে। মূলত পর্তুগীজ জলদস্যুরা 'হার্মাদ' নামে চাটগাঁ, সোনারগাঁ, সিলেট প্রভৃতি নদীসন্নিহিত অঞ্চলে পরিচিত ছিল। এরা নিরীহ মানুষজনের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাতো। এবার একটু ভূগোলের বৃত্তান্ত। ভৌগোলিক অবস্থানে চট্টগ্রামের পূর্বপ্রান্তে মেঘনা নদী, তার ওপারে ব্রহ্মদেশের (ইদানিং মায়ানমার) আরাকান রাজ্য। পুরনো নথিপত্রে আরাকান 'রোসাঙ' নামে পরিচিত। কাহিনীর এই অংশে আরাকানী নাবিকদের সঙ্গে পশ্চিমদেশাগত জলদস্যু হার্মাদদের লড়াইদের কথা আছে, যে লড়াইয়ে হার্মাদরা পরাজিত হয়ে দূরে সরে গিয়েছিল। কিন্তু তারা যে বাংলাদেশ থেকে পুরোপুরি চলে যায়নি, যার প্রমাণ দিত জনপদে হঠাৎ হঠাৎ আঘাত হেনে। দ্রুতগামী স্লুপ নৌকা ছিল তাদের জলযান। সমুদ্র-মধ্যে অসহায় কাউকে পেলে আক্রমণ করতো। আখ্যানের রাঙাবালিতে জেলেদের টঙয়ের আলো দেখতে পেয়ে হার্মাদেরা অনুমান করলো এখানে নিশ্চয়ই মনুষ্যবসতি আছে। চুপিসারে চরে প্রবেশ করে তারা নিরীহ

জেলেদের উপর আক্রমণ করে তাদের যা কিছু ছিল সব কেড়ে কুড়ে নিল। হার্মাদদের বাধা দিতে মাগন অস্ত্র হাতে এগিয়ে এলে এক লাঠির আঘাতে তার কোমর ভেঙে দিয়ে গেল তারা। সমস্ত জেলে পল্লীতে উঠলো হাহাকার রব। সেখানে তাদের টিঁকে থাকবার মতো আর কোন সঙ্গতি রইলো না। নিজেদের দেশে ফেরাও তাদের পক্ষে সঙ্কট হয়ে উঠলো, যেহেতু তাদের মূল বাসভূমি থেকে রাঙাবালির চর ছিল প্রায় একমাসের খেয়াপথ।

এদিকে পোজলার বাপ পেলারাম গত হলে নিজের নিরাপত্তার জন্য ভাইটাকে কাছে এনে রাখলো পোজলা। অতি কায়ক্লেশে তাদের দিন কাটতে লাগলো। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হল মাগনের কোনো খবর না পাওয়ায়। সতী সাধ্বী পোজলার আর খাওয়ায় মন নেই, আগ্রহ নেই শাড়ি কিংবা অলঙ্কারে। কেবল দিনরাত চিন্তা করে সে মাগনের জন্যে। স্বামী বিহনে পোজলা ফুলের কলির মতো যেন শুকিয়ে গেল। তার এই বিরহ-ব্যথাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কবি লিখলেন অপূর্ব দুই চরণ ঃ

> 'শরীলে সাহিল যত মনে ন সহিল।
> বিরহ বিষের জ্বালা পরাণ দহিল।।'

এ জ্বালা বোধহয় পোজলার কাছে সহ্যের সীমার মধ্যে ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে যা ঘটলো, তাতে সে রীতিমত আতঙ্কিত হল। বুধা নামে এক লম্পট বদমাস বাস করতো ঐ অঞ্চলে। দীর্ঘদিন ধরে পোজলার উপর তার কুনজর। স্বামী-বিচ্ছিন্না পোজলার কাছে একদিন বুধা এল এক গোছা পান নিয়ে। এটা যে চরিত্রহীন বুধার দিক থেকে মিলনের প্রস্তাব তা বুঝতে দেরি হল না পোজলার। সে বুধার সঙ্গে কোন কথা বললো না, কিংবা বসতে আসনও দিল না। অপমানিত বুধা এর উচিত প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় খুঁজতে লাগলো। সুযোগ মতো একদিন রাত্রে আরো কিছু সঙ্গী জুটিয়ে বুধা হাজির হল পোজলাদের বাড়িতে। তখন ভাই-বোনে ঘুমে অচেতন। ঘরের দরজা ভেঙে বদ মতলবে বুধা উঠে এল পোজলার বিছানাতে। তন্দ্রাচ্ছন্ন পোজলা অমনি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে মাথার কাছ থেকে রাম দা নিয়ে কোপ দিল বুধার হাতে। যন্ত্রণায় কাতরে উঠে সঙ্গীদল সহ পালিয়ে গেল বুধা। আপাতত লুচ্চাদের হাত থেকে রক্ষা পেল পোজলা। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের এই ঘটনাবর্তের নাম দেওয়া হয়েছে 'বিপদে রক্ষা'।

এরপর চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 'হার্মাদের হাতে'। রাত্রিতে যৌবনবতী পোজলার ঘরে কিছু মানুষের নিঃশব্দ আগমন ও তাদের সশব্দ পলায়ন পাড়া-প্রতিবেশীদের মনে অন্য জাতীয় সন্দেহ ঘনীভূত করলো। সমাজে নারীর কলঙ্ক বড়ই মিঠা—উপভোগ্য এক উপকরণ। অতএব সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে চমৎকার এক গল্প বানিয়ে তারা পোজলার নামে কলঙ্ক রটালো এবং পোজলা যে নষ্টা চরিত্রের মেয়েতে পরিণত হয়েছে, এ বিষয়ে আর কারও সন্দেহ রইলো না। এমতাবস্থায়—

> কেহ বলে—'বেইশ্যার ঘর পুড়ি কর ছাই।'
> কেহ বলে—'মারি পিডি দেয়রে ধাবাই।।'

না, ঘর জ্বালিয়ে কিংবা বেদম প্রহার করে গ্রামবাসীরা পোজলার শাস্তির বিধান করেনি, তার চেয়ে ভয়ানক পন্থা তারা বেছে নিয়েছিল। এই ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিল বুধা।

সে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছিল। তাই যুক্তি করে সে ও তার সঙ্গীরা পাঁচশ টাকার বিনিময়ে হার্মাদদের হাতে পোজলাকে তুলে দিতে রাজি হল। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মরলো। একদিকে অপমানের চরম প্রতিশোধগ্রহণ, অন্যদিকে বিনা পরিশ্রমে নগদ অর্থের রোজগার। তাদের সঙ্গে চুক্তি মতো হার্মাদের গুপ্তচর এসে একদিন পোজলাকে দেখে গেল, চিনে গেল পথঘাট। সুযোগ মতো একদিন তারা নদীর ঘাটে নিজেদের স্লুপ নৌকো বাঁধলো। তা দেখে গাঁয়ের বৌ-ঝিদের আতঙ্কের সীমা-পরিসীমা রইল না। রাত্রি গভীর হলে হার্মাদের দল চড়াও হল ঘুমন্ত পোজলার কুটিরে। তারা দরজা ভেঙে প্রবেশ করল শয়ন কক্ষে। পোজলা চিৎকার করে ডাকলো পাড়া-প্রতিবেশীদের, কিন্তু কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে এল না। ফলে অবাধে পোজলা লুঠ হয়ে গেল হার্মাদ জলদস্যুদের দ্বারা। তার ভাই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল। ডাকাতেরা পোজলাকে তাদের নৌকোয় তুলে দিয়ে দক্ষিণা বাতাসে পাল খুলে দ্রুত বেগে ঘাট ছেড়ে চলে গেল।

'নির্মমতার একশেষ' নামের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের মূল বিষয়বস্তু হল হার্মাদ সর্দার কর্তৃক পোজলাকে বশ মানানোর চেষ্টা ও শেষ অব্দি সতীত্ব রক্ষার্থে অন্ধকার অগাধ সমুদ্রে পোজলার ঝাঁপ দিয়ে পড়া। হার্মাদেরা পোজলাকে লুঠ করে এনে হাত-পা বেঁধে নৌকোর একটা ঘরের মেঝেতে ফেলে রেখেছিল। দুপুর বেলা তারা এসে পোজলাকে আদর করে ডাকতে লাগলো। পোজলা তার জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলো। খাওয়া-দাওয়ার জন্য তারা অনেক সাধাসাধি করলো, কিন্তু পোজলা খাবার খাওয়া তো দূরের কথা, জলও স্পর্শ করলো না। দিন কেটে এবার এল রাত। ভীষণ-দর্শন ডাকাত-সর্দার এসে তাকে হাত ধরে ভূমিশয্যা থেকে তুললো। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে জানিয়ে দিল তার মনের অভিলাষ—'শুন ওরে হারামজাদী।/জোর জোলমে এখ্‌খনি যে তোরে কর্য্যম সাদি।।' সর্দারের নির্দেশে খোলা হল তার হাত-পায়ের বাঁধন। এবার পোজলা কাতর কণ্ঠে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো—'তুমি আমার ধর্ম্মর বাপ রৈক্ষা কর মোবে।' রেহাই পেতে চাইলো সেই দস্যুর হাতে-পায়ে ধরে। কিন্তু সর্দার অতি নির্মম। জানিয়ে দিল, পাঁচশ টাকা দিয়ে সে কিনেছে, সাদি না করে ছাড়বে না। পোজলা এখন তার ভোগের সামগ্রী। ফাঁপরে পড়ে পোজলা তখন এক উপায় ঠাওরাল। সে সর্দারকে জানাল ক্ষিদে-তেষ্টার কথা। তবে অন্নগ্রহণের আগে সে একবার 'বাইরে' অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগ করতে যেতে চায়। সর্দারের তাতে সন্দেহ হল না, সে এ প্রস্তাবে রাজি হল। নৌকোর পিছন দিকে থাকে সিঁড়ির মতো একটা অংশ, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে 'দাহর', সেখানে বসে মলত্যাগ করতে হয়। পোজলা একাকী গিয়ে পৌঁছলো সেখানে, তারপর সুযোগ বুঝে 'যা থাকে কপালে' মনে করে এক ঝাঁপ দিল নদীর কালো জলে। 'ঝুপ্‌' করে কিছু পড়ার কেবল শব্দ এল সর্দারের কানে। সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাঝিদের উদ্দেশে 'সামাল' 'সামাল' বলে চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু নৌকা সঙ্গে সঙ্গে থামানো গেল না। অকুস্থল বেশ কিছুটা পেরিয়ে এসে নৌকো থামল। পরে পিছিয়ে এসে জলে নেমে পোজলার তল্লাস করতে লাগল তারা। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেল না। দূরবীণ চোখে নৌকোয় বসে ছিল সর্দার। হঠাৎ তার নজরে পড়ল দক্ষিণ দিক থেকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসা একটি নৌকো। চিনতে তার ভুল হল না। এ নৌকো ছিল আরাকানী বা মগের নৌকো। এদেরকে খুব ভয় পেতো হার্মাদরা। তাই অবস্থা বেগতিক বুঝে সঙ্গীদের নিয়ে অকুস্থল ছেড়ে চম্পট দিল।

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটির ষোড়শ তথা শেষ পরিচ্ছেদটির নাম 'জীবন প্রাপ্তি'। পরের দিন সকালবেলা সূর্য উঠলে মগের নৌকোর দাঁড়ি-মাঝিরা পোজলাকে নদীতে মৃতবৎ ভাসতে দেখলো। তা দেখে তাদের মনে দয়া জাগলো। তারা জল থেকে নৌকোতে তুলে এনে চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তুললো। পরে নৌকোর মাঝিরা তার পরিচয়, বাড়িঘরের কথা ইত্যাদি জানতে চাইলো। পোজলা এদেরকেও ডাকাত মনে করে আবার জলে ঝাঁপ দিতে গেলে তারা সবাই মিলে আটকাল। এবার এল মগদের সর্দার। সে এসে ভীত পোজলাকে এই কথা বলে শান্ত করলো—

"তুমি আমার ধর্ম্মর মাইয়া।
রাখি আইস্যম তোমারে যে তোমার বাড়ীৎ যাইয়া।।
ন করিও ডর ভয় মোরা মগর জাত।
তোমার শরীলে কেহ ন দিব রে হাত।।"

কিন্তু ব্যথিত পোজলা তার অভাগিনী কলঙ্কের জীবন আর রাখতে চায় না। তাই নিদারুণ কষ্টে—

"কইন্যা বলে, 'হেলা যদি তুমি ধর্ম্মর বাপ।
মরিতে দেও রে মোরে পানিৎ দিয়ম ঝাঁপ'।।"

সেকথা শুনে মগদের সর্দার তার প্রতি সমব্যথী হয়ে পড়লো, তাকে অনুরোধ করলো নিজের দেশ-গাঁয়ে ফিরে যেতে। কিন্তু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে পোজলা? তখন অসহায় নারী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জানালো—

"কইন্যা বলে, সেই দেশেতে মাইনসে মানুষ খায়।
হাত পা বাঁধিয়া মোরে ভাসাইল দর্জ্যায়।।"

এ কথার পিছনে অনেক রহস্য আছে অনুমান করে মগদের সর্দার পোজলাকে তার বিগত জীবনের ইতিহাস জানাতে বলল। পোজলা তখন অকপটে সব কথা জানালে সেই মগ সর্দারের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো। এইখানেই দ্বিতীয় দফা তথা প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটির সমাপ্তি।

কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্ববঙ্গ গীতিকার যে যে বৈশিষ্ট্য অন্যান্য পালাতে পাওয়া যায়, আমাদের আলোচ্য পালাতেও তার কিছু কিছু লভ্য। মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার অধিকাংশ উপাখ্যানে প্রেমই প্রধান উপজীব্য। আদি ও অন্তহীন এই কাহিনীতেও নারীর প্রেমই প্রকারান্তরে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নদীর নির্জন ঘাটে বিকেলবেলায় ভরন্ত কিশোরীকে দেখে জালিয়া যুবক মাগনের মনোবাসনা জেগে ওঠে, পরে তা রূপান্তরিত হয় প্রেমে। প্রেমের টানেই সে পিতার শাসনকে অগ্রাহ্য করে লুকিয়ে রূপসী কিশোরী পোজলাকে বিয়ে করে। বিয়ের পর রোজগারের ধান্দায় অনেক দূর সমুদ্রে মাছ ধরতে সে চলে যায় এবং সেখানে সে ও তার সঙ্গীরা হার্মাদ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। একাকিনী পোজলাকে পেয়ে লম্পট বুধা হীন প্রস্তাব দিয়ে অপমানিত ও নিগৃহীত হয়। তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বুধা পাঁচশ টাকার বিনিময়ে হার্মাদ দুস্যদের কাছে পোজলাকে বিক্রি করে দেয়। নদীর উপর দিয়ে যাবার সময় পোজলা অসহায় অবস্থায়

নিজের ধর্মকে বাঁচাতে অকূল দারিয়ায় ঝাঁপ দেয়। পরে মগদের দ্বারা রক্ষা পায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে, গোটা আখ্যানের মধ্যে পোজলা ও মাগনের প্রেমই মুখ্য। এই প্রেমের কারণেই স্ত্রীকে সুখে রাখবে বলে মাগন বেশি অর্থোপার্জনের আশায় বিপজ্জনক স্থান রাঙাবালির চরে গিয়েছিল। আবার এই প্রেমের কারণেই নষ্ট চরিত্র বুধা কিংবা হার্মাদ দস্যুদের শত প্রলোভন, শাসানি, উৎপীড়নের কাছে নিজেকে নত করেনি পোজলা; বরং সে তার সতীধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে খরস্রোতা নদীতে অন্ধকার রাত্রিতে ঝাঁপ দেয়। শেষ পর্যন্ত মাগন ও পোজলার মিলন হয়েছিল কিনা তার কোন আভাস এখানে না থাকলেও, প্রাপ্ত কাহিনীটুকুর সূত্রে দুজনের প্রেমের প্রগাঢ়তা সহজেই টের পাওয়া যায়।

এই প্রেমকাহিনীকে গীতিকার রচয়িতা যে-সামাজিক ফ্রেমে ধরতে চেয়েছেন সেটিও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। পোজলা ও মাগনের বৃত্তিগত জাতি-পরিচয় একই—দুইজনেই ধীবর সন্তান। তবে আখ্যানভাগে প্রকাশ পেয়েছে যে, মাগনের পিতা কেবল জেলে নয়, সে জেলেদের সর্দার। দশ-বিশটা গাঁয়ের লোকের কাছে তার একটা উঁচু স্থান আছে। তার চোখে পোজলার পিতা পেলারাম ধীবর সমাজে 'একঘরে', কেউ তার বাড়ির অন্নজল স্পর্শ করে না। সামাজিক এই উচ্চাবতার বিষয়টি মাগন ও পোজলার সামাজিক বিবাহের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। গল্পের এমন পরিকাঠামো গীতিকার অন্য পালাতেও লক্ষ করা যায়। সর্বজন পরিচিত 'মহুয়া পালা'-তেও সামাজিক দিক থেকে নিম্নে অবস্থানকারী বেদের মেয়ে মহুয়ার সঙ্গে জমিদার-তনয় নদ্যার চাঁদের প্রণয় হয়েছিল। সে কাহিনীতে বিপুল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুইয়ের মিলন ও পরিশেষে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এখানেও নায়ক-নায়িকার স্বাভাবিক প্রেমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক সম্মান; কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেমের প্রবল বাত্যায় বিরুদ্ধ প্রতিকূলতার সমস্ত দেওয়াল ভেঙে পড়ে। প্রেম শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে সার্থকতা পায়। এরপর গীতিকার কাহিনীটিকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাতে নায়কের বিশেষ বৃত্তি ও দারিদ্রের ব্যাপারটি উপাখ্যানের গতিমুখ নির্ধারণে ভূমিকা নিয়েছে। পিতার শাসনকে আগ্রাহ্য করে নিজের প্রণয়-পাত্রীকে বিয়ে করে বলে সে কথা মাগন বাড়িতে জানাতে পারে না। কিন্তু ভালবাসার উপহারস্বরূপ সে কিছু দিতে চায় পোজলাকে। সেই উপহার সামগ্রী কেনার জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে সে একা মাছ ধরতে বেরোয়। স্ত্রীর প্রতি তার নিঃসীম ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জনের পয়সায় পোজলার প্রিয় অলঙ্কার ও শাড়ি কিনে দেবার ঘটনায়। এরপর মাগন আরো বেশি টাকা উপার্জনের আশায় দূর সমুদ্রে অন্যান্য জেলেদের সঙ্গে চলে যায় এবং হার্মাদের কবলে পড়ে।

হার্মাদ ও মগদের প্রসঙ্গ এ গীতিকায় ব্যবহার করে এর রচয়িতা বিশুদ্ধ সামাজিক এক আখ্যানে নিয়ে এসেছেন সমকালীন ইতিহাসের ছোঁয়া। মধ্যযুগের একটা সময়পর্বে, বিশেষ করে ষোড়শ শতকের সূচনাভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের উপান্ত পর্যন্ত, বাংলার উপকূলভূমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল মগ ও হার্মাদ জলদস্যুদের অত্যাচারে। আরাকানীরা 'মগ' নামে পরিচিত ছিল। তাদের নারকীয় তাণ্ডবের স্মৃতি বিধৃত হয়ে আছে বিশৃঙ্খলা-ব্যঞ্জক 'মগের মুলুক' শব্দযুগলে। হার্মাদ অর্থাৎ পর্তুগীজ বোম্বেটে জলদস্যুরাও ছিল প্রকৃতিতে ভয়ানক। বাংলার উপকূলে এদের উপস্থিতি ও অত্যাচার বিষয়ে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদেরা অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র

মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ মধ্যযুগ' গ্রন্থে এই দুই শ্রেণীর জলদস্যুদের সম্পর্কে লিখেছেন, ''হারমাদ পর্তুগীজ আরমাডা শব্দের অপভ্রংশ। পর্তুগীজ বণিকেরা যে বাঙালীর তথা ভারতীয়ের ব্যবসায় বাণিজ্যে বহু অনিষ্ট করত তাহার প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ পর্তুগীজ বণিকেবা ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে এদেশীয় বাণিজ্য জাহাজের উপর জলদস্যুর ন্যায় আচরণ করিত এবং তাহার ফলেই বাংলার জলপথের বাণিজ্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। আরাকান হইতে মগদের অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছিল। পর্তুগীজরাও তাহাদের অনুকরণে নদীপথে ঢুকিয়া দক্ষিণবঙ্গে বহু অত্যাচার করিত। ...মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র উপকূলের অধিবাসীরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ইহারা নগর ও জনপদ লুঠপাট করিত ও আগুন লাগাইয়া ধ্বংস করিত, স্ত্রীলোকদের উপর বহু অত্যাচার করিত এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ নর-নারীকে হরণ পূর্বক পশুর মত নৌকার খোলে বোঝাই করিয়া লইয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত।'' এ কাহিনীতে দুই ভিন্ন দেশীয় বণিক গোষ্ঠীর মধ্যে বৈরিতার কথা বলা হয়েছে এবং রোসাঙ্গ রাজার ভয়ে পর্তুগীজ হার্মাদরা যে তীরে উঠতে পারতো না সে কথা জানানো হয়েছে। আরো একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। পোজলার উপর পর্তুগীজ জলদস্যুরা অত্যাচার করলেও মগরা কিন্তু সদয় ব্যবহার করেছিল। মগ-সর্দারের মানবোচিত আচরণ তার চরিত্রের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

এ উপাখ্যানে খল চরিত্র হিসাবে বুধা উপস্থিত। তাকে ব্যবহার করে এর রচয়িতা কাহিনীকে বেশি আর্বতসঙ্কুল ও দীর্ঘায়ত করেছেন। সমকালীন ইতিহাসের সংযোগ ঘটেছে প্রত্যক্ষত তার দ্বারাই। সে-ই হার্মাদদের আহ্বান করে এনেছে গ্রামে ও পোজলার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে। বুধা লম্পট, লোভী, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও মতলববাজ। মাগনের অনুপস্থিতিতে সে সদ্যযৌবনা নারী পোজলার কাছে কুপ্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছিল। এ ধরনের প্রস্তাবের উপস্থাপনায় বাঞ্ছিতাকে পান উপহার দেওয়া বোধহয় বাংলাদেশের সুপ্রাচীন এক রীতি। এ প্রসঙ্গে নির্ঘাৎ মনে পড়বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তাম্বূলখণ্ডের কথা, যেখানে বিবাহিতা রাধার কাছে কৌশলী কৃষ্ণ শরীরী মিলনের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল বড়ায়ির মারফৎ এবং অবশ্যই তাম্বূল অর্থাৎ পান সহকারে। অন্যদিকে, স্বামী বিদেশে, তাই মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর বিবাহিতা নারী—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পোজলার দিকে বুধার এগোনো মনে পড়িয়ে দিতে পারে মধ্যযুগের আর একটি প্রেমোপাখ্যানকে। সেটি দৌলত কাজীর লেখা 'সতী ময়না'। ময়নার স্বামী রাজা লোর অন্যত্র গেলে ছাতন নামে এক লম্পট রাজকুমার রত্না নামে এক বাক্‌পটু মালিনীকে পাঠিয়েছিল ময়নাকে মিলন প্রস্তাবে সম্মত করতে। এখানে বুধা নিজেই এসেছে, উপরোক্ত দুই আখ্যানের সঙ্গে এই যা তফাৎ। আবার বুধার প্রতি পোজলা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তার সঙ্গেও মিল রয়েছে উল্লিখিত দুই কাহিনীর। রাধা কৃষ্ণ-প্রেরিত তাম্বূল মাটিতে ফেলে দিয়ে বড়ায়িকে লাথি মেরে তাড়িয়েছে সতীত্বের অহঙ্কারে। আর ময়না রত্নার শত প্ররোচনাতেও স্বামীপ্রীতি থেকে নড়েনি। সে স্পষ্টত জানিয়েছে—'যদি ইহলোকে/না মিলে লোরকে/পরলোকে হৈব সঙ্গী।' একইভাবে এ গীতিকার নায়িকা পোজলা আপন নারীধর্মের গর্বে বুধাকে অভ্যর্থনা জানায় না, পরন্তু রাত্রে তার সাথে নষ্টামি করতে এলে ধারালো কাটারি দিয়ে আঘাত করে। রাধার আক্রমণাত্মক ভূমিকার চাইতে পোজলার ভূমিকা আরো

বেশি মনে দাগ কাটে যেন। হার্মাদদের কবলে পোজলাকে তুলে দেবার যাবতীয় প্রক্রিয়া নিঃশব্দে সারে বুধা। এইখানে সে ক্রূর, ভয়ংকর, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত এক পশু। সে এক্ষেত্রে আত্ম-পর বিবেচনা করেনি, একটি নারীর মান-সম্মান তার কাছে শূন্য। বুধার চরিত্র টাইপ চরিত্র হতে পারে বটে, কিন্তু স্বল্প পরিসরে রচয়িতা তাকে যেভাবে রূপ দিয়েছেন তাতে তাঁর চরিত্রসৃষ্টির মুন্সিয়ানা ধরা পড়ে।

এবার রসের প্রসঙ্গ। সকলেই জানেন, রসবিচার নির্ভর করে কাহিনীর পরিণতির উপর। পশ্চিমী সাহিত্যভাবনায় সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মতো রসের এতবিধ বৈচিত্র্য নেই। পরিণাম সুখকর না দুঃখদায়ক—এটার উপর ভিত্তি করে অ্যারিস্টটল কেবল রসের দুই স্থূল শ্রেণীভেদ করেছিলেন—ট্র্যাজেডি আর কমেডি। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে কিন্তু নয়টি স্থায়ীভাবের সূত্রে নয়টি মুখ্য বা অঙ্গীরস। 'পোজলার পালা' আদি ও অন্তবিহীন। উপাখ্যানের শেষে পোজলা ও মাগনের মিলন হয়েছিল কিনা প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে তার কোন হদিস নেই। ফলে সে ব্যাপারে মন্তব্য অবান্তর। কেবল উপস্থাপিত অংশের নিরিখে বলা যায়, দুইজনের প্রেমের প্রসঙ্গে যে-রস পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেটা রোমান্স-রস। নদীর ঘাটে দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ, তাদের পারস্পরিক কথোপকথন, তুল্যানুরাগ, পরবর্তী সময়ে মাগনের চিন্তা, নিদ্রাহীনতা ও প্রেমিকাকে স্বপ্নে দর্শন ইত্যাদি ঘটনা মিষ্টি মধুর প্রেমের আভাস বয়ে নিয়ে আসে। দুইয়ের গভীর অনুরাগের বাঙ্ময় ও শরীরী ভাষার মধ্যেও কবি কীভাবে এই রোমান্স রসকে আভাসিত করতে সক্ষম হয়েছে তা নীচের অংশটুকু পড়লেই বোঝা যায়—

"গাঙের ঘাটে তেঁতই গাছটা তেঁতই বেঁকা বেঁকা।
দুপুরকালে সেই না পন্থে দোনজনর দেখা।।
চলন খঞ্জনের মত কলসী কাঁকে লই।
জল ভরিতে যায় রে কইন্যা আপন ভোলা হই।।
মুখে দিল শিষ্ মাগন, কইন্যা চাইলো ফিরি।
চারি চোগর কথা আমরা বুঝিতে না পারি।।
বায়ে উড়ে আঁচলখানি গায়ে বিঁধে কাঁটা।
আজিকে চলিতে পন্থে হইল বিষম লেঠা।।
একাশ্বরী চলে কইন্যা পিছে ফিরি চায়।
কাউরা-মেউরা চুল বাতাসে উড়ায়।।"

সারি গানে ব্যবহৃত প্রেম-অনুষঙ্গটিও এমনই রোমান্স রসে ভরপুর।

পোজলা-মাগনের বিবাহের কালে আকাশে কালো মেঘের নিদারুণ ঘনঘটা, প্রবল বর্ষণ, আত্মীয়-স্বজনদের অনুপস্থিতি, অনুষ্ঠানে জাঁকজমকের বাহুল্য না থাকায় একটা অন্য রকমের অনুভূতি জাগে বটে, তবে তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে আপ্লুত পেলারামের কন্যাসম্প্রদানের মর্মভেদী ভাষা ও প্রত্যুত্তরে মাগনের স্বীকারোক্তিমূলক তীক্ষ্ণ উচ্চারণ। এই প্রসঙ্গে কবি ঘনান্ধকার নিশীথ প্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে ভীষণই মানানসই। একটু লক্ষ করুন ঃ

"রাইৎ নিশিথে কালা মেঘ বাতাসে উড়ায়।
শুকতারা নাই আইজ আকাশের গায়।।
ডান কানের মদন কড়ি বাঁ কানেতে দিয়া।
মাগন করিল সেই পোজলারে বিয়া।।
সাক্ষী রৈল কালা মেঘ বরিষার পানি।
গোপনে হইল বিয়া নাই রে জানাজানি।।

কবিত্ব ও কারুণ্য এখানে মিলে মিশে একাকার।

রাঙাবালির চরে হার্মাদের আক্রমণ থেকে শুরু করে পরপর কয়েকটি পরিচ্ছেদের ঘটনা কেবল আকস্মিকতার কারণে মর্মঘাতী নয়, বর্ণনার গুণেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এতক্ষণের রোমান্টিক প্রেম-অনুষঙ্গকে ছিঁড়ে রচনাকার তাঁর কাহিনীতে সমকালীন ইতিহাস প্রসঙ্গের উপস্থাপনার পাশাপাশি ভয়ানক ও বীভৎস রসের অবতারণা করেছেন। নিষ্ঠুর হার্মাদরা নিরীহ জেলেদের জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট করে, নৃশংস বুধা কাম ও ক্রোধ পরবশ হয়ে পোজলার গৃহজীবনকে ছারখার করে দেয়। রাত্রিকালে যেভাবে পোজলা অপহৃত হয় তা রীতিমত নাটকীয় ও আতঙ্ককর। 'নির্মমতার একশেষ' অংশে পাঠক-শ্রোতা পোজলার অসহায় অবস্থার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়ে প্রতিমুহূর্তে চরম সর্বনাশের জন্য যেন প্রহর গুণতে থাকে। সবশেষে স্বস্তি পায় হার্মাদ সর্দারের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবার পর। 'জীবন প্রাপ্তি' পরিচ্ছেদে বিষণ্নতা থেকে কাহিনী ক্রমশ প্রসন্নতার দিকে এগোয়। পিতৃসম মগ সর্দারের স্নেহ, করুণা ও সহানুভূতি উজ্জ্বল করে রাখে এ আখ্যানের মানবিক মুখ। কিন্তু আপাত সুখানুভূতির মধ্যে নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক বিচ্ছেদের যন্ত্রণা পাঠক হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে। অবশ্য অধিকাংশ রসোত্তীর্ণ ও গুণমানে শ্রেষ্ঠ গীতিকাই এমন অতৃপ্তির বেদনা ও বিচ্ছেদের যন্ত্রণা দিয়েই পরিসমাপ্ত। এ কাহিনীরও এখানে শেষ যতি পড়লে সাহিত্যের রসাবেদনের ক্ষেত্রে কোন ক্ষয়ক্ষতি ঘটে না।

এবার আলোচ্য গীতিকটির সাংগীতিক স্বরূপ ও নাটকীয়তা গুণের প্রসঙ্গ। 'গীতিকা' শব্দেই প্রকাশ মৌখিক সাহিত্যের এই ঘরানাটি সুরেলা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এ সঙ্গীত আবশ্যিকভাবে লোকসঙ্গীত। এটা সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা যে, ভাটিয়ালি হল লোকসঙ্গীতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটি একান্তভাবেই নদীনালা-খালবিল সমাকীর্ণ পূর্ববঙ্গের নিজস্ব লোকসঙ্গীত। বাংলা গীতিকার অধিকাংশই গীত হয় ভাটিয়ালি সুরে। অঞ্চলভেদে এই সুরের পাঁচটি ধাঁচ এবং প্রতিটি ধাঁচে ঝাঁপ, সারি, বিচ্ছেদ ও ফেরুসাই নামে চারটি করে লহর বর্তমান। এই লহরগুলি বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুসারে নির্বাচিত হয়। করুণ রসে বিচ্ছেদ, হাস্যরসে সারি, অন্যান্য রসে ঝাঁপ লহর সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভাটিয়ালি ছাড়া গীতিকায় প্রযুক্ত হয় হালদাফাটা, মুড়াই ও সাইগরী। এগুলি স্থান বিশেষের উপর নির্ভর করে। যেমন, চট্টগ্রামে হালদাফাটার ব্যবহার বেশি, মুড়াই ব্যবহৃত হয় প্রধানত চাটগাঁয় ও ত্রিপুরায়, ইত্যাদি। আলোচ্য 'পোজলার পালা'-টি চট্টগ্রামের সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী 'বঙ্গসমুদ্রের মাঝখান' থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কাহিনীটি ধীবর সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত যারা জেলে ডিঙি বেয়ে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত। পূর্ববঙ্গে ভাটিয়ালি শোনা যায় মূলত ডিঙ্গি নৌকোর মাঝিমাল্লাদের মুখে। তাই অনুমান করা যায়

এটি গান করতে গায়েনরা প্রধানত নির্ভর করতেন ভাটিয়ালির উপর। তাছাড়া গীতিকাটির মধ্যে 'বাইসার সারি গান' কথাটি সরাসরি উল্লেখিত থাকায় আমাদের এই অনুমান অনেকটাই জোর পায়। কেননা হালদাফাটাতে সারির প্রয়োগ নেই। পাণ্ডুলিপিটির মধ্যে দুটি স্থানে 'ধুয়া' শব্দটির প্রয়োগ থাকায় বোঝা যাচ্ছে গল্পরসকে সমৃদ্ধ করার জন্যে এর ব্যবহার করা হয়েছে, কেননা ধুয়া এ কাজেও প্রযুক্ত হয় বলে কোন কোন সমালোচক জানিয়েছেন।

ইংরেজি ব্যালাডের যে-সংজ্ঞা আলোচনার শুরুতেই উদ্ধৃত হয়েছে সেখানে সাধারণ চারটি উপাদানের মধ্যে ক্রিয়া (action) ও চরিত্র (character) অন্যতম উপকরণ। আমরা জানি, এই দুইয়ের সমবায়ে এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য-সংরূপ গড়ে ওঠে, যার নাম নাটক। অভিধার বিচারে 'গীতিকা' গীতিমূলক আখ্যান, যার মধ্যে নাট্যগুণ থাকাটা একটু বিস্ময়কর। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ বাংলা গীতিকার ঘটনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতি যথেষ্ট নাটকীয়তাপূর্ণ। সুগঠিত আখ্যানের সূত্র ধরেই গীতিকায় নাটকীয়তার আবির্ভাব—একথা বলাই বাহুল্য। কোথাও কোথাও এই নাট্যগুণ এত বেশি যে, সেখানে কাহিনী এগোয় সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে। মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া পালা'-য় এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই কারুর নজর এড়িয়ে যায়নি। নাট্য-স্বভাবের বিপুল উপস্থিতির কারণে কোন কোন সমালোচক গীতিকার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমনও বলেছেন যে, 'It deals with a single situation revealed dramatically, with little intrusion on the part of the story-teller.' 'পোজলার পালা'-তেও সংলাপে ও ঘটনা-গ্রন্থনে রচয়িতা নাট্যধর্মের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। প্রায় প্রতিটি ছোট-বড় চরিত্রের প্রত্যক্ষ উক্তি এতে গ্রন্থিত। সংলাপের আগে-পরে বক্তাদের দেহভঙ্গির প্রকাশ কিংবা মানসিক অবস্থার বিবরণ অনেকটা নাট্য-নির্দেশের ভূমিকা পালন করেছে। পিতার অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও মাগনের পোজলাকে লুকিয়ে বিয়ে করা, বুধা আহত হয়ে পোজলার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় হার্মাদের হাতে পোজলাকে তুলে দেওয়া, নিশ্চিত সর্বনাশের হাত থেকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পোজলার স্লুপ থেকে পলায়ন ও অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ এবং পরিশেষে মগদের দ্বারা তার দেহ উদ্ধার ও জীবনপ্রাপ্তি—এইসব প্রতিটি ঘটনাই নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ।

অবয়বকে যেমন আরো সৌন্দর্যময় ও রমণীয় করে তোলে যে কোন ধাতব অথবা পুষ্পালঙ্কার, তেমনি শব্দময় কাব্যশরীরকে মোহময় ও উপভোগ্য করে তোলে সাহিত্যের অলঙ্কার। একটা সময় অলঙ্কারবাদীদের মত কাব্যবিচারে প্রাধান্য পেয়েছিল, যাঁরা মনে করতেন নিষ্প্রাণ সাহিত্য সজীব ও প্রাণবন্ত হয় অলঙ্কারের গুণে। কাব্যের গ্রাহ্যতার নাকি ঐ এক চরমমাত্রা। অবশ্য তাঁদের সেই মত ভিন্ন প্রস্থানবাদীদের যুক্তিতে ধোপে টেকে নি। কিন্তু বাস্তব হিসেবে এটা সত্য যে, অলঙ্কার অনেক ক্ষেত্রে তুলনাত্মক কিংবা বিরোধমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট ভাবকে স্পষ্টতা দেয়। এই স্পষ্টতাবিধানের ক্ষেত্রে অলঙ্কারের অনুভাবন ক্রিয়াটি খুবই জরুরী। লোক-কবিরা তথাকথিত পুঁথি-পোড়ো বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু কাব্যসৃষ্টির এই করণকৌশলটি বুঝতেন। কাব্যের অলঙ্কার যে মূল অনির্বচনীয় ভাবটিকে শ্রোতা কিংবা পাঠকের ধরা-ছোঁয়ার জগতে এনে দেবার একটা উপায়, এই সত্য তাঁরা কখনো বিস্মৃত হননি। ফলে দেখা যায়, তাঁরা এমন কোন অলঙ্কার ব্যবহার করতে চান নি, যাতে অস্পষ্টভাব আরো বেশি ঘোলাটে হয়ে যায়।

দু'চারটি জায়গা ছাড়া লোকসাহিত্যে তেমন বিরোধমূলক অথবা গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলঙ্কারের দেখা মেলে না। লোক-কবিরা বেশি নির্ভর করেছেন সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের উপর। তুলনা করাই যার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তুলনা টানতে গিয়ে তাঁরা হাত বাড়িয়েছেন সেইসব উপমানের দিকে, যা আমাদের চারপাশের জগতে অনায়াস-লভ্য। এমনকি তুলনাবাচক সাধারণ ধর্মের মধ্যে তাঁরা দেখাতে চান ভাবনার প্রাতিস্বিকতা। সম্ভ্রান্ত রুচিতে আমরা যাকে আমল দিই না, কিংবা কখনো-সখনো 'ভাল্‌গার' বলে দূরে সরিয়ে রাখি, লোককবিদের চিন্তায় এই জাতীয় শুচিবায়ুগ্রস্ততা বিশেষ থাকে না। আমাদের প্রাপ্ত পালাটিতে বেশ কয়েকটি স্থানে অলঙ্কার প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। ব্যক্তির রূপ ও স্বরূপ পরিস্ফুট করতে কিংবা কোন চরিত্রের মনোভাব বোঝাতে অথবা কোন বিশেষ অবস্থাকে স্পষ্ট করে তুলতে এ পালার রচয়িতা অলঙ্কারগুলি প্রয়োগ করেছেন। সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের মধ্যে কবিরা বেশি ব্যবহার করেন উৎপ্রেক্ষা, উপমা, রূপক ও ব্যতিরেক। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কয়েকটি অলঙ্কার এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হল ঃ

ব্যক্তির বাহ্যরূপ প্রকাশে অলঙ্কার ঃ

১. চৈক্ষেতে অপরাজিতা গায়ে চাম্বাফুল। (প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা)

২. ডুম্ব দিয়া উডি কইন্যা ঝাইড়া লইল চুল।
কাল ভোমরা দেখিয়ারে ভাবিয়া আকুল।। (ব্যতিরেক)

৩. এক এক হাত তার ঠুনির সমান।।
দুই পা দেখিতে যেমন দুইটা গাছের গোড়া। (লুপ্তোপমা)

৪. দুই চোখে ঝরে কইন্যার শাত্তনের পানি। (প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা)

৫. চলন খঞ্জনের মত কলসী কাঁকে লই। (লুপ্তোপমা)

৬. থিয়াই রহিল একটা গাছের মতন। (লুপ্তোপমা)

ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশে অলঙ্কার ঃ

১. জ্বলিয়া উঠিল বাপ জ্বলন্ত আগুনি। (প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা)

২. বিরহ বিষের জ্বালা পরাণ দহিল। (রূপক)

৩. বঁধু আমার আচমানেরি চান। (রূপক)

কোন চরিত্রের মনোভাব প্রকাশে অলঙ্কার ঃ

১. মাছে চিনে গহিন পানি পানিয়ে চিনে ধার।
মায়ে জানে পুতর বেদন যার গর্ভের সার।। (প্রতিবস্তূপমা)

২. যৈবন হৈল কাল কইন্যার রূপ অ হৈল কাল।
আগুনি দেখিলে হায়রে ফেরুমের ফাল।। (প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা)

৩. নবীন যৈবন কইন্যার হেলি পড়ের গাও।
ফুলেতে থাকিলে মধু ভরমরার রাও।। (প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা)

৪. চাম-রাঙ্গা মাইয়া দেখি ভুলিল কি পুত।
   পরখ করি ন চাইল রে দুধ আর মুত। (দৃষ্টান্ত)

লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত অলঙ্কারসমূহ অতি-আরোপনের নিষ্প্রাণতা ও যান্ত্রিকতাবর্জিত। এখানে উপমানস্বরূপ কবির মনোলোক অধিকার করেছে চাঁদ, ফুল, ভ্রমর, গাছ, বিষ, আগুন, ফড়িং, থাম ইত্যাদি অতি সাধারণ বিষয়। এমনকি, ভব্যরুচিতে বাধতে পারে এমন বস্তুও ('মুত' < মূত্র) কবি অনায়াসে এনেছেন, যা কেবল লোকসাহিত্যেই সম্ভব। অলঙ্কারগুলি প্রযুক্ত হওয়ার ফলে ব্যক্তির রূপ, স্বরূপ ও তাৎক্ষণিক মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যের বয়ান রচনায় ভাষাই একমাত্র উপকরণ। সাহিত্যিকের মুখ্য কাজ বয়ান রচনা। তাই রচয়িতার কাছে ভাষা এক অপরিহার্য উপাদান। লোকসাহিত্যের ভাষা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় স্থান তথা প্রতিবেশের দ্বারা। লোকায়ত জীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে বলে লৌকিক তথা গ্রামীণ মানুষের মুখের ভাষাই অবিকৃতভাবে উঠে আসে এ জাতীয় সাহিত্যে। মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় লোকভাষার ব্যবহার যথেষ্ট। কোথাও কোথাও তা ভীষণই আকাঁড়া। সংগ্রাহকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 'পোজলার পালা' সংগৃহীত হয়েছে বঙ্গসমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপ ও চড়াভূমি থেকে। সেখানে পূর্ববঙ্গের জেলে-জাতির বাস, যারা একেবারেই নিরক্ষর। এই পালা যে নিতান্তভাবে তাদেরই জীবন-সঞ্জাত কাহিনীর চরিত্র ও বিশেষ সমস্যা (হার্মাদদের অত্যাচার) সূত্রে তা বোঝা যায়। সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি লোকসাহিত্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানতেন। এ ধরনের গীতিকা যে অবিকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয় এই তাত্ত্বিকতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এ প্রণালী তাঁর সংগৃহীত অন্যান্য পালাতেও অনুসৃত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য পালাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে চাটগাঁ সন্নিহিত পূর্ববঙ্গের উপভাষা তথা বঙ্গালীর উপর। অবশ্য ভাষাতাত্ত্বিকরা বাঙ্গালীর যতগুলি ধ্বনিগত ও রূপগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন, সবগুলি এ পালার ভাষায় লভ্য নয়। মধ্য-বাংলায় অপিনিহিতির আবির্ভাব ঘটেছিল, যা বঙ্গালী ভাষায় আজও পরিপূর্ণরূপে বর্তমান। 'পোজলার পালা'-তে অপিনিহিতির প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। এখানে অনাবশ্যকবোধে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করছি—কাইল, আইসা, বাইজাছে, কইরে, চইলা, মাইল্ল, কইন্যা, জাইন্য, কাইস্ত, বইস্যে ইত্যাদি। ভাষার এই মূল কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে রচয়িতা এর মধ্যে প্রচুর আঞ্চলিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, যা অন্যত্র দুর্লভ। একইভাবে, বিশেষ বৃত্তির (ধীবর বৃত্তি) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজন এর পাত্রপাত্রী বলে সেই বৃত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক শব্দ অনায়াসে স্থান পেয়েছে এখানে। রয়েছে অন্যান্য অনেক ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশেষত্ব, ক্রিয়াপদিক বৈচিত্র্য, বিদেশী শব্দের ব্যবহার। নীচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্গীকরণ করে প্রত্যেকটির কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে পালাটির ভাষাগত বিশেষত্বটি পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

১. আঞ্চলিক শব্দ—থিয়াই, ঘুট্যা, তঁয়সা, মিক্যা, আদিগুরি, দর্জ্যা, ফোয়াদ, উদাম্যা, উয়ানালে, কাউরা-মেউরা, ফেরুম, আঠাট্যা, ফেউস্বা, হুদা, গুঁইয়া, টেবাটেবা, হাঁচুরি, আতাইক্যা, অলছ-তলছ, আড়াল্যাপাড়াল্যা, ফুতি ইত্যাদি।

২. বৃত্তি-নির্ভর শব্দ—যমুনা, টাউলা, খো, জো, বালাম, টাল, ঠোঁড়া, পাছিলে, টং, দহিনালী, উতরালী ইত্যাদি।

৩. বিদেশী শব্দ—গোজারিয়া, কামাই, লালছিতে, বেরাজি, মালুম, পানি ইত্যাদি।

৪. উচ্চারণগত আঞ্চলিকতা—হেঁচকাই, মাইয়া, শরীলে, ঠেঙ্গা, তেঁতই, জলজলা, লেজ্জাবাড়ি, তেলালী-ঝোলালী, তেরিমেরি, কালুকা, গা-আঁধারি ইত্যাদি।

৫. অপিনিহিতির অতিপ্রভাব-জাত শব্দ—কৈল্লাম, কৈবর্ত্ত, রৈক্ষা, সৈন্ধ্য', চৈক্ষেতে, কৈত্ত, বৈপাকে, বৈদেশে ইত্যাদি।

৬. ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশেষত্ব—(১) ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন:

(ক) ঘোষীভবন, বিশেষত ট, ঠ > ড ধ্বনিতে পরিবর্তিত। যেমন—ফুটি > ফুডি, উঠিল > উডিল, জ্যাঠা > জেডা, কাটিকুটি > কাডিকুডি, হাটে > হাডে, চোখের > চোগর, পেটির > পেডির ইত্যাদি।

(খ) কোথাও কোথা অঘোষীভবনের দৃষ্টান্তও আছে। যেমন—ডুবিল > ডুপিল।

(গ) শ, ষ, স কখনো কখনো 'হ'-তে রূপান্তরিত। যেমন—স্রোতের > হোতর, শাক > হাক, সিথান > হিথান, সানাই > হানাই, সেই > হেই ইত্যাদি।

(ঘ) স > চ, ছ-তে পরিণত। যেমন—সামনে > ছামনে, আসমান > আচমান।

(ঙ) ন > ল-তে দৈবাৎ পরিবর্তিত। যেমন—নামি > লামি।

(চ) ব্যঞ্জনাগমও হয়েছে। যেমন—ডুব > ডুম্ব, ব্যাকুল > বেয়াকুল।

(ছ) শব্দের শেষে ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে। যেমন—লাগিয়া > লাই, বন্ধ > বন, ডাকাত > ডাকু, দেবতা > দেবা।

(২) স্বরধ্বনির পরিবর্তন:

(অ) স্বরভক্তির দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন—প্রথম > পরথম, প্রধান > পরধান, সূর্য > সুরুজ, গ্রাস > গরাস, শ্বাস > শোয়াস ইত্যাদি।

(আ) উ > ও হয়েছে। যেমন—সুন্দর > সোন্দর, জুলুমে > জোলমে।

(ই) ঋ > ই-তে পরিণত। যেমন—পৃষ্ঠ > পিষ্টি, দৃষ্টি > দিষ্টি

(ঈ) ও > অ রূপে উচ্চারিত। যেমন—কোনদিন > কনদিন।

(উ) ঔ > উ ধ্বনিতে পরিণত। যেমন—নৌকা > নুকা।

(ঊ) এ পালাতে 'না' সর্বত্র 'ন' রূপে ব্যবহৃত। এটি স্বরলোপের দৃষ্টান্ত।

৭. রূপতাত্ত্বিক বিশেষত্ব—

(ক) ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষে 'ম' বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন—আসিব > আইস্যম, দিব > দিয়ম, রাখিব > রাখ্যম, করিব > কর্য্যম ইত্যাদি।

(খ) অধিকরণ কারকে 'ৎ'-বিভক্তির ব্যবহার। যেমন—মনে > মনৎ, মুখে > মুয়ৎ, বাড়িতে > বাড়িৎ, পানিতে > পানিৎ, হাতে > হাতৎ, ভাটাতে > ভাডাৎ ইত্যাদি।

(গ) অপাদান কারকে 'হইতে' অনুসর্গের স্থলে 'থথুন' অনুসর্গ। যেমন—হরপথুন।

(ঘ) সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠীর-'এর' বিভক্তি ব্যবহৃত হলেও গোড়ার 'এ' ধ্বনিটি লুপ্ত। যেমন—গায়ের > গায়র, বৌয়ের > বৌয়র, রাতের > রাতর, স্রোতের > হোঁতর, ছাঁচিবরের > ছাঁচিবরর, চোখের > চোগর, মহিষের > মৈষর ইত্যাদি।

(ঙ) অতীত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও ধাতু-শব্দের পর 'গই' বিভক্তির প্রয়োগ ঘটেছে। যেমন—যারগই, গেলগই ইত্যাদি।

(চ) ঘটমান বর্তমান কালের ক্ষেত্রে মূল ধাতুর পর '-র' বিভক্তি যুক্ত করে ক্রিয়ার তাৎক্ষণিক রূপটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। যেমন—যাচ্ছে > যা-র, চাচ্ছে > চা-ই, আসছে > আ-ই, করছে > করে-র, পড়ছে > পড়ে-র ইত্যাদি।

এইসব বৈশিষ্ট্যের বাইরে আরও অনেক ভাষিক লক্ষণ পালাটিতে থাকা সম্ভব।

কথাসাঙ্গ ঃ

পুরনো সাহিত্যের প্রতি সঙ্গত কারণেই আজকের অধিকাংশ পাঠকের আর খুব বেশি আগ্রহ নেই। এর একটা কারণ যদি হয় এর দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ-সমাকীর্ণ সেকেলে কাব্যভাষা, দ্বিতীয় কারণটি হল একালের মানুষের সঙ্গে ফেলে-আসা সময়ের মন্থর মানুষের 'অ্যান্টিক'-জীবনবোধের তফাৎ। অনেকের মতে, ওগুলো এখন 'কিউরিও' হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনায় পুরনো কালের সাহিত্যকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া চলে না। কারণটা সামান্য বিশ্লেষণযোগ্য। আমাদের একালীন সবল, প্রাণস্পন্দিত, প্রযুক্তিনির্ভর জীবনচেতনার নিরিখে প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগের সাহিত্য আজ অনেকের চোখে 'মৃত'। যেহেতু তাতে এসময়ের সমস্যা ও সংকট, আততি ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন আদৌ নেই। কথাটা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এটা তো মানতেই হবে যে, সাহিত্যের পরম্পরা একটা নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা। সাহিত্যে সময়ের পরতগুলো অনেকটাই মিলে যায় সিঁড়ির নানা উচ্চতার ধাপের সঙ্গে। নীচের ধাপগুলো না অতিক্রম করলে যেমন উঁচু থাকের ধাপগুলোতে উঠতে পারা যায় না, সাহিত্যও তেমনি। একটিকে পুরোপুরি অস্বীকার করলে আর একটির অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়বে। যাঁরা অতীত কালের সাহিত্যকে 'প্রাণহীন' অর্থাৎ মৃত বলে ঘোষণা করেছেন তাঁদের মতকে আংশিক সমর্থন করেও বলা যায়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে মৃত মানুষের দেহ যেমন শিক্ষানবিশ চিকিৎসক-ছাত্রের কাছে শারীর সংস্থান বিদ্যার জ্ঞান অর্জনে সহায়ক, তেমনি পুরনো কালের সাহিত্যকে কাটা-ছেঁড়া করে তার অন্তর্বর্তী গঠনের কলাকৌশলগত তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যের বিচারে তাকে প্রয়োগ করা সম্ভব। আলোচ্য গীতিকাটি বিষয়ের দিক থেকে হয়তো অতি অকিঞ্চিৎকর। তবু এর মূল্য এইখানে যে, বাংলাদেশের সরস উর্বর মাটি থেকে এ সরাসরি উদ্গত হয়েছে। কথাবস্তুর অন্তর্ভাগের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা নাই-বা ধরলাম, কিন্তু এ জাতীয় পালা সংগ্রহের পিছনে যে একটা সুদীর্ঘ প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস আছে তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। অনাবশ্যক জঞ্জাল হিসেবে এটাকে পৃথিবী থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলার আগে আগ্রহীজনের কাছে তার এই সামান্য মুখ প্রদর্শনে যদি এর শ্রমনিষ্ঠ সংগ্রাহকের দুরূহ প্রচেষ্টা ও অসীম অধ্যবসায়ের সামান্য স্বীকৃতি মেলে তাহলে বর্তমান আলোচকের এই পণ্ডশ্রম সার্থক হয়ে উঠবে। অলমিতি।।

উনিশ শতকের উপন্যাস-পাঠক ঃ একটি রূপরেখা

প্রসূন ঘোষ

উলফ গাং আইজার বলেছেন ঃ "The stars of a literary text is fixed, the lines that join them are variable." অর্থাৎ টেক্সট বা পাঠ্য সর্বদা ধ্রুব, কিন্তু নানা পাঠকের পাঠের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পাঠক তার নানা পাঠের মধ্য দিয়ে অগোচরে হয়ে উঠতে পাবেন আর এক দ্বিতীয় নির্মাতা। আসলে লেখক যখন কোন সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তা করেন নিজ কাল-পরিসর ও শ্রেণির সঙ্গে ক্রমাগত মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই। আবার সেই সৃষ্ট সাহিত্যকে যখন পাঠক পাঠ করেন, তখন সে সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য হতে পারে। কোন সাহিত্য যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থানকারী ব্যক্তির নিজ ভাবনার ফসল, সেহেতু তা একটি বিশেষ স্থির বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকে না। স্রষ্টা যেমন নিজ সময় পরিসর ও সত্তার মধ্য দিয়ে অহরহ দেওয়া নেওয়ার মধ্য দিয়ে পাঠ্য সৃষ্টি করেন, পাঠকও তেমনি তাঁর স্থান কাল ও নিজের সঙ্গে মোকাবিলার মধ্য দিয়ে পাঠ্যের অন্তর্ভুবনে প্রবেশ করতে চান। কোন পাঠ্যই তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ নয়। রোমান ইনগার্ডেনের মতো তাত্ত্বিক তাই পাঠকে মূর্ত বলতে চেয়েছেন আর জোনাথন কালারের মতো মেধাবী সমালোচক কমপিটেন্সের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রোমান ইনগার্ডেন যেমন বলেছেন পাঠ পাঠ্যকে সম্পূর্ণতা দেয়, পাঠকের চিন্তা পাঠ্যের কলাঙ্গিক কিংবা শৈল্পিক রূপরীতির শূন্যস্থানগুলিকে পরিপূর্ণ করে তোলে, জোনাথন কুলর তেমনি বলেছেন পাঠক নির্দিষ্ট কনটেক্সটে একটি বিশেষ প্রতীতি গড়ে তোলেন আর সেই প্রতীতি দিয়েই তিনি পাঠ্যকে পাঠ করেন। অন্য কনটেক্সটে গড়ে ওঠে অন্য প্রতীতি, কিংবা পাঠকভেদে গড়ে ওঠে ভিন্ন প্রতীতি, সেই প্রতীতি দিয়ে বিচার করলে পাঠ্যের তাৎপর্য পাল্টে যায়। নানা পাঠকের পাঠের বিচার করলে তাই একটি সময়ের, পরিসরের, পাঠকের সত্তার কিংবা স্বভাবের নানা মাত্রাকে অনুধাবন করা যায়।

বর্তমান সময়ে আমরা একবিংশ শতাব্দীর শরিক। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জগতে এখন নানা পরিবর্তন ঘটে গেছে। এইসব জগতে বিরাট পরিবর্তন কেবল ঘটেনি, উত্তর-আধুনিক কিংবা উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে প্রতাপ ও আধিপত্যের নানা রকমফেরও পরিলক্ষিত। মানবজীবন সম্পর্কিত প্রথাগত যে বিশ্বাস ও ধারণাগুলি ছিল তারও অনবরত বদলকেও আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করি। নিশ্চয়তাহীন কেন্দ্রচ্যুত এক জগতে আমরা যেন দেখছি মরীচিকাকে, দেখছি মোহগ্রস্ততাকে, দেখছি ক্রমাগত অন্ধকার সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে কিংবা অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার প্রবণতাকে। এই সময়ের অংশীদার পাঠক যখন সাহিত্যকে অনুধাবন করতে বসেন তথা পুনর্নির্মাণ করতে বসেন, তখন অবশ্যই তা পূর্ববর্তীকালের পাঠকের চেয়ে নানাদিক দিয়েই ভিন্নতর হয়ে ওঠে। জীবনের নানারূপকে লেখক তাঁর সৃষ্ট পাঠ্যে আশ্রয় করতেই পারেন, কিন্তু স্রষ্টার থাকে তৃতীয় চক্ষুও, তিনি সেই তৃতীয় চক্ষু দিয়ে জীবনে যা কিছু ঘটতে পারে সেই ভবিষ্যৎ ভুবনকেও নির্মাণ করেন। পাঠক সমালোচক যখন পাঠ্যকে বিশ্লেষণ করতে বসেন তখন এই সহজ সত্য কথাগুলি অবশ্যই স্মরণে রাখেন, তিনি কেবল লেখকের নির্দেশিত বিধানকে মেনে চলেন না। পাঠকেরও থাকে একটি বৃত্তরেখা, সেই বৃত্তরেখা গড়ে তোলে তার মনের মধ্য সামাজিকবোধ, রাজনৈতিক চেতনা,

ঐতিহাসিক বীক্ষা। সেই বীক্ষা থেকেই এক পাঠক কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যের অন্তর্জগতকে অন্য পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অপেক্ষাকৃত নবনির্মিত নগরী কলকাতায় এক বড় পালাবদল ঘটেছিল। একে নবজাগরণ বলা যায় কি না, কিংবা এই নবজাগরণ সার্বিক কি না, এ নিয়ে নানা বিতর্কও আছে। কিন্তু উনিশ শতকে এই পালাবদল মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মনের মধ্যে এই দুটি দিক জাগ্রত করেছিল—এক, যুক্তির উদ্রেক এবং দুই, মানবতাবোধের উত্তরণ। এখান থেকেই তাঁদের চেতনায় জাগ্রত হয়েছিল আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য। যেমন, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, অর্থাৎ ব্যক্তি হিসাবে স্বাধীনভাবে ভাববার ক্ষমতা আমার আছে, সে ভাবনা ঠিক বা ভুল যাই হোক না কেন আমি আমার ভাবনা প্রকাশ করব। ইহমুখীতা অর্থাৎ পারত্রিক জীবনের প্রতি নয়, ঐহিক জীবনের প্রতি আকর্ষণও দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যের মাধ্যমের ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এর আগে সাহিত্যের মাধ্যম ছিল শোনার মাধ্যম। প্রকৃতপক্ষে, মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার আগে অর্থাৎ মধ্যযুগে পুথির সংখ্যা ছিল অল্প। সে পুথি কয়েকজনের কাছেই গচ্ছিত থাকত, সকলের ইচ্ছা থাকলেও পুথি পড়তে পারতেন না। মধ্যযুগে সারাদিন কাজকর্ম করার পর দিনাবসান হলে মানুষ একত্রে মিলিত হতেন এবং গায়কেরা পুথি পড়ে শোনাতেন কিংবা গান করে শোনাতেন আর সাধারণ মানুষ ভক্তিভরে তা শুনতেন। উনিশ শতকে সাহিত্যের মাধ্যম হল পড়ার মাধ্যম। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের কতকগুলি নতুন সংরূপ বা জঁার নির্মিত হয়—যেমন, উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি। এই সময়ে প্রথমদিকে সমসময়কে অবলম্বন ক'রে নাটক আর অতীত সময়কে অবলম্বন ক'রে উপন্যাস লেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নাটককে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যার প্রথমটি হল উদ্দেশ্যমূলক সামাজিক বা পারিবারিক নাটকের ধারা আর দ্বিতীয়টি হল ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকের ধারা। এই সময়ের নাটকে কেবল সমসময়কে উপজীব্য করা হয়নি, বৃহত্তর মানুষের স্বার্থে বৈষম্যের বিরুদ্ধাচারণও করা হয়েছে। যে কোন ঔপনিবেশিক সমাজে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় নারী এবং নিম্নবর্গের মানুষ, এরা 'other' বা 'অপর' হিসাবে গণ্য হয়। এই সময়ের নাটকে এর বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছে মূলত দুটি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে—এক বিদ্রোহ, দুই ব্যঙ্গ। বাংলা নাটকে এই বিদ্রোহ দেখা গেছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এর মধ্য দিয়ে, ব্যঙ্গ দেখা গেছে 'কুলীনকুল সর্বস্ব'-এর মতো নক্শাধর্মী নাটকে কিংবা 'একেই কি বলে সভ্যতা?' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'সধবার একাদশী'-র মতো প্রহসনধর্মী নাটকে। লক্ষ করার বিষয়, ডমিন্যান্ট যখন ঔপনিবেশিক সমাজ, তখন তার আধিপত্যের বিরুদ্ধে অর্থাৎ নীলকর ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ দেখা গেছে। আবার ডমিন্যান্ট যখন এদেশের লোক অর্থাৎ কখনো সমাজপতি পুরুষ কিংবা নব্যবঙ্গের অনুকরণ স্পৃহ যুবসমাজ তখন দেখা গেছে ব্যঙ্গ। এই কারণেই, এই বিদ্রোহ বা ব্যঙ্গ করেছে কখনো সমাজের নীচের তলার মানুষ, কখনো বা নারী। তাই, 'নীলবিদ্রোহ'-এর মতো নাটকে তোরাপের মতো নিম্নবর্গের মানুষের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে মুসলমান নিম্নশ্রেণির মানুষেরা নব্যবঙ্গীয় মানুষদের ব্যঙ্গ করে, কিংবা 'কুলীনকুল সর্বস্ব'-এর মতো রচনায় জমিদার পুরুষ বা সমাজপতি ব্রাহ্মণকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে অন্দরের নারী। উনিশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধের নাটকের পরবর্তী ধারাটি হল ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকের ধারা। এই প্রবণতা পরিবর্তনের কতকগুলি কারণকে চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নাটককারকে প্রচুর পরিমাণে নাটকের যোগান দিতে হচ্ছে, ফলত ফরমায়েশী লেখা লিখতে হচ্ছে, গিরিশ ঘোষের মতো নাটককার একদিকে নাটক লিখছেন, অন্যদিকে অভিনয় করাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে সুচিন্তিতভাবে সম-সময়কে জারিত ক'রে নিজ অভিজ্ঞতার প্রকাশ সবসময় সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, এই সময়েই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ হিন্দুধর্ম সংস্কারের মধ্য দিয়ে দেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এর ফলে, নাটককারও পুরাণ অনুসরণ ক'রে তা নতুনভাবে নির্মাণ করতে চাইছেন। তৃতীয়ত, নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে সমসময়ের অন্যায় অবিচার তুলে ধরতে গিয়ে পাছে কোপে পড়তে হয় শাসক সমাজের— নাটককারদের মনে এ চিন্তাও যে সেদিন দেখা গেছিল এ সত্যকেও স্বীকার করতে হয়। অবশ্য প্রথাগত পথ থেকে বরাবরই বেরিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই দেখি, ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকের প্রবল জোয়ারের কালেও কখনো প্রথা ও প্রতাপের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন (যেমন, 'বিসর্জন' নাটক), কখনো নারী পুরুষ সম্পর্কের গতানুগতিক ধারণার ব্যতিক্রমী বৃহত্তর ধারণাকে স্থাপন করেছেন (যেমন 'রাজা ও রাণী' নাটক), কখনো নারীকে স্বাধিকার অর্জনের মধ্য দিয়ে পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন (যেমন 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমদিকে সমসময়কে উপজীব্য ক'রে সরাসরি শোষিত পরিবার কিংবা সমাজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা উপন্যাসে হয়নি। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র, ব্যতীত রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মীর মোশারফ হোসেন, চণ্ডীচরণ সেন, রোহিনীকুমার সেনগুপ্ত, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, সীতানাথ চক্রবর্তী, বরোদাকান্ত মজুমদার, মনোমোহন রায় প্রমুখ ঔপন্যাসিক অতীত সময়কে অবলম্বন ক'রে উপন্যাস লিখেছিলেন। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, উপন্যাস পড়া যায়, কিন্তু নাটকের মতো অভিনয় ক'রে দেখানো যায় না। বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রকে উপন্যাসের উপযোগী পাঠকও তৈরি করতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন নবনির্মিত এই শিল্পমাধ্যমটির পাঠক গ্রামের মানুষরা নয়, তাঁরা ভক্তিভরে পাঁচালী পড়বেন কিংবা কথকতা শুনবেন। ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠা নগরী কলকাতার মধ্যবিত্ত মানুষরাই হবেন উপন্যাসের পাঠক। এই মানুষগুলির উৎসভূমি গ্রাম, অথচ তারা পাশ্চাত্যজাতির অনুকরণে সদাব্যস্ত। নানা দিক দিয়ে স্ববিরোধিতাকে তাঁরা বর্জন করতে পারেননি, অনেকক্ষেত্রে তাঁরা বিকারগ্রস্তও বটেন। এই বিকারগ্রস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তিনি যদি উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে অঙ্কন করেন তাহলে পাঠক তৈরি করা যাবে না। সুতরাং সম সময়ের প্রতি অনীহাবশত তিনি তাঁর উপন্যাসে সমকালীন সমাজছবি না দিয়ে অতীতের পটভূমিকায় উপন্যাস লিখেছেন। অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জাতি গঠনের কারণেও অতীত সময় প্রযুক্ত হচ্ছে। ঔপনিবেশিক শাসকের অধীনস্ত চাকুরীজীবী বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজরা জনগণের প্রতি যে তীব্র ঘৃণা পোষণ করত সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি তাই একটি জাতির দীর্ঘ সুপ্তাবস্থা মোচন করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন জনমনে শৌর্য ও পৌরুষ চেতনাকে জাগ্রত করতে। তাই দেখি, পুরাতন গৌরবের পুনরুদ্ধার

করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে অঙ্কন করতে চাইছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে অপরাপর ঔপন্যাসিকগণ অতীত বিশেষত রাজস্থানকে পটভূমিকা করে রাজস্থানের রাজাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে কিংবা রাজস্থানের নারীদের আত্মত্যাগকে উপস্থাপিত করেছেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন বাঙালি জাতির প্রকৃত ইতিহাসের একান্ত অভাবের কথা। তিনি বারবার আক্ষেপ ক'রে বলেছেন যে, বিদেশী ঐতিহাসিকদের বিকৃত ইতিহাসই আমরা শুনে আসছি। সুতরাং, যথার্থ ইতিহাস লেখা প্রয়োজন। কেননা যথার্থ ইতিহাস মানুষকে অতীত সম্পর্কে অবহিত করে, মানুষও তা পাঠ ক'রে হয় উন্নত। বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর অনুসারী লেখকরা সেই ইতিহাসের নবমূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁদের এই শ্রেণির রচনার মাধ্যমে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেখা যায়, উপন্যাসের মতো নতুন শিল্পমাধ্যম যেমন গ্রামাঞ্চলের মানুষের সহজাত প্রচেষ্টায় জন্ম নেয়নি, তেমনি সামন্ততন্ত্র কিংবা রাজতন্ত্রের অধীনস্ত মানুষের সচেষ্টায় তার উদ্ভব ঘটেনি। বুর্জোয়া সভ্যতার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পমাধ্যমের নির্মাণ সম্ভব হয়। উপন্যাস তাই রাজন্যবর্গের কোন একজন মানুষের ইচ্ছাধীন থাকেনি, কিংবা কোন গোষ্ঠীজীবন নির্ভর সমাজেরও দাক্ষিণ্যপুষ্ট হয়নি। এক নতুন সমাজ ব্যবস্থায় নানা ধরনের মানুষ ভিড় করেছে। সে সমাজ জটিলতায় আক্রান্ত, যে জটিলতা মূলত অর্থনৈতিক জটিলতা। নাগরিক সেই মানুষগুলি চাকুরীজীবী মানুষ, প্রধানত বুদ্ধিকে নির্ভর করেই তাদের জীবিকা গড়ে উঠেছে। সেই চাকুরীজীবী মানুষগুলি আর মধ্যযুগের গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের মতো ভক্তিবাদ বা বিশ্বাসবাদের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তারা যুক্তিবাদে বিশ্বাসী। এই যুক্তিবাদী মানুষগুলির আত্মপ্রকাশের বাহন তাই ছন্দোবদ্ধ পদ্য নয়, তা হল গদ্য। অবশ্য এক্ষেত্রে মুদ্রণযন্ত্রের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। নগরজীবী বুর্জোয়া মধ্যবিত্তরা নানা ধরনের জীবিকাকে অবলম্বন করলেও মুদ্রণযন্ত্রের মধ্য দিয়ে তাদের লিখন ও পঠন সম্ভব হয়। তাঁদের বক্তব্য এই যন্ত্রের ফলেই অবিলম্বে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষগুলির হাতে পৌঁছে যায়। মুদ্রণযন্ত্রের মধ্য দিয়েই গদ্যের প্রসারও সম্ভব হয়, নানা ধরনের চিঠিপত্র লেখা হয়, মানুষের মধ্যে মত বিনিময় সম্ভব হয়, একের পর এক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়, ধীরে ধীরে নিজ বক্তব্য কেবলমাত্র চিঠিপত্রের মধ্যে কিংবা সাময়িক পত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, জীবনীমূলক নানা রচনার মধ্য দিয়েও বের হয়। এই বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরা এইভাবে যেমন তাদের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে, তেমনি উপন্যাসের উদ্ভবও সম্ভব হয়। রুশ সাহিত্য কিংবা ফরাসী সাহিত্যের পূর্বেই ইংরাজি সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজি সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভবের কালপটভূমিটি স্মরণে রাখা জরুরি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে সমাজ ও অর্থনীতির জগতে ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। শহরকে নির্ভর ক'রে এক নতুন বুর্জোয়া সমাজ গড়ে ওঠে। তারা নানা ধরনের মানুষ, তাদের জীবিকাও নানা ধরনের। কেউ ব্যাবসাকে জীবিকা করে, কেউ হিসাব দেখা শোনা করে, কেউ কারখানায় কাজ করে, কারও বা জীবিকা শিক্ষাকে নির্ভর ক'রে গড়ে উঠেছে। তারা আগে ছিল পরস্পরের কাছে অপরিচিত, ক্লাব কিংবা কফি হাউসের সূত্রে তারা একে অপরের পরিচিত হল। এইভাবে রূপান্তরিত এক সমাজের নানা স্তর পরম্পরায় বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠল। এই সময়ের ইংলন্ডে মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভবই কেবল ঘটল না, প্রভূত পরিমাণে তার সংখ্যাবৃদ্ধিও দেখা গেল। মুদ্রণযন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন

নতুন সংবাদপত্রের জন্ম হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল দ্য ডেইলি ক্যারেন্ট পত্রিকা। অবিলম্বে প্রকাশিত হল ট্যাটলার (১৭০৯), স্পেকটেটর (১৭১১)। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল আরও নানা ধরনের সাময়িক পত্র, যেমন—জেন্টেলম্যান ম্যাগাজিন, ক্রনিকল, পোস্ট, টাইম্‌স ইত্যাদি। অর্থাৎ বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য দিয়ে কেবল পাঠক গড়ে উঠল না, ধীরে ধীরে উপন্যাসোপম রচনাগুলিরও জন্ম হল—যেমন বানিয়নের 'দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস' (১৬৭৮) , ডানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো' (১৭১৯), সুইফ্‌টের 'গ্যালিভার্‌স ট্রাভেল্‌স' (১৭২৬) প্রভৃতি। এই জাতীয় রচনাগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদা ইংলন্ডে উপন্যাসের উদ্ভবকে (সামুয়েল রিচার্ডসনের 'প্যামেলা'-১৭৪০) সম্ভব ক'রে তুলল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জগতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হয়ে উঠল গদ্য। বাংলা তথা তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায় নানা শ্রেণির মানুষেরা ভিড় জমালেন। নগরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হল। এই শহরবাসী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণিই ঔপনিবেশিক সমাজে ইংরাজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হলেন, সংবাদ সাময়িক পত্রের জন্ম দিলেন। তাঁরা তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিবেচনার উপযোগী সভা-সমিতিও গড়ে তুললেন। উনবিংশ শতাব্দীতেই পাঠক-সমালোচক তৈরি হল। এই পাঠক-লেখকেরা আর রাজসভার বৃত্তিজীবী নন, তারা অনেক বেশি স্বাধীন। তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধই নানা গদ্য রচনার মধ্য দিয়ে (যেমন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' ১৮২৩, 'নববিবিবিলাস' ১৮৩০, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ১৮৫৮) উপন্যাস নামক নতুন সংরূপ গড়ে উঠল বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

উপন্যাসে সমগ্র জীবনকে উপস্থাপিত করা হয়। বৃহৎ পটভূমিতে, অসংখ্য চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে এই সমগ্র জীবনকে সেক্ষেত্রে ধরা হয়। মহাকাব্য কাহিনি নির্ভর, সেখানেও থাকে বৃহৎ পটভূমির চিত্রণ, অসংখ্য চরিত্রের সমন্বয়। মহাকাব্যে প্রাধান্য পায় না কবির ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি, তাকে ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতনির্ভর ভাষার মধ্য দিয়েও গড়ে তোলা হয় না। জীবনের অসংখ্য জটিলতা, নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘাত ও মিথস্ক্রিয়াকে বর্ণনামূলক শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয় উপন্যাসে। এই বর্ণনাত্মক রচনা মহাকাব্যও। তাই উপন্যাসকে বুর্জোয়া শ্রেণির মহাকাব্য বলা হয়। বুর্জোয়া সমাজের নতুন অর্থনৈতিক স্তর পরম্পরায় স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের নানা সুযোগ থেকে যায়। ধনতন্ত্রের বিকাশ, ব্যাবসায়ী শ্রেণির উদ্ভব, নবনির্মিত নগরীর সম্প্রসারণ, শিল্পের উদ্ভব ব্যক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। আধুনিক যুগের সাহিত্যে তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বড় ভূমিকা থাকে। ব্যক্তি অথর টেকস্‌ট সৃষ্টি করেন, ব্যক্তি পাঠক তা পাঠ করেন। এই ব্যক্তি লেখক মধ্যযুগের গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ-উত্থিত নন, কিন্তু তিনি একেবারে নিজ শ্রেণিচ্যুতও নন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এক নবোদ্ভূত বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির শরিক হওয়ার ফলে লেখক যেমন নির্মাণ করতে পারছেন নতুন শিল্পমাধ্যম, তেমনি পাঠক উপভোক্তা তথা সমালোচকও শ্রেণিচ্যুত কোন ব্যক্তিমাত্র নন। আসলে, বুর্জোয়া সমাজের মধ্যেই থেকে যায় নানা দ্বন্দ্ব, নানা স্ববিরোধিতা—নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোয় ব্যক্তি নিজেও পারেন না তার সত্তাকে অনড়,

অক্ষত রেখে দিতে। পাঠকের পাঠের মধ্যে, তার সমালোচনার মধ্যে থেকে যায় তাঁর দ্বিধাবিভক্ত সত্তার নানা উপস্থিতিও।

১২৮১ বঙ্গাব্দে শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক তাঁর পাঠ-প্রতিক্রিয়ার প্রারম্ভেই তাঁর সময়ে ঔপন্যাসিকের সংখ্যা ও উপন্যাসের পাঠকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সংবাদ জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীকালে উপন্যাসের অন্যতম অবলম্বন 'স্বভাব উক্তি' ও 'স্বভাব চিত্র' সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হল ঃ "বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে, সকলেই স্বভাব। বিশ্বসংসারে যাহা নাই, তাহা স্বভাব নয়। বিশ্বসংসারে জল নিম্নগামী, উচ্চভূমি হইতে নিম্নভূমিতে যায়; সূর্য্য পূর্বদিক হইতে উদিত হন—এজন্য এ উভয়ই স্বভাব। জল উর্দ্ধগামী ও সূর্য্যের পশ্চিমে উদয়, বিশ্বসংসারে দেখা যায় না, সুতরাং ইহারা স্বভাব নয়। পঞ্চম মাসের শিশু কথা কহিতে পারে না। যদি কোন কবি তাহাকে কথা কহান, তাহা হইলে তাঁহার বর্ণনা স্বাভাবিক হইল না। আমাদিগের দেশে অদ্যাপি স্ত্রীলোকে স্বামীর নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকে না। যদি কোন কবি স্ত্রী স্বামীকে নাম করিয়া ডাকিতেছে, এরূপ বর্ণনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণনা হইল না। এইরূপ সকল বিষয়েই, প্রচলিত প্রণালীর অনুসরণ করিলেই কবি স্বভাব বর্ণনা করিলেন, কিন্তু তদ্বিপরীত করিলেই স্বভাব বর্ণনা হইল না।"[১] এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, সমালোচক মূলত উপন্যাসের বাস্তবতা প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্যকে অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, অ্যারিস্টটল অনুকরণের কথা বলেছিলেন, যা ছিল প্লেটোর মতের প্রতিস্পর্ধী। পরবর্তীকালে রোমান্টিসিজম, রিয়েলিজম, ন্যাচারিলজম প্রভৃতি সাহিত্যিক আন্দোলনও পাশ্চাত্যে দেখা যায়। যিনি রোমান্টিক ঔপন্যাসিক তিনি জীবনের আবেগ-স্পন্দনকে নিজস্ব কল্পনায় অভিষিক্ত ক'রে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বর্ণনা করেন। ন্যাচারালিস্ট তথা প্রকৃতিবাদী লেখক শ্রীমণ্ডিত এক রূপের আড়ালে থাকা জীবনের বীভৎস নগ্নরূপকেই পরিবেশিত করতে চান। সোসিয়ালিস্ট রিয়েলিজম বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী লেখক কেবল বাস্তব চিত্রিত করেন না, সে চিত্রণের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাকে প্রকাশ করেন, লাঞ্ছিত মানুষদের সঙ্গে সহমর্মী হয়ে এক সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী চেতনাকে জাগ্রত করতে সচেষ্ট হন। পাশ্চাত্যের এ আন্দোলনগুলি ঘটেছিল অনেক পরে তাই বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ের পাঠকের উপন্যাসের বাস্তবতা বিষয়ক বহুস্তরীয় ব্যাপারগুলি জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কতকগুলি সহজ সত্য বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট অবহিত ছিলেন এ সমালোচনা পর্যালোচনার দ্বারা তা উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে তিনি রোমান্টিসিজিম বা ন্যাচারালিজমের অনুসারী নন, বরং রিয়েলিজমের পক্ষপাতী। এ প্রসঙ্গে এর আগে লিখিত 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬)-র অন্তর্গত 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের উল্লেখ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন ঃ "সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুইয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয়গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না।" কিন্তু কেবলমাত্র স্বভাবের অনুকরণ করলেই যে সৃষ্টি মহৎ হয় না, সে সম্পর্কেও পাঠক বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণাঙ্গ রূপে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন ঃ "কেবল স্বভাবনুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনার মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে

কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টি চাতুর্য্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম, তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাব সঙ্গত গুণবিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্যলাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়।"[৩] 'স্বভাব' বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞানাঙ্কুরের সমালোচক অবহিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুসারে 'স্বভাবানুকারিতা' ও সমালোচকের অভিমত অনুযায়ী 'স্বভাব চিত্রণ' অভিন্ন নয়। তাই দেখি, এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হল ঃ "তৃতীয়ত শিল্প যত স্বভাবের ন্যায় হইবেক ততই তাহার পরিপাট্য হইবেক। স্বাভাবিক গোলাপ হইতে একটা কাপড়ের গোলাপকে হঠাৎ পৃথক করিতে না পারিলে তাহাকে উৎকৃষ্ট বলা যায় সুতরাং কল্পিত ঘটনা যতই স্বাভাবিক ঘটনার ন্যায় হইবেক ততই ভাল হইবেক।"[৪]

সমালোচক প্রাচ্য সমালোচনার তথা সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে যদিও তাঁর পাঠ-প্রতিক্রিয়াকে উপস্থাপিত করেছেন, তবুও তাঁর নিজ দেশ-কালের নানা মাত্রাকেও উপলব্ধি করা যায় সে পাঠ পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে। আদি পর্যায়ের উপন্যাস সমালোচকগণ বিশেষভাবে সমাজ সম্পর্কে ভাবিত হয়েছেন। তাই দেখি জ্ঞানাঙ্কুর সমালোচক 'স্বর্ণলতা' পাঠকালে তাঁর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেন ঃ "আমাদিগের দেখে অদ্যাপি স্ত্রীলোকে স্বামীর নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকে না।"[৫] উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে এ বাংলার সমাজে নানা আলোড়ন দেখা যায়। পুরাতন সংস্কৃতির বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় একদল মানুষেরা যখন চিন্তান্বিত, তখন অন্য একদল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে তার অনুকরণ স্পৃহায় মত্ত। সেই দ্বিধাবিভক্ত রূপের তথা নানা আলোড়নের প্রতিফলন এ মন্তব্যে তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আবার, সমালোচক সংস্কৃতরীতি অনুযায়ী উপন্যাসকে 'কাব্য' ব'লে অভিহিত করেছেন ঃ "উপন্যাস এক প্রকার কাব্য। কাব্যে স্বভাব না থাকিলে সে কাব্য কাব্যই নহে।"[৬] স্মরণীয় বাংলা উপন্যাসের যথার্থ নির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্রও উপন্যাসকে একপ্রকার কাব্যই বলতে চেয়েছেন। সমালোচক উপন্যাসে অবিশ্বাস্য ঘটনা-চিত্রণের পরিহার করা বাঞ্ছনীয় এমন মন্তব্যও করতে চেয়েছেন। যেমন ঃ "দ্বিতীয়তঃ আশ্চর্য্য বা অভাবনীয় ঘটনা যতটা কম হইবেক ততই উপন্যাস ভাল হইবেক।"[৭] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অ্যারিস্টটল ট্রাজেডি আলোচনা প্রসঙ্গে অবিশ্বাস্য সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাসযোগ্য সম্ভাব্যতার পার্থক্য করেছিলেন। বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে ঔপন্যাসিকরা যখন ইতিহাসের রাজা রাজড়াদের কাহিনি শোনাচ্ছিলেন, তখন ঔপন্যাসিক তারকনাথ প্রতিদিনের জীবনে ঘটে যাওয়া অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাকে উপজীব্য ক'রে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসখানি লিখেছিলেন। সে উপন্যাস তৎকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়ও হয়েছিল। সেকালের পাঠকের অভিব্যক্তি ধরা পড়ে 'স্বর্ণলতা'-র বিষয় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ঃ "এক্ষণে স্বর্ণলতার বিষয়। আমরা অনেক উপন্যাস পাঠ করিয়াছি কিন্তু স্বর্ণলতা পাঠে স্বাভাবিক সম্বন্ধে যতদূর প্রীত হইয়াছি বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় আর কোন উপন্যাস পাঠে তাদৃশ প্রীত হই নাই।"[৮] উপন্যাসটির কাহিনি বর্ণনার পর সমালোচকের উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্য ঃ "এইটা উপন্যাসটীর কঙ্কালমাত্র। কিন্তু পুস্তকখানি স্বভাবউক্তি ও স্বভাবচিত্রে পরিপূর্ণ। আমরা ইহাতে এমন এক স্থানও দেখিতে পাই নাই যাহা সচরাচর ঘটে না কিম্বা যাহাতে স্বভাবের

ব্যতিক্রম আছে।" উনিশ শতকের ঔপন্যাসিকগণ যেমন সামাজিক উপযোগিতাবাদের আদর্শকে সামনে রেখেই কলম ধরেছিলেন, তেমনি পাঠকেরাও সে আদর্শকে স্মরণে রেখেই উপন্যাস পাঠ করতেন—"উপন্যাসটীর উদ্দেশ্য দুই। প্রথমতঃ জীবিকা অর্জনে অসমর্থ লোকদিগের বিবাহ দেওয়া অন্যায়, দ্বিতীয়তঃ এক পরিবারে অনেকে বাস করা অনর্থের মূল এই দুটী সপ্রমাণ করা। প্রথমটির সহিত আমাদরে সম্পূর্ণ একমত্য আছে। পুরুষ অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম না হইলে তাহার পক্ষে দার পরিগ্রহ করা চিরদুঃখের বিজ রোপণ করা মাত্র। দ্বিতীয়টির সহিত যদিও আমাদের সম্পূর্ণ একমত্য নাই, তথাপি ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকর্তা নিজের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন।"[৯]

১২৮১ বঙ্গাব্দের জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'মৃন্ময়ী' উপন্যাসের সমালোচনা লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক দামোদর মুখোপাধ্যায় 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উপসংহার লিখেছিলেন 'মৃন্ময়ী' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। ''কপালকুণ্ডলা'-র শিল্পগুণকে স্বীকরণ করার ক্ষমতা দামোদরের ছিল না। তাই দেখি, নবকুমার-পদ্মাবতী-মৃন্ময়ী চরিত্রগুলি দামোদরের লেখনীতে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক নবকুমার-পদ্মাবতীর মিলন, পদ্মাবতীর মৃত্যু, নবকুমার-মৃন্ময়ীর পুনর্মিলনকে যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি উমাপতি ও মুক্তকেশীর প্রণয়দৃশ্যও অঙ্কন করেছেন। সমালোচক যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে 'মৃন্ময়ী', অপেক্ষা 'কপালকুণ্ডলা'-র শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন উভয় উপন্যাসের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা। এ জাতীয় উপন্যাস রচনা যে হাস্যকর অপচেষ্টা মাত্র সে কথা বলতেও তিনি ছাড়েননি। অবশ্য সামাজিক উপযোগিতাবাদের আদর্শকে মূল চাবিকাঠি ধরে নিয়েই তিনি উপনাস সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাই তিনি স্পষ্টভাবে ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, পাতিব্রত-অপবিত্রতা প্রভৃতি বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন। মৃন্ময়ী উপন্যাসকার এগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেননি বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং এই কারণেই তিনি তাঁর রুচির প্রশংসাও করতে পারেননি।

১২৮৪ বঙ্গাব্দে যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী এই দুই নারী চরিত্র পর্যালোচনায় সমালোচক ইতোপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধের চরিত্র আলোচনা-রীতিটি অনুসরণ করেছেন। সূর্যমুখী চরিত্রটি সীতা ও দেস্‌দিমোনার মিশ্রণে অঙ্কিত এবং কুন্দ চরিত্রটি শকুন্তলা ও মিরন্দার অনুসরণে রচিত—এমন মন্তব্য করেছেন সমালোচক। সে যাই হোক, এই দুই নারী চরিত্র বিচারে সমালোচকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রশংসা করতে হয়। তবে সামাজিক উপযোগিতাবাদের আদর্শকে সামনে রেখে তিনিও উপন্যাস সমালোচনা করেন। সমালোচকের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর ভালবাসার চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে প্রধান শিক্ষক ও মঙ্গলদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ, সুতরাং তিনি প্রশংসনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর হৃদয়ে প্রেম ভালবাসার উপস্থিতিকে দেখিয়েছেন, এর মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের নরনারীকে আত্মবিসর্জন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি সমাজের অশেষ মঙ্গলসাধন করেছেন। সমালোচক এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন।

১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'শ্রীপূর্ণ' নামে এবং ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় 'শ্রী

পূঃ—' নামে পূর্ণচন্দ্র বসু 'শৈবালিনী' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের শৈবলিনী চরিত্রটির কার্যকলাপকে বিচার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মূল কাহিনিটির সঙ্গে উপকাহিনিটির যথার্থ মেলবন্ধন ঘটেনি বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ "চন্দ্রশেখর গ্রন্থে দুইটি পৃথক উপন্যাস একত্র গ্রথিত করা হইয়াছে; কিন্তু ইহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছুই নাই। যে সূক্ষ্মসূত্রে ইহারা পরস্পর আবদ্ধ তাহাতে এত গুরুভার সহিতে পারে না। বিশেষত শৈবলিনীর সহিত দলনীর কোন সম্পর্ক নাই; তাহারা কখন কোন সূত্রে সম্বন্ধ ও মিলিত হয় নাই।"[১০] শৈবলিনী এবং দলনী চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত তুলনামূলক রীতিটিকে অনুসরণ করেছেন সমালোচক ঃ "একজন কুটীরবাসিনী বনসুশোভিনী, অন্যজন প্রাসাদসুন্দরী রাজোদ্যান প্রমোদিনী। একজনকে যে দেখে সেই বিমুগ্ধ হয়, অন্যজন এমত এক নবাবের মন মোহিত করিয়াছিল যাহার মন শতশত সুন্দরীতেও মুগ্ধ হয় নাই। একজন কলঙ্কিনী হইয়াও নিরপরাধিনী, অন্যজন কলঙ্কিনী না হইয়াও অপরাধিনী। একজন দুরবস্থা হইতে প্রেম-গৌরবে উচ্চে উঠিতেছেন, অন্যজন ঐশ্বর্য্যের উচ্চ শিখর হইতে দুরবস্থায় নিপতিত হইয়া প্রকৃত প্রেম মহত্ত্বেই সকলকে বিমোহিত করিতেছেন।"[১১] শৈবলিনী ও প্রতাপ প্রণয় প্রসঙ্গে গ্রন্থকার রোমিও ও জুলিয়েট প্রণয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। শৈবালিনী প্রতাপকে ভালবেসেও চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। সমাজের রিচুয়াল মানতে গিয়ে বাধ্য হয়েই তাকে এ কাজ করতে হয়েছিল। এ সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলেন রচনাকার ঃ 'এক প্রণালীতে বলে, বিবাহ কর, প্রণয় তৎপরে আপনা আপনি সমাগত হইবে। অন্য প্রণালী বলে প্রণয় হইতেই বিবাহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই মতদ্বয়ের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেও মিথ্যা হইয়া যায়।"[১২] পূর্ণচন্দ্র বসুর এ পাঠ যে উনিশ শতকের দেশকাল-উত্থিত তা স্পষ্ট হয়। শৈবলিনী যখন চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করেছিল তখন সুন্দরীর কাছে শৈবলিনীর অন্তর উন্মোচনের নানা দিকগুলিকে অঙ্কন করেননি ঔপন্যাসিক। শৈবালিনীর অন্তর সুন্দরীর কাছে প্রথম থেকেই উদঘাটিত হলে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হত বলেই সমালোচক মত প্রকাশ করেন। শৈবলিনীর প্রেম চিত্রণের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পসৃষ্টির যে পারঙ্গমতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে সমালোচক তা যথার্থভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সমালোচক যে উনিশ শতকের পুরুষ শাসিত সমাজের প্রতিনিধি তা উপলব্ধি করা যায় তাঁর এ জাতীয় সিদ্ধান্তে ঃ "শৈবলিনী স্ত্রী হৃদয়ের চরিত্র, প্রতাপ পুরুষের মনঃসংযমের চরিত্র।"[১৩] শৈবলিনী চরিত্রটির অসীম কৃচ্ছ্রসাধন তথা প্রায়শ্চিত্ত দৃশ্যটি সর্বত্র শিল্পসুন্দর নয়—"চন্দ্রশেখরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। বলিতে গেলে, এইখানেই এই উপাখ্যানভাগ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পর শৈবালিনী বিষয়ক উপাখ্যানাংশের সম্প্রসারণ তত মনোহর বোধ হয় নাই। এই প্রবৃদ্ধভাগ অধ্যয়নকালে আমাদিগের রামায়ণ মনে পড়ে। মনে হয় আবার সীতা পরীক্ষার পালা আরম্ভ হইল। শুদ্ধ তাহাই নহে, অনেককাল আমরা spiritualism এবং যোগসাধন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আবার দেখি সেই ভূতের আবির্ভাব। এই জন্য উপাখ্যানের এই অংশে ক্রমশ বিরক্তি ধরিতে লাগিল।"[১৪] সমালোচকের এ উচ্চারণ বিস্ময়জনক ও সাহসী, কারণ তা কেবল উনিশ শতকের সময়-উত্থিত পাঠসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা একালের পাঠকের অনুভূতিকেও স্পর্শ করে। 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকার আষাঢ়

সংখ্যায় শৈবলিনী চরিত্রের অবশিষ্টাংশ সমালোচনাকালে তিনি ঔপন্যাসিকের চরিত্রসৃষ্টি প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে সর্বত্র সহমত পোষণ করা যায় না—"অনেক উপন্যাস লেখক মনে করেন, যে মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দেখাইতে হইলে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র দেখান উচিত নহে। এইজন্য তাঁহারা সেই মানবপ্রকৃতির দোষগুণ উভয়ই একদা প্রদর্শন করেন। ... এরূপ চরিত্র পাঠের সংস্কার কখনো সাধু হয় না। যে পাপচিত্র দর্শনে পাপের প্রতি অপরক্তি এবং ঘৃণা না জন্মায়, সে পাপচিত্র অঙ্কিত না করাই ভাল।"[১৫] প্রসঙ্গত বলা যায় ফর্স্টার, লাবক, মূর, হেনরি জেমস প্রমুখ সমালোচকগণ উপন্যাসে রাউন্ড এবং ইন্ডিভিজুয়াল চরিত্র অঙ্কনেরই পক্ষপাতী। কেননা, সেই ধরনের চরিত্র আধুনিক জটিল জীবনের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। আসলে, উনিশ শতকের পাঠক উপন্যাস-শিল্প অপেক্ষা যে সমাজ নীতি-ধর্ম রক্ষণের দিকে অধিক মনোযোগী ছিলেন তা অনুধাবন করা যায়।

পূর্ণচন্দ্র বসুর শৈবালিনী চরিত্র সমালোচনা নিয়ে যে তৎকালে বেশ আলোড়ন হয়েছিল তা বোঝা যায়। তাই দেখি, এই সমালোচনার প্রতিবাদে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার 'আর্য্যদর্শন'-এ লেখনীধারণ করেন লোকনাথ চক্রবর্তী। সেই সমালোচনার প্রত্যুত্তরও প্রকাশিত হয় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার আর্য্যাদর্শন পত্রিকায়।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'নব্যভারত' পত্রিকায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দে পাঁচকড়ি ঘোষ 'জয়ন্তী' শিরোনামে 'সীতারাম' উপন্যাসের সমালোচনা করেছেন। সামাজিক উপযোগিতাবাদের আদর্শকে সামনে রেখে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভ থেকেই উপন্যাস পাঠ করেছিলেন পাঠকেরা। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের এক কনটেক্সট পাঠকদের মধ্যে গড়ে তোলে এক কনভেনশন। এই কনভেনশন থেকে উপন্যাস পাঠ ও তার পর্যালোচনা করেছেন পাঠক সমালোচকগণ ঃ "যে প্রতিভাবলে কুন্দ-সূর্য্যমুখীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, যার তেজে ভ্রমরা-মৃন্ময়ী জন্মিয়াছিল, সেই প্রতিভাই প্রফুল্লমুখীকে গড়িয়াছে, আজি সেই প্রতিভাগুণেই বঙ্গসাহিত্যে জয়ন্তীর ভস্মাবৃত রূপমাধুরী, সংসারাসক্তিবিরহিত, ভগবৎপ্রেমে চিত্ত সমর্পিত, নিষ্কাম নির্ম্মল ধর্ম-নিয়োজিত ভৈরবীবেশ দেখিতে পাইতেছে।"[১৬] 'সীতারাম' উপন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই মত প্রকাশ করেন ঃ "সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে। যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা westland সাহেবের কৃত যশোরের বৃত্তান্ত, এবং stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করুন।"[১৭] যদিও পরবর্তীকালে যদুনাথ সরকারের মতো ঐতিহাসিক বলেছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন বাংলার শাসন প্রণালী, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা 'সীতারাম' উপন্যাসে দিয়েছেন তা যথার্থ। এই উপন্যাসে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী বঙ্কিমের মনোভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। সমালোচক সেই কনভেনশন থেকেই জয়ন্তী চরিত্রটিকে দেখেছিলেন ঃ "জয়ন্তী কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা বিত্ত সংযত করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানের সীমায় পৌঁছিয়াছেন; তাঁহার শিক্ষায় শ্রী এখন কর্ম্ম অভ্যাস করিতেছেন, নিষ্কাম হইতে শিখিতেছেন, ভক্তিরসে ডুবিয়াছেন। সাধনার এই মহদুপকরণ দেশে দেশে বিঘোষিত হউক, জয়ন্তীর নিকটে সকলে নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষা করুক।"[১৮]

১২৮৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় পূর্ণচন্দ্র বসু 'কুন্দনান্দিনী' নামের একটি সমালোচনা লেখেন। এই সমালোচনাটির ফুটনোট থেকে জানা যায় যে, এর আগে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বলে তিনি নিজের লেখার সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করতেন না। পূর্ণচন্দ্রের মতে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী ব্যতীত অপরাপর নারী চরিত্রগুলি এতই উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত যে কুন্দনন্দিনীর দিকে পাঠকের দৃষ্টি পড়ে না আর তাই কুন্দনন্দিনী চরিত্রকে বিশেষভাবে দেখানোর জন্যই তিনি সমালোচনাকর্মে অবতীর্ণ হয়েছেন। বাঙালি গৃহবধূর ভীরুতা-নম্রতা-সরলতা-অনভিজ্ঞতা ও কোমলতার মতো গুণাবলী কুন্দনন্দিনীর ছিল। বাস্তবজীবনে বাঙালি গৃহবধূ সেই চরিত্রের অনেকটা কাছাকাছি হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতই কুন্দন্দিনীর মতো গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে না। তাই প্রবন্ধকারের সিদ্ধান্ত : "সূর্য্যমুখী অন্যদেশে দুর্লভ, কিন্তু কুন্দনন্দিনী বঙ্গদেশেও দুর্লভ। এখানে যদি দুই শতের মধ্যে একজন সূর্য্যমুখী থাকে, পঞ্চশতের মধ্যে একজন কমলমণি থাকে, তবে সহস্র বঙ্গগৃহবধূর মধ্যে একজন কুন্দনন্দিনী আছে কি না সন্দেহ।"[১৯] 'বিষবৃক্ষ'-এর চিত্রাবলীতে সূর্য্যমুখী ও কমলমণি উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত, অন্যদিকে কুন্দনন্দিনী কোমলতার বর্ণে অঙ্কিত। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল : "প্রকৃত জীবনের উপর এই অত্যল্প মাত্রায় উচ্চতা দেওয়া কবির কার্য্য; এই উচ্চতা কেবল উপন্যাসে ও কাব্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি কবি নহেন, যিনি সামান্য লেখক, তিনি এই বর্ণগৌরব, প্রকৃত চিত্রে এই বর্ণবিভাস দিতে সমর্থ হয়েন না।"[২০] কুন্দনন্দিনী চরিত্রের যাবতীয় কার্যকলাপের—যেমন, মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসে থাকাকালীন তার অবস্থার, নগেন্দ্রের সঙ্গে তার প্রথম আলাপের, কমলের কাছে লেখাপড়া শেখাকালীন তার সে অবস্থার, দেবেন্দ্রের কাছে উপস্থিত হওয়ার সময় তার অপ্রস্তুত অবস্থার—প্রভৃতি সমস্ত আচরণ বিশ্লেষণের দ্বারা তার চরিত্র প্রকৃতিকে উপস্থাপিত করেছেন সমালোচক। সমালোচকের এই বিশ্লেষণী নৈপুণ্য সেই সময়ের নিরিখে প্রশংসার যোগ্য।

১২৮৭ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় চন্দ্রনাথ বসু রচিত 'নবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য' শিরোনামে উপন্যাসের একটি তাত্ত্বিক আলোচনা প্রকাশিত হয়। আলোচনাটির প্রারম্ভে উপাখ্যানের নানা পদ্ধতি—যেমন নাটক, আখ্যায়িকা ও কথাগ্রন্থের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য কী—তা বলা হয়েছে। আখ্যায়কায় লেখকই ব্যাখ্যাতার ভূমিকা পালন করেন, নাটকে চরিত্রদের কার্যকলাপ তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কথাগ্রন্থ এ দুইয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ের—কেননা সেখানে চরিত্রদের কথাবার্তা এবং লেখকের ব্যাখ্যা—এ দুইই সংযোজিত হয়। সমালোচকের মতে, যেহেতু গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়, সেই কারণে নাটক অপেক্ষা কথাগ্রন্থ লেখা সহজ। তাঁর মতে : "কথাগ্রন্থে প্রতিভার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু নাটকীয় প্রতিভা অপেক্ষা, এই প্রতিভা অনেক অংশে ন্যূন।"[২১] বাংলা সাহিত্যের যথার্থ উপন্যাস-নির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত : "এই কথাগ্রন্থ ইংরেজি কথাগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুকরণ। ইহাতে অনেক অংশে ইংরেজি চরিত্র, ইংরেজি ভাব এমনকি ইংরেজি ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ করা হইয়াছে।"[২২] অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যে নিছক অনুকরণ নয়, সেই অনুকরণের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে সৌন্দর্য্য—সে সত্যটিকে তিনি স্বীকার করছেন। কথাগ্রন্থকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন সমালোচক : একভাগে রেখেছেন 'দুর্গেশনন্দিনী', 'বঙ্গাধিপপরাজয়', 'শতবর্ষ'-এর মতো রোমান্স জাতীয়

রচনাকে, অন্যভাগে রেখেছেন 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'স্বর্ণলতা' প্রভৃতি নিত্যদিনের ঘটনা চিত্রণমূলক কথাগ্রন্থকে। বাংলা কথাগ্রন্থের রোমান্সগুলিতে ইউরোপীয় গ্রন্থের অনুকরণে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ঘটনাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এ সম্পর্কে লেখকের ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক উক্তি ঃ "ইহাতে এই লাভ হইয়াছে যে, আমাদের মধ্যে ডন্ কুইক্সটের প্রণালীর যুদ্ধপ্রিয়তা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। শীর্ণ বঙ্গীয় যুবক আপনাকে জগৎসিংহ বা হেমচন্দ্রের অবস্থায় উপস্থাপিত করে, এবং এইরূপে লোকের নিকট অতীব উপহাসাস্পদ হয়।"[২৩] সমালোচকের মতে কথাগ্রন্থ কেবল গল্পের বই নয়, আমোদের বই নয়, তার অন্য সারবত্তা আছে। কেবলমাত্র সমাজচিত্রণ নয়, সমাজের অবনতিকে সঠিকভাবে দেখে গড্ডলিকা প্রবাহের বিপরীতে অবস্থানের দ্বারা সমাজকে ন্যায় পথে পরিবর্তিত করার প্রচেষ্টাও কথাকারের কাজ। ইংলন্ডের সমাজের আর বঙ্গসমাজের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। অর্থোপার্জন প্রচেষ্টা, কঠোর হৃদয়ের প্রকাশ সে সমাজের বৈশিষ্ট্য হতে পারে, কিন্তু আমাদের সমাজের প্রধান শিক্ষাই হল বৈরাগ্য। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে দুই সমাজের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছিলেন। 'নবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য' রচনাকারের মতে প্রণয়ের মতো হৃদয়ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ইংরেজ ও বাঙালি নরনারীর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই বিষয়ে পাশ্চাত্য অনুকরণ বাংলা সাহিত্যে বাঞ্ছনীয় নয়। তাই সমালোচকের সিদ্ধান্ত ঃ "আমাদের বিশ্বাস এই যে প্রণয় সম্বন্ধে ইংলন্ড আজিও সভ্য পদবীতে আরূঢ় হয় নাই। কারণ যে দেশ যত সভ্য হইবে সে দেশে সমাজের অবজ্ঞা ততই সম্মানার্হ বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং যদি ইংলন্ডীয় প্রণয়ভাব আমরা অবিকল অনুকরণ করি, তাহাতে আমাদের এই লাভ হইবে যে আমরা স্বদেশীর সতীত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রণয়কে কেবল পশুভাবপূর্ণ বলিয়া মনে করিব।

যাঁহারা এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, আমাদের দেশের অভাব সমস্ত হৃদয়ঙ্গমকরতঃ, সেই সমস্ত অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় নভেল লিখিবার প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাকে আমরা আমাদের যথার্থ হিতৈষী বলিয়া সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিব। আর যাঁহারা শুদ্ধ মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য ইংরেজী ভাব সমস্তের অবিকল "তরজমা" করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন, তাঁহারা প্রতিভাশালী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনই দেশের ধন্যবাদার্হ বলিয়া মনে করিতে পারিব না।"[২৫] সামাজিক উপযোগিতাবাদের আদর্শকে সামনে রেখে যদিও রচনাকার এই সমালোচনাটি লিখেছেন, তবুও এক্ষেত্রে তিনি এমন কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যা আজকের কালেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। উত্তর ঔপনিবেশিক কালে এ প্রশ্ন বারেবারে ওঠে যে, বাংলা উপন্যাসের মডেল কি পাশ্চাত্য থেকে ধার করা নয়? আমাদের কথা পরম্পরায় যে নিদর্শন প্রাক্-উপনিবেশ পর্বে ছিল সেই দেশজরীতিটি কি হারিয়ে যায়নি? বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির প্রায় আদিলগ্নে এ জাতীয় প্রশ্ন রচনাকার তুলেছেন, সুতরাং রচনাটির পৃথক গুরুত্বকে স্বীকার করতেই হয়।

১২৮৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচনা'—এই নামে তারকনাথ বিশ্বাসের 'গিরিজা' গ্রন্থটির সমালোচনা করা হয়েছে। 'গিরিজা'র গল্পটি বিবৃত করার মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে উপন্যাস কেবল ঘটনার পর ঘটনার চিত্রণ নয়—"যতক্ষণ ঘটনার সঙ্গে অন্তরের একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে না পারা যায় ততক্ষণ ঘটনা বৃথা।"[২৬]

১২৯৫ বঙ্গাব্দের 'প্রচার' পত্রিকার ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী 'মনোরমা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের পৌষ-মাঘ সংখ্যার 'প্রচার'-এ তিনি 'গিরিজায়া' শিরোনামে আরও একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'মনোরমা' প্রবন্ধে গিরিজাপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'মৃণালিনী' উপন্যাসের মনোরমা চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রারম্ভেই নরনারীব প্রণয়বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিকের পারঙ্গমতার প্রশংসা করেন। পুরুষের প্রণয়বৈচিত্র্য অপেক্ষা নারীর প্রণয়বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তিনি অধিক কুশলী সেকথাও বলেন। মনোরমার প্রথম জীবনের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রথম জীবনের সাদৃশ্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্যে দেখান তিনি। মনোরমার দুটি মূর্তি—একটি মূর্তি 'আনন্দময়ী, সরলা, বালিকা', অন্যটি 'গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী'—এই দুই মূর্তির সামঞ্জস্যের সূত্র অনুসন্ধান করেছেন সমালোচক এইভাবে : "মনোরমার কার্য্য আর কিছুই নহে—চিন্তা। ....এই চিন্তাই মনোরমার প্রখর বুদ্ধিশালিনী তেজস্বিনী প্রকৃতির কারণ।"[২৭] বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার দ্বিবিধ প্রকৃতি কীভাবে জটিল ও রহস্যময় হয়ে পড়েছিল বিশ্লেষণ পরম্পরায় তা উপস্থাপিত করেছেন লেখক। অবশ্য বলাবাহুল্য গিরিজাপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি গভীর অনুরাগমিশ্রিত দৃষ্টিতে বা বলা ভাল কিছুটা ভক্তিপ্লুত মানসিকতায় এই সমালোচনা কর্মে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনোরমার দ্বিবিধ প্রকৃতিটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁকেই সমর্থন করেছেন : "মনোরমা ইহাদের মত এতটা কাল্পনিক নহে, তাহার রহস্যময় দ্বৈতভাবের কোন মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই বটে, এই অদ্ভুত প্রকৃতি বৈষম্যের উদ্ভব কখন এবং কি প্রকারে হইল, সে সম্বন্ধে লেখক আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ কবেন নাই বটে, কিন্তু যেরূপ আশ্চর্য দক্ষতা ও সুসঙ্গতির সহিত তাহাদের কার্যে ও ব্যবহারে এই দ্বৈত ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অবিশ্বাস আর মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না।"[২৮]

১২৯৫ বঙ্গাব্দের পৌষ-মাঘ সংখ্যার 'প্রচার'-এ প্রকাশিত 'গিরিজায়া' রচনাটিতে গিরিজাপ্রসন্নের বিশ্লেষণী দৃষ্টিটি সমানভাবে উপস্থিত। তাই দেখি, গিরিজায়া চরিত্রটির প্রগল্‌ভা প্রকৃতিটির অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি তার উৎসভূমিটিকে চিহ্নিত করেছেন। সে যে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিবেশ থেকে উত্থিত, সেই পরিবেশটি তার 'চিরানন্দময়ী চঞ্চল প্রকৃতি'টির মূল বলে চিহ্নিত করেছেন আলোচক—"ভিখারিণীর মেয়ে কিছু প্রগল্‌ভা হইবারই সম্ভব। ভিক্ষার উপর যাহার জীবিকা নির্ভর করে, ভিক্ষার জন্য যাহাকে দশ দ্বারে বেড়াইতে হয়, কথা বলিতে না পারিলে তাহার চলিবে কেন? কাজেই গিরিজায়া বিশেষ বাকপটু।"[২৯] পরবর্তী সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিজায়া চরিত্রের এই সত্তার উদ্ভবের কারণ হিসাবে একই দিককে উপস্থাপিত করেছেন : "গিরিজায়া বিমলার একটি অধিকতর স্বাভাবিক সংস্করণ, একজন পৌরমহিলার মুখে যে ব্যবহার অশোভন ও অসংগত বলিয়া বোধ হয়, তাহা ভিখারিণীর পক্ষে সুসংগত ও উপযুক্ত হইয়াছে।"[৩০] গিরিজায়ার স্বাধীন প্রকৃতিটির, তার সততার, তার প্রেমিকা সত্তার বিশ্লেষণে প্রয়াসী গিরিজাপ্রসন্ন এবং তার যাবতীয় আচরণের মধ্যে একটি গভীর সংগতি আবিষ্কারে প্রয়াসী তিনি। প্রসঙ্গত মৃণালিনী ও মনোরমার সঙ্গে তার চরিত্রগত সাযুজ্য ও পার্থক্যকেও উপস্থাপিত করেছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে গিরিজাপ্রসন্ন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গভীরমনস্ক পাঠক। উপরন্তু তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে পাঠের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার নব্য লেখক দিগের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক রচনায় বলেছিলেন ঃ ''যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।''[৩১] বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি মানদণ্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে ঔপন্যাসিক যে কেবল সমাজের হিতার্থেই কলম ধরেন না, সমালোচনা মানে যে কেবল সামাজিক উপযোগিতাবাদের মানদণ্ডের সাহায্যে নিক্তির ওজন নয়, সমালোচনা মনোহারী বচনের সংমিশ্রণও নয়, সমালোচনা শিল্পকর্মও বটে তা প্রথম যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রাজসিংহ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের শিল্পরূপ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে নানা ঘটনা দ্রুত লয়ে ঘটে গেছে। এই ঘটনাগুলিকে ঔপন্যাসিক নিঃসঙ্কোচে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যে পাঠকের প্রশ্নমনস্ক হওয়ার সুযোগ ঔপন্যাসিক দেননি। ঘটনাগুলির ত্বরিৎ ঘটে যাওয়ার কিংবা চরিত্রগুলির নিঃসঙ্কোচ দ্রুত আচরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহ' উপন্যাসের স্বতন্ত্র প্রকৃতিটিকে চিহ্নিত করেছেন। 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাসের কুশীলবদের প্রত্যেকেরই আছে পারিবারিক বৃত্তবদ্ধ জীবন ব্যতিরেকেও আর এক বৃহত্তর ব্যাপ্তিময় জীবন। সুতরাং এ উপন্যাসে ঃ ''অর্ধরাত্রির বিশ্বব্যাপী ভয়ংকর জাগরণের মধ্যে কি মধ্যাহ্নকুলায়বাসী প্রণয়ের করুণ কপোতকূজন প্রত্যাশা করা যায়?''[৩২] ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'-এ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস অংশ ও ইতিহাস অংশের যুগল বেণীবন্ধন রচনা করেছেন উপন্যাসের কুশীলবদের অন্তর বিশ্লেষণকে সংকোচনের দ্বারা কিংবা ইতিহাসের ঘটনাবাহুল্যকে বর্জনের মাধ্যমে। চমৎকার উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখান যে নদীস্রোতে ভাসমান নৌকার প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারকে প্রদর্শন করানোর অভিপ্রায় ঔপন্যাসিকের ছিল না। নদীস্রোত এবং নৌকার যুগপৎ চিত্রকে অঙ্কন করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের শিল্পরূপ বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন কতকগুলি মন্তব্য করেছেন যা আধুনিক সমালোচককেও গভীরভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কি কেবলমাত্র 'অত্যাবশ্যক ভার'টুকুই রেখেছেন? ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'-এর চতুর্থ সংস্করণটিতে ইতিহাস ও উপন্যাস অংশের যথার্থ সামঞ্জস্য সাধন কি সম্ভব হয়েছে? না কি রাজপুত্র জাতির জাগরণের চিত্র অপেক্ষা মোগল অন্তঃপুরের চিত্রই সেখানে অধিক পরিস্ফুট। 'সাধনা' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩০১ বঙ্গাব্দে ও চৈত্র ১৩০১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে 'ফুলজানি' ও 'যুগান্তর' উপন্যাস সমালোচনা করেন। স্যেমুর চ্যাটম্যান রিয়েল রিডার ও ইমপ্লায়েড রিডারের কথা বলেছিলেন। রিয়েল রিডারও যে ইমপ্লায়েড রিডার হতে পারে, পাঠকের পাঠও যে সৃষ্টিমূলক হতে পারে রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় সমালোচনা তার প্রমাণ।

উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী সাহিত্য ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হয়েছেন। সমালোচনা কর্মটিকে সাহিত্যকর্মে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাপক ভূমিকাকেও স্বীকার করতে হয়। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে পাঠক-সমালোচকেরা তাদের সমালোচনা কর্মে সমাজ রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। সমাজ যাতে অবনমিত না হয়, সামাজিক মানুষ যাতে অধঃপতিত না হয়—সেই দায়িত্বরক্ষার

ভারটুকু স্মরণে রেখে তারা যেমন উপন্যাস-নাটক সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সে কথা মনে রেখে তার পাঠও করেছেন। আসলে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক পর্বের শিল্পী সাহিত্যিকরা যেমন মনের উভয়ভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেননি, তেমনি ঔপনিবেশিক পর্বের বাস্তবতার মধ্যেই জাতীয়তা-দেশগঠন-সমাজ গঠন ইত্যাদি ভাবনাগুলি তাঁদের অন্তর জগতে রাজত্ব করতে থাকে, যদিও সেই ভাবনাগুলি বৃহত্তর জনসমাজ-মন বিচ্ছিন্ন করতে তাঁরা চাননি, আবার উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে তাঁদের মধ্যে থেকেই সেই আধিপত্য সম্পর্কে প্রশ্ন যে ওঠেনি তা-ও নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঔপন্যাসিক তথা আদি পর্যায়ের সাহিত্য স্রষ্টারা ও তার পাঠকেরা যুক্তিবাদী মনোভঙ্গির শরিক, জনসমাজ-মন বিচ্ছিন্ন আধুনিকতার অংশীদার। পরবর্তীকালে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের মধ্য দিয়ে তাঁরা তা থেকে সরে আসার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রারম্ভ থেকে ঔপনিবেশিক আধুনিকতাবাদের জগতের বাইরে এক ভিন্ন জগৎ-অনুসন্ধানে সচেষ্ট হচ্ছেন পাঠক-লেখকেরা, রবীন্দ্রনাথ যাঁর বড় উদাহরণ। কিন্তু ঔপনিবেশিক পর্বের যুক্তিবাদী চেতনা, বিংশ শতাব্দীর এই ভিন্ন চেতনা, কিংবা বৃহত্তর জনসমাজ-মনের ঔপনিবেশিক স্পর্শহীন আর এক চেতনা—এ সমস্তের কোনটিকেই উপেক্ষা করা যায় না, পাঠকও এই সমস্ত চেতনাগুলি জ্ঞাত হয়েই পরবর্তীকালে উপন্যাস-নাটক পাঠ করেছেন আর এখানেই উনবিংশ শতাব্দীরও বিংশ শতাব্দীর পাঠক-চেতনায় পার্থক্য তথা রূপান্তর লক্ষ করা যায়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ঃ

১. জ্ঞানাঙ্কুর, শ্রাবণ ১২৮১, দ্বিতীয়খণ্ড (১২৮০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ থেকে ১২৮১ বঙ্গাব্দের কার্তিক পর্যন্ত), শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৪২৫-৪২৮।

২. 'উত্তরচরিত' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৬০।

৩. তত্রৈব-২

৪. তত্রৈব-১

৫. তত্রৈব-১

৬. তত্রৈব-১

৭. তত্রৈব-১

৮. তত্রৈব-১

৯. তত্রৈব-১

১০. আর্য্যদর্শন, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১২৮৪, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৩৩-৪২

১১. তত্রৈব-১০

১২. তত্রৈব-১০

১৩. তত্রৈব-১০

১৪. তত্রৈব-১০

১৫. আর্য্যদর্শন, আষাঢ়-১২৮৪, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১২৮-১৩৫

১৬. নব্যভারত, পঞ্চমখণ্ড, ১২৯৪, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৩০৫-৩১৭

১৭. 'সীতারাম' উপন্যাসের মুখবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায

১৮. তত্রৈব-১৬

১৯. 'কুন্দনন্দিনী', পূর্ণচন্দ্র বসু, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫, পৃষ্ঠা ৭৩-৮১

২০. তত্রৈব-১৯

২১. 'নবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য', চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৭, পৃষ্ঠা ২৪-৩৩

২২. তত্রৈব-২১

২৩. তত্রৈব-২১

২৪. তত্রৈব-২১

২৫. তত্রৈব-২১

২৬. 'ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচন', বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৯, পৃষ্ঠা ২০৪-২০৭

২৭. 'মনোরমা', গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, প্রচার, আষাঢ় ১২৯৫, পৃষ্ঠা ৯৮-১৮২

২৮. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬-০৭ (পুনর্মুদ্রণ) পৃষ্ঠা ৭৫

২৯. 'গিরিজায়া', গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, প্রচার, পৌষ-মাঘ ১২৯৫, পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৬৩

৩০. তত্রৈব-২৮, পৃষ্ঠা-৭৪

৩১. 'বাঙ্গালার নব্যলেখকদিগের প্রতি নিবেদন', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমরচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যসংসদ, ১৩৬১, পৃষ্ঠা

৩২. 'রাজসিংহ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আধুনিক সাহিত্য", বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রকাশ ১৩১৪, মাঘ ১৩৯৮, পৃষ্ঠা-৯৮

ইতিহাসের অথবা প্রহসনের পুনরাবৃত্তির মুখে যেতে যেতে 'কালবেলা'কে ফিরে দেখা

অরূপ কুমার দাস

বিগত বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে পশ্চিমবঙ্গে অনেক আত্মকেন্দ্রিক পরিবার-পরিমণ্ডলে লালিত ও বর্ধিত ছেলেরা হঠাৎ চিন্তা ও যাপনে জগৎ-বিস্তারী ভাবপ্লাবনে ভেসে গিয়েছিল। প্রায় চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে ওসব আর না হওয়ার। এখন সবকিছুই খুব হিসাবী। মাধবীলতার চরিত্রে অভিনয় করা পাওলী দামের হাসির মতোই। সিনেমায় নয়, স্টিল পিকচাবের হাসি দেখেই এই মনে হওয়া। সেনেট হলের চাতাল ছাড়াই শুনেছি শুটিং হয়েছে 'পিবিয়ড পিস' এর, অকুস্থল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে। এখনকার প্যান্ট-জামা পরেই ছাত্রযূথ এর দৌড়াদৌড়িতে ছুটেছে তারা—নির্বোধ আত্মতৃপ্তি নিয়ে বলতে শুনেছি ক-বছর আগের শুটিংয়ে ছাত্রফৌজ এর পার্ট করা কয়েকজন কাটা সৈনিককে। এখন অন্তত সময়টার একটা ব্যবধান তৈরি হয়েছে। এবার একটু ফিরে তাকিয়ে পুনর্বিচার করা যায় ওই ছয়-সাতের দশকের কাল নিয়ে যে কোন আখ্যানপ্রিয় বাঙালি যুবক-যুবতীর ভাললাগা 'কালবেলা' উপন্যাসের। 'কালবেলা' রাজনৈতিক কালের প্রচুর ভুল ভাবনা-আরোপ আর প্রধান চরিত্রটার পূর্বসংযোগের ন্যূনতম সূচনা-সূত্র ছাড়াই বিপ্লবী বুলিওয়ালা হয়ে যাওয়ার মতো ভ্রান্তি আর অসঙ্গতি নিয়েও এক আবেশসঞ্চারী উপন্যাস। যথাসুযোগে বলতে দ্বিধা নেই, ১৯৮৪-৮৫ সালে পড়া ভাললাগা এই উপন্যাস থেকেই ছয় ও সাতের দশকের রাজনীতি ও তার প্রভাব-তাপের ছাপ বওয়া উপন্যাস গল্পের প্রতি আমার যাবতীয় আগ্রহ আর আকর্ষণের সূচনা। আমার বাঙালি হিসাবে জন্মানো সার্থক হয়েছে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই দুই দশকের (১৯৬০-১৯৭৯) রাজনীতিস্পন্দিত বাংলা কথাসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে (প্রথম এক বছর JRF হিসাবে); ২০০২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পি.এইচ.ডি উপাধিপ্রাপ্তিতে।

॥ ২ ॥

১৯৮১ থেকে ৮৩-তে প্রকাশিত উপন্যাস 'কালবেলা'য় ধরা হয়েছে প্রায় দু-দশক কালের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাত। এই কালটা ছয় ও সাতের দশক। জলপাইগুড়ির স্বর্গছেঁড়ার চা-বাগানের কোয়ার্টার থেকে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে পড়তে এসে কালঘূর্ণিতে পড়ে সময়ের ভাসমান বিগ্রহ হয়ে উঠেছে অনিমেষ। একটা নির্ভেজাল ভুল রাজনীতির কাষ্ঠপুত্তলিকা সে। তার চোখে সমরেশ আমাদের সময়-সমাজ-মনুষ্যত্ব প্রবাহ চেনান, ব্যাখ্যা করেন। আবার এই অনিমেষের যাপন-ভাবনা-পরিবেষ্টনী থেকে আমরা ওই সময়ের অন্যান্য প্রবণতার হাল হকিকৎ পেয়ে যাই। সেইগুলোই শাশ্বত কালের পক্ষে মূল্যবান—সেগুলোই ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখব এখানে।

'কালবেলা' উপন্যাস থেকে আমরা দেখতে পাই, আত্মস্বার্থভাবনাসর্বস্ব মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাই ছয় ও সাতের দশকের বিপ্লব-আহ্বায়ক রাজনীতির পথানুসারী কর্মী, নেতা ইত্যাদি হয়ে ওঠে। এদের বেশিরভাগেরই পূর্বপ্রজন্ম সংকীর্ণ ব্যক্তি ও আত্মপরিজন স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারত

না, প্রয়োজনবোধও করত না। অনিমেষের বাবা সেই পূর্ব প্রজন্মের অন্যতম প্রতিনিধি, সে অনিমেষকে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি করে যা উপদেশ দেয় তা বিবৃতিকার বাচনে, "এই কলকাতা শহর নতুন ছেলেদের নষ্ট করে দেবার জন্য ওত পেতে থাকে, অনিমেষ যেন কখনও অসতর্ক না হয়। কোনও বন্ধু বান্ধবকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না কারণ বিপদের দিনে তারা কেউ পাশে থাকবে না। কলেজের ইউনিয়ন থেকে যেন সে সাত হাত দূরে থাকে কারণ মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলের এই বিলাসিতা সাজে না। রাজনীতি যাকে নেশা ধরায় তার ইহকাল পরকাল একদম ঝরঝরে হয়ে যায়। যাদের বাপের প্রচুর টাকা আছে তারাই ওসব করুক, যেমন জওহরলাল, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোস।" এই 'সোজা মানুষ' মহীতোষের পরিচয়-জ্ঞাপনে ঔপন্যাসিক লেখেন, 'চা-বাগানের নির্জনতায় থেকে সরল কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত।' এই পরিমণ্ডল থেকেই বেরিয়ে এল অনিমেষরা। একদিকে কর্ম ও বৃত্তি প্রাপ্তির জন্য উচ্চশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জীবনের স্থূল উন্নতিলাভের আগ্রহ-প্রবণতা, বিপ্রতীপে বস্তুবাদী বীক্ষায় বিকাশমান ধনতন্ত্রের যুগাবর্তে আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুঁজিবাদ অভিমুখী বিকাশের ক্রমক্ষীয়মান রুদ্ধধারা উপলব্ধিজাত সমাজব্যবস্থার কুহকী ফাঁকি এবং অন্তঃসারহীনতা অনুভব—এই দুই তীক্ষ্ণ মেরুভাবনার অন্তঃপাতী অবস্থানে বিরাজ করেই ছয়ের দশকের আত্মত্যাগী ছাত্র-আন্দোলনের সারণি ভরে উঠেছিল। অনিমেষের 'রিস্‌ক' নিতে না চাওয়া হিসাবী মনোভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা সুবাস সেনের বিস্ময়-বাচন, "রিস্ক মানে?" বা "এখন তুমি গ্র্যাজুয়েট। কতটা লাভবান হয়েছ তুমি?" এইসব জিজ্ঞাসার মধ্যে অন্তর্লীন থাকে ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের লক্ষ্যে লেখাপড়ায় অভিনিবিষ্টতা—প্রভৃতি ত্যাগ করার প্ররোচনাময় হাতছানি। অথচ কালের হিসাবে এর একটু আগেই রাজনীতি বিবিক্ততাই ছিল ছাত্রসমাজের ধ্রুবধর্ম। এ উপন্যাসেও সেই প্রবণতার সম্প্রসারিত পরিচয় আছে। সর্বজ্ঞ-সুলভ নিস্পৃহতা নিয়ে রাজনীতি-বিবিক্ত সাধারণ ছাত্র সেদিনও অনেক। হোস্টেলের এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট শিলা নাম্নী এক চতুর্থ বর্ষের মক্ষিকাকে নিজের ঘরে নিয়ে এলে ছাত্রদের উত্তেজিত ক্ষোভে নেতৃত্ব দেয় অনিমেষ। রুমমেট ত্রিদিব এসব দেখেও ঘরে ফিরে নির্লিপ্তভাবে সব অন্ধকার করে শুয়ে থাকে। অনিমেষ ঘরে ঢুকলে সে তীর্যক বাচনে বলে, "কাজকর্মগুলো নাকি বাড়ি থেকেই শুরু করতে হয়। তুমি তোমার বিপ্লব হোস্টেল থেকেই আরম্ভ করলে। ...এই প্রথম নেতা হয়ে গেলে, গুড! সামনে খোলা ময়দান, এগিয়ে যাও, ফরোয়ার্ড মার্চ।" সে আরও বলে, "এ ঘটনা কাল অন্য ছেলেরা জানবে। অটোমেটিক্যালি তুমি হিরো হয়ে যাবে। নেক্সট স্টেপ ইউনিভার্সিটির ইলেকশানে জেতা, তারপর ইউনিয়নের সেক্রেটারি, তারপর এম.এল.এ মন্ত্রী। স্বর্গের সিঁড়ি—উঠে যাও।"

স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের বৃত্তিগত ও অধ্যয়ন বিষয়ের থেকে বৃহত্তর সমাজের বহিরঙ্গিক রাজনীতিই ছাত্র-আন্দোলনের কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বিষয় হয়ে উঠছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অনিমেষকে তার ক্লাসে প্রার্থী করার দিনে বিমানের উক্তিতে এর প্রমাণ : 'এখন দেশের যা অবস্থা তাতে কংগ্রেসি সরকার খুব সুখে নেই। মানুষ ক্রমশ ওদের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছে। ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে যখন আমরা প্রচার করব তখন ওই সেন্টিমেন্টটাকে কাজে লাগাব।" আর্থিক প্রাচুর্যের সহায়তায় প্রচারের বাহ্যাড়ম্বর সৃষ্টি করে

জনসংযোগের ঘাটতি ঢাকার তৎকালীন কংগ্রেস দলের অভ্যাস এর ছাত্র সংগঠনের মধ্যেও ব্যাপৃত হয় ষাটের দশকে। উপন্যাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিমান বলে, "ছাত্র পরিষদ প্রচুর টাকা ঢালছে। ওদের পোস্টারগুলো দেখেই তা বুঝতে পারবে। এটা তো সবাই জানে ছাত্র-পরিষদ হল কংগ্রেসের সংগঠন।"

উপন্যাসে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের নানান রূপান্তর পরিগ্রহণও কালের বিশ্বাস্য আলেখ্য তৈরি করেছে। দক্ষিণপন্থী সি.পি.আই-এর ভবিষ্যৎ সাংগঠনিক প্রসার ও পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্ব সংকটের ধারাবাহিকতার সূচক-লক্ষণ ফুটে উঠছিল ১৯৬৪ সালেই। বিমান অনিমেষকে বলে, "এই ইলেকশনে আমাদের প্রতিপক্ষ দু'জন। ছাত্র পরিষদ আর এস.এফ রাইট। শেষ দলটা নিয়ে কোনও চিন্তা নেই, কারণ ওদের শক্তি এত কম যে কিছু করে উঠতে পারবে না।" সহকর্মী এবং নিকটস্তরের ঊর্ধ্ব এবং অধোনেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস-সন্দেহ-সংশয় ও সতর্কতার ত্রস্ততা এই ১৯৬৪ পরবর্তী বামপন্থী ছাত্র-রাজনীতির মৌল বৈশিষ্ট্যে পর্যবসিত হয়। অনিমেষ তার দাদুকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ইউনিয়ন রুমে ঢুকে উপর্যুপরি সুদীপ ও বিমানের ব্যবহারদৃষ্টে এই বোধে পৌঁছে যায়। আগের দিন সন্ধ্যায় হাতিবাগানের রেস্টুরেন্টে সুবাসের কথাবার্তা বিষয়ে অবগত হয়ে বিমান-সুদীপরা অনিমেষকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত সুবাসের দ্বারা প্রভাবিত ও 'প্রতিবিপ্লবী বিপথগামী' চিহ্নিত করে ফেলে। বিমান অনিমেষকে সতর্ক করে সুবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখার জন্য। বিস্মিত অনিমেষ বোঝে, 'রাজনীতি করতে গেলে তাকে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হবে।'

১৯৬৭ সালের অব্যবহিত পূর্বকাল থেকেই সি.পি.আই (এম) দলের মধ্যে উগ্র অতি-বিপ্লবী মনস্করা ঔপনিবেশিক ও জাতিয়তাবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করার মানসিকতায় আস্থাশীল হয়ে ওঠে। 'কালবেলা'য় সেই মানসিকতার প্রতিফলন এইরকম : 'কতগুলো পুরনো বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট যা কিনা বুর্জোয়া মানসিকতা প্রসূত, সেগুলো সম্পর্কে জনসাধারণকে মোহমুক্ত করতে হবে। রেনেসাঁর কাল যাকে বলা হয় সেই সময় এবং তারপর থেকে যাঁদের মহান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, দেশের নানা জায়গায় ঘটা করে মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই সেই সম্মানের যোগ্য ছিলেন না। বুর্জোয়া শক্তিগুলি দেশের মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখার জন্যে তাঁদের ব্যবহার করেছে।" এই ১৯৬৭-রই আগে-পরে সি.পি.আই (এম) দল সম্পর্কে দেশময় বিদ্বেষ ও ভীতিসঞ্চারক প্রচার পরিব্যাপ্ত হয়। এই দলের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোরও এর প্রতি অসূয়া ক্রমবর্দ্ধিত হয়। উপন্যাসে এই আবহের বর্ণনা : "তখন সারা দেশে একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে মার্কসবাদীরা নাকি খুব কট্টর। তাঁদের মনোভাব জঙ্গি। শক্তি প্রয়োগ ছাড়া অন্য চিন্তা করতে পারে না। ফলতঃ তাঁদের সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি অন্য শরিক দলের মধ্যে সঞ্চারিত হল। তারা এদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হল।" উদ্বাস্তু অধ্যুষিত কলোনি ও বস্তি এবং ঘিঞ্জি নোংরা পল্লীগুলো ছিল বামপন্থীদের বাগ্‌বিস্তার ক্ষেত্র। ১৯৬৭ ও তৎপরবর্তী নকশালদের কার্যক্রমের সূচনা এবং প্রসারক্ষেত্র হয়ে উঠতে দেখা গেল এই অঞ্চলগুলোতেই। 'কালবেলা'য় ১৯৬৭-র আবহ বর্ণনায় লেখা হয় : 'কলকাতা শহরের আশেপাশে ছোট ছোট দল তৈরি হয়ে গেল। একদিকে দমদম সিঁথি বরাহনগর বেলঘরিয়ায়, অন্যদিকে

বেলেঘাটা যাদবপুর টালিগঞ্জ এলাকায় কাজকর্ম জোরদার হতে লাগল।' বাস্তুহারার নেতৃত্বে সর্বহারার জন্য ঘোষিত কুহকী বিপ্লব অভিযানের নগ্ন সত্যের আরও প্রকট উদ্‌ঘাটন এই বর্ণনায় : 'এখন শহরতলির এইসব এলাকা তথাকথিত কমিউনিস্টদের দখলে। পাকিস্তান থেকে আসা বাঙালিরা কলকাতার এইসব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন স্বাধীনতার পর থেকেই। তাঁরা নিঃস্ব অবস্থা থেকে আবার যখন মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছেন তখন কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে অনেক ক্ষোভ জমছিল। যার ফলশ্রুতি হিসেবেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি এঁদের সমর্থন গেছে। বিধান রায়ের আমলে (১৯৬২ পর্যন্ত) কংগ্রেস নির্বাচনের সময় এই আসনগুলোকে বাদ দিয়েই তাদের জয়ের হিসেব করত।'

নকশাল আন্দোলনের আবেগের প্লাবনোচ্ছ্বাসে ভেসে যাবার সময়েও অনেকে দেশ-কালের যথার্থ স্থিতি সংস্থান বুঝতো। অনিমেষও তেমন প্রজ্ঞানে ঋদ্ধ ছিল। সিঁথির গোপন সভায় মহাদেব সেনের বক্তৃতার পর সে যা বলে তাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় তার এই বোধ-প্রজ্ঞা : 'এ দেশের মানুষ অন্ধ ধর্মবিশ্বাসী, ব্যক্তি পূজারি, ... এবং রাজনৈতিক দলগুলোর পাইয়ে দেবার চেয়ে খেতে অভ্যস্ত। এই খোলস ছেড়ে আচমকা এরা বেরিয়ে আসবে এমনটা ভাবা যেন আকাশকুসুম চিন্তা।' তদুপরি শিক্ষালোকিত বাঙালি মধ্যবিত্তের বাগাড়ম্বরপূর্ণ তাত্ত্বিক পরিভাষা-কন্টকিত গুরুগম্ভীর আলোচনা ছিল সূচনাপর্ব থেকেই নকশাল সংগঠকদের অভিজ্ঞান। সিঁথির গোপন মিটিংয়ে মহাদেব সেনের বক্তৃতা পরবর্তী কথোপকথনে এই সত্য অভিব্যক্ত :

সুবাস—'গরিব ভূমিহীন কৃষকেরা যদি নেতৃত্বে না আসে তা হলে তো বিপ্লব মধ্যবিত্ত-ভিত্তিক হয়ে যাবে, তাই না?

মহাদেব—"অবশ্যই এবং তারা যে আসবে না তা আমরা জানছি কী করে?"

অনিমেষের পাশের ভদ্রলোক—"এটা তো তত্ত্বের কথা হল। যতদিন গরিব শ্রমিক কৃষক নেতৃত্বে না আসছে মার্কসবাদী লেনিনবাদী যোদ্ধারা উপযুক্ত এবং আদর্শ সময় পেয়েও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে?"

এই নকশালরাই আবার ১৯৬৭ সালের পর তাদের দলীয় বিপ্লব অভিযানের শক্তিবৃদ্ধি করতে 'সমাজবিরোধী' ও 'গুণ্ডা'দেরও রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরণকে তত্ত্বায়িত করেছিল। বেলঘরিয়ার গ্রুপ-মিটিংয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসিত হয় : 'আমরা খবর পাচ্ছি অ্যাকশন শুরু হলে কিছু ছেলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইবে। এই ছেলেরা এতকাল সমাজবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এককালে এরা অনেকেই কংগ্রেসের পোষা গুণ্ডা বলে চিহ্নিত কিন্তু নিজেদের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে যাওয়ায় বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এদের কি নেওয়া ঠিক হবে?' তাত্ত্বিক নেতা চারু মজুমদারের যে ব্যাখ্যা সে মহাদেব সেনের মুখে শুনেছিল এই প্রশ্ন নিরসনে তা-ই পুনরুচ্চারণ করে অনিমেষ : "আন্দোলন শুরু হলে কে ভাল কে মন্দ বিচার করা যথেষ্ট বোকামি হবে। মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে যে কোনও হাতের সাহায্য নিতে হবে। যারা সমাজবিরোধী বলে পরিচিত তাদের মধ্যে এক ধরনের বন্য শক্তি কাজ করে, যেটাকে ঠিকঠাক ব্যবহার করলে কল্পনাতীত ফল পাওয়া যায়। কোনও একটা মহৎ কাজে অংশ নিচ্ছি এই বোধ একবার ওদের মনে সঞ্চারিত হলে ওরা আমাদের গর্ব হয়ে দাঁড়াবে।" আসলে বৈচিত্র্যময় দেশের বহুধাবিভক্ত

জীবনধারার কোন সঙ্গতিসাধক সুনির্দিষ্ট সূত্রায়ন না করেই এই নকশালরা নেমে পড়েছিল তদের 'বিপ্লব' প্রয়াসে। শিলিগুড়ি যাবার পথে অনিমেষ দক্ষিণেশ্বর থেকে ট্রেন ধরে ভুল করে আর্মি কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়েছে বোঝার পর কয়েকজন সেনা-জওয়ানের সহজ-স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়। তাদের সঙ্গে দেশ-গাঁ'এর পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার সময় অনিমেষ বোঝে, "...ত্রিলোক সিং এ দেশের সমস্যা বুঝতে পারবে না। অথচ আশ্চর্য, আমরা একই দেশের অধিবাসী।" তবে বৃহৎ ভারতবর্ষ দিয়ে এই বিভিন্নতা বোঝারও দরকার নেই, কলকাতার জনবিন্যাস ও জীবনযাত্রার প্রণালী নিরীক্ষণ করলেও একে অনুভব করা যাবে। কলকাতা শহরের তিন-চতুর্থাংশ বাসিন্দা অবাঙালি। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে শুরু করে সমগ্র বিংশ শতাব্দীরই যে চরিত্র অভিজ্ঞান ছয়-সাতের দশকেও দেখা যায় তা হ'ল, এই শহরের বুকে সংঘটিত যাবতীয় 'গণ'আন্দোলনে অংশ নেয় শহরবাসী মানুষের খুব সামান্য অংশই, অধিকাংশই থাকে নির্লিপ্ত ও বিরক্ত। অনিমেষের উপলব্ধি : "অবাঙালিরা যারা এই শহর কলকাতায় প্রায় আধাআধি, তাদের সঙ্গে যেন এইসব আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক নেই, দেখলে মনে হয় তারা অন্য পৃথিবীতে বাস করে।"

শুধু বাঙালি-অবাঙালি ভেদ নয়, বাঙালি জাতির মধ্যেও জীবনযাপনের ভিন্নমুখী ধারার বিচিত্র সহাবস্থান দেখা যায়। 'কালবেলা'র কালেও এখনকার মতো এই রাজ্যে শহরের মানুষের নিবিখে গ্রামীণ-মানুষের বৌদ্ধিক গণচেতনার নিম্নমান অতি সহজে গ্রাম ও নগরের ভিন্নমুখী জীবন ধাবাকে চিনিয়ে দেয়। বীরভূমের গ্রামে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন সূত্রে সুবাস বিমানকে যা জানায় তাতে পশ্চিমবঙ্গের জনচেতনায় গ্রাম-নগরের পার্থক্য স্পষ্ট হয় : "এখানে এই কলকাতা শহরের মানুষের যে প্রবলেম আছে, পলিটিক্যাল যে সব ঝামেলা আছে, গ্রামে গেলে তুমি তার সঙ্গে কিছুই মেলাতে পারবে না। কমপ্লিট ডিফারেন্ট ব্যাপার। এমন এক-একটা গ্রাম আছে যেখানে স্বাধীনতা শব্দটার অর্থ জানে না এমন মানুষের অভাব নেই। জওহরলাল, গান্ধী তাদের কাছে শিব, নারায়ণের মতো ভগবানেরই একটা রূপ। ওরা কমিউনিস্ট বলে যাদের জানে তারা থাকে অন্য দেশে। যেন বর্গি কিংবা রাক্ষসের মতো ভয়ানক শত্রু, তারাই কয়েকদিন আগে এই দেশটাকে জয় করতে এসেছিল, ভাগ্যিস গান্ধী দেবতার শিষ্যরা ছিলেন তাই দেশ রক্ষা পেয়েছে।" শহর-গ্রামের বাঙালির ভেদই একমাত্র বিভাজিকা নয় বাঙালির। প্রাক্ ধনতন্ত্রের পরম্পরা ও মূল্যবোধ নিয়ে কলকাতার বাঙালি জীবনও কতটা অনড় থেকে গেছে তার প্রমাণও 'কালবেলা' ধারণ করে রেখেছে। বন্ধু পরমহংস অনিমেষকে প্রাইভেট টিউশন পড়ানোর জন্য ব্যবস্থা করে দেয় তার মাসীমার ননদের শ্বশুর বাড়ীতে। শোভাবাজার চিৎপুর অঞ্চলে খাস ঘটিপাড়ায় যেভাবে গৃহশিক্ষকের প্রতি সতর্ক প্রহরা ও নজরদারির ব্যবস্থা হয় তা অনিমেষকে নিদারুণ অপমানিত ও বিরক্ত করে। না পড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়ে বেরিয়ে আসার পর তার মনে হয় : "কলকাতা শহরে এরকম পরিবার এখনও থাকতে পারে বিশ্বাস করা শক্ত। এরাও বাংলাদেশের মানুষ, যে দেশের স্টুডেন্টস ইউনিয়নগুলো ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। এই যে এত মিছিল হয়, আন্দোলনের আগুন জ্বলে তার সামান্য আঁচ এ বাড়িতে লাগেনি। ঠিক জানা নেই, তবে নিশ্চয়ই এরকম বাড়ির সংখ্যা কম নয়।" ওই বাড়িতে ঢোকার পর অনিমেষের সঙ্গে বিভিন্নজনের ভাববিনিময়ের কয়েকটা মুহূর্ত যে কোন বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকাকেই প্রবন্ধ পাঠের শ্রম থেকে সাময়িক স্বস্তি দেবে : "ক্লাস সেভেনে

পড়ো?''—অনিমেষের এই প্রশ্নের উত্তর ছাত্রী দেয় না, দেয় ওই ছাত্রীর ভাই ভুলু; যে পড়ানোর সময় প্রহরায় নিযুক্ত। সে বলে, ''বাবা তো বলেচেই কোন কেলাসে পড়ে, আবার নেক্কড়ি করে জিজ্ঞাসা করার কি আছে?'' মেয়েটি বই আনেনি, অনিমেষ সে ব্যাপারে বললে ভুলু তাৎক্ষণিকভাবে 'আমি নিয়ে আসচি বই' বলেও বিরত হয়; কেন না সে বিরতিহীন প্রহরার জন্য আদিষ্ট। খুকির পড়ার সময় কে এবং কেন তাকে থাকতে বলেছে, অনিমেষের এই প্রশ্নে সে জানায়, থাকতে বলেছেন স্বয়ং শিয়াল তালুই অর্থাৎ তার বাবা। পাহারায় নিযুক্তির কারণ হিসাবে ভুলু বলে, ''আপনি বাইরের লোক, খুকি সোমত্ত মেয়েছেলে তাই।'' সে আরও জানায় যে আগের অশীতিপর মাস্টারের পড়ানোর সময় থাকতে বলত তার মা। কেননা, ''মা বলত বুড়োরা নাকি খুব খচ্চর হয়।'' তার পড়ানোর সময় ভুলুর থাকা চলবে না—অনিমেষের এই কথার প্রত্যুত্তরে ভুলু বলে, ''ইস। সেই ফাঁকে যদি ফস্টি নস্টি চালান। আমাদের বাড়িতে চাকর পর্যন্ত রাখা হয় না এজন্যে।'' পাঠক, নকশালদের 'বিপ্লবী' কালের কলকাতাকে চেনা যাচ্ছে?

গড়পড়তা বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জীবনযাপনই শুধু নয়, পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরাধিকারীদের প্রতি আকাঙ্খাও এই ছয়-সাতের দশকে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত সার্থকতা চরিতার্থতায় সীমিত হয়ে গিয়েছিল। অনিমেষের পিতামহ শরিৎশেখর নাতির জীবনপ্রবণতায় আশাহত হয়ে ১৯৬৪ সালের শেষে নিজের শ্রাদ্ধ করতে গয়া যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে অনিমেষের হোস্টেলে এসে শরিৎশেখর সেই আশাভঙ্গের কথা ব্যক্ত করে। তার ইচ্ছা ছিল অনিমেষ 'কৃতী হয়ে' ফিরে যাক জলপাইগুড়ি। অথচ সেই অনিমেষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিয়ন করছে, দিনরাত পার্টি নিয়ে মত্ত হয়ে আছে—এই সংবাদই তাকে পার্থিব আসক্তি থেকে বিযুক্ত করে। ভেঙে যায় নাতি অনিমেষকে নিয়ে তার স্বপ্ন দেখা। যে স্বপ্নাকাঙ্খা শরিৎশেখর পোষণ করত অনিমেষকে নিয়ে; তা ব্যক্তও করে উদ্দিষ্টের প্রতি, ''তুমি এখন ছাত্র। তোমার কর্তব্য ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তৈরি করা, যোগ্য করা। তা না করে তুমি কমিউনিস্ট হয়েছ। দেশে বিপ্লব আনতে চাও? এরকম একটা নেশায় তোমাকে ধরবে আমি চিন্তাও করিনি।'' এই শরিৎশেখরের মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্রের সুলভ অভিজ্ঞান; পরস্পর বিরোধিতাও আছে। তাই পরমুহূর্তেই বলে, ''আমি জানিনা সকাল থেকে রাত্তিরে একবারও তোমার নিজেকে ভারতবাসী বলে মনে হয় কিনা। চারধারে যা দেখি তাতে কেউ সে চিন্তা করে বলে মনে হয় না। সাধারণ মানুষ নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। নেতারা রাজনীতিকে সম্বল করে ক্ষমতা দখল করছে। এই দেশে বাস করে কেউ দেশটার কথা চিন্তা করে না। একটা যুবক নিজেকে ভারতবাসী বলে ভাবে না বা তা নিয়ে গর্ব করে না। তা হলে কী জন্যে তুমি রাজনীতি করবে? কেন করবে?'' মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে আত্মোন্নতির আগ্রহে বুঁদ হয়ে থাকুক আত্মস্বার্থসর্বস্ব জীবনবৃত্তে—এ প্রত্যাশা যে শুধু পরিবার প্রতিপালকদেরই তা নয়, এ যেন স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে বাঙালি মধ্যবিত্তের সামাজিক প্রত্যাশা হয়ে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে অনিমেষকে এক পুলিশ সার্জেন্ট তুলে নিয়ে যাবার পর তাকে নিরপরাধ (বোমা ছোঁড়েনি সে) বুঝে ছেড়ে দেবার সময় ঊর্ধ্বতন অফিসারের বিবেকী উপদেশ থেকেও এই সমাজ প্রবণতা স্পষ্ট হয় : ''মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে নিশ্চয়ই? কলকাতায় পড়াশুনো করতে এসেছেন তাই মন দিয়ে করুন। ইউনিয়নবাজি করে নিজের বারোটা বাজাচ্ছেন কেন?''

এইরকম একটা গোঁড়া রক্ষণশীল অনুদার সমাজকে হঠাৎ রাতারাতি আমূল বদলে ফেলার পরিস্থিতি নাকি সৃষ্টি হয়ে গেছে, এমন সিদ্ধান্ত ১৯৬৭ সালের ২৫ মে জানিয়ে দেন দার্জিলিং জেলার বিক্ষুব্ধ সি.পি.এম. নেতা চারু মজুমদার। তিনি হাঁপানি রোগের জন্য নিয়মিত পেথিড্রিন সেবন করতেন। এই ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সেবকের মধ্যে অমূল-প্রত্যক্ষীকরণের অভ্যাস সঞ্চার। অথচ তাঁর মোসায়েবরা এবং এমনকি দূরবর্তী কলকাতা-গোপীবল্লভপুর-কৃষ্ণনগর-বহরমপুরের কিছু অস্থিরমতি সি.পি.এম (১৯৬৭'র) নেতা তা ধ্রুববাক্য ধরে নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। কোথা থেকে কী হল, হড়পা বান এসে ভাসিয়ে নিল বাঙালি সমাজের একাংশকে। পুকুর, ডোবা, নর্দমা, চৌবাচ্চার জল সব একাকার হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে ন্যূনতম অংশ না নিয়েও অনিমেষ হয়ে গেল বিপ্লবী ছাত্রনেতা। তারপর তিন-চার বছরের ঝোড়ো জীবনযাপন। এ ঝড় সমাজমনে নয়, রোম্যান্টিক যুবকের আত্মায়। বহু বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা এবং অবসহনের মধ্য দিয়ে এই ভ্রান্তি ১৯৭১ সালে জেলে বসে অনিমেষকেও উপলব্ধি করতে হয় : "অনিমেষ বুঝতে পারছে বিরাট ভুল হয়ে গেছে। নিজেদের প্রস্তুত না করে, দেশের মানুষকে সঙ্গী না করে শুধুমাত্র বুকভরা উত্তেজনা এবং বিদেশি শ্লোগানকে পাথেয় করে তারা সত্যিই হঠকারিতা করে ফেলেছে। ... তারা যেভাবে এগিয়েছিল সেটাও গোলকধাঁধায় শেষ হল। প্রতিটি প্রদেশের মানুষের মানসিকতা জীবনযাত্রা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। এদের প্রত্যেককে একটা সুতোয় বাঁধতে পারা আকাশকুসুম কল্পনা। এসব নতুন নয়, আগেও জানা ছিল। কিন্তু উত্তেজনা মানুষকে অন্ধ করে।" এই অন্ধ 'বিপ্লব'রোগী হঠকারীদের উত্তেজনার কানাগলির স্বরূপ 'কালবেলা' বিশ্বাস্যভাবে ধারণ করে রেখেছে।

'কালবেলা' শাশ্বত মহিমা রেখে গেল কোথায়? সে মহিমা ধারণ করল নারীর প্রেমে, ত্যাগস্বীকারে, দায়িত্ব গ্রহণের দৃঢ় ব্যক্তিত্বে। পূর্বকালের সব নারীকেই ছাপিয়ে গেল আশুতোষ বিল্ডিংয়ের দুতলার বারো নম্বর ঘরের সুন্দরী নয়, অথচ আকর্ষণীয়া মাধবীলতা; যে অনিমেষকে প্রেমাকর্ষণে আবদ্ধ করেছিল। মাধবীলতার প্রজন্ম পর্যন্ত ছেলে আর মেয়েদের পরস্পরকে 'আপনি' সম্বোধন আর পৃথক বেঞ্চে বসার দস্তুর ভেঙে গেল সাতের দশক থেকে। বিপ্লবী রাজনীতিতে হঠাৎ গা ভাসানো শিক্ষিত যুবকের প্রতি প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্রে বিগত তিন দশকের তুলনায় মাধবীলতা অনেকটাই বেহিসাবী। অনিমেষের এই সহপাঠিনী যুবতী সাংসারিক নিরাপত্তাভাবনা সর্বস্ব আঙ্কিক নির্ণয়কে অক্লেশে অগ্রাহ্য করেছে। অনিমেষের রাষ্ট্ররোষ-উদ্দীপক রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা, পুলিশের দ্বারা তাড়া খাওয়া—এসব জেনেও তাকে মাধবীলতা ভালবেসেছে, একথা জেনে শীলা সেনের সদর্থক জিজ্ঞাসামিশ্রিত বিস্ময়, "তবু সে ভালবেসেছে, না?" পরদিন ভোরবেলা মাধবীলতাকে পুলিশ প্রহরা এড়িয়ে অনিমেষের সঙ্গে দেখা করার আকুলতায় তার বাড়িতে দেখে শীলা সেনের মনে হয়, "এ মেয়ে ইচ্ছে করলেই স্থায়ী নিরাপদ তকমাওয়ালা স্বামীর স্ত্রী হতে পারত। অথচ।" অথচ সে অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করল। প্রেমিক অনিমেষ গুণভূষণ নয়, হি-ম্যানও নয়, তবু! সে অনিমেষের রাজনীতিকে গ্রহণ করেনি। পৌষমেলার বোলপুরে অনিমেষকে সমালোচনা করায় সে খরোষ্ঠী : "এই বয়সে ছেলেরা সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন নিয়ে আলোচনা করে, সমরেশ বসুর 'বিবর' নিয়ে তর্ক করে, তুমি করো না। তোমার ব্যবহার একটু অ্যাবনরম্যাল না?" এই

মাধবীলতা বিয়ে ছাড়াই অনিমেষের সন্তান ধারণ করেছে। একলা বস্তিতে ঘরভাড়া নিয়ে অপেক্ষা করেছে অনিমেষের জেল প্রত্যাবর্তনের। দৃঢ় ও গভীর স্বানুভব নিয়ে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে বাঁচতে চেয়েছে। সে 'মধ্যবিত্ত' সমাজকে অশ্রদ্ধা করেছে। মধ্যবিত্ত প্রেমিকার ছক ভেঙে নতুন প্রেমিকার কল্পমূর্তি এঁকেছেন সমরেশ মাধবীলতার মধ্যে। সাড়ে চারটের ক্লাস শেষ হওয়া শিয়ালদামুখী ছাত্রীযূথের মধ্যে সে অনন্যা। আপাতত শান্তিকল্যাণ সময়ে এই ফুল্লরা'রা আর এ বঙ্গে প্রেমলীলা করতে আসেন না, 'কালবেলা'য় তাই ফিরতেই হয় এই নারীর অস্তিত্বিক আবেশের স্বাদ নিতে।

'কালবেলা' কল্পনা-আরোপিত সময়ভাষ্য হয়েও সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গ-রাজনীতির অন্যতম প্রধান স্পন্দিত প্রাণকেন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজস্ট্রিট শিক্ষাপ্রাঙ্গনের স্পন্দিত গর্ভ থেকে বেরিয়ে গোটা বাংলার রাজনীতি ও সমাজ প্রবাহের মর্মযাপনকে ধরে রেখেছে তৎসময়ের শাশ্বত জীবনপ্রবাহ ও যাপনস্পন্দন সহ। এখানে আছে ছাত্র-রাজনীতি, রোম্যান্টিক 'বিপ্লবী' ছেলেখেলা, গুপ্তহত্যা, গ্রুপিজম, গ্রাম-উদ্ধারে নগর বাউলদের বাউন্ডুলে অভিযান, 'বিপ্লব' ডাকার বালখিল্যতা, উপদলীয় কূপমণ্ডুকতা, পুলিশী সন্ত্রাস, কারারক্ষীদের দৌরাত্ম্য, উচ্চবিত্ত বাড়ির ছেলেদের হঠাৎ সমাজ উদ্ধারের অস্বাভাবিকত্ব এবং থিতিয়ে যাওয়া উত্তেজনাহীন দেশকালের নৈরাশ্য। বিংশ শতাব্দীর আধাসামন্ততান্ত্রিক ভারত একবিংশ শতাব্দীরও একদশক পার করে দিল তার রাজনীতি-ভাবনার স্থবিরতায় ভর করে। এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষা, জাতি, বর্ণ, ধর্ম তার সমাজজীবনের নির্ণায়ক। এখনও সামন্ত-দেশীয় শিল্পমালিক-সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সমন্বয়কারী দলই এ দেশের মানুষের তথাকথিত সংহতির দিশারী। অথচ আঞ্চলিক ভাবাবেগের নিত্যনতুন মুখ-মুখোশের আবির্ভাব এর রাজনীতি-রঙ্গমঞ্চে। সাতের দশকের বাঙালি নকশালদের বিপ্লব-বিপ্লব খেলাকে এখন তাই ছেলেখেলা বলতে খুব বেশি আপত্তি হয়না এমনকি জীবিত নকশাল ধেড়ে খোকাদেরও—তা অবশ্যই মার্কসীয় পরিভাষা ব্যবহার করেই। 'কালবেলা' এই কালের শাশ্বত চিত্রপট, অনিমেষ-মাধবীলতা তার প্রধান পুত্তলিকা, যদিও রক্তমাংসময়।

পঞ্চাশের বাংলা কবিতা এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রফিকুল হোসেন

বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় বিশ শতকের পাঁচের দশক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক দশক পার করে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করছি আমরা। এর আগে প্রায় দুশো বছরের প্রত্যক্ষ বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অবসান ঘটেছে এবং দেশভাগের ফলে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা বাঙালী জাতি দুটি আলাদা রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে চিরকালের চেনা সমাজ-প্রতিবেশ ছেড়ে, চোদ্দো-পুরুষের জন্মভিটে তথা 'দেশ' ছেড়ে 'পরপারে' গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য এবং ব্যগ্র হয় দুই বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনতা। স্বাধীনতা এল, কিন্তু একটা বিরাট অংশের মানুষ ব্যক্তি হিসেবে, পরিবার হিসেবে হয়ে পড়ল নির্বাসিত ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু। এর ফলে শুধুমাত্র আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিপুল পরিবর্তন দেখা দিল। বাঙালীর জাতিগত সাংস্কৃতিক চৈতন্যকে চিরকালের মতো খন্ডিত করে দেওয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সফল হল।

দেশভাগ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিম বাংলার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম আকার নিল। দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, প্রায় সার্বত্রিক নিরক্ষরতা এবং ভয়াবহ কর্মহীনতার দ্বারা জর্জরিত পশ্চিমবাংলার ঘাড়ে এসে পড়ল 'ওপার' থেকে আসা শরনার্থী তথা উদ্বাস্তুর চাপ। স্বাধীনতাকে ঘিরে স্বপ্ন এবং মাত্র তিন-চার বছরের মধ্যে সেই স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ বাস্তবতা পশ্চিমবাংলার বাঙালী-মানসে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সমাজ-রাজনীতি এবং শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য শাখার পাশাপাশি পাঁচ ও ছয়-এর দশকের কবিদের মধ্যেও আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই। কেউ এই দেশকালকে এড়িয়ে ব্যক্তিসর্বস্বতার ছোট গণ্ডিতে মুক্তি খোঁজেন; কেউ একে বদলাতে চান বলে প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা লেখেন; আবার কেউ কেউ সময়েরই নিরন্তর টানাপোড়েনের ভাষ্য রচনা করে শিল্প-সাধনার লক্ষ্যে পৌঁছতে চান।

বিগত চারের দশকে উত্তাল সময়ের অভিঘাতে, মার্কসীয় দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলা কবিতার আনুভূমিক প্রসার ঘটেছিল অনেকটা। অনতি-ইন্টেলেকচুয়াল, বিষয়মুখ্য কবিতার ভাষা ও আঙ্গিক বামপন্থী ভূমিচারী দায়বদ্ধ নন্দনের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে পেরেছিল। কিন্তু কবিতার এই সমকাল সচেতনতা বিশেষত মার্কসীয় মতাদর্শে সমষ্টিচেতনার আলোকে সমকালের মূল্যায়নকে চল্লিশের সমস্ত কবিই যে তাঁদের কাব্যসিদ্ধির পথ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তা কিন্তু নয়। প্রচ্ছন্ন হলেও সমাজ-বিচ্ছিন্ন আত্মগত বিশুদ্ধ গীতিকবিতার ধারা একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যায় নি। অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু অথবা চল্লিশের একেবারে উপান্তে আবির্ভূত আলোক সরকার প্রমুখ কবিদের কাব্যপ্রচেষ্টা চল্লিশের কাব্যনন্দনের মূল প্রবণতাকে প্রভাবিত করতে না পারলেও, স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতিতে পাঁচের দশকে আবির্ভূত তরুণদের একাংশের কাব্যভাবনায় তার প্রভাব পড়ল। 'কৃত্তিবাসের কবি' হিসেবে বিশ শতকের পাঁচের দশকে যাঁদের আবির্ভাব হল, তাঁরা চল্লিশের বামপন্থী আদর্শে সরব দায়বদ্ধ নন্দনের বিপরীত অবস্থান গ্রহণকেই মুখ্য গুরুত্ব দিলেন। সমাজ ও সমকালকে ধারণ ও বিশ্লেষণের মানসিকতাটা বদলে যাওয়ায়

সমকালীন রূঢ় বাস্তবের দুঃসহ বিশৃঙ্খলাকে প্রতিকারহীন মনে হল তাঁদের। আর প্রতিকারহীন বিশৃঙ্খলা থেকে জীবনে কোথাও সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়ে তাঁরা নিজেরাও হয়ে উঠলেন বিশৃঙ্খল, মূল্যবোধহীন—উন্মার্গগামী। প্রবল ঘৃণায় সমাজকে অস্বীকার করে ব্যক্তিসর্বস্বতার ছোট সীমানায় আবদ্ধ করে ফেলতে চাইলেন নিজেদের। 'জীবনের গভীর ও চলিষ্ণু সমগ্রতায়' আস্থা হারিয়ে, সমাজ-বাস্তবের দ্বন্দ্বময় বিশ্লেষণের পথে না গিয়ে শিল্প ও শিল্পীর সমস্ত রকম সামাজিক দায় অস্বীকার করে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত আত্মস্বরূপের উন্মোচনে, যৌবনমদির ফ্যান্টাসির চর্চায় মেতে উঠলেন। মার্কসবাদ তো বটেই, সমস্ত রকম স্বীকৃত মতবাদ বা আদর্শকেই তাঁদের ঘৃণা। কবিতাকে তাঁরা ব্যক্তিগত বিশুদ্ধ করে তুলতে চান এবং শুধুমাত্র কবিতার জন্যই কবিতা লিখতে চান। এই গোষ্ঠীরই নেতৃস্থানীয় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্কে আলোচনার আগে পঞ্চাশের কবিতা চর্চার অন্য দু'টি অভিমুখ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

চারের দশকের শেষদিকে জনযুদ্ধ-উত্তর এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী নব্য-ঔপনিবেশিক আর্থ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বামপন্থী কবিদের উচ্চকিত আবেগ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও মার্কসীয় দর্শনের প্রতি নবাগত তরুণদের একটা বড় অংশের আকর্ষণ তখনও অব্যাহতই ছিল। স্বাধীন ভারতে শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির স্বপ্ন দেখা কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রসৃতিকে রোখার লক্ষ্যে দেশীয় সামন্তপ্রভু ও পুঁজিপতিদের প্রতিভূ শাসক দল সবরকমের চেষ্টা চালালেও কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন গণসংগঠনের ক্রমশ প্রসারিত হওয়াকে আটকানো যায় নি। তেভাগা-পরবর্তী কৃষক আন্দোলন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীর আন্দোলনে বাঙালী যুবককুলের সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন ক্রমশ সম্ভবপরতার ভিত্তি খুঁজে নিতে চাইছিল। সোভিয়েত দেশ তো ছিলই, পূর্ব ইউরোপের নতুন নতুন ভূ-খণ্ডে সমাজতন্ত্রের বিস্তার; ঘরের কাছে চীনের অসামান্য সাফল্য, মালয়-ভিয়েতনাম-ইন্দোনেশিয়ায় নতুন দিনের সূর্যোদয়-সম্ভাবনা দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগ-উত্তর প্রজন্মকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। বামপন্থায় অবিচল চল্লিশের অপেক্ষাকৃত প্রবীনরা তো ছিলেনই—ততদিনে তাঁরা প্রথম দিককার উচ্ছ্বাসকে সংবরণ করে গভীরতায় স্থিতু হয়েছেন। পাঁচের দশকে বামপন্থাকে আদর্শ করে রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, পূর্ণেন্দু পত্রী, গোলাম কুদ্দুস, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মণীভূষণ ভট্টাচার্যদের মতো অজস্র তরুণ কবি শিল্প তথা কবিতার সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অঙ্গীকার করে কবিতাচর্চা করেছেন। পঞ্চাশে এসেই সম্পূর্ণ নতুন রূপে আবির্ভাব ঘটেছে চল্লিশের আত্মমগ্ন রোমান্টিক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও।

নান্দনিক প্রবণতার দিক থেকে দেখলে পাঁচের দশকের বাংলা কবিতায় কৃত্তিবাস-পন্থী আত্মকেন্দ্রিক, আঙ্গিকসর্বস্ব, অভিজ্ঞতাবাদী, স্বতস্ফূর্ত স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা-লিখিয়েদের বিপরীতে বামপন্থী দায়বদ্ধ নন্দনের উপস্থিতিই শেষ কথা নয়। বিপরীতমুখী এই দুটি নান্দনিক প্রস্থানক্ষেত্রের বাইরে তৃতীয় একটি প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাবে, যাদের সঙ্গে এই প্রধান দুই গোষ্ঠীরই যোগ রয়েছে, অথচ কোন একটির সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে দেওয়া যাবে না তাকে। দু'পা দু'নৌকায় রেখে চলা বা ভাসার তুলনা মনে আসতে পারে—প্রবচনটির বিশিষ্টার্থক প্রয়োগের ব্যাপারটি উপেক্ষা করে, শুধুমাত্র দৃশ্যগত ব্যঞ্জনার দিক থেকে দেখলে ব্যাপারটি অনেকটা তাই-ই। কোন নৌকারই যাত্রী নন এঁরা, অথচ দু'নৌকার সঙ্গেই যোগ এবং দু'টি ভিন্ন গতিকে মেলাতে চান এঁরা। শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ

চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর সেন, রণজিৎ সিংহ প্রমুখ কবিরা নান্দনিক উপলব্ধি ও প্রকাশের দিক থেকে এই পথেরই পথিক। বামপন্থী দায়বদ্ধ কবিদের থেকে এঁদের আলাদা করার প্রয়োজন হয়ত ছিল না—এঁরা সকলেই দায়বদ্ধ এবং হয়ত বামপন্থাতেও আস্থাশীল। তবু সমাজ-বোধের ভিন্নতর গভীরতা, আঙ্গিক ও ভাষ্যব্যবহারের আশ্চর্য সংযম ও সিদ্ধিকে বোঝার জন্য এঁদের বামপন্থী কবিদের থেকে আলাদা করে দেখা প্রয়োজন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়পর্বের অস্থিরতাকে আপন চেতনায় গ্রহণ করেও স্থির সংযত বাচনে নিজের সামাজিক বিবেক ও নান্দনিক বোধকে তুলে ধরতে চান এঁরা। সময়ের নিরন্তর টানাপোড়েনে দাঁড়িয়ে থাকে যে আধুনিকতা, যা ব্যষ্টির উপলব্ধি হয়েও সমষ্টি মানুষের কথকতায় পরিণত হয়—শঙ্খ ঘোষেরা সেই আধুনিকতার সাধনা করেছেন। আমাদের পরিপার্শ্বের যে ক্ষয়, আমাদের চিন্তার ও জীবনযাপনের যে যান্ত্রিক সরলীকরণ ও বিকৃতি; এমনকি আমাদের কাব্যের যে রুচিহীনতা তার বিরুদ্ধেই যেন এঁদের মননঋদ্ধ অভিযান।

২

১৩৬৫ বঙ্গাব্দে 'কৃত্তিবাস'-এর একাদশ সংখ্যায় 'বুদ্ধদেব বসু এবং উত্তরকাল' শীর্ষক রচনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

> "বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় যৌবন এবং ছন্দ বহু বিচিত্র। আমাদের অভীপ্সিত ঔদাসীন্য তাঁর কবিতায় খুঁজে না পেলেও আর একটি জিনিস পেয়েছি, যে বিষয়ে বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনিই প্রথম উল্লেখযোগ্য। বাংলা কবিতাকে তিনি তথাকথিত জীবনদর্শনের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। ..... তিনি শুধু কবিতার জন্যই কবিতা রচনা করেছেন। দৃশ্যমান পৃথিবীকে তিনি শরীর দিয়ে স্পর্শ করেছেন এবং সেই স্পর্শের অনুভব আমরা তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে পেয়েছি।"

'আমাদের অভীপ্সিত ঔদাসীন্য'—এ এক মারাত্মক ব্যাধি, সংক্রামক নেশা। সমাজ-সমকাল সম্পর্কে, মানুষ ও মানুষের ভালমন্দ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে চান তাঁরা। শিল্পের তথা কবিতার কোন রকম দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করতে চান না সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়রা।

সময়-প্রতিবেশের অস্থিরতা সুনীলদের জীবনযাত্রা এবং চেতনালোক তথা কবি-মানসিকতা গড়ে তুললেও সমকালীন কিছু ঘটনার প্রভাবও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ; বলাবাহুল্য ঘটনাগুলি আর্থ-রাজনৈতিক নয়। যেমন, জীবনানন্দের আকস্মিক অদ্ভুত মৃত্যু জীবনানন্দের প্রতি সুনীলদের আকর্ষণ বাড়িয়েছে—নিজেদের মতো করে জীবনানন্দকে আবিষ্কার ও ব্যবহার করেছেন তাঁরা। চারের দশকের মধ্যভাগ থেকে জীবনানন্দও যে ক্রমশ ভূমি-অভিমুখী হচ্ছিলেন; তাঁর কবিতার ডিকশনও যে কত বদলাচ্ছিল—শেষ আট-দশ বছরের জীবনানন্দকে বাদ দিয়ে প্রথম দিকের আত্মমগ্ন 'নির্জনতম' জীবনানন্দকেই গ্রহণ করলেন তাঁরা। দ্বিতীয়ত, এই সময়েই প্রকাশিত হয় 'শার্ল বোদলেয়র ও তাঁর কবিতা'—যৌবনের কবি বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়র অনুবাদ, সঙ্গে দীর্ঘ একটি ভূমিকা। বুদ্ধদেব বসুর মাধ্যমে পাওয়া বোদলেয়রের নগর-দৃষ্টি—নাগরিক জীবনের ক্লেদ-গ্লানি, ব্যর্থতা-পাপ, বেশ্যা-মাতাল প্রভৃতির প্রতিই তাঁদের আকর্ষণ দেখা গেল অন্যসব কিছু বাদ দিয়ে। তৃতীয়ত, অ্যালেন গিনস্‌বার্গ—প্রায় দুশো বছরের শক্তিশালী বুর্জোয়া গণতন্ত্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মহাশক্তিধর হয়ে ওঠা আমেরিকার বিট সম্প্রদায়ের কবি অ্যালেন এসেন কোলকাতায়। শ্মশানে বসে

গাঁজার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে অ্যালেন দীক্ষা দিলেন দায়হীন ব্যক্তিগত স্বতস্ফূর্ততায়—সর্বক্ষণের কবিতা-লিখিয়ে হওয়ার পেশাদারিত্বে।

সুনীল গঙ্গেপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন' প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ (পৌষ ১৩৬৪)-তে। পরের কাব্যগ্রন্থ 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি' বের হয় ১৯৬৬ (মধ্যচৈত্র ১৩৭২ বঙ্গাব্দ)-তে। পঞ্চাশের কবি হিসাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যায়নে আমরা এই দু'টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই সীমিত থাকব। সুনীল তাঁর 'একা এবং কয়েকজন' কাব্যগ্রন্থটির প্রথম কবিতাতেই সুনীল লেখেন—

আমারও আকাঙ্ক্ষা ছিল সূর্যের দোসর হবো তিমির শিকারে
সপ্তাশ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অঙ্গীকারে।
অথচ সময়াহত আপাত বস্তুর দ্বন্দ্বে দ্বিধাহীন মনে
বর্তমান-ভীত চক্ষু মাটিতে ঢেকেছি সঙ্গোপনে।

—প্রার্থনা/একা এবং কয়েকজন।

উপরের এই চারটি চরণে কবি যেন নিজের (এবং সমকালীন সম-মনোভাবাপন্ন আরো কয়েকজনের) কবিতা এবং কাব্যভাবনার স্বপক্ষে কৈফিয়ত হাজির করেছেন। 'দীপ্ত অঙ্গীকারে', 'তিমির শিকারে'র আকাঙ্ক্ষা নাকি তাঁরও ছিল; 'অথচ সময়াহত', 'বর্তমান-ভীত' কবি মুখ ঢাকলেন 'সঙ্গোপনে'—ব্যক্তিগত একান্ত তিমিরে। কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধ-স্বরূপ সর্বংসহা বসুধার কাছে প্রার্থনা-সূচক এই কবিতাটিতেই কবি 'নির্মম মুহূর্ত ছুঁয়ে বাঁচার বঞ্চনা স'য়ে স'য়ে' বেঁচে থাকার হৃদস্পন্দে 'আলো-উৎসের ঝংকার-উদ্দীপক 'নবীন যৌবনের' সমারোহ-স্বাক্ষর প্রার্থনা করেছেন।

এরপর কবিতার পর কবিতায় এই অন্ধকার আর যৌবন, ক্লান্তি আর বিষণ্ণতার মিশেলে অনাস্বাদিতপূর্ব এক ব্যক্তিগত 'দ্বিতীয় পৃথিবী' গড়ে তোলেন সুনীল। সময়ের তাপকে, ক্লীবত্বকে উপেক্ষা করতে চেয়ে কবি পরম ঔদাসীন্যে সমস্ত পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে আপন পৃথিবীতে আশ্রয় নেন—সত্তা জুড়ে জ্বলে ওঠে যৌবনের অতৃপ্ত অবদমিত আগুন। আর এই আত্মসচেতনতা জনিত তীব্র অতৃপ্তির অনুভবে 'বৃষ্টির মতো ঝরে অন্ধকার—সমস্ত অন্তরে'। দিবসরজনীর এই অন্ধকার, সত্তার গভীরের এই অনন্ত বিচ্ছিন্নতা অনিবার্যভাবেই নিয়ে আসে ক্লান্তি। একসময় এই ক্লান্তিই আবিষ্ট করে ফেলে—আবেশাতুর ক্লান্তিই মোহনীয় হয়ে ওঠে—

"..... ক্লান্তি যেন অন্ধকার নারী।
একদা অসহ্য হলে বাহুর বন্ধনে পড়ে ধরা
যন্ত্রণায় জর্জরিতা দুঃখিনী সে আলোর স্বরূপে
মাংসের শরীর তার শুভক্ষণে সব ক্লান্তিহরা
মণ্ডুকের মতো আমি মগ্ন হই সে কন্দর্প-কূপে।

—বিবৃতি/একা এবং কয়েকজন

অথবা,

এ কি অবাধ হাওয়া বইছে বাসনা চঞ্চল
আলো চাইনি, হাওয়া চাইনি, বুকের হলাহল

নিচে টানছে অন্ধকারে, চোখ ঢাকছে আঁধার
হয়ত শুকনো বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।

—তামসিক/একা এবং কয়েকজন।

তখনও গীনস্‌বার্গ আসেন নি, তখনও বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়র অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি; 'বাংলাদেশের তরুণতম কবিদের মুখপত্র' কৃত্তিবাসের তরুণ সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তখন থেকেই তামসিকতায় সিদ্ধ-ই শুধু নন—ক্লান্তি অন্ধকারের নান্দনিক বোধে—ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ভুবনের ইন্দ্রিয়সর্বস্ব নেশায় দীক্ষিত করতে চান অন্যদেরও। তাঁকে ঘিরে বেশ কয়েকজনের একটি সন্ধ্যাকালীন গোষ্ঠীও গড়ে উঠেছে। 'একা' নামের কবিতাতে সেই কয়েকজনের কথা রয়েছে—

একা গৃহকোণে আছি, তোমরাও এসো কয়েকজন
অন্ধকার চিন্তাকুন্ডে পা ছড়িয়ে বসো হে আরামে
কয়েকটি উজ্জ্বল স্মৃতি সময়কে করি সমর্পণ
অনন্তের হাত থেকে কিছুক্ষণ অনিত্যের নামে।

চারপাশের বহুব্যাপ্ত জীবনের সঙ্গে কোন যোগ খুঁজে না পেয়েই তাঁরা অন্তর্মুখী হয়েছেন—নিজেদেরই খন্ড খন্ড করেছেন কেবল। শুধুমাত্র কবিতার জন্য কবিতা লেখার ব্রতে, বেঁচে থাকার, নিঃশ্বাস নেওয়ার উদগ্র বাসনাকে চরিতার্থ করতেই সুনীলরা বাস্তবের প্রতিকল্পে এক দ্বিতীয় পৃথিবী নির্মাণ করে চলেন—আত্মস্বরূপের গভীরে প্রসারিত করেন সৃজনীসত্তাকে। অন্তর্মুখী ব্যক্তিগত সেই বাস্তবেই সুনীল তাঁর অস্তিত্বের শিকড় সন্ধান করেন। আত্মগত বিষাদের অহঙ্কারে আশ্চর্য সব রঙিন ফুলও ফুটে ওঠে—

একসঙ্গে জেগে উঠি দুজনেই, হে সবিতৃদেব
দেখা হয় নিরালায় আমার ছাতের একলা ঘরে
নানা কথা বলি আমরা দুঃখ সুখ অজস্র হিসেব,
আকাশের ঘন-নীল চোখে মুখে গায়ে মাখি দুই হাত ভরে
ছড়াই, জমিয়ে রাখি, বুকের মধ্যেও একটু নীল
সঙ্গোপনে রাখা থাকে—দু'জনের এইটুকু মিল।

এইবার যেতে হবে দু'জনের, দু'মুখো সংসারে
কোথায় সায়াহ্ন আছে, তুমি তাকে খুঁজবে ঘুরে ফিরে
কুন্তলে লুকিয়ে আলো, সে যখন আসবে অন্ধকারে
তুমি চলে যাবে দূরে; কোথায়? হয়তো অন্য নীলের গভীরে।

আমিও একলা ঘুরি পথে পথে, দিবালোকে দুই চক্ষু বুজে
বুকের জমানো নীল কাকে দেবো যেন তাই খুজি।

—অনুভব/একা এবং কয়েকজন।

অথবা

আমার নিঃসঙ্গ জাগা ভাঙে না কোথাও ঘুমঘোর
অতিরিক্ত অবিশ্বাস মানুষের পাশাপাশি হাঁটে
মানুষ না প্রতিবিম্ব? অবিশ্বাস না মায়ার শোক?
আমার নিঃসঙ্গ জাগা অবেলায় অস্থির ললাটে
গম্ভীর ধ্বনির মধ্যে ভেসে রয়, অফুরন্ত অলীকের পাশাপাশি হাঁটে।
—অবেলায়/আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি।

কবি হিসেবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম থেকেই পাঠকের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। সুনীল এবং তাঁর সেদিনের বন্ধুদের বে-পরোয়া জীবনযাত্রা প্রাথমিকভাবে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করলেও, মূল কারণটা কিন্তু কবির জীবনযাপনে নয়—কবিতার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত, সুনীল মনন নয়, আবেগের চর্চা করেছেন—আর সেই আবেগ ব্যক্তিগত প্রেমের কামনাঘন শরীরী অবয়বে রূপ পেয়েছে। একটা নিষিদ্ধ গোপন ভাবের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়েছে মধ্যবিত্ত বাঙালী কাব্যপাঠকের একাংশ। দ্বিতীয় যে দিকটা সুনীলকে জনপ্রিয় করেছিল সেটি হচ্ছে তাঁর কাব্যভাষা বা আঙ্গিক।

যৌবন-ঋদ্ধ, বাসনা-উন্মুখ প্রেমভাবনার প্রথম প্রকাশ আমরা পেয়েছিলাম বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'তে। অতীন্দ্রিয়তার রহস্যময়তা থেকে মুক্ত করে প্রেমের আবেগত্মক ইন্দ্রিয়-সংলগ্নতাকে স্বীকৃতি জানানোর মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রোত্তর তিরিশের কবিরা 'আধুনিক' হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। চল্লিশের দিনগুলিতে বামপন্থী শিবিরের বাইরে অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহদের মতো যে দু'একজন কবি ছিলেন, তাঁদের কাব্যে তিরিশের ব্যক্তিগত প্রেমের ইন্দ্রিয়ঘন প্রকাশের উত্তরাধিকার প্রবাহিত হলেও, চল্লিশের বামপন্থী নন্দনধারার অনুসারী প্রধান কবিদের কাব্যে প্রেমের ব্যক্তিগত রূপ গুরুত্ব পায় নি। শাসন-শোষণ আর প্রতিরোধ-সংকল্পের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে নরনারীর সম্পর্কের ব্যক্তিগত গোপন দিকটিকে তাঁরা একপ্রকার উপেক্ষাই করেছিলেন। নারীকে তাঁরা শ্রমে-বিশ্রামে, আনন্দ-বেদনায়, লড়াই-সংগ্রামে ব্যাপ্ত জীবনের মাঝখানেই খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। পাঁচের দশকে সুনীলদের কাব্যভাবনায় চল্লিশের প্রধান মানসিকতার বদল ঘটে যায়। সুনীল এবং তাঁর সময়-সতীর্থদের কবিতায় যৌবন—যৌবনের ব্যর্থতার, হাহাকারের—পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের, দুঃসহ ক্লান্তির মিশেলে তীব্র প্যাশনের আশ্চর্য সব কবিতা পেলাম আমরা। 'স্বপ্নের কুহকে বন্দী কঠিন সময়'-এর বিষাদকে কিভাবে কবিতায় রূপান্তরিত করে তুলতে হয়—অন্তঃকরণের গভীর গভীরতর অন্ধকারে ডুব দিয়ে কি করে উজ্জ্বল মুক্তো-শুক্তি তুলে আনতে হয়—কি করে 'পৃথিবীর একনিষ্ঠ আদিম নেশায়' মগ্ন ব্যাপ্ত হয়েও অনাসক্ত থেকে, রক্তমাংসের সবল প্রণয়কে কবিতার আশ্চর্য স্পর্শকাতর ভাষায় প্রকাশ করা যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর বন্ধুরা সেদিন অনায়াসেই তা রপ্ত করে ফেলেছিলেন। সুনীলের কবিতা থেকে দুটি উদ্ধৃতি—

ক. অনিশ্চিত সর্বনাশে চিরকাল যুবকের নেশা
এই সত্য জেনে তুমি সুকুমার মৃণাল-শরীরে
ফোটালে বিষাক্ত পদ্ম ছদ্মবেশী মাধুর্যেতে মেশা
অনায়াসলভ্যমণি রেখে দিলে দুর্গ দিয়ে ঘিরে।
হিংস্র অন্ধকারে ভরা অরণ্যের মতো চুল খুলে

পৌরাণিক রূপসীর মতো তুমি মায়াবী-আলোকে
এ জন্মের স্বচ্ছ স্নান লুকালে জঙঘায়, যোনিমূলে
ভয়ঙ্কর মনোলোভা সমুদ্র সাজালে দুই চোখে।

—চতুর্দশপদী/একা এবং কয়েকজন

খ. অরুন্ধতি, সর্বস্ব আমার
হাঁ করো, আ-আলজিভ চুমু খাও, শব্দ হোক ব্রহ্মান্ড পাতালে
অরুন্ধতি, আলো হও, আলো করো, আলো, আলো
অরুন্ধতি, আলো—
চোখের টর্চলাইট নয়, বুকে আলো, অরুন্ধতি, লাইট হাউস হয়ে
দাঁড়াবে না?
বুকের উপরে দুই পা, ফ্লরোসেন্ট উরুদ্বয়,
মন্দিরের দেয়ালে মাছের
রূপ মনে পড়ে—কেন এত রূপ? রূপ বুঝি জন্মান্ধের খাদ্য;
বুঝি মহিষের টুকরো লাল কাপড়—
জলে ডুবে সূর্য স্তব, চোখ বেঁধে প্রণয়ের মতো
অরুন্ধতি, জীবন সর্বস্ব, নাও চোখ নাও, বুক নাও
ওষ্ঠ নাও, যা তোমার ইচ্ছে তুলে নাও,
তুলে নাও, নষ্ট করো, ভাঙো বা ছড়াও, ফেলে দাও, অরুন্ধতি।

—চোখ বাঁধা/আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এরকম অজস্র রক্তমাংসের প্রণয়-কবিতা লিখেছেন। নীরা—'বাহান্ন তীর্থের মতো এক শরীর'-বিশিষ্টা তাঁর প্রিয়তমা নারী চরিত্রটি, যাকে তিনি 'বাসস্টপে তিন মিনিট' আর 'স্বপ্নে বহুক্ষণ' ধরে দেখেন—তাঁকে নিয়ে প্রায় পাগলামির মতো স্বগতোক্তি করে চলেন কবিতার পর কবিতায়। একজন শক্তিশালী কবির হাতে নারীর এই একমাত্রিক এবং প্রায়শই নগ্ন রূপ আমাদের পীড়িত করে অনেক সময়। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিষয় হিসেবে এই ইন্দ্রিয়সর্বস্ব যৌনতা এবং অসংকোচ আত্মগত নগ্নতা-ই সুনীলের কাব্যভাষায় অন্যতর এক তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা সঞ্চারিত করেছিল। সুনীল যখন লেখেন—

ভগ্ন প্রেমিকের ছুরি ঝলসে উঠলে
প্রতি নায়িকার কণ্ঠে আর্তনাদ নেই
শুধু আছে উদ্ভিদের পদশব্দ, অজ্ঞাত শিশুর হাসি;
এবং ঘড়ির গূঢ় আলোচনা
দূরে ফুল ফোটার কলরব, জলাশয়ে মাছের চিৎকার।

—শব্দ ১/আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি

তখন শব্দ আর নৈঃশব্দের সীমারেখা অনায়াসে লুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর ব্যবহৃত শব্দ কবিতার দেহে

শুধুমাত্র তীব্র প্রবহমানতা এবং অনিবার্য ইন্দ্রিয়ঘনতাই বহন করে আনে না, ভাষার বিন্যাসের গুণে তীব্র আবেগও ঝলসে ওঠে—

একলা ঘরে শুয়ে রইলে কারুর মুখ মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না
চিঠি লিখবো কোথায়, কোন মুণ্ডহীন নারীর কাছে?
প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে না, চোখের আলো মনে পড়ে না
ব্লেকের মতো জানলা খুলে মুখ দেখবো ঈশ্বরের?

বৃষ্টি ছিল রৌদ্র ছায়ায়, বাতাস ছিল বিখ্যাত
করমচার সবুজ ঝোপে পূর্বকালের গন্ধ ছিল
কত পাখির ডাক থামে নি, কত চাঁদের ঢেউ থামেনি
আলিঙ্গনের মতো শব্দ চোখ ছাড়েনি বুক ছাড়েনি
একলা ছিলুম বিকেলবেলা, বিকেল তবু একা ছিল না
একটা মুখ মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না।

—অসুখের ছড়া/আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি।

পঞ্চাশ এবং ষাটের প্রথমার্ধের বাংলা কবিতায় ব্যক্তিগত শরীরী প্রেমাভিজ্ঞতার, বাসনা চঞ্চল যৌবনের আমিত্বময় উপলব্ধির যে নান্দনিক ধারা তৎকালীন বাঙালী পাঠককে অভিনবত্বে হতচকিত করেছিল, নিঃসন্দেহে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ই ছিলেন তার পথ প্রদর্শক এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র। সুনীলের আহ্বানেই গদ্যকার শক্তি চট্টোপাধ্যায় উপলব্ধিময় শব্দের মৌতাতে মজলেন। আপন রক্তে 'সময়ের বিষ'কে মিশিয়ে নিয়ে হাজির হলেন দীপক মজুমদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, প্রবণকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ রায়, সমীর রায়চৌধুরী, বিনয় মজুমদার, মলয় রায়চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষদের মতো তরুণ কবিরা। কবি-স্বভাব এবং কাব্যিক সিদ্ধিতে এঁদের পরস্পরের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত সমস্ত রকম মতাদর্শকে দূরে সরিয়ে রেখে অনেক সময় প্রচলিত সংস্কার তথা মূল্যবোধের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে, আত্মগত উপলব্ধির বিস্ফোরণধর্মী স্পর্ধিত উচ্চারণকে কবিতার শরীরে প্রকাশ করে সৃষ্টির অভিমানে মজে থাকতে চেয়েছিলেন। দৈন্যে-সঙ্কটে, আন্দোলনে-পীড়নে ধ্বস্ত স্বদেশে প্রতিদিন একটু একটু করে ফিকে হয় বেঁচে থাকার উদ্দাম স্বপ্নের রঙ, নিভে আসে আলো, বাতাস হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ। চোখের সামনে প্রতিদিন একটু একটু করে প্রিয় স্বদেশভূমিকে লুট হয়ে যেতে দেখে কী করবেন সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত তরুণ? প্রতিক্রিয়া তো অনেক রকম-ই হতে পারে—পঞ্চাশের বাংলা কবিতায় তার বহুমুখী পরিচয়ও পেয়েছি আমরা। কিন্তু সুনীলদের এই প্রতিক্রিয়া? আত্মময় 'দ্বিতীয় ভুবন' গড়ে তোলা এবং তাতে মজে থাকা শেষ পর্যন্ত জীবন সম্পর্কে, সেই সঙ্গে শিল্প সম্পর্কেও চূড়ান্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর-ই পরিচয়বাহী।

গিরিশচন্দ্র ও তাঁর থিয়েটার

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা থিয়েটার ও বাংলা নাট্য সাহিত্য-এ দুটিরই ইতিহাসের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

উনিশ শতকের কলকাতায় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী লক্ষ্য করছিলেন—অবশ্য যাঁরা উৎসাহী ছিলেন, লক্ষ্য করেন কিভাবে বৃটিশ শাসক সম্প্রদায়ের শোষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং শ্বেতাঙ্গ জাতি বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছিল যা পরবর্তী শতকে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় পর্যবসিত। তাই ঐ সময়ে কোনো নাট্যকার/পরিচালক সম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষভাবে আলোচ্য কিভাবে তৎকালীন ইওরোপীয় চিন্তা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উত্তাল অবস্থার সৃষ্টি করে; একদিকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও আইডিয়ার প্রসার, অন্যদিকে বিজ্ঞান বিরোধী শাসিত কৃষ্ণাঙ্গ জাতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শ্বেতাঙ্গজাতির শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব—গিরিশের নাটক ও নাট্যচিন্তায় এই দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে উপস্থিত। গিরিশ যখন প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও জীবন নিয়ে নাটক লেখেন যা কোনোভাবেই প্রাচীনপন্থা বা আদর্শের জয়গান নয়।

গিরিশচন্দ্র অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর অভিনেতা হিসেবেই থিয়েটারে যুক্ত হন; নাটককার গিরিশচন্দ্র, নট গিরিশচন্দ্রের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ। তাঁর নাট্যরচনার সূত্রপাত ১৮৭৭ সালে কিন্তু নট হিসেবে সক্রিয় ১৮৬৭ সালে।

কবি অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "সাধারনী" পত্রিকা ১৮৬১ সালে গিরিশচন্দ্রকে মেঘনাদবধকাব্য রূপান্তরিত নাটকে, রাম ও মেঘনাদ এক সঙ্গে উভয় চরিত্রের অভিনয়ের জন্য "বাংলার গ্যারিক" উপাধি প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় এ হলো "উজান স্রোতের কাল" শুরু হবার যুগ যখন যুক্তির চেয়ে ভক্তি বড়ো করে দেখার যুগ। এ হলো শশধর তর্কচূড়ামণি কর্তৃক হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যার যুগ, হেনরি অ্যালকট ও মাদাম ব্লাভাতস্‌কি-র থিওসোফিষ্ট আন্দোলনের যুগ। পঞ্চানন তর্করত্নের পুরাণ সম্পাদনা ও প্রকাশনা থেকেই হিন্দু পুনরুত্থানবাদেব আন্দোলন শুরু হয়।

গিরিশচন্দ্রের জন্ম ১৮৪৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৫ই ফাল্গুন) বাগবাজারে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে। গিরিশের মাতাঠাকুরানী রাইমণি দেবীর গুরুতর অসুস্থতার জন্য গিরিশ বাগদী ধাত্রী উমার স্তন্যপান করে বড় হন। উল্লেখযোগ্য সামন্ত প্রভুরা যুদ্ধের সময় এই বাগদি সম্প্রদায়কে তাদের সৈন্য হিসেবে নিয়োগ করতেন তাদের অসমসাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য এবং যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকলে তারা ডাকাতি করে জীবন নির্বাহ করত। ধাত্রী উমার হাতে গিরিশ ছোটবেলায় এক ডানপিটে কিশোর এবং যৌবনে তিনি এলাকার বেশ কয়েকজন যুবককে জুটিয়ে দলবল নিয়ে এলাকার শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের ত্রাসে পরিণত হন। অন্যদিকে রাত বিরেতে মড়া পোড়ানো, ডাক্তার বদ্যি তলব বা প্রয়োজনে মাতালবাবুদের হৈ-হল্লার প্রতিবাদে তাদের ঠেঙিয়ে শায়েস্তা করতেও উদ্যোগী ছিলেন। সজ্জন শান্ত মানুষ হিসেবে পিতা নীলকমল ঘোষ সর্বদাই ছেলের আচার আচরণে সশঙ্কিত চিত্তে দিন কাটাতেন। অবস্থা চরমে পৌছয় যখন ছেলে গিরিশ একবার দুর্গা পূজার সময় একটি দুর্গাপ্রতিমা কুড়ুল দিয়ে কেটে খণ্ড খণ্ড করেন। এ সময়ে তিনি নিজেকে ঘোর নাস্তিক বলে প্রচার করতেন এবং কারণে অকারণে যে কোনো লোকের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্কে

প্রবৃত্ত হতেন। তিনি পরবর্তীকালে লেখেন যে এ সময়ে তিনি মানসিকভাবে চরম বিভ্রান্তির শিকার হন। তিনি লিখছেন—"হিন্দুরা নানা গোষ্ঠিতে বিভক্ত—কেউ কালীর ভক্ত তো কেউ কৃষ্ণের; সবাই সবাইকে সর্বদা যমের বাড়ি পাঠাচ্ছে। আর ব্রাহ্মণরা তো আরো নোংরা, কারণ তারা সত্যনারাণের পাঁচালি শ্রাদ্ধের মন্ত্র হিসেবে চালায় ও অনেকে আবার নর্দমার জলে মাটি ভিজিয়ে তিলক কেটে তাকে পবিত্র বলে চালায়। এরপর নিজের ধর্ম সম্বন্ধে আমার আর কোনো বিশ্বাস ছিল না। তারপর কয়েকটি ইংরিজি বই পড়ে উপলব্ধি করেছি যে বস্তুবাদীরাই বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, ...আমি ঈশ্বরকে ডেকে বলতাম—"যদি তুমি থাকো আমাকে পথ দেখাও ...পরপর হঠাৎ মনে হোলো এসব মিথ্যা। জল, আলো, বাতাস যা মানুষের এই পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য দরকার তা তো না চাইতেই মেলে, হাত বাড়ালেই মেলে। তাহলে মানুষকে ধর্মের খোঁজ করতে হয় কেন চিরন্তন জীবনের জন্য? এ এক মহা মিথ্যা। বস্তুবাদীরাই শিক্ষিত, প্রাজ্ঞ, ওরাই সঠিক।"

এ সব প্রশ্নই নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পায় তাঁর নাটকে পরিণত নাট্যকার হিসেবে। যেমন 'কালাপাহাড়', 'জনা' বা ভ্রান্তি নাটকের ভাঁড় চরিত্রে। জীবন, ধর্মীয় চিন্তা সম্বন্ধে এই মানসিকতাই তাঁকে তাঁর শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই খোশামোদপ্রিয়, দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন ফিচেল বাবুদের থেকে—যারা সাহেব কোম্পানীর আপিসে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সন্ধ্যেবেলায় শরীরমনে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে অন্য কোনো চিন্তাভাবনার তগিদ অনুভব করত না। এই অজ্ঞেয়বাদ অল্পবিস্তর তাঁর মধ্যে বজায় ছিল রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের সময় পর্যন্ত বা তার পরেও সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত জীবনে উপর্যুপরি নানা ট্র্যাজেডির দরুণ।

রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তাঁর সামনে মদ্যপান করতেন এবং মত্ত হয়ে মাঝে মাঝে নিলর্জ্জ আচরণ করতেন কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তা গায়ে মাখতেন না এবং গিরিশচন্দ্রের নাম দিয়েছিলেন ভক্ত ভৈরব।

ঠিক কী কারণে যে তাঁর মত এক উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক রামকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছিলেন তা বলা কঠিন তবে তাঁর মধ্যে এক 'পবিত্র গর্ব' লক্ষ্য করেন যার ফলে গিরিশ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি মানুষকে আত্মসম্মান ফিরিয়ে দেন যখন তারা রাজশক্তি খ্রিষ্টান, পাদ্রী, শিক্ষিত বাঙালী, সমাজ সংস্কারক প্রত্যেকের কাছেই অবহেলিত ও অপমানিত হচ্ছিলেন, বিখ্যাত রঁম্যারল্যাও ঠিক এই কারণে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকৃষ্ট হন। রল্যা এই বলে শেষ করেন :

"রামকৃষ্ণদেব তাঁর চারপাশের মানুষের মধ্যে আনন্দ আর মুক্তির ঝোড়ো হাওয়া বইয়ে দেন।" এই আনন্দ ও স্বাধীনতাই ছিল গিরিশচন্দ্রের আকাঙ্খিত সম্পদ।

গিরিশচন্দ্রের বাবা তাঁকে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন কিন্তু পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার পর স্কুল ছেড়ে দেন। পরবর্তী সময়ে তিনি লিখেছিলেন :

> "ভয় দেখিয়ে আমাকে কোনো কাজ করানো বা
> বিরত করা যাবে না। কোনো দিন ভয় জিনিষটা
> আমার ছিল না। যে কাজে আনন্দ নেই বা
> করার ইচ্ছে নেই এমন কাজ জীবনে ছুঁইনি।
> চাবকে জন্তুকে বশ মানানো যায়। মানুষকে নয়।"

সম্ভবতঃ ইস্কুলের যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নল-দময়ন্তী নাটকে যেখানে বিদূষক/৩য় অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে বলছে—'গুরুমশায় শালা কান মলে দিলে, যদি তা না দিত তাহলে হয়তো আমার অক্ষর জ্ঞানটা হতো।' কিন্তু স্কুলের বাধ্যবাধকতা যখন রইল না তখন গিরিশচন্দ্র হয়ে উঠলেন বইয়ের পোকা। এ ব্যাপারে তিনি বন্ধুবর ব্রজেন্দ্র সোমের কাছে চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। আজীবন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ও এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন।

এরই পাশাপাশি পাঠশালার জীবন থেকে গিরিশ শহরের কবিয়ালদের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। উপরন্তু বাগবাজার অঞ্চল তার হাফ আখড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল যার স্রষ্টা মোহন চাঁদ বসু। অবশ্য গিরিশের সমকালীন কবিয়াল মনোমোহন বসু, যার দলে গিরিশ যোগ দেন এবং রাতের পর রাত দলের নেতার জন্য তাৎক্ষণিক গান রচনা করেন। মনোমোহন বসু বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যার প্রেরণার উৎস ছিল হিন্দুমেলা। এই প্রেরণা থেকেই তিনি বাঙালির ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে যাত্রার আঙ্গিক অনুসরণ করেন। তাঁর প্রণয় পরীক্ষা নাটকে তিনি যাত্রা ও থিয়েটারের মেলবন্ধন সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেন। যেহেতু মনমোহন বসুর দলে ছিল গানের লড়াই, যেখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কবি দ্রুত মুখে মুখে গানে পরস্পরের কথার জবাব দিতেন। মনোমোহনের দলের খ্যাতি ছিল তাদের সূক্ষ্ম রুচি ও রসবোধের, তাই গিরিশের কাছে মনোমোহনের দলে গান রচনা ছিল তাঁর কাব্য ও ছন্দের শিক্ষানবীশী। একথা সুবিদিত যে গিরিশ পরের জীবনে অপেরার জন্য গান লিখতেন অবলীলাক্রমে এবং গীতিনাট্য মনিহরণের জন্য ২৮টি গান লেখেন ''সীতারাম' নাটকে অভিনয়ের ফাঁকে। বলাবাহুল্য পরবর্তীকালে গিরিশের নাটকের মডেল ছিল মনোমোহন বসুর যাত্রা।

এই কবিয়ালরা ছিলেন কলকাতা শহরের মধ্যে আবদ্ধ এবং তার যাবতীয় কুৎসিত ও রসবোধের প্রতিনিধি। তাঁরা বেশ স্পষ্টভাবেই যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরতেন কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পক্ষ অবলম্বনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেন এবং শহরের বিভ্রান্তি আরো জটিল করে তুলতেন। গিরিশ এই বিভ্রান্তি থেকে উঠে আসেন এবং তাঁর নাটকে মেলে ধরেন সময় ও শহরের যাবতীয় আপাতবিরোধিতা; বিদেশী শাসকের প্রতি ঘৃণা, বাবু সম্প্রদায়ের আচার আচরণে তীব্র কটাক্ষ, হিন্দু ধর্মের যাবতীয় কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার সমালোচনা ইত্যাদি। কিন্তু যে কবিয়ালরা ছিলেন তাঁর প্রেরণা তারা সে সময়ে কোনো সংগঠিত শক্তি ছিল না। অবশ্য কবি দাশরথি রায়ের বাড়িতে পুলিশ একবার তল্লাসি চালায় গোপন বিপ্লবী হিসেবে সন্দেহের বশে।

এইসব কবিয়ালদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কলকাতার নব্য বাবু সম্প্রদায়, কারণ রাজা নবাবদের ধ্রুপদী গানের আসরে তাদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু এসব নব্য বাবুদের কাব্যছন্দ গান ইত্যাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান বা রুচি ছিল না—পক্ষান্তরে তাঁরা অর্থ ও সম্পদ এবং বিলাসিতা ও সময়ের অপচয়ের এক আশ্চর্য নিদর্শন সৃষ্টি করেন। কিন্তু সংগীত বা কাব্য সম্বন্ধে কোনো বোধবুদ্ধি ছিল না, তবে সহজে অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামি গলাঃকরণ করতেন, ফলে ঐ কবিয়ালরা ক্রমশঃ ঐ অশ্লীলতা ও গালিগালাজের পাঁকে ডুবে যান। উপরন্তু এঁদের শ্রোতা ছিল ঐ খেটে খাওয়া মানুষেরা, যাদের এযাবৎ কোনোরকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশাধিকার ছিল না। এইসব বাবুদের বাড়িতে কবিগানের আসরে এরা কোনোরকম প্রবেশমূল্য দিতে সমর্থ ছিল না; তবে

বাবুদের সে ব্যাপারে কোনো চাহিদা ছিল না এবং তাঁরা চাইতেন এঁদের মুখে নিজেদের অর্থ সম্পদের প্রশংসা এবং শহরের অন্যান্য ধনীদের তুলনা, যেন তারা ঈর্ষান্বিত হন। তবে এসব কবিগানের অন্য একটি ইতিবাচক দিক ছিল, কারণ দর্শকরা হাজারে হাজারে এসব অনুষ্ঠানে হাজির হতেন এবং এর ফলে ভবিষ্যতে বাংলা পেশাদার থিয়েটারের এক গণতান্ত্রিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে গড়ে ওঠে পেশাদার থিয়েটারের প্রাকশর্ত। থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সতীর্থরা দীর্ঘ চল্লিশ বছর নেতৃত্ব দেন।

যাত্রা ও কবিগান নিয়ে যে বিতর্ক তার বিশেষজ্ঞদের আইডিয়া ও মতপার্থক্যের সংগ্রাম কারণ তাঁরা কলকাতার সমাজকে দুই স্পষ্ট শিবিরে ভাগ করে দেন। সাধারণ শ্রোতারা তার রসবোধ ও বাস্তববাদিতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে বুকে টেনে নেন, পাশাপাশি শিক্ষিত উন্নাসিক মানুষ তা অশ্লীল ও কুৎসিত হিসেবে এই কবিগান ও যাত্রার স্থূলতায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই উচ্চশিক্ষিত বিছিন্ন মধ্যবিত্তরা সংস্কৃত পণ্ডিতদের সমর্থন পান, যাদের চোখে একমাত্র প্রকৃত নাটক রচয়িতা কালিদাস এবং তারপর আর কিছুই নেই। পরিবর্তে দরিদ্র মানুষ তাকে আলিঙ্গন করেন নিছক বিনোদন বলে নয় বরং নৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা হিসেবে।

গিরিশচন্দ্র এই শিল্পের কারিগর হিসেবে সচেতনভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নিজ শ্রেণীর বিরুদ্ধে। উপরন্তু তাঁর সমগ্র কর্মমুখর থিয়েটারের জীবনে তিনি তার নিজশ্রেণীর কাছে যা কিছু মূল্যবান তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

মহান সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহনের চোখে এই যাত্রা ও কবিগান কুসংস্কারের প্রশয়দাতা যা মানুষের মন মেঘাচ্ছন্ন করে। বিখ্যাত ভারতবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চোখে ঐ কবির লড়াই এমনই অশ্লীল যে ভদ্র ভাষায় তা বর্ণনার অযোগ্য। একমাত্র ব্যক্তিক্রম ছিলেন বিদ্যাসাগর; যিনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা সত্ত্বেও বলেন :

''বাংলার সমাজ সজীব রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজন রামগোপাল ঘোষের মত বক্তা, হুতোম প্যাঁচার মত রসজ্ঞ মানুষ ও ভোলা ময়রার মত কবিয়ালের।'

উপরন্তু এই কবিয়ালরা শুধু তাদের গান ও কাব্যের জন্যই নয়, জীবনযাত্রার মাধ্যমেও ছিলেন রক্ষণশীল সুবিধাবাদী অলস মধ্যবিত্তের চক্ষুশূল। ব্রাহ্মণ কবিয়াল দাশরথি রায় ছিলেন আকাবাঈ নাম্নী এক মুসলিম ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিলামের রেশম শিল্পের শ্রমিকশ্রেণীর দলভুক্ত। তাঁর অবিস্মরণীয় পাঁচালিগান শান্তিপূর্ণ ও নবদ্বীপ অঞ্চলে এক কিংবদন্তী হয়ে ওঠে। তাঁর একটি গানে তিনি শ্রোতাদের ব্যবসাদারদের প্রতিটি ব্রত্যকথন মিথ্যা বলে গণ্য করতে উপদেশ দিয়েছেন এমনকি হিন্দুদের পবিত্র বিশ্বাসকেও রেহাই দেননি। তাঁর রাবণ-বধ নামক কাব্য প্রায় একযুগ ধরে বাংলার কবিকুলকে প্রভাবিত করেছে। উল্লেখযোগ্য এই কাব্যে রাবণ নায়ক রাম আগ্রাসী। এই কাব্যে এক গানে দেবতাদের নিরেট নির্বোধ বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে যা শুনে শ্রোতারা হেসে লুটিয়ে পড়ত।

১৮৬৭ সালে গিরিশচন্দ্র তাঁর নিজস্ব যাত্রাদল গঠন করেন বাগবাজারে বন্ধুবান্ধবদের সহযোগে—নগেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, ধর্মদাস সূর প্রভৃতিদের নিয়ে এবং প্রথম নাটক হিসেবে তাঁরা বেছে নেন শর্মিষ্ঠা-মাইকেলের নাটক। এর সঙ্গে সমসাময়িক যাত্রাদলের পার্থক্য

সূচিত হয়—যাদের মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বা বিদ্যাসুন্দরেব চটুল রসাল বিষয়—যদিও গিরিশচন্দ্রের নির্বাচন খাঁটি ইওরোপীয় মডেলের নাটক কিন্তু তা প্রযোজনা করেন যাত্রার ঢংয়ে। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের থিয়েটারী আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছে : পাঁচ অঙ্কের নাটক, সূক্ষ্ম মানবিক দ্বন্দ্ব, রুচিশীল সাসপেন্স এবং ক্যাথারাসিস, কিন্তু এই ভংগীর মধ্যে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন যাত্রার উপকরণ।

তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল বাবু বিলাসের কবল থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করা এবং জনগনের রুচিভিত্তিক থিয়েটার গড়ে তোলা, যাদের তিনি দর্শক হিসেবে খুব ভালো চিনতেন।

১৮৬৮ সালে তিনি প্রযোজনা করেন সধবার একাদশী সতীর্থ অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফির সঙ্গে এবং কলকাতায় আলোড়ন সৃষ্টি সে নাটকের অভিনয়ে। বিশিষ্ট নাট্যকার/অভিনেতা অমৃতলাল সে উপলক্ষে কবিতা লিখে তাকে অভিনন্দন জানান। কবিতাটি হলো—

"মদমত্ত পদ টলে,
নিমেদত্ত রংঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ
নব নাট্যগুরু তার।"

কিন্তু এ নাটকের নায়ক এক অতি উচ্চশিক্ষিত মদ্যপ যুবক, যে নিরেট ধনী উচ্চবিত্তদের পয়সায় মদ্যপান করে তাদেরই সমালোচনায় ছিন্নভিন্ন করে, ফলে পৃষ্ঠপোষকদের কাছে এ নাটক বিষবৎ বলে মনে হয় এবং তার ব্যবসায়িক সাফল্য সম্বন্ধে তাঁরা সন্ধিগ্ধ মনোভাবাপন্ন হন।

গিরিশের এর পরবর্তী প্রযোজনা নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' (১৮৭১)। নাট্যকার দীনবন্ধু তাদের প্রস্তাব দেন বড়লোক বাবুদের বৈঠকখানায় না ঘুরে নিজেদের থিয়েটার গড়ে তুলতে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে গিরিশের সতীর্থরা উদ্যোগী হন কিন্তু সকলেই তাদের বিমুখ করেন কিন্তু বন্ধুবর ব্রজনাথ দেব তাদের টাকা ধার করে এনে দেন মহাজনের কাছে থেকে। এইভাবে ১৮৭১ সালে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে লীলাবতী নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

১৮৭২ সালে গিরিশচন্দ্র উদ্যোগী হন পেশাদারীভাবে 'নীলদর্পন' নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য। দলের নামকরণ হয় ন্যাশনাল থিয়েটার। কিন্তু দৃশ্যসজ্জা, পোশাক ইত্যাদির ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাবের জন্য গিরিশচন্দ্র 'ন্যাশনাল' নামকরণে আপত্তি জানান এবং অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দেন।

এরপর গিরিশচন্দ্র সারাজীবন এক থিয়েটার থেকে অন্য থিয়েটারে ঘুরে বেড়িয়েছেন ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, স্টার, এমারেল্ড, কোহিনুর, মিনার্ভা, ক্ল্যাসিক এবং অসংখ্য অভিনেতা অভিনেত্রী তৈরি করেছেন।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যশিল্পী হিসেবে সবচেয়ে বড় অবদান গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মঞ্চ নির্মাণ। তিনি কাঠের মঞ্চ তৈরী করেন মিসেস লুইস-এর চৌরঙ্গীতে অবস্থিত 'থিয়েটার রয়্যাল'-এর হুবহু প্রতিরূপ-খাঁটি এলিজাবেথীয় থিয়েটারের অনুকরণে। এই থিয়েটারের জন্যই গিরিশের নাট্য রচনার প্রেরণা, যেমন ছিল এলিজাবেথীয় থিয়েটার মহাকবি শেকসপিয়ারের নাট্যরচনার। গিরিশচন্দ্র ও

তাঁর সতীর্থরা চেয়েছিলেন বাবুদের অনুগ্রহ থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করে জনগণের টাকায় থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তখন কলকাতায় ছিল একাধিক অপেশাদার থিয়েটার যাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঐ বড়লোক বাবুর দল। থিয়েটার সম্বন্ধে এঁদের আগ্রহ ছিল কোনো বিশেষ অভিনেত্রীদের প্রতি লালসা থেকে। গিরিশচন্দ্রও ছিলেন এমনই এক অ্যামেচার থিয়েটার বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের পরিচালক ও অভিনেতা। গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সতীর্থরা জনগণের টাকায় থিয়েটারের স্থায়িত্ব ও পেশাগত নিরাপত্তার ভিত্তি গঠন করলেও তাঁদের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব কিন্তু মিটল না। গিরিশের প্রয়োজন ছিল নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য টাকার এবং ব্যবসায়ীরাও তাঁদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তায় আকর্ষিত হয়ে টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন কিন্তু নতুন চাল চাললেন। তাঁরা প্রতিমাসে নতুন নতুন নাটকের দাবী জানাতে থাকেন এবং গিরিশচন্দ্রও থিয়েটার ও সতীর্থদের রুজিরোজগারের নিরাপত্তার কথা ভেবে অক্লান্ত পরিশ্রমে লিপ্ত হলেন। কিন্তু যখনই ঐ মালিকদের কাছে নাটক বোধগম্য হতো না তাঁরা গিরিশের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে বলে প্রচার শুরু করলেন। এমনই ঘটনা ঘটেছিল তাঁর দুটি বিখ্যাত নাটক 'কালাপাহাড়' এবং 'মায়াবসান'কে কেন্দ্র করে।

গিরিশচন্দ্র কলকাতার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে নাটককে পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতির উন্নতিসাধন করেন, যে দর্শক ছিলেন তাঁর বিশেষ পরিচিত। যাঁদের সান্নিধ্যে তিনি যাত্রা ও কবিগানের প্রাথমিক পর্যায়ে অতিবাহিত করেন। ঐ দর্শক আবেগে অবগাহন করতে চায়, ত্রাসে কম্পিত হতে চায়, হাস্যরস চায়, শোকে মুহ্যমান হতে চায়। এ ব্যাপারে তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন মহাকবি শেকসপিয়ারের নাটক ও থিয়েটার—যিনি সে যুগের আপামর মানুষ অর্থাৎ aphrentree থেকে উচ্চকোটির অভিজাত ব্যক্তিবর্গ সকলের মনোরঞ্জনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি শেকস্পিয়ারের কাছেই শিখেছিলেন নাটকের চরিত্রগুলিকে জীবনের চেয়ে বড়ো করে আঁকতে, নানা নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ করতে হিংসা, ডাইনী, প্রেতাত্মা, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, যুদ্ধবিগ্রহ—সবই ছিল মহাকবির নাটকের ভংগীর অন্তর্ভুক্ত। নাটকের ঘটনা আরো ঘনীভূত করে তুলতেই নাটকের হিংসাত্মক ঘটনাগুলি জীবনের চেয়ে বেশি হিংসাত্মক করে মেলে ধরতে। একমাত্র সেই অর্থেই নাটক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। 'রাজা লীয়ার' নাটক এক রূপকথার গল্পের মত শুরু হয়—রাজা ও তাঁর তিনটি কন্যাকে নিয়ে এবং নাটকে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তুমুল টানাপোড়েন ও উত্তাল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শেষে সব ভালো লোকেরা মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু একমাত্র মূর্খ ব্যতীত কেউ একে অবাস্তব হিসেবে গণ্য ও প্রত্যাখ্যান করবে না। অবশ্য ঠিক তাই বলতে এবং করতে থাকেন, পৃথিবীর তাবৎ বুর্জোয়া সমালোচকরা। তাঁরা শেকস্পিয়ারেব নাটক ও চরিত্রগুলিকে illogical আখ্যা দেন। তাঁদের চোখে চরিত্ররা সব হবে স্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয় জগত যেখানে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হবে লজিক মারফত। তাঁদের চিন্তায় গতিশীল জীবন যুক্তিহীন—ন্যরীপুরুষ যেখানে আচমকা বদলে যায়। শেকসপিয়ারের নাটকের হিংসাত্মক ঘটনাবলীর জগত তাঁদের চোখে অযৌক্তিক কারণ তাঁর চরিত্ররা unpredictable। বুর্জোয়াদের চোখে শেকস্পিয়রের নাটকের জগৎ ছলনাপ্রবণ—তারা বাস্তববাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—যাঁরা নানারকম আপোষরফা করে বেঁচে থাকে। এইরকম ছোটমাপের মানুষের ড্রইংরুমের জগত চারদেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ জগতই একমাত্র সত্য একমাত্র শিক্ষিত মানুষের আচরণ।

গিরিশচন্দ্রও এই তথাকথিত বাস্তববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বিশাল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা এনেছেন তাঁর নাটকের। তাঁর সব চরিত্ররাই তিন হাতেব চেয়ে বড়মাপের মানুষ—এমন কি তাঁর ঘরোয়া নাটকের নায়ক যোগেশ কালীকিংকবরাও কেউ ঐ ছোট মাপের মানুষের আওতায় পড়েন না এবং পড়েন না বলেই তারা বেশি সত্য।

গিরিশের নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথিতযশা সমালোচক ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা ড. সুকুমার সেন লিখেছেন :

> গিরিশ জানতেন তাঁর দর্শকের শিল্পগত সীমাবদ্ধতা। যাদের জন্য তিনি নাটক লিখেছেন। তাই তিনি সস্তা Sentimentality ও কান্নার প্যানপ্যানানি ও মঞ্চ কলাকৌশল ব্যবহার করেছেন তাঁর নাটকে।"

যদি ডাঃ সেন কান্নার প্যানপ্যানানি বলতে চান তাহলে গিরিশের কোনো নাটকই তা নয়, কারণ তার অধিকাংশ নাটকের নায়কই অর্জুন, মেঘনাদ, কৃষ্ণ, রাম, রাবণ ইত্যাদি—যাঁদের সঙ্গে দর্শকের সর্বদাই এক শ্রদ্ধার আড়াল বজায় থাকে, যাদের সঙ্গে দর্শক কখনই নিজেকে একাকার করেন না।

আবার—"গিরিশ ব্যভিচার ও অন্যান্য নীতিহীনতা না এনে নাটক লিখতে পারেন না।"

ডাঃ সেন গিরিশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'জনা'কে আক্রমণ করে বলেন :

> "শিব এক নারীকে ব্যবহার করছেন প্রবীরকে প্রলোভিত করতে—এটি এক নিম্নতম শ্রেণীর চাতুরী। এর ফলে প্রবীরের চরিত্র কলংকিত হয় এবং শিবকেও মহান করে না।"

'জনা' নাটকে গিরিশচন্দ্র এক নশ্বর জীবের বিরুদ্ধে দেবতার সমবেত ষড়যন্ত্রের ছবি এঁকেছেন। প্রবীর তা অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। দেবতাদের বিরুদ্ধে এক মানবের অসম যুদ্ধের ইতিবৃত্ত। উপরন্তু গিরিশচন্দ্রের শিবকে মহান করার কোনো উদ্দেশ্যই নেই যা অপ্রাসংগিকভাবে ডাঃ সেন উত্থাপন করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে কৃষ্ণ এক উপাস্য দেবতা নন বরং তিনি এক ষড়যন্ত্রী অধিনায়ক যিনি প্রবীরকে নীচ উপায়ে ধ্বংস করতে চান। এ হলো গিরিশের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি। তিনি বলতে চেয়েছেন মানুষের প্রতি দেবতারা সহানুভূতিশীল নন বরং মানুষ তাঁদের হাতে নিছক ক্রীড়নক মাত্র যাঁরা প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করেন এবং যখন খেয়াল খুশি হয় তখন তাদের ধ্বংস করেন। এ বক্তব্য গভীরভাবে ঐতিহ্য লালিত। ডাঃ সেন সম্ভবতঃ দেবতাদের চরিত্র অংকনে New Testament-এর ধারণার অনুগামী—যীশুখ্রীষ্টের প্রতিরূপ হবে যিনি এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়রা নতুন ধরনের দেবদেবী সৃষ্টি করেন—সৈনিক রাষ্ট্রনায়ক, ধূর্ত, নির্মম, নারীলোলুপ এমন কি নীচ বিবেচনাহীন। কিন্তু সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

গিরিশচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং জানতেন ষড়যন্ত্র করে যুদ্ধে জয়লাভ কৃষ্ণের কাছে আদৌ ঘৃণ্য নয়। মহাভারতে এমন অন্যায় পদ্ধতি অবলম্বনে যুদ্ধে জয়লাভের ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে তাই প্রবীর হত্যা দর্শকের কাছে ঐ রকম এক চাতুরী। তা যেন একইভাবে উক্তি করেন 'চৈতন্যলীলা' ও 'বুদ্ধদেব' নাটক সম্বন্ধে। 'চৈতন্যলীলা' সম্বন্ধে

ডাঃ সেন বলেন "এটি উৎকৃষ্ট নাটক বলা যায় না কারণ গোড়াতেই চৈতন্যের দেবত্ব ধরে নিয়ে সব নাটকীয়তা ধ্বংস করা হয়েছে"। আবার বুদ্ধদেব নাটক সম্বন্ধে বলেছেন :

> "প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যেই বুদ্ধদেবকে দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়—ফলে নাটকে কোনো নাটকীয় প্রভাব থাকে না।"

কিন্তু ডাঃ সেন বিস্মৃত হয়েছেন দর্শক থিয়েটারে প্রবেশের পূর্বেই জানে বুদ্ধদেব বা চৈতন্য কে ছিলেন, সুতরাং এ ধরনের নাটকে 'suspense' প্রত্যাশা করা কি মহাপণ্ডিত ডাঃ সেনের পক্ষে মানায়?

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন রামকৃষ্ণদেব এবং বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁরাই তাঁর চিন্তা পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেন এবং মনকে গঠিত করেন। তাঁদের চিন্তা ও শিক্ষাই গিরিশের সব নাটকের বিষয়বস্তুর মূল প্রতিপাদ্য। এ শিক্ষা হলো দেশের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, স্বাধীনতার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি ও আপোষরফার বিরোধিতা, হিন্দুধর্মের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম, রামকৃষ্ণের বেদান্তের শিক্ষায় সব মানুষের সমন্বয় ঐক্য গঠন, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর সুদক্ষ ব্যবহার এবং আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা। দীর্ঘ ৪৫ বছর কর্মমুখর জীবন অতিবাহিত করে গিরিশচন্দ্র ২৫শে মাঘ (১৩১৯) ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯১২ সালে প্রয়াত হন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা হিসাবে প্রদত্ত ভাষণ (২০০২ সালের ২২ মার্চ তারিখে প্রদত্ত)।

নাটকের সংলাপ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইউরোপ-আমেরিকায় নতুন ধরনের যে-নাট্যান্দোলনের শুরু হয় তাতে নাট্যাংশের সংলাপ কমিয়ে আনার ঝোঁক প্রবল হয়ে ওঠে। আর্তো প্রভাবিত 'অঁসম্বল থিয়েটার মুভমেন্ট', জের্জি গ্রটোস্কির 'ল্যবরেটরি থিয়েটার', চেইকিন-এর নেতৃত্বে 'ওপেন থিয়েটার' এবং পিটার ব্রুক প্রমুখের প্রযোজনা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁদের নাট্যে সংলাপের বদলে দৃশ্যময় চিত্রকল্প, শরীরী অভিব্যক্তি, প্রথা-বহির্ভূত স্পেসের ব্যবহার, আপাত সম্পর্কহীন ধ্বনির প্রয়োগ নাটকের ভাবনাকে বাঙ্ময় করে তুললো। জার্মানীর সুবিখ্যাত নাট্যকার হাইনের মুলার তাঁর 'হ্যামলেট মেসিন' নাটকের স্ক্রিপ্টে যৎসামান্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন। তাঁর স্ক্রিপ্ট ছিল আট পৃষ্ঠার, যা মঞ্চ উপস্থাপনায় সময় নিয়েছে প্রায় আট ঘণ্টা। বোঝাই যাচ্ছে, সংলাপের ভাষার থেকে থিয়েটারের ভাষা এক্ষেত্রে কী পরিমাণ বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে। এ-ধরনের সংলাপ বর্জনের ঝোঁক সম্প্রতি অন্য নানা ধরনের নাটকে প্রকট হচ্ছে।

তবে পৃথিবীর সুবিস্তৃত নাট্যক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত সংলাপ-প্রধান নাটকের প্রাধান্য ও গুরুত্ব স্বীকৃত। আমরাও এখানে এই ধারাতেই চলছি। আমাদের কাছে সংলাপ নাটকের মেরুদণ্ড এবং এই সংলাপের গা বেয়েই নাটক বিকশিত হয়ে ওঠে। সংলাপ-ই নাটকের গড়নে ও চলনে সমাদৃত।

উৎকৃষ্ট সংলাপ রচনা কঠিন। একাজে সুনির্দিষ্ট কোনো ম্যাজিক ফর্মুলাও নেই যা অনুসরণ করে কেউ সার্থক সংলাপ লিখবেন। নাট্যকারের নিজস্ব শক্তিই এর প্রধান উৎস। প্রতিভা সংলাপকে গভীর অর্থবহ, দ্যুতিময় এবং নাট্যগুণসম্পন্ন করে তোলে, নতুন মাত্রা এনে দেয়। তবে যথার্থ সংলাপের মধ্যে এমন কিছু চারিত্রিক বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায় যা পৃথিবীর সেরা নাটক প্রণেতারা সকলেই অনুসরণ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি, যা সংলাপের সাধারণ ধর্ম, সে-সম্পর্কে সজাগ থেকে 'ডায়ালগ' লেখায় মনোযোগী হলে অবশ্যই উপকার পাওয়া যাবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ঃ

নাটকের সংলাপ দৈনন্দিন কথাবার্তার চেয়ে বেশি কিছু

Dialogue is more than conversation. নাটকের সংলাপ শুনে মনে হবে আমরা যেমন ভাবে কথাবার্তা বলি তেমন ভাবেই বলা হচ্ছে কিন্তু আসলে তা কলাসম্মত ভাবে গড়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় নানারকম ত্রুটি থাকে—সবক্ষেত্রে ঠিকভাবে শুরু হয় না, যুক্তির পথ ধরে এগোয় না, পরিমিতি বা বাক্যগঠনের শৃংখলা ও সৌকর্য থাকে না, আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এরকম বহু বিচ্যুতির কারণে প্রাত্যহিক কথাবার্তাকে 'মডেল' করে নাটকের সংলাপ রচনা করা যায় না। নাট্যকার বাস্তব বাক্যবিনিময়ের স্বাভাবিকত্ব এবং স্বাদ-গন্ধ বজায় রেখে নিজের মতো করে যথাযথ ও সুঠাম সংলাপ বানিয়ে নেয়। এবং এমনভাবে সংলাপ বানাতে হবে যাতে সংলাপ কাহিনীকে গড়বার উপাদান হয়ে ওঠে, চরিত্র নির্মাণের সহায়ক হয়, মূল 'থীম' বা আইডিয়া প্রকাশের অনুপান হয়, নাট্যক্রিয়ায় গতি, দ্বন্দ্ব, তীব্রতা বৃদ্ধির কারণ হয়। এখানে প্রতিটি শব্দ গুরুত্বপূর্ণ, everything said counto. Dialogue

is, thus, not natural, but artistically constructed. Dialogue is synthetic, daily conversation is pragmatic. নাট্যকার গলসওয়ার্দি তাই বলেন, "Good dialogue is hand-made, like a good lace; clear, of fine texture, furthering with each thread and harmony and strength of a design to which we all must be subordinated "

ভুলে যাব না যে, নাট্যসংলাপের কাজ ত্রিমুখী। প্রথমত তা গোটা নাটকের 'নিউক্লিয়াস' হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকবে। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে 'ইন্টার অ্যাকশন' ঘটিয়ে 'ড্রামাটিক ইনটারেস্ট' বাড়িয়ে তুলবে। তৃতীয়ত দর্শকের সঙ্গে উপযোগী 'কমিউনিকেশন্' তৈরি করবে।

এতসব কাজ দৈনন্দিন সংলাপের মধ্যে থাকে না, একারণেই নাট্যগুণান্বিত আদর্শ সংলাপ শিল্পসম্মতভাবে বানিয়ে নিতে হয়। এ ব্যাপারে নাট্যকারের যোগ্যতা এবং নাট্যকলার জ্ঞান এবং বোধ-ই ঔৎকর্ষের দিকে নিয়ে যেতে পারে অন্যথায় সংলাপ দুর্বল হবে, সেই সঙ্গে নাটকও নিষ্প্রাণ হতে বাধ্য।

সংলাপের সার্থকতা অভিনেতা-নির্ভর -

নাটক পড়ে সংলাপের পুরো স্বাদ ও মহিমা পাঠক পান না। কিন্তু ঐ একই সংলাপ দর্শক যখন মঞ্চে শোনেন এবং দেখেন তখন পাঠকের চেয়ে বহুগুণ লাভবান হন। এর কারণ নাট্যসংলাপের প্রকৃত মূল্যায়ন অভিনয়-নির্ভর। আদর্শ অভিনেতার অভিনয়ের নৈপুণ্যই লিখিত সংলাপের অন্তর্লীন আবেগ, অনুভবকে বহুমাত্রিক 'ড্রামাটিক এক্সপ্রেশন' দেয়। ফলে সংলাপ 'এনহ্যান্সড' হয়। স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন যে, কমিউনিকেশন স্টাডি দাবি করে যে সংলাপের শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি শরীরের ভাষাকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়, শতকরা ত্রিশ ভাগের বেশি অভিনেতার কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা, বিরাম, নীরবতার সঙ্গে উন্মোচিত হয় এবং সংলাপের মাত্র দশ ভাগ ব্যবহৃত শব্দের নিজস্ব অর্থে প্রকাশ পায়। এর থেকে বুঝতে পারি, সংলাপের নিজস্ব একক শক্তিতে তার মাহাত্ম্য ধরা পড়ে না। Dramatic dialogue is much more than the words on the page. The actors have to live the words and give them life So, dialogue needs its surrounding apparatus—acting, gesture, bodymovement, music, costume, scenery etc. সংলাপের এসথেটিক্স বুঝতে তাই এইসব কিছুর সমন্বয় চাই।

এইভাবে অভিনেতা নাট্যসংলাপকে কেবল শোনায় না, শরীরীভাষা এবং অভিব্যক্তির মাধ্যমে দেখায়ও বটে। সংলাপের তলদেশে চরিত্রের যে আবেগ অনুভূতি সঞ্চারিত থাকে তাকে অভিনয়ের মাধ্যমে দৃশ্যমান করে তোলে। তখন সংলাপের অভিনয় হয়ে ওঠে মেন্টাল পিকচার, ভিডিওগ্রাফ অফ মেন্টাল স্টেট। এইভাবে actors show dialogues. তাই অভিনেতা একজন showman এবং এই showman-দের নৈপুণ্যে লিখিত সংলাপ হয়ে ওঠে ভিজুয়াল ডায়ালগ্।

সংলাপের ঔৎকর্ষ আসে সাবটেক্সটের রচনায়

স্তানিস্লাভস্কি তাঁর দু বছরের বাচ্চাটিকে যখন বলতেন—I shall kill you, তখন বাচ্চাটি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বাবাকে জড়িয়ে ধরতো। কারণ বাচ্চাটি বাবার বলার ধরন দেখে বুঝে নিত, I shall kill you-র মানে হচ্ছে, I love you. বাবার সংলাপটিকে যদি text বলি তাহলে তার বলা কথাটির কোনো মানে রইল না, তার তলায় লুকোনো আর একটা text বেরিয়ে এল, যার মানে,

I love you এটাই নাটকের সংলাপের subtext. subtext যা বলা হল তার থেকে অন্যরকম কিছু। যখন কী বলা হয়েছে সেটা নয়, কী বলতে চাওয়া হয়েছে সেটাই প্রধান হয়ে ওঠে—তখনই subtext গড়ে ওঠে। ভারতীয় আলংকারিকেরা যাকে প্রতীয়মান অর্থ বলেছেন subtext অনেকটা সেরকম। subtext is the content underneath the spoken dialogue, and this hidden content is the unspoken thoughts, emotions and motives of the character. Drama is rich in subtext. এ ধরনের subtext নাটকের মুহূর্ত ও পরিস্থিতি অনুযায়ী মাঝে মাঝে আসবে। দর্শকের কাছে subtext খুবই আকর্ষণীয়।

সংলাপ হচ্ছে Spoken action

ভাষাতত্ত্বের দার্শনিক John L. Austin speech-act theory সম্পর্কে তাঁর How to do Things with words গ্রন্থে বলেছেন, "Language is a mode of action as it is a means of conveying informations". অর্থাৎ speech একধরনের performance of acts. যেমন চার্চে চার্চ মিনিস্টার দুজন বিবাহার্থীর শুভ পরিণয় ঘোষণা করে বল্লেন—"I now pronounce you husband and wife." এই speech অবশ্যই একটা act বা action. তাই speech is action-ও বলা যায়। এই speech-action-এর মধ্য দিয়ে শ্রোতা বক্তার intention, attitude বুঝতে পারে।

নাটকের সংলাপও speech আর সেকারণে তা কোনো action অবশ্যই ঘটিয়ে থাকে। সংলাপের এই action হল কাহিনী, ঘটনা এবং চরিত্রকে conflict ও tension তৈরি করে climax-এর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সংলাপের action তাই ঘটনা ও চরিত্রকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেত দেয় না—action moves forward. একেই আমরা বলি চরিত্রের movement, ঘটনার pace বা tempo, সংলাপের অন্তর্লীন action তাই progression-এর মাধ্যম ঘটে। Good dialogue is action as it leads progress of events, পিরানদেল্লো একেই বলেছেন, "azione parlata"–spoken action.

Speech action ছাড়া নাটকে physical action-ও থাকে কিন্তু তা isolated act নয়—it underline the dialogue.

দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, উদ্দেশ্য সাধনে বা অভীষ্ট লাভে বাধা, রহস্য কৌতূহল, বিস্ময় action-কে ড্রামাটিক করে এবং তা সংলাপের সূত্র ধরেই আসে।

একারণে সংলাপ রচনার সময় তা অভিপ্রেত action গড়ে তুলতে পারছে কি না, সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

সংলাপে কবিত্বের তরঙ্গ

Theatre and poetry are kissing lovers থিয়েটারের সূচনাপর্বে সব দেশে কাব্যই ছিল নাটকের প্রকাশ-মাধ্যম। ঋগ্বেদের সংবাদ-সূক্ত, প্রাচীন গ্রীক নাটক থেকে শুরু করে কয়েক শতাব্দী ধরে এভাবেই চলেছে। তারপর যখন থেকে নাটকের সংলাপ গদ্যে লেখা হতে আরম্ভ করল সেক্ষেত্রেও গদ্যের ধমনীতে কবিতার গোপন রক্তপ্রবাহ থেকে গেছে। নাটক কাব্যানুভূতিকে কোন কালেই নির্বাসন দিতে পারবে না।

কবিত্ব কবিতার থেকে বিস্তৃত। কবিত্ব কেবল কবিতার মধ্যেই একনিষ্ঠ থাকে না। চলচ্চিত্র, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি যাবতীয় শিল্পকর্মের মধ্যেই কবিত্ব তরঙ্গ তোলে, গভীরতম অনুভবের মর্মর জাগায়, এমন কি আমাদের জীবনচর্যার মধ্যেও আকস্মিক বিদ্যুতরেখার মতো কবিত্ব উদ্ভাসিত হয়। কবিতা-র মধ্যেই কবিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে সন্দেহ নেই, তবে সব শিল্পেই তার স্পর্শ এবং দ্যুতি থাকে। নাটকে তো বটেই। কবিতা সাহিত্যের, কবিত্ব সর্বজনীন।

নাটকের সংলাপে কাব্যগুণ একটা deeper suggestive meaning এনে দেয়। Alexander Pope বলেছেন—poetry is stronger than thinking–it is imagination তাই দর্শনের দুরূহ বিষয়ও তাঁর কবিতায় লিখতে খুবই ইচ্ছে হতো। কবিতার মতো deeply এবং briefly বলার সুযোগ আর কিছুতে মেলে না। তাই সংলাপে কাব্যের আমন্ত্রণ থাকে। It extends the meaning of dialogue by giving it a life, glow and colour–poetic expression heightens the vigour and depth of the dialogue. At any stage poetry works its magic

কোনো গভীরতম মুহূর্তে যখন চরিত্রের অন্তস্থল থেকে কিছু কথা বাইরে আসে, সেই inner dialogue কবিত্বের ছোঁয়া পেলে সার্থক হয়ে ওঠে। চরিত্রের ভাবুকতা, বিশেষ কোনো mood-এর প্রকাশে কাব্যগুণ বড় সহায় হয়ে ওঠে। Realistic speech pattern-এর মধ্যে কাব্যের অতর্কিত প্রবেশ একটা আলাদা ambience গড়ে তোলে যার ফলে দর্শকের imagination stimulated হয়, দর্শক তখন ভিন্নতর একটা level-এ পৌঁছে যায়।

ওথেলো যখন ডেসডেমোনাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে যাচ্ছে তখন সে বলে—"put out the light, and then put out the light"। তখন তার হাতে একটি জ্বলন্ত মোম। এই আলোটি নিভিয়ে সে ডেসডেমোনার প্রাণের আলোটি নিভিয়ে দেবে। এসময় ওথেলো তার বেশবাস নিয়ে এগোয় একজন খ্রীষ্টীয় পুরোহিতের মতো, যেন ঘটতে চলেছে একটা ritualistic sacrifice "Put out the light and then put out the light"। —খুবই সরল নিরাভরণ এই poetic words থিয়েটারের context-এ গভীর, শিহরণশীল, এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ মুহূর্ত রচনা করেছে। এখানে কবিতা একটি দুর্লভ dramatic speech-এর জন্ম দিয়েছে।

কবিতার শব্দচয়ন এবং তার প্রয়োগ যে effect তৈরি করে নাটকের সংলাপ সাজানোর মধ্যেও তা টের পাওয়া যায়। Carol Korty বলেছেন, "The words of the whole play create sounds, rhythms, tones like a piece of music. This is the magic of poetry, whether or not it rhymes or has a definite meter.

সংলাপে কৌতুকের ছোঁয়া

কৌতুকের মধ্য দিয়ে কীভাবে বিশ্বজয় করা যায় চ্যাপলিন আমাদের তা দেখিয়েছেন। হৃদয়ের গভীরতম অনুভবগুলো তাঁর অভিনয়ে কৌতুকের ছোঁয়া লেগে অনন্য স্বাদ এনে দেয়। চ্যাপলিনকে স্মরণে রেখেই বুঝতে পারি কৌতুক নিছক তরল বিনোদন নয়—কৌতুক এমন একটি সুবাতাস যা সব রকম আবহাওয়াতেই প্রসন্নতা এনে দেয়।

সংলাপ রচনাতেও সুযোগ থাকলে humour-এর প্রয়োগ ভালো। সংলাপে কৌতুকের

উপযুক্ত ব্যবহার নাট্যকারের সৃজনশীল বোধেরই পরিচায়ক। অনেক সময় গভীর কথা গাম্ভীর্যের কণ্ঠস্বরে না বলে humorously বললে বেশি ফলপ্রদ হয়। এই thoughtful laughter নাটকের শ্রীবৃদ্ধি করে। যে কমেডি হাসাতে হাসাতে ভাবায়, কাঁদায়, খুশিতে দোলায়, তার কথা মানুষ সযত্নে মনে রাখে। কৌতুক মানুষের প্রিয় আহার, সংলাপ যদি তা স্বাদ ও রুচি বজায় রেখে পরিবেশন করে তাতে নাটকের আবেদন আরও গাঢ় হবে, সন্দেহ নেই।

সংলাপের humour অনেকক্ষেত্রে নাটকের কোনো অবস্থা থেকে সরতে চাইলে তার সুযোগ করে দেয়। কৌতুক কেবল relief-ই দেয় না—সংলাপের একটা প্যাটার্নকে ভেঙে আর একটা প্যাটার্নের প্রেক্ষিত রচনা করে।

Dark বা Black humour সংলাপে বুদ্ধিদীপ্ত wit এবং তির্যক শ্লেষের মধ্য দিয়ে কৌতুকে ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। যেমন—

(ক) ইঁদুর দৌড়ে জেতার পরও কিন্তু আপনি সেই ইঁদুরই থাকবেন।

(খ) তিনজনে মিলে যদি কোন কথা গোপন রাখার শপথ নেন, তাহলে সেই শপথ রক্ষা করতে তাদের দুজনকে মারা যেতে হবে।

মনোলগ, সলিলকি এবং অ্যাসাইড-এর সংলাপ

নাটকের সংলাপ, কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কথার আদান-প্রদান। তবে প্রত্যেক সংলাপের গতিমুখ দুটো—একটি কাহিনীর পারস্পরিক চরিত্রগুলির সঙ্গে, অন্য গতিমুখ দর্শকের অভিমুখে। সংলাপ একই সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের এবং নাটকের সঙ্গে দর্শকের communication তৈরি করে। যে সংলাপে দর্শক আকৃষ্ট হবে না, তা কখনই আদর্শ হতে পারে না। রসজ্ঞ দর্শকের তারিফেই সংলাপ ধন্য হয়।

তবে monologue বা একক অভিনয়ে সংলাপের communication একমুখী—কেবল দর্শকের সঙ্গে। অন্য চরিত্র থাকলে যে verbal conflict থাকে একক অভিনয়ে তার সুযোগ নেই। অনেক সময় monologue-এ অন্য চরিত্রের উপস্থিতি থাকতে পারে কিন্তু তার এই উপস্থিতি নিষ্ক্রিয় এবং নির্বাক বলেই চরিত্রের একক সংলাপই একমাত্র হয়ে পড়ে।

বাস্তব জীবনে আমরা একক নাট্যের মতো দীর্ঘকাল ধরে সরব সংলাপ একা একা বলি না। তাই মঞ্চের monologue artificial constructs. তবে মনে মনে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে নিরিবিলিতে যখন কথা বলি তা একপ্রকার Monologue-এরই সমগোত্রীয়। সব মানুষের মগজেই monologue খেলা করে। তাই মঞ্চের একক অভিনয় artificial constructs হলেও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তার একটা বাস্তবিক শিকড় আছে।

একক সংলাপ যেমন নাট্যমূর্তি নিয়ে মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে পারে তেমনি উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসেবেও লিখিত হয়ে পাঠকের সামগ্রী হতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা 1st person point of view থেকে কোনো বিশেষ চরিত্রের interior dialogue. যেমন আলবেয়ার কামুর "The Fall" বা মার্ক টোয়েনের "The Adventure of Hucklebry" কবিতা এবং অপেরা নাটকেও একক অভিনয়ের অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। কবি রবার্ট ব্রাউনিং এবং লর্ড টেনিসনের কাব্য

সংগ্রহে অনেক সুবিখ্যাত 'ড্রামাটিক মনোলগ' রয়েছে। বিশ শতকে টি.এস.এলিয়ট রচিত "The Love song of J. Alfred Prufrock" এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এসব ক্ষেত্রে রচনার বক্তা স্বয়ং কবি নন, নাট্যাংশের চরিত্র। Operatic monalogue-এর দৃষ্টান্ত wagner-এর "Ring Cycle", স্যামুয়েল বেকেটের "Krapp's Last Tape" মঞ্চের অসাধারণ একটি monologue.

এই একক সংলাপের মধ্যে বক্তা-চরিত্রের অন্তর্জগত, জীবন দৃষ্টি এবং তার emotional development-এর অন্তরঙ্গ রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

একক নাটকে বক্তা গোটা নাটক জুড়ে একাই বলে যায়। Soliloquy বা স্বগতোক্তিতে সংলাপ আসে একাধিক চরিত্রের নাটকের মধ্যে যখন মঞ্চে সে একা থাকে। স্বগতোক্তির মধ্যে চরিত্রের মনের কথা ব্যক্ত হয়। তার মনের অবস্থা, তার উদ্দেশ্য, তার ভাবনা, তার অনুভব, পরিকল্পনা—এসব কিছুর প্রকাশ ঘটে স্বগতোক্তির মাধ্যমে। চরিত্র এখানে more details নিয়ে ব্যক্ত হয়। এই পদ্ধতি একধরনের indirect charactensation-এর technique.

শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের সেই বিখ্যাত উক্তি—"To be or not to be, that is the question"—Soliloquy-র সার্থক দৃষ্টান্ত। হ্যামলেট এই উক্তিটি করে স্বগতোক্তিসম্মতভাবে অর্থাৎ মঞ্চে যখন সে একা এবং এর মধ্য দিয়ে তার বুদ্ধিদীপ্ত thoughtful জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় পাই। এই স্বগতোক্তি তখনই শেষ হয় যখন তার কাছে ওফেলিয়া আসে। কারণ স্বগতোক্তি হবে তখনই যখন যে একা। কিড্-এর Spanish Tragedy-তে বহুল ভাবে স্বগতোক্তি এসেছে। সব দেশের প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় নাটকে এধরনের উক্তির বিশেষ প্রচলন। হালের নাটকে সাধারণভাবে এধরনের উক্তি লোপ না পেলেও, সবিশেষ কমে গেছে।

আর এক ধরনের সংলাপ প্রাচীন এবং মধ্যযুগে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, একালে অল্পস্বল্প ব্যবহার হয়—জনান্তিকে বা Aside. মঞ্চে অন্যচরিত্র থাকলেও তারা শুনতে পাবে না, কেবল দর্শক শুনবে এটা ধরে নিয়ে Aside-এর সংলাপ কোনো চরিত্র বিশেষ মুহূর্তে বলতেন। এটা বক্তার মনের কথা, ভাবনা, খল উদ্দেশ্য, শঠতা ইত্যাদি প্রকাশ করার একটা পুরনো প্রথা। Othello নাটকে lago এধরনের aside মাঝে মধ্যেই প্রকাশ করেছে।

উপসংহারে বলতে চাই নাট্যকারের প্রতিভা এবং সচেতন planning ছাড়া সার্থক সংলাপ রচনা করা যায় না। নাট্যসৃষ্টির কলাসম্মত নানা প্রক্রিয়া সম্পর্কে সবিশেষ সজাগ থেকেই সংলাপ লিখতে হবে। তবেই clean, simple, exciting এবং dramatically interesting সংলাপ লেখা সম্ভব হবে। নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য হবে দর্শককে মেনে নিতে বাধ্য করা যে অভিনেতারা অভিনেতা নয়, মঞ্চ মঞ্চ নয়, চরিত্রগুলো যে-কথা বলছে তা নাট্যকারের লিখে দেওয়া নয়—তাদের মনের কথা, তারাই বলছে। Coleridge যে "willing suspension of disbelief"-এর কথা বলেছেন, দর্শককে সেই illusion-এ নিবদ্ধ করতে হবে।

২০০২ সালের দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মারক বক্তৃতা হিসেবে প্রদত্ত ভাষণ (১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)।

শতবর্ষের আলোকে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অমল গুহ

চারের দশকের যে সকল নাট্যকার পেশাদারী নাট্যমঞ্চের ইতিহাস-পুরাণ আশ্রিত আধ্যাত্মিক ও শরৎ-বঙ্কিম উপন্যাস অবলম্বিত সামন্ত মূল্যবোধকে অতিক্রম করে বিনোদনমুখিনতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাটককে সমাজ রূপান্তরের আয়ুধ হিসেবে গণ্য করেছিলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯০৮ সালের ৫ জুলাই ঢাকা বিক্রমপুরের আদাবাড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। গাণিতিক হিসাবে এ বৎসর ৫ জুলাই তাঁর নিরানব্বই পূর্ণ করে শতবর্ষে পদার্পণ। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একজন পুরোনো কর্মী হিসাবে শতবর্ষের আলোকে তাঁর মূল্যায়ন আবশ্যক, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর রচনা, সংগ্রাম ও প্রযোজনা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে।

সাহিত্য রচনায় সমকালীন সমাজ, জীবন, চিত্রপট, সংগ্রাম, বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান ও প্রাক্-স্বাধীন দেশের রূপান্তরকামী পটভূমি বিশ্লেষণ আবশ্যক।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর ফ্যাসিবাদীশক্তির পোল্যাণ্ড আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধারম্ভের পটভূমি। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসভূমিতে তখন একজন মসীজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের দুর্বার বাসনা। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করার পর কর্মজীবনে প্রবেশের সূচনাপর্বে তিনি সাংবাদিকতাকে বেছে নেবেন এই বাসনাই মনে ছিল বিভিন্ন দৈনিক ও পাক্ষিক-মাসিক পত্রপত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লেখা শুরু করে দিয়েছেন। যদিও কৈশোরে ও যৌবনে ছাত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি ধীরেশ চক্রবর্তী, নৃপেন চক্রবর্তী, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মাখন সেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, মন্মথ সান্যাল, কবি অরুণ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করেন। ইতিমধ্যে মাতুলালয়ে নাট্য পরিবেশ থেকে আগত দিগিন্দ্রচন্দ্রের মনে নিত্যনূতন নাটকের পালা রচনা। কখনও শরৎচন্দ্রের কখনও বা বঙ্কিমের। রামায়ণ-মহাভারতের অমূল্য রত্নভাণ্ডার খুঁজে খুঁজে নাট্য মুহূর্তের বিভিন্ন উপাদান হাতড়ে বেড়িয়েছেন ছোটবেলা থেকেই। রবীন্দ্র কল্পলোকের সাঙ্কেতিক ও রূপক নাটক ও মঞ্চ ধারার বিশেষত্ব তরুণ দিগিন্দ্রচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। কিশোর বয়সের কাঁচা হাতে মেজদিদি, রাতকানা, রামের সুমতি, পরিণীতা, বঙ্কিমের কমলাকান্ত এবং যৌবনে রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ, হালদারগোষ্ঠী, মুকুট প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেন। যৌবনের উচ্ছ্বাসপ্রবণ কল্পনার আবেগে তিনি রচনা করলেন 'জাহ্নবী' ও 'আহুতি' নাটক। পাণ্ডুলিপি পেলে পড়ে দেখা যেত কেমন ছিলেন সেই তরুণ নাট্যকার? দেখা যেত সেই আঁতুড়ঘরের দুধ-ওঠা বমনের মধ্যে নিহিত ছিল ভবিষ্যতের কী ভীষণ শক্তিধর ও কালজয়ী নাট্যকারের ঘুমন্ত অঙ্কুর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণোন্মাদনা, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের আস্ফালন, গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে স্বদেশপ্রেম ও বিদেশী বর্জন, ৯ আগস্ট বিয়াল্লিশের ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, ১৯৪৩ সালের মনুষ্যসৃষ্ট মহা দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারী, মুনাফাবাজী, "একটু ফ্যান দাও মা" অসহায় মানুষের গগনবিদারী আর্তনাদ, সন্তান বিক্রয়, স্ত্রী বিক্রয়, নারীত্বের অবমাননা, নির্মম গোরা পুলিশের অত্যাচার, ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষকসভা গঠন, হরিপুরা ও ত্রিপুরী কংগ্রেসে

সুভাষচন্দ্রের উত্থান এবং আপোষকামী নেতৃত্বের বিরোধিতায় কংগ্রেস ত্যাগ ও ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন, দেশত্যাগ ও আই.এন.এ. গঠন, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নৌবিদ্রোহ, রশিদ আলি সহ বন্দীমুক্তি আন্দোলন, পুলিশী বর্বরতা ও দমনপীড়নের শিকার শত শত দেশপ্রেমিক যুবক-যুবতীর আত্মত্যাগ ও মৃত্যুবরণ, তেভাগা আন্দোলন, বুর্জোয়া নেতৃত্বের আপোষকামী সমঝোতার ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধীনোত্তর বাস্তুহারা সমস্যা। এই প্রেক্ষাপটেই দিগিন্দ্রচন্দ্রের মানসভূমিতে নাটকের আনাগোনা। দ্যাখতা-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত তাঁর নাটকের কাহিনী, চরিত্রায়ন, সঙ্কট, দ্বন্দ্ব, মানবিক সম্পর্ক ও উপসংহার। মূলত সর্বহারার মানবতাবাদকে ভিত্তি করেই তাঁর নাট্য পরিণতির দিক্‌নির্দেশ। ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং সর্বোপরি শেক্সপীয়র, ইবসেন, বানার্ড শ, মলিয়ের, আন্তন চেকভের রচনারীতি ও উদ্ভাবনী বিশালতাই তাঁর ভবিষ্যৎ নাট্য কৃতিত্বের প্রেরণা।

ছাত্রজীবনে ও যৌবনে মুক্তি আন্দোলনের দিগন্ত-বিস্তারী দেশপ্রেমী অনুভাবনায় ও উত্তাপে কিছুদিন এবং বেশ কয়েকবার কারান্তরালে যেতে হয় দিগিন্দ্রচন্দ্রকে। সেই সময়ে নৃপেন চক্রবর্তী, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও তখনকার দিনে পোড়খাওয়া কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীর প্রেরণায় তিনি মার্কসবাদী সাহিত্য পড়তে শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের ষড়যন্ত্র, প্রায় ৫০ লক্ষ সোভিয়েত দেশপ্রেমিক সন্তানের জীবনদান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম লগ্নে ফ্যাসিবাদের সমাধি রচনায় সোভিয়েত স্থপতির ভূমিকায় স্তালিনের আত্মপ্রকাশ, হিটলার কর্তৃক রুশ-জার্মান চুক্তি লঙ্ঘন ও অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির অনিবার্য যুদ্ধ ও নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতান্ত্রিক ঠাণ্ডাযুদ্ধ বা বিশ্বের মূল দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। সোভিয়েত আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে ভারতীয় পটভূমিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে চরিত্রগতভাবে জনযুদ্ধের অনুভাবনা ও আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টির আত্মপ্রকাশ। ইতিপূর্বে কৃষকসভা, এ.আই.টি.ইউ.সি. ও সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন এ.আই.এস.এফ. গঠনের মতো যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৪৩ সালের ২৫মে মুম্বাইতে (তখন বোম্বাই) ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জন্ম এবং ওই বৎসরেই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূকম্পিত আত্মপ্রকাশ। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে, মহিলা নির্যাতনের বিরুদ্ধে, অবমাননা ও অপমানের উর্ধ্বে সমানাধিকারের দুর্জয় সঙ্কল্প।

ইতিমধ্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘ এবং পরবর্তীকালে মুন্সী প্রেমচন্দ্রের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ঐতিহাসিক কারণেই, আদর্শবোধের তাড়নায়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পূর্বে চলে সলতে পাকানোর অধ্যায়। স্বভাবতই স্ফুলিঙ্গবৃত্তির তাগিদে তখন দিগিন্দ্রচন্দ্র বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যুদ্ধ ও সমরবাদের উপর নানা প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। এইসব প্রবন্ধ তখনকার সুধীমহলে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করে। একের পর এক প্রবন্ধ সংকলন তখন প্রকাশিত হতে থাকে। বর্তমান জাপান, জনযুদ্ধে মুক্তিসেনা, যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র, রণ ও রাষ্ট্র প্রভৃতি যুদ্ধ ও সমরাস্ত্র বিষয়ক তথ্য, বিজ্ঞান ও আধুনিক যুদ্ধের বীভৎসতা তখন বহু বিশিষ্টজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-একটি বই পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়। এই পর্যায়ে (১৯৩৬-৪১)

দিগিন্দ্রচন্দ্র সমর বিশেষজ্ঞ বা রণবিশারদ হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করেন। দিগিন্দ্রচন্দ্রের এই সূচনাপর্বে দিক্‌নির্ণয়ের পালা। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনে সাহিত্যের খনি গহ্বরে তিনি কোন রত্ন আহরণ করবেন? যুদ্ধ বিষয়ক রোমাঞ্চ সাহিত্য না কি সমাজদর্পণে প্রতিবিম্বিত অসংখ্য সংগ্রামী মুখচ্ছবির জীবনবেদ বা নাট্যকাব্য বা দৃশ্যকাব্য?

এই ধাঁধা অতিক্রম করতে দিগিন্দ্রচন্দ্রকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। কেননা এই কালপর্বের সূতিকাগারে তিনি রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা তাঁর প্রথম 'দীপশিখা' নাটক মঞ্চস্থ হবার এক বাস্তব রূপায়ণ স্বচক্ষে দেখেছেন। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট অ্যামেচারিস্ট শ্রীসত্য রায়। এরপর দিগিন্দ্রচন্দ্রের কাছে সাংস্কৃতিক দিগন্তে বহু নামী-দামী সংগঠনের হাতছানি। নাট্যচক্র ও অশনিচক্র নামে দুটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক ছিলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র। নিজের লেখা বাস্তুভিটা, মোকাবিলা, মশাল, তরঙ্গ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন ও মুক্তির উপায় প্রভৃতি নাটকগুলির পরিচালনা, মঞ্চায়ন ও নাটকের আধুনিক প্রয়োগ কৌশল নাটকপ্রিয় দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলা বাহুল্য দিগিন্দ্রচন্দ্র তখন নাট্যকার, অভিনেতা ও দক্ষ পরিচালক হিসাবে পাদপ্রদীপের সামনে দণ্ডায়মান নায়ক। স্বভাবতই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণে আর কোনও বাধাই রইল না। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালী সরকার, সাধন সরকার, অশ্রু রায়, সত্য রায়, প্রীতি রায়, অনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়. মমতাজ আহমদ প্রমুখ স্বনামধন্য কুশীলব তাঁর নাটকে শীর্ষবিন্দুতে অবস্থিত। তখনও দিগিন্দ্রচন্দ্র গণনাট্য সংঘে যুক্ত হননি। কিন্তু গণনাট্য অনুসারী যে দলগুলি (নাট্যচক্র, অশনিচক্র এবং পরবর্তীকালে নাটমহল, নাট্যকার সংঘ) তিনি পরিচালনা করতেন সেখানে গণনাট্য আদর্শ ও সর্বহারাব মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা এক সঞ্জীবনীর কাজ করত। 'নবান্ন' নাটকের যুগান্তকারী প্রযোজনা নাট্য অঙ্গনে এক পথপ্রদর্শনকারী দিক্‌চিহ্ন। বাণিজ্যিক থিয়েটারের ভিত গিয়েছিল ধ্বসে। শহীদের ডাক, জবানবন্দী, কল অফ ড্রাম (নৃত্য ব্যালে) নাট্যজগতে এক গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করল। বিশেষ করে গণসংগীত ও লোকনৃত্যের প্রবর্তনায়, প্রযোজনায় ও পরিকল্পনায় এক দিগন্ত-বিস্তারী অভিঘাতের সূচীমুখ লক্ষ করা গিয়েছিল।

ঠিক এমনি এক কালপর্বে গণনাট্য সংঘের রাজ্য সম্পাদক চারুপ্রকাশ ঘোষ, নবান্ন-স্রষ্টা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য ও সুধী প্রধান দিগিন্দ্রচন্দ্রকে অনুরোধ করেন গণনাট্য সংঘে যোগদানের জন্য। উন্মুখ দিগিন্দ্রচন্দ্র তখন ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে যোগদান করেন ও নাট্যশাখার সম্পাদক পদে বৃত হন। ১৯৪৭ সালে সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলনে (দ্বিতীয়) তিনি প্রতিনিধি হয়ে যান এবং রাজ্য শাখার সহ সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। নাট্য বিভাগের দায়িত্বে থাকায় তিনি অনেক পরিবর্তন আনার প্রস্তাব দেন। বিশেষ করে মহলা, পরিচালনা, নাটক নির্বাচন ও শৃঙ্খলা বিষয়ে তাঁর নতুন সংকেত ও উপদেশ পেয়ে বহু শিল্পী উজ্জীবিত হন। তিনি দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের সমকালীন সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নাটকটি গণনাট্য রাজ্যকমিটিতে নতুন প্রযোজনার প্রস্তাব দেন। বলা বাহুল্য গণনাট্য সংঘের নাটক তখন দর্শকমনে এক প্রেরণা। সমকালীন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সংগ্রাম ও বঞ্চনাকে ইতিমধ্যে নবান্ন, জবানবন্দী, ঢেউ প্রভৃতি নাটকের মধ্যে রূপায়িত হতে দেখে আঙ্গিক, প্রযোজনা ও অভিনয় কুশলতা সম্পর্কে,

দর্শক নাটক সম্পর্কে এক নবআস্বাদনের তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে নীলদর্পণ মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে পরিচালক ও সংগঠকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। ১৯৫৮ সালে রাজ্য গণনাট্য দ্বিতীয় সম্মেলন থেকে দিগিন্দ্রচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সংগঠন ও নাট্য প্রযোজনার সমস্যাগুলিতে মনোনিবেশ করেন। শাখাগুলির প্রযোজনার ক্ষেত্রে পেশাদারী কুশলতা ছাড়াও আদর্শগত বনিয়াদ রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। শাখাগুলির মধ্যে প্রযোজনাগত মানোন্নয়ন করার জন্য আন্তর শাখা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হত। মনে আছে দমদম ঘুঘুডাঙ্গায় এই রকম একটি প্রতিযোগিতায় দেশবন্ধুনগর শাখার প্রযোজনা "কিম্বদন্তী" প্রথম হয়েছিল এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত নাটক On the high road অবলম্বনে "পান্থশালা" দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের অমোঘ নিয়মেই গণসংগঠনের আন্দোলনে মত ও পথ নিয়ে বিরোধ বাধে, জড়িয়ে পড়ে সকলেই। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে চীন বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করে দিগিন্দ্রচন্দ্র ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্যের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী এক আবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ গণনাট্য কর্মী এই অপচেষ্টার বিরোধিতা করেন। ফলে দিগিন্দ্রচন্দ্র প্রমুখ বহু শিল্পীকেই আদর্শগত-রাজনৈতিক বিরোধের কারণে ধরে রাখা যায়নি। ফলশ্রুতিতে ১৯৬৭ সালে তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনে রাজনৈতিক শিল্পাদর্শ ও ভাবাদর্শের এক গণ বিপ্লবী সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। বিরোধীরা সরে যান। এক অভূতপূর্ব সাড়া ও গণজাগরণ পরিলক্ষিত হয়।

১৯৪২ সালে দিগিন্দ্রচন্দ্র লেখেন "অন্তরাল" নাটক। কানীন সন্তানের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে দ্বন্দ্বমুখর এক মহাভারতীয় সাবেকী প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন তিনি বর্তমান কালের গর্ভে। বহু নন্দিত ও বিতর্কিত এই নাটকটি নাট্যাচার্য শিশির কুমারের হাতে আসে এবং তিনি শ্রীরঙ্গম মঞ্চের ব্যবসায়িক থিয়েটারে এটি মঞ্চস্থ করার আশ্বাস দেন। দিগিন্দ্রচন্দ্র স্বাভাবিক কারণেই আশায় বুক বাঁধেন এবং চিরন্তন রীতি অনুযায়ী আপোষ করেন নি বলে সেখান থেকে নিরাশ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় বাগুইআটিতে ১৯৫৩ সালে "চলতি বাসর" সংগঠনের সুবাদে। দিগিন্দ্রচন্দ্র ইতিপূর্বে তখন স্বমহিমায় উজ্জ্বল। মণিমাণিক্যের সন্ধান করে নিতে জহুরীর বেশি সময় লাগে না। রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠনের আলাপ জমতে বেশি সময় লাগে নি। সে বৎসর প্রথম মহিলা চরিত্রে মহিলা শিল্পীর আত্মপ্রকাশ এবং সামন্ত সংস্কারে আচ্ছন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের আদেশে আমার বিদ্যালয়ের চাকুরি খতম। যা হোক সে অন্য কথা। ১৯৫৩ সালে আমার পরিচালনায় মনোরঞ্জন বিশ্বাসের "সাড়া" এবং দিগিনদার পরিচালনায় তাঁরই নাটক "পূর্ণগ্রাস" অভিনয় স্থানীয় অঞ্চলে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। ১৯৫৪ সালে এপ্রিল মাসে 'চলতি বাসর' থেকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ দেশবন্ধু নগর শাখার আবির্ভাব। এরপর আর পেছন দিকে তাকাতে হয় নি আমাদের। শুধুই সমুখপানে পথ চলা। দিগিনদার তরঙ্গ, মোকাবিলা, বাস্তুভিটা, মশাল, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন ও মুক্তধারা, মনোরঞ্জন বিশ্বাসের মহেশ (নাট্যরূপ), কর্মখালি, বাঁধ ভেঙে দাও, আমার মাটি, জননী প্রমুখ নাটকের বন্যায় প্লাবিত নাট্যরঙ্গ ভূমিতে তখন জীবনের প্লাবন। দিগিনদার নাট্যশিক্ষা, নাট্যবাস্তবতা, চরিত্রায়ন পদ্ধতি, ইতিহাস ও

রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, কোরিওগ্রাফি ও আঙ্গিক এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে এক আধুনিক, বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ করে মঞ্চসজ্জা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দর্শকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সহজতর উদ্ভাবন মানুষকে টেনে এনেছিল মঞ্চমুখীন আবেগে। লোক বিস্মিত হয়ে বলত এ কি নাটকের কোনও দূরাগত আবেগঘন মুহূর্ত? নাকি জীবনেরই এক স্বচ্ছন্দ সহজতর প্রকাশ? জীবন তো পরণকথা নয়, সে তো বাস্তব। যেন নাটক দেখতে বসে প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র অনুভূতি। কী সে বাস্তবতা? সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা।

নাটক বিমূর্ত শিল্প নয়, নয় কোনও জীবনের গূঢ় রহস্যের রূপকথা। রিয়ালিটির স্পর্শে তাকে সঞ্জীবিত করো। চরিত্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করো। যেন একজন অন্যজনের কতদিনের চেনা। হাত পা নাড়ার জন্য একটা যুক্তি খুঁজে বার করো। অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন শুধু অনাবশ্যকই নয়, বিরক্তিকর বোকামি। স্টেজে চলার জন্য যে শরীরী ভাষা সেটা রপ্ত করে নাও। মনে করো তুমি তোমার ঘরবাড়িতে স্বচ্ছন্দ হাঁটছ-বসছ-চলছ-ফিরছ ইত্যাদি। কৃত্রিমতার ঊর্ধ্বে উঠে মঞ্চকে করে তোল জীবনের দৈনন্দিন লীলাভূমি। নাট্য বিজ্ঞানের দুর্বার আকর্ষণে তখন আমাদের শিল্পী সংখ্যা ছিল ৬০-এর উপর। খোলামঞ্চ বা মুক্তমঞ্চ নিয়ে বহু বিশেষজ্ঞের বাগাড়ম্বর শুনে ক্লান্ত হয়েছি। কিন্তু দিগিনদাই বোধহয় প্রথম '৫৫ সালে এই মঞ্চ ব্যবস্থার প্রবর্তক। মুক্তধারা ও তরঙ্গ নাটকের এরকম বাস্তবমুখী সহজ পরিকল্পনার কথা আগে কেউ ভাবতেই পারে নি। দিগিনদার পরিচালনায় আমাদের 'বিসর্জন' নাটক দেখে স্বনামধন্য শচীন সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন— "এঁরা রবীন্দ্রনাথকে বুঝে অভিনয় করছেন বলেই মুগ্ধ হয়েছি।"

মাঠে-ময়দানে কলে-কারখানায়-বন্দরে দিগিনদা আমাদের শাখায় অভিনয় করেছেন কত। বাস্তুভিটায় মহেন্দ্র মাষ্টার, মুক্তধারায় বিশ্বজিৎ, কাঁঠালের আমসত্ত্বে মাড়োয়ারী, তরঙ্গ নাটকে শশীভূষণ, মোকাবিলা নাটকে বিশ্বনাথ—আরও কত চরিত্র দিগিনদার রিয়ালিটির যাদু-স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পরবর্তীকালে কিম্বদন্তী, রাহুমুক্ত, নতুন ইহুদী, নবজন্ম, জননী, আমার মাটি, রথের রশি, মিছিলে, কাছেই সমুদ্র, ছেঁড়া তার, চার্জশীট, বাস্তবশাস্ত্র, বিদ্রোহী তেলেঙ্গানা, অনিবার্য মৃত্যু প্রভৃতি নাটকের ভার আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। দিগিনদার অমূল্য সম্পদ তাঁর চল্লিশটির বেশি একাঙ্ক নাটক। যে নাটক করে খ্যাতি হয়েছে তা হল—অপচয়, দু'এর পিঠে একশূন্য, গোলটেবিল, পাণ্ডুলিপি, বোধন, রক্তরাঙ্গা সিঁথি, দাম্পত্য কলহে চৈব, পাকাদেখা, কাঁঠালের আমস্বত্ব, কেউ দায়ী নয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

'গোলটেবিল' শীর্ষক একটি নাটক লেখার অপরাধে দিগিন্দ্রচন্দ্রের ১৮ বছরের আনন্দবাজারের সাব এডিটরের চাকরি চলে যায়। দিগিনদা অসহায় হয়ে পড়েন। আমরা show করে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করি।

সেই সময় গণনাট্য সংঘর পক্ষ থেকে নিন্দা জানিয়ে বলা হয়—"জনপ্রিয় নাট্যকার ও গণনাট্য পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ-সভাপতি শ্রী দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনন্দবাজার পত্রিকার মালিকগোষ্ঠী কোন কারণ না দেখাইয়া চাকরি হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। খ্যাতনামা নাট্যকারকে অন্যায়ভাবে চাকরি হইতে ছাঁটাই করার বিরুদ্ধে গণনাট্য সংঘর সভ্যরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুনর্বহালের দাবিতে সমগ্র শিল্পীগোষ্ঠী ও জনসাধারণকে জমায়েত

করিবার জন্য গণনাট্য সংঘের প্রতিটি শাখার নিকট আবেদন জানাইতেছি। এই উদ্দেশ্যে সভা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ, সহি সংগ্রহ অভিযান প্রভৃতি করিতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।"

অর্থহীন বেকার জীবনে ছেলে মেয়ের মুখে দুটো অন্ন জোগান দেবার উদ্দেশ্যে তখন তাঁকে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমি ও সংগঠনের অন্য সবাই ছায়া-সঙ্গীর মত দিগিনদাব পাশে দাঁড়িয়েছি। অশনিচক্র, নাট মহল ও গোরাবাজার সংস্কৃতি সংঘের সঙ্গে দিগিনদার সাহায্য রজনীতে অংশ নিয়েছি। শ্রদ্ধেয় সুধী প্রধান, চারুপ্রকাশ ঘোষ, ব্রজসুন্দর দাস, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, মুজফফ্‌র আহমদ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব সাহায্যের হাত উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মলিনা গুরুদাস এন্টারপ্রাইজ 'পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ' নাট্যাভিনয়ের সংগৃহীত অর্থ সাহায্য তহবিলে দান করেছেন।

মতাদর্শগত কারণে মতান্তর ঘটলেও দিগিনদার সঙ্গে মনান্তর ঘটেনি। তিনি আমাদের অনেকেরই নাটকের গুরু। আটের দশকে আমাদের শাখার নাট্যোৎসবে দিগিনদা ছিলেন প্রধান অতিথি। আমাদের প্রযোজনা প্রফেসর ম্যামলক, অমৃত অতীত ও রক্তরাঙ্গা সিঁথি দেখে বলেছিলেন কেউ আজকাল আমার নাটক করছে না। তবু তুমি করলে। গুরুদক্ষিণা দেবে তো অমল? বলেছিলাম—আপনার নাটক নিজস্ব গুণেই বেঁচে থাকবে, তাকে কোরামিন দিতে হবে না।

ঘোর দুর্দিনে পাশে থাকার নামই আন্তরিকতা। থাকবার চেষ্টা করেছি। বিনা পারিশ্রমিকে রাতের পর রাত অভিনয় করেছি শুধু দিগিনদার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে। মোকাবিলা, তরঙ্গ নাটকের পেশাদারী show হয়েছিল শ্রীরঙ্গমে। আমি ছাড়া জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, মঞ্জু মুখার্জী, মাধুরী (বর্তমানে মাধবী) মুখার্জী, চারুপ্রকাশ ঘোষ, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ শিল্পীরা সহায়তা করেছিলেন। পূর্বতন আকাদেমি মঞ্চে 'অন্তবাল' নাটকের রণেশের চরিত্রে অভিনয় করে দিগিনদার সাহায্য রজনীতে বাহবা পেয়েছি। এমনকি নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীও দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের পাশে।

আটের দশকের শেষভাগে দিগিনদা হতাশার অবসাদে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে না। সাথীহারা, দলহারা, আস্থাহীনতা ও বয়সের চাপে কিছুটা ন্যুব্জ দিগিনদা শুধু চেয়ে থাকেন আধুনিক থিয়েটার ও গ্রুপথিয়েটারের বিদেশী প্রযোজনা দেখে। ভাবেন তবে কি সব শেষ?

এরই পশ্চাদপটে আর একটি সান্ত্বনা তাঁর স্বর্গের সিঁড়ি, জীবন স্রোত, নয়া শিবির, অমৃত সমান তখন নানা পুরস্কারে বিভূষিত। ১৯৭১ সুধাংশুবালা স্মৃতি পুরস্কার, ১৯৬৪ সোবিয়েত ল্যাণ্ড পুরস্কার, পঃ বঃ সরকার প্রদত্ত দীনবন্ধু পুরস্কার।

প্রশ্ন জাগে, জাগাই স্বাভাবিক। দিগিনদা কি ব্যাক-ডেটেড? বর্তমান প্রজন্ম কি তাঁর নাটক করবে না? দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিচ্ছিন্নতা, জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম, মূল্যহীনতা এবং শ্রেণীসংগ্রামের পটভূমিতে লেখা নাটকগুলি কি অবসোলিট? আগামী প্রজন্ম অবশ্যই তার বিচার করবে।

শতবর্ষের আলোকে দিগিনদার প্রতিকৃতি দেখি আর ভাবি। যুগধর্মিতা ছাড়াও সাহিত্যে নিত্যকালীনতা বলে একটা কথা থেকেই যায়।

একাধারে প্রাবন্ধিক, ঔপনাসিক, গীতিকার, পালাকার দিগিন্দ্রচন্দ্র কম করে ১৯টি পূর্ণাঙ্গ, ৪০টি একাঙ্ক, ২০টি শিশু নাটিকা, ৩টি উপন্যাস, সমর বিজ্ঞানের উপর ৪টি ও নাট্যতত্ত্বের উপর ৩টি বই লিখে সাহিত্য ভাণ্ডারে তাঁর অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিমধ্যে ৩ জন নাটক ও সাহিত্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র ও সমকাল জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন। এবার 'নাটক' বিশেষপত্রে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) তাঁর "বাস্তুভিটা" নাটকটি পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় আমরা সন্তোষ প্রকাশ করছি।

যুগের মূল্যায়ন শুধু যুগেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কখনও যুগ পেরিয়ে যুগান্তরে পৌঁছে পথ খুঁজে বেড়ায়। সন্ধান পায় অতীতের গহ্বরেই লুকিয়ে আছে আজকের সত্যের প্রতিমূর্তি নিদারুণ বর্তমান। খনি গহ্বরে খুঁড়তে খুঁড়তে একদিন পেয়ে যায় কাঁচকাটা হীরের সন্ধান।

১৯৯০ সালের ১২ এপ্রিলের এক বিষণ্ণ সকালে প্রয়াত হন বিরাশী বৎসর বয়স্ক যশস্বী নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র

দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাটক।। দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য জীবনে ১৯টি পূর্ণাঙ্গ নাটক, ৪০ খানা একাংক নাটক ও ২০টি শিশু নাটক লিখেছেন। এছাড়াও তান্তিয়া, জাহ্নবী, আহুতি, পরশমণি নামে আরও ৪টি তাঁর প্রথম যৌবনের নাট্য প্রয়াস হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। সাহিত্য রচনার সূচনা পর্বে সাংবাদিক জীবনের প্রভাব পড়েছিল তাঁর সাহিত্যজীবনে বলাই বাহুল্য। যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র, রণ ও রাষ্ট্র, বর্ত্তমান জাপান, মহাযুদ্ধে সোবিয়েত, মুক্তি সংগ্রামে জনসেনা প্রমুখ যুদ্ধ-বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। একজন রণ বিশারদ হিসাবেই তিনি তাঁর লেখনী চালনা করবেন একথা ভাবলে হয়তো ভুল হবে না। কিন্তু নাটক ছিল তাঁর রক্তের অণুপরমাণুতে, কৈশোর যৌবনের নাট্যক্রিয়ায়, দিম্মা, দাদু ও মামাদের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের সুখশ্রাব্য কাহিনীর রোমাঞ্চে। তাই ভবিষ্যৎ জীবনে নাটকের অঙ্কুরিত বীজবিস্তৃতি, পরিণতি ও কুশলতার মহীরূহে পরিণত হবে বলাই বাহুল্য। মাঝখানে একটি পর্বে ৪টি উপন্যাস ৩টি ছোট গল্প ও আত্মজীবনী "চড়াই উৎরাই" লেখাতেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সাহিত্য কীর্তির সুগভীর স্পর্শ অনুভব করা যায়। নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন—"নাট্য চিন্তা : শিল্প জিজ্ঞাসা" সংকলন ও "শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রবন্ধ" শিশিক্ষু ছাত্রসমাজের কাছে অমূল্য সম্পদ।

"নবান্ন" নাটকের পাশাপাশি গণনাট্য সংঘ যে নাটক মঞ্চস্থ করে খ্যাতি অর্জন করেছিল সেটি হল ১৯৪৭ সালের রচনা "বাস্তুভিটা"। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় গণনাট্যের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে নাটকটি উভয় বাংলায় অভিনীত হয়ে ভুক্তভোগী বঙ্গবাসীর হৃদয় বিপুল ভাবরসে জারিত করেছিল। যদিও পূর্ববঙ্গের লীগ সরকার মৌলবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অপিচ পশ্চিমবংগে "বাস্তুভিটা" নাটক আপামর জনসাধারণের চিত্ত বিগলিত করেছিল। শহরে উপকণ্ঠে, পল্লীতে ও সাধারণ রঙ্গালয়ে নাটকটি বহু রজনী অভিনীত হয়েছিল।

জাতীয় নেতৃত্বের আপোষকামিতাও দ্বিজাতি তত্ত্বের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গবিভাজনকে

মানুষ মেনে নিতে পারে নি। হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষ উভয়বঙ্গের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জিঘাংসার কারণে কীভাবে আশ্রয়, স্বজন ও প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা বুকে নিয়ে দেশত্যাগ করেছিল তা আমাদের সকলেরই জানা। দিগিন্দ্রচন্দ্র রাজনৈতিক কার্যকারণকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে আর্থ-সামাজিক-মানবিক পটভূমিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের জল, মাটি হাওয়ায় আত্মীয় পরিজনের মধুর সান্নিধ্যে লোকচার-ও পূজাপার্বণের নিবিড় বন্ধনে সম্পৃক্ত হয়ে যাঁরা কালযাপন করেছেন তাঁদের পক্ষে দেশ বিভাগজনিত এই আকস্মিক পট পরিবর্তন একদিকে বেদনার অন্যদিকে অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের কালগর্ভে নিমজ্জিত। নিজের একটুকরো জমি বা বাস্তুভিটার স্বত্বত্যাগ করে সহায় সম্বলহীন ভবিষ্যতের কাছে আত্মসমর্পণ এক চরম জাতীয় অভিশাপ ও লাঞ্ছনা বলাই বাহুল্য।

মৌলবাদী আক্রমণ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলে পড়ে শিশুপুত্রেরও বয়স্থা যুবতীর মর্য্যাদা রক্ষার দায়ে পৈতৃক প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে বহু পরিবারকে উভয়বঙ্গে। আশ্রয় হয়েছে রেলষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম বা কোন উদ্বাস্তু শিবির। লঙ্গরখানার লপ্‌সা বা অপাচ্য খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে অনেকে অকালে প্রাণব্যথা জুড়িয়েছেন। অন্যদিকে দেশ নেতারা তখন এই দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ভাষণ দিয়ে বেড়িয়েছেন ও কুম্ভীরাশ্রুবর্ষণ করেছেন। পুনর্বাসনের মত জাতীয় সমস্যার সমাধানের অসার সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায় সেরেছেন।

দেশ মাটি জল হাওয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সুবিশাল শস্যক্ষেত, সুমিষ্ট বিহঙ্গ কূজন, নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের জলযান নৌকাস্টীমার, লোকাচার পার্বণ-পড়শীসুলভ আত্মীয় নিবিড় বন্ধন সব ছেড়ে ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের কাছে কৃপার দাক্ষিণ্য চেয়ে আত্মসমর্পণ যে একটা সুবিধাবাদী ক্লীবত্ব তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানেই দিগিন্দ্রচন্দ্র সেই মানবিক আবেগ থেকেই সব বিচার করবার চেষ্টা করেছেন।

মৌলবাদী শক্তি উভয়বঙ্গেই বিরাজমান। প্রশ্ন হ'ল আত্মসমর্পণ, না ভালবাসা সৌহার্দ্দ্য ও মিলনের মানবিক আদর্শপ্রচারে ব্রতী হওয়া—কোন্‌টা সমীচীন? দিগিন্দ্রচন্দ্র এই দ্বিতীয় পথের দিশারী। একদিকে যেমন ইয়াসিন, কেরামত চরিত্রের মত হিংসাশ্রয়ী কুটিল মৌলাবাদী মানুষ অন্যদিকে তেমনি আমীন মুন্সী, সোনা মোল্লা, কফিলদ্দি, আব্বাসের মত মানবিক মূল্যবোধে স্পন্দিত মানুষজনও আছে। সাদা কালো, ভালোমন্দ, কুটিল উদার সব দেশের বিপরীত ধর্মী চরিত্র লক্ষণ। এটা থাকে আবার শুভশক্তির কাছে অশুভ শক্তি পরাস্তও হয়। এটাই রীতি, চলমান স্বাভাবিকতা। মানবিকতা না থাকলে সে মনুষ্য পদবাচ্যই নয়। তাই স্ত্রী মানদা যখন বলে—তোমার যাওয়া হবে না। তখন মহেন্দ্র মাষ্টার আবেগে বলে ওঠে—না, যাওয়া হবে না। আমীন মুন্সীর ছেলে মরে যাবে আর আমি এখানে বসে তোমাদের গোষ্ঠীর পিণ্ডি চটকাবো। যত্তোসব—

সামান্য একটা বাটি ভেঙে ফেললে গৃহকর্ত্রীর তীব্র ভর্ৎসনায় কন্যা কমলা যখন অবনত তখন মহেন্দ্রমাষ্টার এগিয়ে এসে সেই সস্নেহ দার্শনিক উক্তি করেন—"বাটি! গোটা দেশটাই ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়ে গেল।" মনে পড়ে আব্বাসের সেই সার্বজনীন মানবিক উক্তি—"দুনিয়ার সবে জুটা না বাবু, সাচ্চাও কিছু কিছু আছে।" মৌলবাদী ইয়াসিনের চক্রান্তে যখন গঞ্জ লুট হ'ল, হিন্দুদের

বাড়ীতে আগুন দেওয়া শুরু হল এবং অবিচল মহেন্দ্র মাষ্টার যখন দুঃখে বেদনায় অভিমানে বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে উদ্যত তখন সোনামোল্লার বন্দুকের আওয়াজে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে গেলে আমীন মুন্সী ছুটতে ছুটতে এসে বলে—মাষ্টারদা, মাষ্টারদা, তুমি নাকি চলে যাচ্ছো? রুদ্ধবাক্ মহেন্দ্র মাষ্টার তখন চোখের জল আটকে রাখতে পারেন না। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন—না, না, আমীনভাই, আমি কোথায় যাবো—কোথায় যাবো। এখানেই থাকবো আমি—মরি, বাঁচি আমি তোমাদের নিয়েই থাকবো। তাই বাস্তুভিটা দেশবিভাগজনিত নিছক সমস্যা কণ্টকিত নাটক না হয়ে দেশপ্রেম ও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল দলিল হয়ে ওঠে।

১৯৪২ সালে লিখিত "অন্তরাল" নাটকে দিগিন্দ্রচন্দ্র কানীন সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতির দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন যুগের দাবীকে স্বীকার করে নিয়ে। পুরনো সামন্ত যুগীয় তথাকথিত সতীত্বের সংস্কার এই আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির জগতে যে পশ্চাদগামিতা সেটা নাট্যকার দেখিয়েছেন যুক্তিগ্রাহ্য ঘটনা পরম্পরায়। পৌরাণিক মহাভারতের যুগে কুন্তীর কানীন পুত্র 'কর্ণ' বীরের মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বিত বঞ্চনার শিকার হয়ে বলে—'আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।' ভবতোষ-মাধবীর জীবনের অন্তরালে যেমন রণেশের আবির্ভাব অপত্য-স্নেহরস-সিক্ত জননীর হৃদয় আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার করে, ভবতোষ-মাধবীর সুখী আধুনিক জীবনে হঠাৎ এক দমকা হাওয়ার ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করে কিন্তু দ্বন্দ্বমুখর জটিল জীবন চর্যায় সত্যকে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সুবিনয়-ঝর্ণার অবিবাহিত জীবনের ফসলকে সুবিনয় স্বীকার করতে না চাইলেও ঝর্ণা তার কৃতকর্মকে কখনই সামন্তযুগীয় সামাজিক লজ্জার দোহাই দিয়ে পার পেতে চায় না। সে সত্যকে অস্বীকার করে না। সে তাঁর কানীন সন্তানের আগমনকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায় সামাজিক বাস্তবতার সত্যরূপে। অপরাধবোধ তাকে অবনত করে না বরং মাথা উঁচু করেই সে সন্তানের মা হতে চায়। রণেশের রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে দার্শনিক প্রত্যয় ঝর্ণাকে সাহস জোগায়। সে বলে—"ভুললে চলবে না যে আমরা কোন সমাজে বাস করছি। লোকের সংস্কার নীতিবোধের পরিবর্তন রাতারাতি করা যায় না।" ঝর্ণার আত্মপ্রত্যয়, সুবিনয়কে প্রত্যাখ্যান, রণেশের বৈজ্ঞানিক সমাজ-সত্য ও মাধবী-ভবতোষের ঔচিত্য-অনৌচিত্য, সত্যাসত্যর দ্বন্দ্ব নাটককে এক সুউচ্চ দ্রবণে মোহগ্রস্ত করে ফেলে। পাশ্চাত্য সমাজবোধ ও আধুনিক জীবন বিজ্ঞান দিগিন্দ্রচন্দ্রকে এ নাটকে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই।

"জীবন স্রোত" নাটকে আধ্যাত্মিক জীবন ও বস্তুবাদী জীবনবোধের বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও আত্মিক মহামিলনের কোন বিরোধ নেই। আশ্রমনিবাসী গীতার ব্রহ্মচর্য জীবন বস্তুবাদী জীবনাদর্শের সহজ সরল জিতেনের সংস্কারহীন মুক্ত চিন্তার দর্শনে আপ্লুত হয়ে সুগৃহিনী হবার অভিলাষে বেগবতী হয়ে ওঠে। আধ্যাত্মিক জীবনের গণ্ডীর মধ্যে থেকেও তেজসানন্দ ও অঘোরানন্দের জীবনবোধের বৈপরীত্য দিগিন্দ্রচন্দ্রের একটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার। নাটকটির সংলাপ রচনায় যুক্তিগ্রাহ্যতা ও দুই শিবিরের বিশ্বাস ও সংবদ্ধতা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে নিষ্ঠুর সত্যের কাছে অসহায় পারিবারিক দায়বদ্ধতার জন্য সুধা তিল তিল করে দেহকে উৎসর্গ করেছে কামনার অনলে। অথচ বিজন জোর করতে চায় নি। সুধার অসহায়ত্ব তার অবলম্বন হয়েছে। পঙ্কিল ভোগবাদী সমাজের এই অবক্ষয়ের জন্য দায়ী কে?

"কেউ দায়ী নয়" নাটকে এই সমাজ সত্যকে দিগিন্দ্রচন্দ্র নিপুণ ঘটনা বিন্যাসে বাক্ বৈদগ্ধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকায় লিখিত "তরঙ্গ", সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় মৌলবাদী হিংস্রতার ঊর্ধে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন "মশাল" নাটকে। দুর্ভিক্ষ কালোবাজার— ক্ষুধার বহ্নিময় জ্বালায় স্ত্রীলোকের ইজ্জৎ বিক্রি, "একটু ফ্যান দাও মা"-র গগন বিদারী আর্তনাদের মধ্যেও, জীবনের প্রজ্জ্বলিত 'দীপশিখা" এবং শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বের পটভূমিতে রচিত "মোকাবিলা" নাটক দিগিন্দ্রচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাট্য অবদান ও মঞ্চসফল নাটক।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের সর্বশেষ নাটক "স্বর্গের সিঁড়ি" ১৯৮২ সালে রচিত। অর্থ লালসা ও ভোগবাদী জীবনের সর্বগ্রাসী শূন্যতার মাঝখানে মানুষের সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ ও সৌন্দর্যবোধ এ নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। একদিকে বীরেশ্বর ও সুদেষ্ণার সৌন্দর্যপ্রীতি, কণ্টকময় পর্বতশীর্ষে যেমন স্বর্গীয় পারিজাতের আভাস, বালুকা সমুদ্রে যেমন মরুদ্যানের অবস্থান তেমনি এই সংসার সমুদ্রে সীমাহীন ভোগলালসার আবর্তে অন্তর্লীন মনুষ্যত্বের হাতছানি। মৃণালিনী চরিত্রের সর্বগ্রাসী অর্থক্ষুধা এই পুঁজিবাদী সমাজেরই বাস্তব চিত্ররূপ বা চরিত্ররূপ আবার অন্যদিকে সুব্রতর মহৎ যুক্তিনিষ্ঠ প্রেমময় জীবনাদর্শ এবং উত্তাল নগ্ন আধুনিকতার কাছে সর্বস্বান্ত বীরেশ্বরের আত্মসমর্পণ নাটকটিকে বাস্তববাদী ভাবাদর্শে বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু জীবনের হাহাকারে পরিণত করেছে।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের সুদীর্ঘ নাট্যজীবনে রাজনৈতিক জীবনের মতাদর্শই তাঁর লেখনীর চালিকাশক্তি। প্রত্যেক নাট্যকারের একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। দিগিন্দ্রচন্দ্রেরও আছে। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে পারে।

(১) দিগিন্দ্রচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় বিশ্বাসী নাট্যকার।

(২) বস্তুবাদী দর্শনে প্রত্যয় থাকার দরুণ বহির্বিশ্বের জাগতিক ঘটনা প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায় সিক্ত করে জীবন রসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিটি চরিত্র।

(৩) সর্বহারার শ্রেণী আদর্শ মন্ত্র হবার সুবাদে ব্রাত্য মানুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এসেছে স্বাভাবিক কারণেই। কিন্তু সমাজ বাস্তবতায় যুক্তির বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বীয় প্রতিপাদ্য। যুক্তিহীনতার ধারাভাষ্যে কখনও কলমকে চালিত করেন নি। মানবিক আবেগ এসেছে যুক্তিগ্রাহ্য প্রবহমানতায়।

(৪) কাহিনী বা প্লট মেকিং-এর ক্ষেত্রে কষ্ট কল্পলোকের কোন বিমূর্ত জীবনের ভাবাবেগে আপ্লুত না হয়ে সমস্যা জর্জরিত সামাজিক ঘটনাবলীই হয়ে উঠেছে কাহিনীর মূল কেন্দ্র যেখানে জীবন দ্বান্দ্বিক বিকাশের মূলসূত্র ধরে এগিয়ে গেছে কাঙ্খিত পরিণতির সন্ধানে Reality-র হাত ধরে। একদিকে দারিদ্র, দুঃখ, বেদনা, আশাহত মানুষের আর্তনাদ অপর দিকে লোভ, হিংসা, লালসা, ক্রোধ, ঘৃণার অভিশাপে প্রোটাগনিস্ট ও এ্যান্টাগনিস্ট চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করেছেন সুচতুর নান্দনিক ব্যঞ্জনায়।

(৫) সংলাপ রচনায় দিগিন্দ্রচন্দ্রের মুন্সিয়ানা সমকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুখে বারবার নন্দিত হয়েছে। জীবনকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির অনুভূতি দিয়ে না দেখলে ঐ

রকম স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ, যুক্তিগ্রাহ্য, আবেগধর্মী সংলাপ লেখা সম্ভব নয়। বাদী ও প্রতিবাদী উভয় সংলাপেই জীবন হয়ে উঠেছে মহত্তর, সুন্দর ও বিশ্বাসযোগ্য।

(৬) চরিত্র সৃজনে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে দিগিন্দ্রচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। জিতেন্দ্র-গীতা দুই বিপরীত মেরুর ভাবাদর্শের নায়ক-নায়িকাকে সূত্রায়িত করেছেন সৃজনশীল মনস্বিতায়। "তেজসানন্দ" সেই সেতুবন্ধনে ভারসাম্য রক্ষার কাজ করেছেন। এরকম বহু চরিত্র উল্লেখ করে দেখানো যায় আপাত বিরোধী দুই চরিত্র বীরেশ্বর ও মৃণালিনী (স্বর্গের সিঁড়ি) কেমন করে বিপরীতমুখী ধারায় জীবন-রহস্যের আবর্তনে তরী বেয়ে অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছেন। তরঙ্গ নাটকে গগন চৌকিদার, বাস্তুভিটায় মহেন্দ্র মাষ্টার, মশাল নাটকে ললিতা, অন্তরাল নাটকে ঝর্ণা, মোকাবিলা নাটকে বিশ্বনাথ ও মনোজিৎ শুধু চরিত্র হিসাবেই উজ্জ্বল নয়, মানবতার গভীর স্নেহরসে সম্পৃক্ত। বলা হয় অন্তরাল নাটকে 'সুবিনয়' চরিত্রের প্রতি তিনি অবিচার করেছেন। কিন্তু জীবন-পরিক্রমায় সব চরিত্র কি সফল? ব্যর্থতাও তো জীবনের অঙ্গ।

(৭) ছোটবেলাতেই পিতৃহীন দিগিন্দ্রচন্দ্র মামাবাড়ীতে মানুষ হবার সুবাদে নাটক দেখেছেন, শিখেছেন, বুঝেছেন ও করেছেন। চৌকিতে শাড়ী টানিয়ে, মশারী টানিযে, রাংতার মুকুট পড়ে বহু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাট্য চরিত্রের কুশলী অভিনেতা দাদু-মামা-দিদ্মার কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারতের বিচিত্র কাহিনী তাঁর শিশু ও কিশোর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তারই স্বাভাবিক পরিণতি তাঁর পরিণত বয়সের সৃজিত নাটকাবলী। বলা বাহুল্য সাংবাদিকতা ছিল তাঁর রুজি রোজগারের অবলম্বন আর নাটক ছিল তাঁর জীবনের মূলধন, নান্দনিক কম্পন।

(৮) দৃশ্যপট রচনা, সংগীত, সরঞ্জাম, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির ক্ষেত্রে দিগিন্দ্রচন্দ্র কখনও সহজ সরল আবার কখনও প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্রতী হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী।

(৯) দার্শনিক ক্ষেত্রে তিনি পরিবর্তনশীল জগতে স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও নির্ভীক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

(১০) শরৎচন্দ্রের সামন্ত মূল্যবোধ, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক অভিপ্রকাশ ও জাতীয়তাবোধ ও রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা দিগিন্দ্রচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই তিনি বার বার হাঁটু গেড়ে বসেছেন রবীন্দ্রনাথ, গোর্কি, টলস্টয় ও রঁল্যার বিশ্বমানবতার কাছে।

(১১) সমকালীন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী ও অগ্রজ শচীন সেনগুপ্ত ও মন্মথ রায়ের কাছে দিগিন্দ্রচন্দ্র ছিলেন একজন স্বাধীন সত্তার নির্ভীক সৈনিক। বিচিত্রজীবন বোধে একদিকে যেমন তিনি তাঁর লেখনীকে চালিত করেছেন জটিল সুক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের আবরণ ভেদ করে আবার সহজাত ভাবালুতাকে শাসন করেছেন বাস্তবের নির্মমতায়।

(১২) বিভিন্ন সমালোচকের কাছে দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাটকে অপূর্ণতা, স্ব-বিরোধিতা, পুষ্টিহীনতা,

অবিশ্বাস্যতা, চরিত্র নির্মাণে যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তবতার অভাব প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এইসব সমালোচকরাও স্তম্ভিত হয়েছেন মঞ্চ সফলতা দেখে।

স্মৃতিপটে প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা দিগিন্দ্রচন্দ্র

গত ৫ জুলাই ২০০৮ যশস্বী নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষ পূর্ণ হল। নামের আগে নাট্যকার বিশেষণটি দিগিন্দ্রচন্দ্রের মূল পরিচিতি হলেও একমাত্র পরিচয় নয়। দিগিন্দ্রচন্দ্র একাধারে ছিলেন সাংবাদিক, চিত্রকর, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, গীতিকার ও অনুবাদক। তাঁর অন্যতম আর একটি বিশেষ পরিচয় তিনি ছিলেন নাট্য প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, দেশবন্ধু নগর শাখার নাট্য পরিচালক ছিলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সূত্র ধরেই লেখকের সঙ্গে দিগিন্দ্রচন্দ্রের হৃদয়ের যোগ। বলাবাহুল্য যেন গুরু-শিষ্যের নাড়া বাঁধা।

১৯৫৩ সালে বাগুইআটি দেশবন্ধুনগরে এক টুকরো জমির উপর দিগিনদা তখন একটি আশ্রয়স্থল নির্মাণের পরিকল্পনা করছেন। তার আগে দেশবন্ধুনগরেই মুরারি মোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির ভাড়াটে। আমরা তখন 'চলতি বাসর' করে বাগুইআটি ও দমদম অঞ্চলে সাংস্কৃতিক আঙ্গিনায় এক বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী। দিগিনদা সেটা জানতেন। আমাদের গণসংগীত, শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের নাট্যরূপ (মনোরঞ্জন বিশ্বাস কৃত) তখন বেশ সাড়া জাগিয়েছে পরিবর্তন কামী আধুনিক মানুষের মনে। পেশাদারী মঞ্চে তখন শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী ও মহেন্দ্র গুপ্তের যুগধারা প্রবর্তিত অভিনয় রীতি—মানুষের মনে একটা মনোটনি বা একঘেঁয়েমি এনে ফেলেছে। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সাংসারিক ট্র্যাজেডির পটভূমিতে কিছু সামাজিক নাটক অভিনয় হয়ে চলেছে। কিশোর ও যুব মনে সেই অভিনয় রীতির ব্যর্থ অনুকরণ প্রয়াস নাট্যপ্রেমী মানুষদের ক্লান্ত করে তুলেছে।

এমন একটি কাল পর্বে "চলতি বাসর"এর আবির্ভাব বা ঐতিহাসিক কারণেই অনিবার্য উপস্থিতি। সংগীতের কথা ও সুরে, নাটকের ঘটনা, সংলাপ ও প্রয়োগে এক নতুন আঙ্গিক, নতুন গ্রহণযোগ্য রীতি, সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি, মঞ্চে Reality-র বাস্তব ব্যঞ্জনা, মঞ্চনির্মাণ, অভিনয়, পরিচালনা, কুশীলবদের দলগত বোঝাপড়ায় এক মহান ঐক্য—আদর্শ বোধ, প্রয়োগ রীতি ও বিনোদন সর্বস্বতার বাইরে গিয়ে সমাজ পরিবর্তনের দুর্বার আকাঙ্খা।

দিগিনদার ভাড়া বাড়িতে একদিন সকালে লেখক, নিরাকার চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন বিশ্বাস ও জলদকান্ত চট্টোপাধ্যায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। দিগিনদা মন দিয়ে শুনলেন আমাদের কথা। মনে মনে উৎসাহিত বোধ করলেন এই ভেবে যে ভুল জায়গায় তিনি বসবাস করতে আসেন নি। মনের মানুষজন বা কাছের মানুষজন কিছু লোক এখানে থাকেন। তিনি সানন্দে আমাদের নাটক বিভাগের দায়িত্ব নিতে সম্মত হলেন। সঙ্গে এই নির্দেশও দিলেন যে "চলতি বাসর"কে অবিলম্বে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শাখায় রূপান্তরিত হতে হবে। দিগিনদা তখন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসের কোন এক শুভদিনে "চলতি বাসর" পরিচিত হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দেশবন্ধুনগর শাখা হিসেবে শ্রীযুক্ত অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির উঠোনে এক মহতী কনভেনশনের মাধ্যমে। বারাকপুর মহকুমার গণনাট্য

সম্পাদক কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন মাতৃ সংগঠনের পক্ষ থেকে। সম্পাদক হলেন নিরাকার চক্রবর্তী আর সভাপতি দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজ্য সহ-সভাপতি)।

শুরুর আগে সলতে পাকানোর কাজ শেষ। গোড়ার কথা না জানলে সব কিছুই অসম্পূর্ণ। এর মধ্যে ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে দেশবন্ধুনগর হিন্দু বিদ্যাপীঠের পশ্চিম পার্শ্বস্থ একটি ফাঁকা জমি তখনও উন্মুক্ত ছিল পূজা পার্বণ নাটক গান করার জন্য। চলতি বাসর থেকে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'সাড়া' ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পূর্ণগ্রাস' নাটক, গণনাট্য সেন্ট্রাল স্কোয়াডের গান, সন্দীপ সান্যালের হাস্যকৌতুক, চলতি বাসরের নৃত্যনাট্য এসব নিয়ে সে এক এলাহি ব্যাপার। এই নাটকে মেয়েদের ভূমিকায় মহিলা শিল্পীরা অভিনয় করেছিলেন। সংস্কারপন্থী রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সেদিন যে নাট্যবিপ্লব হয়েছিল সেই সামন্ত ও আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের সন্ধিক্ষণে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল আমাদের। হিন্দু বিদ্যাপীঠে প্রাথমিক বিভাগে কর্মরত এই অধমকে চাকুরি খোয়াতে হয়েছিল। পরে অবশ্য উদীয়মান নব্য আধুনিকতার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল কর্তৃপক্ষকে। এই ভাবে স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্ব অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একদিন এই রোষানলের শিকার হতে হয়েছিল। আবার প্রগতি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকদের কাছে কর্তৃপক্ষকে হার মানতে হয়েছিল।

১৯৫৪ সালে এপ্রিল মাসে রেলপুকুর ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নবীন দেশবন্ধুনগর শাখার গণনাট্য উৎসব। তখন পূর্ববঙ্গাগত ছিন্নমূল মানুষের কান্নায় আকাশ-বাতাস মুখরিত। এই উদ্বাস্তু সমস্যাই তখন আমাদের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমস্যা। এই অনুষ্ঠানে আমরা মঞ্চস্থ করেছিলাম দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী নাটক "বাস্তভিটা" ও সলিল সেনের "নতুন ইহুদী"। ক্ষিতীশ বসুর জারিগান, দেশবন্ধুনগর শাখার গানের স্কায়াডের বলিষ্ঠ প্রয়োজনা ও শম্ভু ভট্টাচার্যের "রানার" নৃত্যানুষ্ঠান। ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি তখন স্থানীয় অঞ্চলে আগামী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মানুষের বিপুল সমাগম ঘটিয়েছিল বলাই বাহুল্য। দিগিনদা নাটক দেখে বললেন সম্ভাবনাময়। কিন্তু কলকাতার নাট্যশাখার সমকক্ষ হ'য়ে ওঠার আহ্বান জানালেন।

এই সময়কার এক দুঃখময় কাল দিগিনদার জীবনপর্বে যে কী ভয়াবহ দুঃসময় ডেকে এনেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ১৯৫৩ সালের ১লা ডিসেম্বর "গোলটেবিল" শীর্ষক একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক লেখার অপরাধে আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদ থেকে ছাঁটাই হয়েছিলেন। ১৮ বছর এক নাগাড়ে কাজ করার পর হঠাৎ এই বিনা মেঘে বজ্রপাত তাঁকে দমিয়ে দিলেও সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারেনি। নাটক লেখা, প্রযোজনা ও পরিচালনা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করা যায়নি।

সেই দুঃসময়ে দিগিনদার দু'বেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থানের জন্য যাঁরা লড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, কবি-মণীন্দ্র রায়, অরুণ মিত্র, সরোজ দত্ত, সুধী প্রধান, চারুপ্রকাশ ঘোষ, ব্রজসুন্দর দাস, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, মুজফফর আহমদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তখন অতটা শক্তিশালী ছিল না। তাছাড়া সংবাদপত্র মালিকবিরোধী মত প্রকাশই ছিল অন্যতম কারণ। দিগিনদা কৈশোর ও যৌবনে কংগ্রেসী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শরিক হিসাবে জেল খেটেছেন। এই জেলে (দমদম

সেন্ট্রাল) বসেই নৃপেন চক্রবর্তী প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃত্বের দ্বারা মার্কসবাদী দর্শনে দীক্ষিত হন। ১৯৪৬ সালের শেষ ভাগে তিনি গণনাট্য সংঘে যুক্ত হন। তার আগে প্রগতিশিল্পী সংঘ, নাট্যচক্র প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংগঠনে উজ্জ্বল নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন।

নিদারুণ দুঃসময়ে যাঁরা বন্ধু তাঁরাই প্রকৃত বন্ধু। তাই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ দেশবন্ধুনগর শাখাকে তিনি কোনদিন ভুলতে পারেন নি—যাঁরা শেষদিন পর্যন্ত তাঁর পাশে পাশেই ছিলেন।

এই সময় দিগিনদার মধ্যে এক নতুন সৃষ্টিধর্মী দীপ্তি আমরা দেখেছিলাম। ক্লান্তিহীন বিনিদ্র রজনী তিনি যাপন করেছেন। নতুন নাট্য উদ্ভাবনে, নব নব নাট্য প্রযোজনায়, সামান্য অর্থের বিনিময়ে টলস্টয়ের উপন্যাসের বঙ্গীকরণে, যুগান্তর ও দৈনিক বসুমতীতে এবং পরবর্তী কালে কালান্তরে কলম লেখার কাজে, শিশুসাথী সম্পাদনার কাজে এবং বাণিজ্যিক নাট্য প্রয়োজনায় (টিকিট বেচে) কী অক্লান্ত পরিশ্রম। প্রায় অভুক্ত থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, ব্যক্তির কাছে, সংবাদ পত্রের দুয়ারে-দুয়ারে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে চেপে ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস চালানো। পরে সন্ধ্যায় ডিক্সন লেনে চারুপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে এক কাপ চা ও এক গ্লাস জল। এই ক্ষুদ্র লেখক তাঁর সহগামী ছিলেন।

মলিনা গুরুদাস এনটারপ্রাইজ দিগিনদার "সম্মান রজনী" করেছিলেন বাগুইআটিতে 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' পালা অভিনয় করে। কত লাভ হয়েছিল বা আদৌ হয়েছিল কিনা জানা নেই।

এই সময় দিগিনদার উষ্ণ সান্নিধ্যলাভের মধ্যে থেকেই নাট্য পরিচালনা, প্রযোজনা ও অভিনয় সম্পর্কে কিছু শিখেছি। সেই হিসেবে দিগিনদা আমাদের অনেকেরই নাট্যগুরু।

"মুক্তমঞ্চ" পরিকল্পনা নিয়ে ষাটের দশকে অনেক কথা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালে দেশবন্ধুনগরে দিগিনদা গণনাট্য সংঘকে দিয়ে মঞ্চস্থ করালেন রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা তাঁর বিখ্যাত নাটক 'তরঙ্গ'। তিনদিক খোলা মঞ্চে পেছনে ব্যাকড্রপে (সাইক্লোরামা) প্রতীকধর্মী কাট্ আউট ও নেপথ্য আলোর ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল নানা দৃশ্যপট বা পটের ইলিউশন। বাম ও ডান পাশ থেকে কুশীলবদের প্রবেশ প্রস্থানের মাধ্যমে যে সাবলীলতা ও গতি এবং আলো ও আবহ সংগীতের এক সঙ্গতিপূর্ণ ঐক্য ফুটে উঠেছিল তা অনেকদিন ভুলতে পারেননি স্থানীয় দর্শকমণ্ডলী। ভদ্রবাড়ির মাঠে প্রয়োজিত হয়েছিল দিগিনদার "মোকাবিলা" ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিসর্জন" নাটক। প্রসেনিয়ম থিয়েটারে এক নতুন আঙ্গিকে হয়েছিল সে অভিনয়। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত সেই বিসর্জন নাটক দেখে বলেছিলেন—শিল্পীরা বুঝে অভিনয় করছেন বলেই নাটক এত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

দিগিনদা অভিনয় শিক্ষায় বলতেন—বাস্তব জীবনের বাইরে নাট্যভাবনার কোন অস্তিত্ব নেই। তুমি যে হাত পা নাড়ছ বা দৌড়ে গেলে বা ছুটছ বা রাগে উত্তেজিত হলে বা হাসিতে ফেটে পড়লে এর কারণ কি? দর্শক জানে তুমি অভিনয় করছ। কিন্তু যুক্তি দিয়ে তুমি তাকে এমন সম্পৃক্ত করলে যে মানুষ আকৃষ্ট হল। যাকে ইংরেজিতে বলে ইমোশনাল উইন ওভার। Reason হচ্ছে আসল কথা। মানে না বুঝে কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গির তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। দিগিনদা গণনাট্যে আসার আগে যাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁদের যুক্তিনিষ্ঠ অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ হতেন। শিশিরকুমার তাঁর 'অন্তরাল'

নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তখন নিভৃতে তিনি দিগিনদার মতো একজন প্রগতিবাদী আধুনিক সমাজের নাট্যকারের সঙ্গে আলাপ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ''রাম'', 'আলমগীর', 'মাইকেল', 'জীবানন্দ' চরিত্রগুলিতে শিশিরকুমার যে ভাবীকালের জন্য কত সামগ্রী রেখে গেছেন যারা তা দেখেছেন দিগিনদা তাঁদের অন্যতম। ''মহর্ষি বাল্মীকি'' চরিত্রে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয় 'সীতা' নাটকে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করতো। এখান থেকেই আধুনিক থিয়েটার, অভিনয় ও পরিচালনা সম্পর্কে দিগিনদার হাতে খড়ি। পরে গণনাট্য সংঘে শম্ভু মিত্র, চারুপ্রকাশ ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সাহচর্য লাভ করেছেন। দিগিনদার 'বাস্তুভিটা' নাটকে মহর্ষি মনোবঞ্জন ভট্টাচার্য, সাধন সরকার, কালী সরকাব, সাধনা, কল্যাণী, অনু রায়, শোভা সেন ও মমতাজ আহমেদ খাঁ যে অভিনয় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন যাঁরা তা দেখেননি তাঁদের কাছে অকল্পনীয়। এছাড়া 'মোকাবিলা' নাটকে কালী সরকার, চারুপ্রকাশ, তুষার দাস, মাধুরী মুখার্জি (বর্তমানে মাধবী মুখার্জি), মঞ্জু মুখার্জি, তুলসী লাহিড়ি এবং অধম নিজে যে অভিনয়ের অংশীদার হয়েছি আজকের সিরিয়ালের নায়ক-নায়িকাদের কাছে তা স্বপ্ন। আকাদেমি মঞ্চে (তখন কাঠের পাটাতন ছিল না) দিগিনদার ''অন্তরাল'' নাটকে আমি ''রণেশ'' করেছি—অজিতেশ ব্যানার্জি যে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সত্য রায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী ভট্টাচার্য, নীলিমা ঘোষ, মায়া ঘোষ প্রমুখ মঞ্চ ও চিত্রজগতের স্বনামধন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অভিনয় করেছিলেন। পরিচালক হিসাবে দিগিনদা ন্যাচারেলিষ্টিক ট্রেন্ড বর্জন করে রিয়ালিষ্টিক ট্রেন্ডকেই গণ্য করতেন। তিনি বলতেন যে জীবন ফটোগ্রাফিক ট্রুথ নয়। As if reality এই সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয়ে যে সমস্ত প্রতীক ব্যবহার করতেন তা আজকে ভেবে শিহরিত হই।

রাজারহাট গুঁড়েরআঁইটে ''বাস্তুভিটা'' নাটকের অভিনয়। একটি স্বচ্ছল চাষির বাড়ির উঠোন। চারদিকে ধানের গোলা। হ্যারিকেনের আলো। একটি মাত্র পেট্রোম্যাক্স। দিগিনদা ঐ ধানের গোলাকে পারস্পেকটিভ হিসেবে ব্যবহার করে চারপাশ থেকে প্রবেশ-প্রস্থানের যুক্তিসঙ্গত একটা উপায় খুঁজে বার করলেন। উঠোন ভরে মুসলমান ও হিন্দু কৃষকের বধূ ও চারপাশে দণ্ডায়মান কৃষককুল। নাটক আরম্ভ হল। একটা হোমলি এ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে পূর্ববঙ্গের এক হিন্দু মাস্টারের জীবনের দেশত্যাগের ট্র্যাজেডি অভিনীত হল। কিন্তু এইটুকুতে মন ভরে না। আরেকটু হলে ভাল হোত। জীবন দিয়ে জীবনকে অনুভব না করলে এই Reality অসম্ভব। Emotional win over কিন্তু Reasonable approach. এই ভাবেই গ্রামের দর্শক সেদিন Re-act করেছিল শহরের বাবুদের অভিনয় দেখে।

দিগিনদা বলতেন যে তোমার চেহারা ভালো, তোমার কণ্ঠস্বর মধুর। তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম। চরিত্রটা ভালো করে বুঝেছ তো? মঞ্চটা একটি ফ্রেম। তুমি যে ছবি আঁকবে সেটা Running picture। ঐ ফ্রেমের ভেতর থেকে একটা চলমান ছবির গতি তৈরি করবে। সেটা যুক্তিপূর্ণ হওয়া চাই। সংলাপ যখন বলবে তার ইনটোনেশন, মডিউলেশন, তার pause, তার উচ্চারণের স্পষ্টতা ও অর্থবহ করে তোলা আর তার সঙ্গে তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সব মিলে যে ঐক্য সেটা হবে বিশ্বাসযোগ্য illusion; নইলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হবে গানের পসরা। তোমার

co-actor-এর সঙ্গে এই বিশ্বাস বন্ধনে তুমি যখন যুক্ত হবে তখনই হবে involvement তখন তুমি "অমল" নও তখন তুমি "গোপাল মিস্ত্রি"। ষাট বছর তোমার বয়স। কাঠের কাজ করে সামান্য রোজগার। বাবুদের কথায় তোমার "পেত্যয়" নেই। তাই তুমি তোমার সহজ সরলতায় খুঁজে পাও তোমার মনের মানুষ "গগন চৌকিদার" বা আগামী দিনের বার্তাবহ "অমরের" মাঝখানে। দৃশ্যপট রচনায় দিগিনদা ছিলেন রবীন্দ্র-অনুসারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়িতে "বাল্মীকি প্রতিভা" বা "বিসর্জন" নাটকে কৃত্রিম আঁকা দৃশ্যপট ব্যবহারের ছিলেন ঘোর বিরোধী। মালিনী ফুল তুলতে এসে দেখলেন সারি সারি ফুলের টব বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে সেই ফুল তোলা আপাত-সত্যকে লঙ্ঘন করা। মনের মাধুরী মিশিয়ে সদ্য স্নাত শুভ্র সিক্ত বসনে কল্পনার ফুল তোলার মধ্যেই রয়েছে দর্শককে অনুভাবিত করে তাঁদের হৃদয়ের ফুল ফোটানো। এই সত্যটাই নাট্যসত্য। আঁদ্রে আঁতোয়ার মত মঞ্চে কাঁচা শুয়োরের মাংস সাজিয়ে মাংসের বাজার বোঝাতে চাইলে দর্শকের বিড়ম্বনা বাড়ে বই কমে না। নাকে রুমাল চাপা দিতে হয়। আঙ্গিকের অভিনয় দ্বারা মূক অভিনয়ের মাধ্যমে এক পেয়ালা চা সেবন করা মঞ্চে অনেক ভাবোদ্দীপক, একটি সিগারেট সেবনের মূকাভিনয় দর্শক মনে অনেক ক্রিয়াশীল।

অভিনয় প্রসঙ্গে স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতি ও বের্টোল্ট ব্রেশট পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বার বার বলতেন দর্শককে বোকা ভেবো না। তাঁরা জানেন তুমি অভিনয় করছো। কিন্তু মুহূর্তের চকিত-বিভ্রম ঘটিয়ে তুমি দর্শককে করে ফেললে মোহতন্দ্রাহত। এটাই স্টান্ট বা নাট্য চমক। কুশলতার প্রয়োজন। সবাই পারে না। তুমিও পারবে না যদি অনুশীলন না করো। ইম্‌প্রোভাইজেশন পাকা অভিনেতার কাজ। Average অভিনেতাকে দিয়ে সে কাজ হয় না। ব্রেশটের "এ্যালিয়েনেশন" তো স্তানিস্লাভস্কির 'ইনভলভ্‌মেন্ট" পদ্ধতিরই পরিপূরক। একটা হল "স্ট্রেইন" অপরটি "রিলাক্‌সেশন"। একটি চরিত্র বোঝাবার আগে দিগিনদা গল্প বলতেন। চরিত্রটির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক এমনকি তার অভ্যাসগত মুদ্রাদোষ সব কিছুই বুঝিয়ে দিতেন। তারপর স্ক্রিপ্ট রিডিং। তারপর Co-actor, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অভিনীত দৃশ্যের মেজাজ আবেগ, যুক্তি এবং নায়করূপী আমাকে নায়িকার খুব কাছে গিয়ে কীভাবে এবং কেমন ভাবে তাকাতে হবে বোঝাতে গিয়ে যে ভাবাবেগ সৃষ্টি করলেন নায়িকারূপী কল্যাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তো লজ্জায় মরে যাই আর কি। ঘটনাটি ঘটেছিল 'তরঙ্গ' নাটকে আমি "মহীউদ্দিন" ও "মঞ্জুরূপী" কল্যাণীর মধ্যে। এই যুক্তিনিষ্ঠ সত্যতাই নাট্য চরিত্রের মূলকথা। পরবর্তী কালে আমার পরিচালিত 'রক্তরাঙ্গা সিঁথি', 'অপচয়', 'দু-এর পিঠে এক শূন্য', 'গোলটেবিল', 'বোধন' নাটকে দিগিনদা আমার সদর্থক সমালোচনা করেছিলেন।

'অশনি-চক্র' দিগিনদার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের একটি অন্যতম কীর্তি। শিবকালী চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য এই সংগঠনে বহুদিন কাজ করেছেন তিনি। শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা এবং দায়বদ্ধতাই ছিল এই সংগঠনের মূলমন্ত্র। দিগিনদার হাতে গড়ে উঠেছিল সংগঠনের প্রতিদিনের রোজনামচা।

চিত্ত চ্যাটার্জি, অবনী রায়, মনোরঞ্জন চ্যাটার্জি, দুর্গাদাস ব্যানার্জি, সাধন সরকার, অনু রায়, কল্যাণী দাস, নিবেদিতা দাস, চারুপ্রকাশ ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং এই অধম এঁদের

কুশীলবদের তালিকা ভুক্ত। তরঙ্গ, মশাল, মুক্তির উপায় নাট্যানুষ্ঠান নিয়ে পাঁচের দশকে আমাদের তখন দিগন্ত পরিক্রমা। দিগিনদা নিজেও ছিলেন অভিনেতা।

অভিনেতা হিসেবে দিগিনদা স্বতন্ত্র মাত্রা ও স্বতন্ত্র ধারার নাট্যশিল্পী। আমাদের সঙ্গে তিনি বাস্তুভিটা নাটকে মহেন্দ্র মাস্টার, তরঙ্গ নাটকে ছোট ভুঁইয়া 'শশী'র ভূমিকায়, মোকাবিলা নাটকে লাঠিয়াল—এ ছাড়াও ছোটখাট চরিত্র যেমন পুলিশ অফিসার, পথচারী, গ্রামবাসী প্রমুখ চরিত্রে রূপদান করে এক সহজ সরল অভিনয় ধারার প্রবর্তন করেছিলেন যা আমাদের কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। বসিরহাটে নির্বাচনী সভায় নাটকে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। টাউন হলের পাশে দর্শক পরিবৃত মাঠের ঠিক মাঝখানটিতে একটি ছোট মঞ্চের আভাস। নেহরুর সমাজতান্ত্রিক ভাঁওতার পটভূমিকায় রচিত দিগিনদার 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব'। দর্শকদের মাঝখানে থেকে এক একজন ক্রেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা আমি (জহরলাল) ও ইন্দিরার (ইন্দ্রানী দত্ত) কাছ থেকে সমাজতান্ত্রিক টুপি কেনার জন্য আসছেন। ছেলে হবে কিনা, লটারির টাকা পাওয়া যাবে কিনা, পরীক্ষায় পাশ করা, ব্যবসায় উন্নতি, প্রেমে সাফল্য বিষয়ক নানা দাবী দাওয়া—সে এক অনাবিল দমফাটা হাসির ব্যাপার। দিগিনদা ঝুনঝুনওয়ালা। এই টুপি নিয়ে ব্যবসা করতে চান। চেহারার সঙ্গে সেই মারোয়াড়ি উচ্চারণ মনে পড়লে আজও হাসিতে ফেটে পড়ি।

১৯৫৭ সাল বনগাঁয় সারাভারত কৃষক সভার সম্মেলনে তরঙ্গ নাটকের অভিনয়। কুড়ি হাজার দর্শক। বিরাট মঞ্চে মাইক্রোফোন ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রতুল বিবেচনায় আমি (গোপাল মিস্ত্রি) তারা স্কেলে না বুঝে অভিনয় শুরু করলাম। দিগিনদা উইংসের ফাঁক দিয়ে ধমকে বললেন—You are away from the T's of drama অর্থাৎ Tone, Temper এবং Tempo of drama. পরে দর্শক গ্রিপ করার পর বুঝেছিলাম নাটকে ধরতাই একটা বিশেষ অঙ্গ। সেদিনের তিরস্কার ভবিষ্যতে অনেক পুরস্কারের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

১৯৫৮ সালে 'নাটমহল' প্রতিষ্ঠা। এই সংগঠনের মধ্যমণি ছিলেন চারুপ্রকাশ ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন সত্য রায়। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ি, কল্যাণী চৌধুরী, সবিতাব্রত দত্ত, লীলা মুখার্জি, মাধুরী, মঞ্জু, জ্ঞানেশ ও অমল। চারুপ্রকাশ ঘোষের ডিক্সন লেনের বাড়িতে মাচা বেঁধে অভিনয় হয়েছিল। তখনকার দিনের নাট্যরসিক ও সমালোচক ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মোহিতলাল মজুমদার, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বোধ হয় আধুনিক থিয়েটারের সূতিকাগার এই মঞ্চ থেকেই পরে গণনাট্য সঙ্ঘের দিকপালরা নতুন অস্ত্র নিয়ে রণসজ্জায় মেতে ছিলেন।

১৯৫৯-৬০ সালে কাশিমবাজার রাজবাড়িতে দিগিনদা সৃষ্টি করলেন নাট্যকার সঙ্ঘ। প্রাণপুরুষ ছিলেন কাশিমবাজার রাজবাড়ির সন্তান সোমেন নন্দী। সেই প্রাসাদোপম কুঞ্জভবনে বিদেশী ম্যাডোনার ষ্ট্যাচু সহ কৃত্রিম ফোয়ারা ও নানা ফুলের সম্ভার ছিল পর্যটকদের আকর্ষণ। সেই রাজবাড়িতে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল সহজ ভঙ্গিতেই বঙ্গীয় নাট্য পরিষদের সদস্য হিসাবে। দারোয়ান দেখামাত্রই ছেড়ে দিতেন নৌটঙ্কি বলে। ষোড়শীকুমার মজুমদার ছিলেন এই বঙ্গীয় নাট্য পরিষদের পরিচালক। রাজবাড়ির অভ্যন্তরে রাজদরবারের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ছিল একটি Experimental নাট্যমঞ্চ। ছোট ছোট নাটক, আলোকসম্পাত, আবহ, অভিনয় নিয়ে প্রায়শই

হত সেমিনার। প্রতি শনি ও রবিবার হোত অভিনয়। সকাল বেলার এক ঘণ্টা, যার যা ভাবনা, আর্য অনার্য, আশ্রম পীড়া, গোলটেবিল, চলচ্চিত্ত চঞ্চরী প্রমুখ নাটক অভিনয় এবং অভিনয় শেষে আলোচনা। দিগিনদা ছিলেন নাট্যকার সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ছিলেন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। ১৯৫৯ সালে মে মাসে ভাঙ্গড় থানার ভোজেরহাট নামক গ্রামে দিগিনদার নেতৃত্বে গণনাট্য দেশবন্ধুনগর শাখার শিল্পীরা লঞ্চে করে গিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে "তরঙ্গ" নাটক অভিনয় করতে। কাল বৈশাখীর দাপটে মঞ্চ প্রায় উড়ে যাবার যোগাড়। কোন রকমে একটি স্কুল বাড়িতে আত্মরক্ষা। ৯টার পর বৃষ্টি থামলে দেখা গেল মঞ্চের পর্দা, উইংস, স্কাই ছিঁড়ে কোথায় বিলীন, ৯টার পর কম্‌রেড লতেমন মোল্লা করজোড়ে দর্শকদের উদ্দেশে মাইকে ঘোষণা করলেন—আপনারা বসুন। নাটক আরম্ভ হবে। গানের শাখা গান শুরু করতেই পিল পিল করে লোক জড়ো হল মাঠের মধ্যে। বললাম—মঞ্চ? দিগিনদা বললেন, পর্দাহীন মুক্তমঞ্চে নাটক হবে। আকাশ, ঐ অনন্ত আকাশ আমাদের আবরণ। আজকের শিল্পীদের কাছে সে অভিজ্ঞতা স্বপ্ন বলে মনে হবে।

১৯৫৮ সালে শিবপুরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন থেকে দিগিনদা হলেন রাজ্য সভাপতি। তখন থেকে বিভিন্ন শাখাকে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। নাটক রচনা, প্রযোজনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে ভাঁটা পড়েনি কোন দিন।

ব্রজসুন্দর দাস শ্রীরঙ্গম মঞ্চ ভাড়া নিয়ে বাণিজ্যিক প্রগতি নাটকের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। তরঙ্গ নাটকে ও মোকাবিলা নাটকে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম। পরিচালনা ও অভিনয় নিয়ে যে প্রশংসা 'যুগান্তর' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল ভাবীকালের গবেষকদের তা কাজে লাগতে পারে।

১৯৮২ সালে গণনাট্য সঙ্ঘের দেশবন্ধুনগর শাখার নাট্যোৎসবে দিগিনদা ছিলেন প্রধান অতিথি। আমাদের অভিনীত প্রফেসর ম্যামলক, অমৃত অতীত, রক্তরাঙা সিঁথি দেখে দিগিনদা মন্তব্য করেছিলেন—"তোমাদের অভিনয়ে যে পরিণতির ছাপ সেটাই আমার নাট্যকার জীবনেব প্রাপ্তি ও পুরস্কার। কিন্তু গুরুকে গুরুদক্ষিণা দিতে হয় জান তো। যদি পার সেটা কোনদিন চুকিয়ে দিও।"

সে গুরুদক্ষিণা দিতে পারিনি। অনেক কিছুই উচিত ছিল। সব পারিনি। পারতে হবে।

দিগিনদার নাটকের সংলাপ যাঁরা বলেছেন তাঁরা আজও ভোলেন নি। কেননা চলমান জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রামরত শ্রমজীবী মানুষের প্রাত্যহিক স্বাভাবিকতার বসে জারিত সে সংলাপ। ডুবুরি যেমন সমুদ্রগর্ভে ডুব দিয়ে তুলে আনেন মণিমাণিক্য, দিগিনদা বোধ হয় তেমন তাঁর পিতৃহীন শৈশব থেকেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সেই সব দ্বান্দ্বিক বাক্-বিন্যাসে যাকে তিনি Reality-র কলম দিয়ে শাসন করেছেন বার বার। ২০ খানা পূর্ণাঙ্গ এবং প্রায় ৫০ খানা একাংক নাটক লিখে তিনি নাট্য সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। তাঁর নাটক বিষয়ক ও প্রয়োগকলা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও নাট্যভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ। 'নাট্য চিন্তা ঃ শিল্পজিজ্ঞাসা' ও 'শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রবন্ধ' নাটক নিয়ে অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের কাছে শিক্ষার উপকরণ হয়ে থাকবে চিরকাল।

দিগিনদা ১৯৯০ সালের ১২ এপ্রিল প্রয়াত হয়েছেন। পরিণত বয়সেই বলা চলে। তবু নাট্য জগতে সে বিরাট শূন্যতা ভরাট করার লোকের খুবই অভাব।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য ও জীবন, সমসাময়িক নাট্য আন্দোলন ও দিগিন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যে ছাত্রছাত্রীরা Ph.D. করে খেতাব পেয়েছেন ও পাচ্ছেন।

তাঁর নাটক কি সময় ও কালের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে? এত নাটক যিনি লিখেছেন আমরা কি পারি না তার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে? তাকে পুনরুজ্জীবিত করে সমসাময়িক আধুনিক নাটকের সঙ্গে পুরনো কালের সমস্যা জর্জরিত নাটকের মিলন ঘটাতে? কালের প্রেক্ষাপটে নতুন নাটক করতে গেলে পুরনোকে জানতে হয় বুঝতে হয়। তাই সেক্সপীয়র আজও আমাদেব ভাবিত করে। নিদ্রা কেড়ে নেয়।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক প্রযোজনাই দিগিনদার শতবর্ষে আমাদের গুরুদক্ষিণা।

নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবর্ষে বিভাগীয় সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা (১১ নভেম্বর ২০০৮)।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যের কয়েকটি নির্বাচিত দিক

কাননবিহারী গোস্বামী

১. কথামুখ ঃ

আরম্ভেরও আরম্ভ আছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানোর আগে দিনে সলতে পাকানোর আয়োজন।' তাই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে আলোচনার আগে ষোড়শ শতকের যুগ-পটভূমিকা এবং বৈষ্ণব ভাবান্দোলন ও বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। এজন্যই কথামুখ, বা অবতরণিকা।

১৫১০ খ্রীস্টাব্দের মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়ে নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত হলেন সর্বভারতের শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। তাঁর প্রেমাশ্রুবিগলিত জ্যোতির্ময় মূর্তিতে সমগ্র বিশ্ব দেখল শ্রীরাধার পরমদয়িত শ্রীকৃষ্ণের জন্য দিব্য বিরহার্তি। এ জিনিস আগে কেউ দেখে নি। পরেও না। সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে গৌড়ের পথে রামকেলিতে এলে গৌড়াধিপতি হোসেন শাহ্ তাঁকে দেখেছিলেন প্রাসাদশীর্ষ থেকে। কেশব ছত্রীর কাছে তাঁর আংশিক পরিচয় জানার পর হোসেন শাহ রাজাজ্ঞা প্রচার করেছিলেন—এই সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাঁর ধর্মাচরণে ও কীর্তনগানে কাজী বা অন্য কেউ বাধা দিলে তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীচৈতন্য অবাধে তাঁর নামপ্রেমধর্ম প্রচার করতে থাকলেন। কুলিয়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুর থেকে ঘুরে গৌড়ের পথে নীলাচলে ফিরলেন তিনি। এরপর পাঁচ বছর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, মথুরা ও বৃন্দাবনে লুপ্ত বৈষ্ণবতীর্থ উদ্ধার, উৎকল, কাশী ও প্রয়াগে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকদের দ্বৈতবাদী ভক্তিপথিক ক'রে তোলা, শ্রীসনাতনকে বৈষ্ণব কৃত্যাদি ও শ্রীরূপকে বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্র ও রসশাস্ত্রের মূল তত্ত্বাদি শিক্ষাদান, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বৈষ্ণবের প্রকৃত বৈরাগ্য আচরণে শিক্ষাদান—সংগঠক শ্রীচৈতন্যের অনন্য কৃতি। তাঁর মননে, জীবনাচরণে, দিব্যভক্তিতে শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্মা ও সনক—এই চার সর্বভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পর শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায় পঞ্চম সর্বভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মান্যতা পেল। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকরগণ—স্বরূপ দামোদর, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, উভয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতি 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে'র আধারে এই সম্প্রদায়কে দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি দিলেন। আরো পরবর্তীকালে শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ '*ব্রহ্মসূত্রে*'র '*গোবিন্দভাষ্য*' রচনা ক'রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক ভিত্তিকে সর্বভারতীয় সশ্রদ্ধ মান্যতায় স্থাপিত করেন।

শ্রীচৈতন্য বাংলা ভাষায় প্রায় কিছুই রচনা করেন নি। একমাত্র '*চৈতন্যভাগবতে*' শ্রীবৃন্দাবনদাস কাজী দমনের সময় শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে কয়েকটি বাংলা কীর্তনপদের টুকরো বসিয়েছেন। সেগুলি সম্ভবত পূর্বাগত, শ্রীগৌরাঙ্গের নিজরচনা না হওয়াই সম্ভব। একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের মুখোচ্চারিত "করিল পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।।"— ইত্যাদি দুটি ছত্র তাঁর প্রামাণ্য বাংলা রচনার নিদর্শন। জীবনের শেষ বারো বছরে গম্ভীরালীলায় তাঁর মুখোচ্চারিত '*শিক্ষাষ্টকে*'র আটটি সংস্কৃত শ্লোক তাঁর নিজ রচনার বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য নিদর্শন। একটি রোম্যান্টিক ও

ভক্ত কবিমনের দাস্যভক্তি, নামভক্তি ও বিরহবিগলিত প্রেমভক্তির তা অপূর্ব নিদর্শন। শ্রীচৈতন্য-মুখোচ্চারিত '*জগন্নাথাষ্টকের*' আটটি সংস্কৃত শ্লোক তাঁর নিজ রচনা ব'লেই পরিগৃহীত।

শ্রীচৈতন্য লিখেছেন অত্যল্প। কিন্তু তাঁর দিব্য প্রেম ও ভক্তি-প্রভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীতে বহু কবি, পদকর্তা, নাট্যকার, জীবনীকাব্যলেখক, দার্শনিক, আলঙ্কারিক, বিধিগ্রন্থ-প্রণেতার আবির্ভাব হ'ল। শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষলীলাদর্শী কবিগণ বাংলা ও ব্রজবুলিতে লিখলেন—অজস্র গৌরাঙ্গবিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকার পদাবলী এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিলাসের পর্যায়ক্রমিক পদাবলী। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার ঠাকুর, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা অবলম্বনে সংস্কৃত ও বাংলায় রচিত হ'ল চৈতন্যচরিতকাব্যধারা। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে দেবকথার বাইরে সমসাময়িক মানবজীবনকথা নিয়ে কাব্য ও নাটক রচনা সর্বভারতীয় সাহিত্যে এই প্রথম একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিল।

১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের অল্পকাল পরেই তাঁর সহপাঠী মুরারি গুপ্ত সংস্কৃতে সমাপ্ত করেন '*শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্*' মহাকাব্য। হয়তো কাব্যটির সূচনা হয়েছিল মহাপ্রভুর জীবৎকালেই ১৪২৫ শক, বা ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দে। শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষলীলাদর্শী কবির এই কাব্যের প্রভাব পরবর্তী সমস্ত সংস্কৃত ও বাংলা চৈতন্যচরিতসাহিত্যে পড়েছে।

শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালে এক বঙ্গদেশীয় বিপ্র শ্রীচৈতন্যজীবনকথা নিয়ে একটি সংস্কৃত নাটক লিখেছিলেন। স্বরূপ দামোদরের অনুমোদন না থাকায় নাটকটি লুপ্ত হয়েছে। তবে নান্দী-শ্লোকটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের '*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে*'র সম্পুটে রক্ষা পেয়েছে।

মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদলীলার অন্তরঙ্গ সঙ্গী স্বরূপ দামোদর সংস্কৃত '*কড়চাগ্রন্থ*' লিখে শ্রীচৈতন্যের দিব্যতনুতে রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলনাত্মক 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব' প্রচার করেন। এই গ্রন্থটিও লুপ্ত। তবে কৃষ্ণদাসের '*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে*' এবং সপ্তদশ শতকে লেখা বংশীবদন চট্টোর প্রপৌত্র রাজবল্লভ গোস্বামীর '*মুরলীবিলাস*' কাব্যে এই কড়চার কয়েকটি শ্লোক সংকলিত হয়ে রক্ষা পেয়ে গেছে।

শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা নিয়ে সংস্কৃতে রচিত দ্বিতীয় নাটক '*শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্*'। রচয়িতা—মহাপ্রভুর পার্ষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠপুত্র পরমানন্দ সেন, বা কবিকর্ণপূর। কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকৃপাধন্য এবং তাঁর লীলাসমূহের প্রত্যক্ষদর্শী। দশ অঙ্কে গ্রথিত এই রূপক-জাতীয় নাটক থেকে সপ্তদশ শতকের সূচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ববিচার' অংশটি নিয়েছেন। নাটকটি লেখা হয় ১৫৪০ থেকে ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে, ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে, বাংলায় এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন প্রেমদাস '*চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী*' কাব্যে।

কবিকর্ণপূর ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে লেখেন তাঁর শ্রীচৈতন্যজীবনীমহাকাব্য '*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্*'। সংস্কৃতে ২০টি সর্গে লেখা এই মহাকাব্যে পাই শ্রীচৈতন্যের সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত, যা প্রামাণিক।

১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃতে লেখা কবিকর্ণপূরের '*গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের

নবদ্বীপলীলা, নীলাচললীলা ও মথুরা-বৃন্দাবনলীলার 'গণ', বা প্রিয়-পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সঙ্গে মিলিয়ে তাঁদের তত্ত্বরূপ নির্ণীত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরেই, ৪০ বছরের মধ্যেই, শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিকদের নিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে উদার মানবিকতা থেকে এক অলৌকিক তাত্ত্বিকতায় বেঁধে ফেলা হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল যে, শ্রীবৃন্দাবনদাসের '*শ্রীচৈতন্যভাগবত*' বাংলায় রচিত প্রথম চৈতন্যচরিতকাব্য। কিন্তু সম্প্রতি আমি '*বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*'র ১০৮ বর্ষের ১-৪ সংখ্যায় (প্রকাশকাল-২৪ ফাল্গুন, ১৪০৯) প্রকাশিত **'প্রথম বাংলা চৈতন্যচরিতকাব্য ঃ শ্রীগৌরলীলামৃত'** শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে নানা তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছি যে, মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত '*শ্রীগৌরলীলামৃত*' হল বাংলায় লেখা প্রথম শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্য। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পর ইনি মহাপ্রভুর আদেশে ১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৮ বছর প্রভু-পরিবারে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর 'Guardian', বা রক্ষকরূপে বাস করেছিলেন। ১৫০৮ থেকে ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত মহাপ্রভুর সপার্ষদ সমস্ত ব্রজলীলানুকরণে তিনি প্রিয়পরিকররূপে যোগ দিয়েছিলেন। ইনিই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রিয়বিরহবেদনা-প্রশমনের জন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থানের নিমগাছের কাঠে তাঁর চাঁচরচিকুরশোভিত দারুমূর্তি নিজহাতে নির্মাণ করেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ও বংশীবদন উভয়ে এই শ্রীমূর্তির পূজা করতেন। এটিই নবদ্বীপের **'ধামেশ্বর মহাপ্রভু'**র বিগ্রহ। এই শ্রীমূর্তি শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালে প্রকাশিত ও পূজিত সর্বপ্রথম দারুবিগ্রহ। বংশীবদন প্রখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও পদকর্তা। ইনি আমার ঊর্ধ্বতন দ্বাদশ পুরুষ। এর একমাত্র খণ্ডিত পুথিটি আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থশালায়, পুথিসংখ্যা—৩৯৯৬। উৎসাহীরা দেখে নিতে পারেন। এই কাব্যের প্রাপ্ত অংশটুকুতে, সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যের গোষ্ঠলীলাভিনয় বর্ণনায়, চিত্রপটে গোদোহনলীলা দর্শনে, গৌর-গদাধরের হিন্দোলিকা বিহার ও ফাগুখেলার বিবরণে কবির প্রত্যক্ষদর্শিতার ছাপ সুস্পষ্ট। কাব্যটিতে "চলে দেবী লক্ষ্মীমণি/সর্বভুবনজননী/সঙ্গে দাসী অতুল উপাম"—এই দীর্ঘ ত্রিপদী পদটিতে শ্রীচৈতন্যের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মী দেবীর রূপগুণের যে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বর্ণনা আছে, তা কি সংস্কৃত, কি বাংলা—কোনো চৈতন্যজীবনী কাব্যেই নেই।

'*শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*' গ্রন্থে ড. বিমানবিহারী মজুমদার নানা তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন—'*শ্রীচৈতন্যভাগবত*' ১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দের আশে-পাশে লিখিত হয়। বংশীবদনের প্রধান শিষ্য জগদনন্দের পরবর্তী বংশধর বিশ্বম্ভর গোস্বামী তাঁর রচিত '*বংশীবিলাস*' পুথিতে জানিয়েছেন—মেদিনীপুরের জগতীমঙ্গলপুরে ১৪৭০ শক, বা ১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দে বংশীবদনের তিরোভাব হয়। তাহলে, তাঁর '*শ্রীগৌরলীলামৃত*' কাব্যরচনা নিশ্চয়ই ১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর তিরোধানের আগে। আমার অনুমান, ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের অল্পকাল পরে কাব্যটি লেখা। এরও উদ্দেশ্য ছিল, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার চিরপ্রিয়বিচ্ছেদবেদনায় সান্ত্বনাদান। কাব্যটি তা'হলে সুনিশ্চিতভাবে ১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভগবত' কাব্যরচনার পূর্ববর্তী রচনা। অতএব এটিই নিঃসন্দেহে বাংলায় রচিত প্রথম চৈতন্যচরিতকাব্য। এ-বিষয়ে আমার তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা

ও পুথিপৃষ্ঠার প্রতিলিপি-সহ প্রবন্ধ প্রকাশের পর বাংলা শ্রীচৈতন্যচরিত-সাহিত্যের ইতিহাস নতুন ক'রে লেখা দরকার।

শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর পুত্র শ্রীবৃন্দাবনদাসের '*শ্রীচৈতন্যভাগবত*' কাব্যটি রচিত হয়েছে ১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দের আশে-পাশে। আদি, মধ্য, অন্ত্য-তিনখণ্ডে বিভক্ত বৃহৎ কাব্যটি ৫১টি অধ্যায়ে সজ্জিত। এটিও খণ্ডিত এবং অপূর্ণ কাব্য। এতে শ্রীচৈতন্যের তীর্থাদি পর্যটন, জীবনের শেষ বারো বছরের অপার্থিব গম্ভীরালীলা এবং মহাপ্রভুর লীলাসম্বরণের বিবরণ নেই। অথচ, শ্রীবৃন্দাবনদাস নীলাচল ও তীর্থস্থানাদিতে শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ চব্বিশ বছর অবস্থানের কথা জানতেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ-শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনদাস শেষদিকে শ্রীনিত্যানন্দ লীলাবর্ণনে বেশি আবেশের জন্যই কি শ্রীচৈতন্যলীলাবর্ণন শেষ করতে পারেন নি, কিংবা চান নি? তবে এ-কাব্যের আদি ও মধ্যখণ্ডে মানব নিমাই পণ্ডিত ও ভক্তবেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গের চিত্র চমৎকার ফুটেছে। ড. সুকুমার সেনের ভাষায় তা বাংলা সাহিত্যে 'Human Interest' এবং 'Social History'-র উপাদান রূপে বিস্ময়কর, সমস্ত অলৌকিকতা সত্ত্বেও উচ্চ প্রশংসনীয়।

শ্রীলোচনদাসের '*চৈতন্যমঙ্গল*' কাব্য ১৫৫০-৫৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লেখা। চারখণ্ডে গ্রথিত। শেষ খণ্ডটি অসম্পূর্ণ। এতে নানা পুরাণ-প্রসঙ্গ আছে। মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তরঙ্গ দাম্পত্যলীলা বর্ণনায় মধুররস পরিবেশনে বেশ বাড়াবাড়ি আছে, যা অবিশ্বাস্য মনে হয়। তবে এতে পাওয়া যাচ্ছে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের অলৌকিক বিবরণ।

শ্রীজয়ানন্দের '*চৈতন্যমঙ্গল*' লোকমনোরঞ্জক পাঁচালী ধরণের মন্দিরা-চামরাদি-সহ গেয় কাব্য। এ কাব্য আনুমানিক ১৫৫০-৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লেখা। এ-কাব্যের শেষে রথাগ্রে নৃত্যকালে বামচরণে ইষ্টক বিদ্ধ হয়ে শ্রীচৈতন্যের মরতনুত্যাগের বিবরণ নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবগণের কাছে বিশ্বাস্য নয়। কিন্তু সম্প্রতি এর সহযোগী প্রমাণ মিলেছে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ রায় রামানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব পট্টনায়কের ওড়িয়া পুথিতে। এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে গেছেন প্রয়াত ড. বিষ্ণুপদ পণ্ডা।

এই সংস্কৃত ও বাংলায় রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্যগুলি পরবর্তী সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্য, মহান্তচরিতকাব্য ও শাখানির্ণয়-জাতীয় কাব্যগুলিকে প্রভাবিত করেছিল বিপুলভাবে।

ষোড়শ-শতকের সংস্কৃত ও বাংলা চৈতন্যকাব্যগুলি থেকে তৎকালীন সমাজ সংস্থানের নানা বিবরণ এবং শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক তার মানবিক পরিবর্তনের নানারূপ পাই। এগুলি পরবর্তী সপ্তদশ-অষ্টদশ শতকের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য এবং সমাজ-সংরূপকে প্রভাবিত করেছিল নিশ্চিতভাবেই। তবে তারও কিছু অনিবার্য রূপান্তর ঘটেছিল। সূত্রাকারে এ-বিষয়ে বলা যায়—

১. শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপ ছিল নব্যন্যায় ও গোঁড়া স্মৃতিশাস্ত্রকার-শাসিত। বিদ্যাদর্প ও ধনগর্ব মানুষে-মানুষে ভেদ রচনা ক'রে জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়গত ও অর্থনৈতিক স্তরবিভাজিত অনৈক্য সৃষ্টি করেছিল। শ্রীচৈতন্য তাঁর মানবকল্যাণমুখী জীবনসাধনায় এর অনেকটাই দূর করতে পেরেছিলেন।

২. মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরি মনসার পূজায় ছিল ভক্তিহীন আড়ম্বর। মদ্য-মাংস দিয়ে যক্ষ

বিশ্বাবসুর পূজাও প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্য সেখানে সহজ সরল কৃষ্ণনামাশ্রয় নির্দেশ ক'রে জনগণের মধ্যে শুদ্ধা ভক্তি নিয়ে এলেন।

৩. যবন-শাসিত দেশে হিন্দুদের স্বধর্মাচরণের স্বাধীনতা ছিল না। শ্রীচৈতন্য কীর্তন-সমারোহ ও প্রতিবাদী মহামিছিল বার ক'রে কাজী মৌলানা সিরাজুদ্দীনের অন্যায় কীর্তন-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়েছিলেন। ড. সুকুমার সেন এর তাৎপর্য নির্দেশ করে 'History of Bengali Literature' (Sahitya Akademi Edn.) গ্রন্থে বলেছেন—"It was perhaps the first act of civil disobedience in India". এরই উত্তরাধিকার পরে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে বর্তেছিল।

৪. মদ্যপ ও অনাচারী নগর কোতোয়াল দুই ব্রাহ্মণ ভাই জগন্নাথ ও মাধবকে, বা জগাই-মাধাইকে ভক্তিপথিক করে তুলেছিলেন শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস। মাধাইকে গঙ্গার ঘাট বাঁধাবার নির্দেশ দিয়ে শ্রীচৈতন্য 'Community Welfare', বা লোককল্যাণের দিশা দেখালেন।

৫. নবদ্বীপে নিজ টোলের ছাত্রগণসহ নগরভ্রমণলীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ তন্তুবায়, মালি, শঙ্খবণিক, গোপ, গন্ধবণিক, তাম্বূলী প্রভৃতি বৃত্তিজীবীদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে, আজকে আমরা যাকে ব্যাপক গণসংযোগ বা 'Mass Communication' বলি, তার পথ প্রবর্তন করেন।

৬. দরিদ্র ব্রাহ্মণ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ও খোলাবেচা শ্রীধরকে শ্রীচৈতন্য মানব-মর্যাদা দিয়ে সমাজে সমস্তর বা আনুভূমিক সচলতা, অর্থাৎ এখনকার Sociology-নির্দেশিত 'Horizontal Mobility, আনলেন।

৭. যবন হরিদাসকে অদ্বৈতাচার্যের পিতৃশ্রাদ্ধে অগ্রপাত্র দান করিয়ে এবং অন্তিমকালে স্বহস্তে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও বালুসমাধি রচনা ক'রে মহাপ্রভু সমাজে স্তরান্তরিত বা উল্লম্ব সচলতা, অর্থাৎ 'Verlical Mobility', দেখালেন।

৮. হোসেন শাহকে কীর্তন-আনুকূল্য মানিয়ে নিয়ে এবং কালঞ্জর দুর্গাধিপতির পুত্র পাঠান রাজকুমার বিজুলী খান, তাঁর সঙ্গী পীর ও অশ্বারোহী যবন সৈনিক পুরুষদের শাস্ত্রালোচনায় ও ভক্তিদৃষ্টান্তে বৈষ্ণব ক'রে তুলে শ্রীচৈতন্য তৎকালীন সমাজে হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ অনেকটা দূর করেন।

৯. তাঁরই প্রেমধর্মের দৃষ্টান্তে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পাণিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীরঘুনাথ দাসের দণ্ডমহোৎসবে সব জাতির একত্রে চিঁড়া-দধি প্রসাদের পঙ্‌ক্তিভোজনের আয়োজন করেন। একেই '*দেশ*' পত্রিকায় পরপব দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী এবং আমি দেখিয়েছি—এ ছিল সে-যুগে আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের, বা 'Spiritual Democracy'-র দৃষ্টান্ত।

১০. শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত অদ্বৈতপন্থী বৈদান্তিক শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমকে এবং কাশীর বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে

তর্কযুদ্ধে ও শাস্ত্রোলোচনায় পরাস্ত ক'রে দ্বৈতবাদী ভক্তিপথিক ক'রে তোলেন। এতে সর্বভারতে বাঙালীর শাস্ত্রোজ্জ্বলা মনীষার প্রতিষ্ঠা হ'ল।

১১. গোদাবরী তীরে রায়-রামানন্দের সঙ্গে 'সাধ্য-সাধনতত্ত্ব' আলোচনাকালে শ্রীচৈতন্য শূদ্র রামানন্দকে শিক্ষাগুরুর মান্যতা দিয়েছিলেন—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" এই দৃষ্টান্তে সপ্তদশ শতকে কায়স্থ নরোত্তম দত্ত এবং গোয়ালা শ্যামানন্দ বৈষ্ণবগুরুর মান্যতা পেয়েছিলেন। তাঁদের বহু ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিল। এভাবে গুরুপদ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেল।

১২. শ্রীচৈতন্যই বাঙালীদের মধ্যে প্রথম পরিব্রাজক 'ভারতপথিক'। গৌড়বঙ্গ ও উৎকল থেকে সমগ্র দক্ষিণভারত, বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা-বৃন্দাবনে তীর্থপর্যটন ও নামপ্রেম-প্রচার ক'রে শ্রীচৈতন্য বাঙালী জাতিকে সর্বভারতীয় প্রীতিডোরে বাঁধলেন। ঘরকুণো বাঙালী প্রথম 'National Integrity' বা জাতীয় সংহতির স্বাদ পেল। এ কাজ পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীশ্যামানন্দও ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে করেছেন।

আমাদের এসব-কথা বলার উদ্দেশ্য, ষোড়শ শতকের সমাজের সঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্যের এই নানামুখী সংযোগের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে কতটা বাহিত হয়েছে, সংক্ষেপে তা দেখা।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর রচনাদির কথা আগে বলেছি। শ্রীনিত্যানন্দের তিরোভাব আনুমানিক ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর সংস্কৃত ও বাংলা রচনাদির কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দে ১২৫ বছর বয়সে হয় অদ্বৈতাচার্যের মহাপ্রয়াণ। অদ্বৈতাচার্যের রচনাদির কথাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশেষ কিছু জানা নেই। তবে শ্রীচৈতন্যের মর্ত্যলীলা-সংবরণের ইঙ্গিত দিয়ে অদ্বৈতাচার্য আচার্য জগদানন্দের মারফৎ নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে "বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল"—ইত্যাদি চারছত্রের একটি প্রহেলিকা 'তরজা' পাঠান। সম্ভবত, এটি তাঁর বাংলা রচনার একমাত্র দৃষ্টান্ত। এর অল্পকাল পরেই শ্রীমন্মহাপ্রভু মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন।

২. বৃন্দাবনে ষোড়শ শতকে ও সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চা ঃ

বৃন্দাবনে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু ক'রে সপ্তদশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ষড় গোস্বামী ও অন্যান্য নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ভক্তগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুশীলন করেন। তার প্রায় সবই সংস্কৃতে। একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্য '*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*' বাংলায় রচিত কালজয়ী মহাগ্রন্থ।

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ছিলেন শ্রীচৈতন্যের প্রথম শিষ্য শ্রীতপন মিশ্রের পুত্র। তিনি কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। তবে তাঁর ভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের খুব প্রিয় ছিল। শ্রীরঘুনাথ ভট্টের অপ্রকট সম্ভবত ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দে।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সংস্কৃতে '*চৈতন্যাষ্টক*' ও '*গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ*' নামে দুটি ছোট স্তোত্রে শ্রীচৈতন্যবন্দনা করেছেন। তাঁর '*স্তবমালায়*' অনেকগুলি স্তব ও প্রার্থনা আছে। এগুলির প্রভাব ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের শ্রীচৈতন্যবিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকা পদাবলীতে পড়েছে। তাঁর '*মুক্তাচরিত্র*'

গদ্যে-পদ্যে মেশা চম্পূকাব্য। মুক্তার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের কাছে দেহদান-প্রার্থনা এর বিষয়; অনেকটা বৈষ্ণব পদাবলীর 'দানলীলা'র মতো। পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে দানলীলা-পালায় এর ঠিক প্রভাব পড়ে নি। তাঁর '*দানকেলিচিন্তামণি*' ভাণিকা শ্রীরূপ গোস্বামীর '*দানকেলিকৌমুদী*'র আদর্শে রচিত। বিষয়টি অভিনব। নান্দীমুখীর মধ্যস্থতায় মানসগঙ্গার কুঞ্জাভ্যন্তরে রাধা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দান দিলেন। ঠিক এমন ঘটনার প্রভাবও পরবর্তী বাংলা দানলীলা পদাবলীতে পড়ে নি। শ্রীরঘুনাথ দাস অন্তশ্চিন্তিত ভাবদেহে মঞ্জরী-অনুগত হয়ে কল্পনাবলে এসব গ্রন্থ লেখেন। বোঝা যায়, তিনি ছিলেন মঞ্জরী-অনুগত রাগানুগামার্গের সাধক। শ্রীদাস গোস্বামীর তিরোধান সম্ভবত ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার পূর্বেই শ্রীদাস গোস্বামীর কাছে শ্রীচৈতন্যজীবনকথা ও মহাপ্রভুব তত্ত্বরূপের কথা শুনেছেন এবং '*শ্রীচৈতন্যচরিতমৃতে*'র সম্পুটে তা ভ'রে রেখেছেন।

প্রসিদ্ধ ষড় গোস্বামীর সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রীসনাতন গোস্বামী '*ভাগবতে*'র দশম স্কন্ধের সংস্কৃত টীকা লেখেন '*বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী*'। এটি '*দশম টিপ্পনী*' নামেও পরিচিত। এতেই কাব্যশাস্ত্রের পরম বৈচিত্রীর উদাহরণ দিতে 'শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদিলীলা প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়া ঃ' বলা হয়েছে। এটি বড়ু চণ্ডীদাসের '*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*' কাব্যের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ কি না, সে-বিষয়ে বিতর্ক আছে। এছাড়াও তিনি '*ভাগবত*' অবলম্বনে '*বৃহৎভাগবতামৃত*' নামে একটি পৌরাণিক ভাবধর্মী বৈষ্ণবকাব্য লেখেন। এতে '*ভাগবত*' ও অন্যান্য পুরাণ অনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব, দর্শন ও আদর্শ ব্যাখ্যাত। স্বরাচিত '*দিগ্‌দর্শিনী*' টীকায় শ্রীসনাতন গ্রন্থের আশয় আরো স্পষ্ট করেছেন। শ্রীচৈতন্যের বন্দনাশ্লোকে কিন্তু তাঁকে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার বলা হয় নি। তাঁর '*লীলাস্তব*' বা '*দশমচরিত*' গ্রন্থের পুথি পাওয়া যায় নি। শ্রীসনাতন সম্ভবত ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিরোধান করেন।

কবিত্বে, পাণ্ডিত্যে, নাট্যবোধে, রসজ্ঞতায়, আলঙ্কারিকতায় সনাতনের অনুজ শ্রীরূপ গোস্বামী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর '*হংসদূত*' ও '*উদ্ধবসন্দেশ*' কাব্যদুটি সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্য-সংসর্গের আগে লেখা। মহাপ্রভুর উপদেশে শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অবলম্বনে '*বিদগ্ধমাধবম্*' নাটক রচনা সমাপ্ত করেন গোকুলে, ১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে। আর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অবলম্বনে '*ললিতমাধবম্*' নাটক সমাপ্ত করেন ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে, ভদ্রবনে। পরবর্তী সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব পদাবলীতে এই দুটি সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু প্রভাব পড়েছে। শ্রীরূপ '*নিকুঞ্জরহস্যস্তবাবলী*'তে অন্তশ্চিন্তিত ভাবদেহে মঞ্জরী-সাধকের মতো রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জবিলাস স্মরণ করেছেন। তাঁর '*চাটুপুষ্পাঞ্জলি*' ও '*স্তবমালায়*' নানা বৈষ্ণব প্রার্থনা ও দৈন্যাত্মিকা পদ সংকলিত। '*পদ্যাবলী*' পূর্বাপরপ্রচলিত নানা সংস্কৃত বৈষ্ণব কবিতার সংকলন। এর মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যের '*শিক্ষাষ্টকে*'র আটটি সংস্কৃত শ্লোক পাচ্ছি। এখান থেকে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্লোকগুলি সংগ্রহ ক'রে '*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে*'র অন্ত্যলীলার শেষ বিংশ পরিচ্ছেদে গ্রথিত করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও অলঙ্কারশাস্ত্রে শ্রীরূপের শ্রেষ্ঠ অবদান '*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*' ও '*উজ্জ্বলনীলমণি*' গ্রন্থদুটি। '*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*' শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালেই লেখা শুরু হয়েছিল। তবে '*উজ্জ্বলনীলমণি*' রচিত হয় শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরে। '*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*' সমাপ্ত হয় ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে। '*উজ্জ্বলনীলমণি*'র সমাপ্তিকাল এর বেশ কিছু পরে। '*ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে*' বৈধী ও রাগানুগা ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত। এর চারটি বিভাগে (১) সাধনভক্তি, (২) ভাবভক্তি ও (৩) প্রেমভক্তি

ব্যাখ্যাত। তিনি প্রেমভক্তিতে মুখ্য পঞ্চ ভক্তিরসের পরিচয় দিয়েছেন—(১) শান্ত, (২) দাস্য বা প্রীত, (৩) সখ্য বা প্রেয়স্, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর বা উজ্জ্বল। আর সপ্ত গৌণী ভক্তিরসের মধ্যে রয়েছে—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। তাঁর 'Rasa Synthesis'-মতে, সকল মুখ্য ও গৌণরসের অন্তর্ভাবনা ও সম্মিলন—একক ভক্তিরসে। এর কিছুই লৌকিক নয়, সবটাই অলৌকিক।

'*উজ্জ্বলনীলমণি*'তে উজ্জ্বল বা মধুর রসের সর্ববিধ বিস্তার। এর আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব, নায়কভেদ প্রকরণ, নায়িকাভেদ প্রকরণ, সখা, সখী ও দূতী প্রকরণ, বিরোধী রসের পরিচায়ন, স্নেহ, প্রেম, ভাব, মাদন ও মোদনাখ্য মহাভাব প্রভৃতির বিশ্লেষণ গভীর মননশীল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও ভক্তিভাবিত। ড. সুশীলকুমার দে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজন ও বর্গীকরণে বাঙালী মনীষার নব্যন্যায়ের প্রভাব দেখেছেন। এর ভালো-মন্দ—দুটি দিকই আছে। এই দুই মহাগ্রন্থের প্রভাবে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলী রচনা সুনিয়ন্ত্রিত, সংযমিত ও আদর্শায়িত হয়ে গেল। এটি এর ভালো দিক। আব মন্দ দিক হ'ল—অতিরিক্ত আলঙ্কারিক বিধিবিধানের আনুগত্যে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে 'Spontaneity' বা স্বতস্ফূর্ততা হারিয়ে 'Stereotyped' বা বাঁধা ছকে গাঁথা হয়ে গেল। ফলে অজস্র পদাবলী রচিত হলেও অধিকাংশই পুরোনোর পুনরাবৃত্তি ও চর্বিতচর্বণ।

ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের তিন বছর আগে লোকান্তরিত হন। অর্থাৎ তিনি পরলোকগমন করেন—১৫৫২ খ্রীস্টাব্দে।

শ্রীসনাতন '*হরিভক্তি বিলাস*' গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় বৈধী সাধনার যাবতীয় কৃত্যাদি সংকলন করেন। এটি শ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ বৈষ্ণব বিধিগ্রন্থ। শ্রীসনাতন পূর্বতন যবন-সংস্পর্শের সঙ্কোচে বইটি নিজের নামে বৈষ্ণবসমাজে চালাতে চান নি। তাই এটি ব্রাহ্মণ আচার্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নামে প্রচারিত।

উপরের বিবরণে দেখা যাচ্ছে, বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী বৈধী ও রাগানুগা দুরকম সাধনা-পদ্ধতির কথাই বলেছেন। উভয়ের সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেছেন শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব '*ষট্‌সন্দর্ভে*'। শ্রীজীবের প্রসিদ্ধ ষট্‌সন্দর্ভ হ'ল ছয়টি দার্শনিক গ্রন্থ—'*তত্ত্বসন্দর্ভ*', '*ভগবৎসন্দর্ভ*', '*পরমার্থসন্দর্ভ*', '*শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ*', '*ভক্তিসন্দর্ভ*' ও '*পরমাত্মসন্দর্ভ*'। এই গ্রন্থগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনাকে সুদৃঢ় দার্শনিকভিত্তি দিয়েছে। দার্শনিক শ্রীজীবের কবিপ্রতিভার দান বৃহৎ '*গোপালচম্পূ*' কাব্য (১৬৪৯ সংবৎ)। গদ্য-পদ্যময় এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সঙ্গে মিল রেখে গোলোকের বিষ্ণুলীলা বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার সমান মর্যাদা স্বীকার ক'রে শ্রীজীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিচিন্তাকে নতুন দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

ষোড়শ শতকের শেষ দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে একটি প্রধান বিতর্ক ছিল শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া, না পরকীয়া কান্তা? শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরাধাকে 'পরমস্বীয়া' বা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা বলেছেন। ১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী তাঁর শেষ বৃন্দাবনযাত্রায় কাম্যকবনে গোপীনাথ-মন্দিরে গোপীনাথ বিগ্রহের বাম পাশে শ্রীরাধিকার মূর্তি স্থাপন ক'রে স্বকীয়াবাদকেই প্রতিষ্ঠা দিলেন। কিন্তু পরে শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে, ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে মালিহাটিতে অনুষ্ঠিত বিচারসভায় জয়পুরের পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত ক'রে 'পরকীয়াবাদ' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং বিজয়পত্র লিখিয়ে নেন।

শ্রীজীব গোস্বামীর তিরোধান হয় ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দের কিছু আগে। তার পূর্ব পর্যন্ত, ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বৃন্দাবন ও বঙ্গের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রধান সংযোগ-সেতু। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীমতী বসুধার পুত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব নেতা শ্রীবীরভদ্র বা শ্রীবীরচন্দ্র। শ্রীনিবাস আচার্য এবং শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজের সঙ্গে তাঁর সংস্কৃতে পত্রালাপ ছিল। এরকম বেশ কিছু পত্র পরবর্তীকালে, সপ্তদশ শতকে শ্রীনরহরি চক্রবর্তী '*ভক্তিরত্নাকর*' কাব্যে তুলে দিয়েছেন। শ্রীজীব গোস্বামীই উদ্যোগ নিয়ে বৃন্দাবন থেকে শতাধিক বৈষ্ণবগ্রন্থ একটি বৃহৎ সুরক্ষিত পেটিকায় পুরে শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ—বৈষ্ণব আচার্য-ত্রয়ীর সঙ্গে গৌড়ে পাঠিয়েছিলেন। ঐ পেটিকা বন-বিষ্ণুপুরের ডাকাত রাজা বীর হাম্বীরের অনুচরদল লুণ্ঠন ক'রে নেয়। এ-প্রসঙ্গ এবং উল্লিখিত আচার্যত্রয়ীর কথা সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য প্রসঙ্গে পরে আসছি।

৩. সপ্তদশ শতকের যুগ-বৈশিষ্ট্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যের কয়েকটি দিক :

ষোড়শ শতকের শেষপাদে বঙ্গদেশ পুরোপুরি মুঘল শাসনে আকবরের অধীনে আসে। এই সময় তাঁর সেনাপতি মানসিংহ কিছুকাল—'গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' ছিলেন। মানসিংহ ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ তাঁকে বলেছেন—'বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ'। মানসিংহ বৃন্দাবনে গোস্বামীদের দেবকীর্তি স্থাপনে সাহায্য করেন। তিনি শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্যও হতে চেয়েছিলেন। আকবরের রাজস্বসচিব তোডরমল ও সেনাপতি মানসিংহ-প্রবর্তিত ভূমি-ব্যবস্থায় বঙ্গে কৃষি ও অন্যান্যক্ষেত্রে সমৃদ্ধি এল। ছোট ছোট ভূস্বামীরা সমৃদ্ধ হয়ে রাজগৌরব পেতে চাইলেন। বৈষ্ণব-ধর্মের আশ্রয়ে তাঁদের মর্যাদাবৃদ্ধিতে সামাজিক 'উল্লম্ব সচলতা' বা 'Vertical Social Mobility' সাধিত হ'ল। তখন স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম হচ্ছিল কঠোরতর। জাত-পাতের ব্যবধান এবং ব্রাহ্মণের কৌলীন্য-অহঙ্কার ও দীক্ষাগুরুগর্ব বাড়ছিল। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত মানবিক বৈষ্ণবধর্ম সপ্তদশ শতকেও এই স্মৃতিবিধানবন্ধন শিথিল করতে এবং জাতিগত বিভেদ দূর করতে অনেকটাই সহায়ক হয়। David Mccutchion, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, প্রণবকুমার রায় প্রভৃতি মন্দিরবিশেষজ্ঞগণ দেখিয়েছেন, সপ্তদশ শতকে বঙ্গে টেরাকোটা-অলঙ্করণে সমৃদ্ধ যে-সব চারচালা, আটচালা ও শিখর মন্দির স্থাপিত হয়েছে তার অধিকাংশই নির্মাণ করেছেন বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয়ে নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা রাজা, জমিদার, ভূস্বামী ও সম্পন্ন গৃহস্থরা। তারাপদ সাঁতরা দেখিয়েছেন, এই সমস্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বলরাম-কৃষ্ণ ও গৌর-নিতাইয়ের দারুমূর্তিতে বঙ্গে দারু ভাস্কর্যের একটা নতুন দিক খুলে যায় এবং তার সমৃদ্ধি ঘটে। রেবতী, রাধারানী ও বালগোপালের অষ্টধাতুব বিগ্রহ নির্মাণে ধাতুশিল্পেরও উন্নতি হয়।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধে শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তিন প্রধান আচার্য এবং স্তম্ভই তিরোহিত। বৃন্দাবনের প্রধান গোস্বামিগণের প্রায় সকলেই তিরোহিত; কেবল শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী আরো কিছুকাল জীবিত ছিলেন।

প্রধান আচার্যত্রয়ীর তিরোধানে বঙ্গে বৈষ্ণবসমাজের নেত্রী হলেন শ্রীনিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী বিদুষী জাহ্নবা দেবী। ১৫৮১, অথবা ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁরই নেত্রীত্বে শ্রীনরোত্তম দত্ত পূর্ববঙ্গে রাজশাহীর খেতুরীতে সুবৃহৎ বৈষ্ণব সম্মেলন করেছিলেন, যা প্রাচীন বৌদ্ধদের বিশাল মহাসঙ্গীতির তুল্য। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী, শ্রীবীরচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী, অদ্বৈতাচার্যের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীসীতা দেবী এবং শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর বৈষ্ণবশাস্ত্র-অনুশীলনে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব গৃহস্থদের অন্তঃপুরেও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটল। এর প্রভাব অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতক পর্যন্ত সঞ্চারিত। উনিশ শতকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরিকাদের গৃহশিক্ষা দিতেন দয়া বৈষ্ণবী।

১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে বৃন্দাবনে গোপীনাথ মন্দিরে শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী অপ্রকট হন। তাঁর অন্তর্ধানে বঙ্গে বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র ও শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীবীরচন্দ্র, জাহ্নবা দেবীর পালিত পুত্র ও প্রধান দীক্ষিত শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী, অদ্বৈতাচার্যের পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীগোপাল ভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীনরোত্তম দত্ত ঠাকুর এবং শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর কাকা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের নাতজামাই শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শিষ্য গোপ শ্রীশ্যামানন্দ। এঁদের মধ্যে শ্রীবীরচন্দ্র, শ্রীঅচ্যুতানন্দ এবং শ্রীনিবাস আচার্য বিশেষ কিছু লেখেন নি। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী, বৈষ্ণব বিধিনিবন্ধ ও তত্ত্বগ্রন্থ, মহান্তজীবনী প্রভৃতি সপ্তদশ শতকেই লিখেছেন শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী, তাঁর ভাই শ্রীশচীনন্দনদাস, ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য রাজবল্লভ, অন্যতম প্রধান শিষ্য হরি গোস্বামী, শ্রীরামচন্দ্রের প্রশিষ্য প্রেমদাস, নরোত্তম ঠাকুর এবং দুঃখী কৃষ্ণদাস, বা গোপ শ্যামানন্দ। রামচন্দ্র, তাঁর ভ্রাতা, শিষ্য ও উত্তরপুরুষগণ বাঘনাপাড়া শ্রীপাট-পত্তন এবং তার সমৃদ্ধিসাধন করেন। এঁদের বৈষ্ণব সাহিত্যসাধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে আর একটি উপচ্ছেদে দিচ্ছি। এই উপচ্ছেদে প্রধানত আচার্যত্রয়ী শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দের কথা সংক্ষেপে বলছি। প্রসঙ্গত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজ ও শ্রীজ্ঞানদাসের কথাও একটু ছুঁয়ে যাব, কারণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থাদি এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থাদিতে এঁদের কথা প্রচুর বলা হয়েছে।

প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের '*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*' মহাকাব্যের কথা না বললেই নয়। এটি শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেরই নয়, আবহমানকালের সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরও সম্ভবত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থসমাপ্তিতে 'শাকে সিন্ধ্বগ্নি বাণেন্দৌ'...... ইত্যাদি শ্লোকানুসারে গ্রন্থটির রচনাকাল ১৫৩৭ শক, বা ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দ। ড. সুকুমার সেন এই সনতারিখে বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে, ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই '*চৈতন্যচরিতামৃতে*'র রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী গবেষক ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, '*চৈতন্যচরিতামৃতে*'র রচনাকাল ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দ। আমরা তাই কাব্যটিকে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সূচনায় রচিত, ধরছি।

'*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*' মহৎ কবি ও মহান বৈষ্ণব সাধকের লেখা। মহান বৈষ্ণব সাধকদের ও ভক্তদের পাঠের জন্য রচিত। আদি, মধ্য ও অন্ত্য তিনটি লীলা এবং বাষট্টিটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। গ্রন্থে বিভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য-নাটকাদি ও প্রাকৃত উৎস থেকে ১০১১টি শ্লোক সংগৃহীত ও ব্যাখ্যাত। এদের মধ্যে ১০১টি শ্লোক শ্রীকৃষ্ণদাসের নিজের রচনা। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ,

সর্বপ্রামাণ্য ও সর্বমান্য শ্রীচৈতন্যের পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ। এর আদিলীলায় শ্রীচৈতন্যকে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যুগলমূর্তিরূপে উপস্থাপনা ও 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা; মধ্যলীলায় অদ্বৈতবাদী বাসুদেব সার্বভৌমকে শ্রীচৈতন্যের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত ক'রে দ্বৈতবাদী ভক্তিপথিক ক'রে তোলা, রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের মধ্যে 'সাধ্য-সাধন তত্ত্ববিচার', শ্রীচৈতন্যের সমগ্র দক্ষিণ ভারত, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবনে তীর্থ পর্যটন ও লুপ্ত বৈষ্ণব তীর্থোদ্ধার, সর্বোপরি অন্ত্যলীলায় শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক দিব্যোন্মাদে গম্ভীরালীলার প্রকৃত পরিচয়দান এবং মহাপ্রভুর মুখোচ্চারিত '*শিক্ষাষ্টকে*'র সংস্কৃত শ্লোকগুলির মর্মব্যাখ্যান—কোনো শ্রীচৈতন্যজীবনীগ্রন্থ, অথবা অন্য কোনো বৈষ্ণবগ্রন্থে নেই। তত্ত্ববিচারের দার্শনিকতা, ঐতিহাসিকের প্রমাণ-সহ তথ্যসন্নিবেশ এবং সহৃদয় কবির রসজ্ঞতা ও ভক্তিভাবুকতা—এই ত্রয়ী উপাদান মিলে '*চৈতন্যচরিতামৃত*'কে বাংলা ভাষার কালজয়ী মহাগ্রন্থে পরিণত করেছে। ড. সুকুমার সেন ঠিকই বলেছেন, কৃষ্ণদাসের '*চৈতন্যচরিতামৃত*' রচনা '*গীতা*' ও '*ভাগবত*' ছাড়া অন্য সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠকে অপ্রয়োজনীয় করে দিয়েছে। '*চৈতন্যচরিতামৃতে*'র বিপুল প্রভাব তাই পরবর্তী সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের সমস্ত বৈষ্ণব মহান্ত-চরিতগ্রন্থের উপর বিস্তৃত। এমনকি, বৈষ্ণব সহজিয়াগণও '*চৈতন্যচরিতামৃত*'কে তাঁদের আদিগ্রন্থ ব'লে স্বীকার ক'রে বহুমান দিয়েছেন।

ষোড়শ শতকের শেষপাদ থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যদ্বয়, দুইভাই শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজ, জাহ্নবা দেবীর শিষ্য শ্রীজ্ঞানদাস ও শ্রীবলরামদাস ব্রজবুলি ও বাংলা পদাবলী সাহিত্যকে আলোয় আলোকময় করে রেখেছেন। রামচন্দ্রের রূপানুরাগ ও স্মরণ-মনন পদাবলী, শ্রীগোবিন্দদাসের গৌরাঙ্গবিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকা পদাবলী এবং অভিসার পদাবলী, শ্রীজ্ঞানদাসের রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও বংশীশিক্ষা পদাবলী এবং শ্রীবলরামদাসের বাৎসল্য ও সখ্যলীলা এবং রসোদ্গারের পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। এগুলি বহুচর্চিত বিষয়; তাই এদের বিশদ আলোচনায় যাব না। এই পর্বে বেশ কিছু বৈষ্ণবমহান্তচরিত, শাখানির্ণয় এবং তত্ত্বনিবন্ধ গ্রন্থাদি লেখা হয়েছে। কৌতূহলী পাঠকরা ড. সুকুমার সেনের '*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে*'র সর্বশেষ আনন্দ সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের '*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*' গ্রন্থের পরিমার্জিত তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বে এদের বিস্তৃত বিবরণ দেখে নেবেন।

এবার আসছি আচার্যত্রয়ীর কথায়। শ্রীনিবাস আচার্য বীর হাম্বীরের সভায় গিয় '*ভাগবত*' পাঠে তাঁকে মুগ্ধ ক'রে বৃন্দাবন থেকে পাঠানো বৈষ্ণব গ্রন্থপেটিকা উদ্ধার করেন। বীর হাম্বীর এবং তাঁর পুত্র ধাড়ী হাম্বীর ও তাঁদের সমগ্র প্রজাবর্গ শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবদীক্ষা নিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য নিজে কিছু লেখেন নি। কিন্তু শ্রীনিবাসের শিষ্য বীর হাম্বীর দুটি বৈষ্ণব পদ লিখেছিলেন। একটি গুরু শ্রীনিবাসের বন্দনাপদ। আর একটি নবানুরাগিনী রাধার দৃষ্টিতে কালাচাঁদের স্বরূপ বর্ণন, যার প্রথম পঙ্ক্তি "শুনগো মরমসখী/কালিয়া কমল আঁখি কিবা/হৈল কিছুই না জানি।" ধাড়ী হাম্বীরের ভণিতাতেও গুরু শ্রীনিবাসের একটি বন্দনাপদ আছে। শ্রীনিবাসের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরানীর শিষ্য শ্রীযদুনন্দনদাস লেখেন বৈষ্ণব ইতিহাস ও তত্ত্বকাব্য 'কর্ণানন্দ'।

শ্রীনরোত্তম দত্ত ঠাকুর কায়স্থ হলেও ব্রাহ্মণ-গুরুর মর্যাদা পেয়েছিলেন। তাঁর বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। তাঁরা মস্তকে গুরুর পদধূলি নিতেন। প্রসিদ্ধ নরোত্তম 'খেতুরী উৎসবে'র আয়োজক-রূপে বৈষ্ণব ইতিহাসে বহুমানিত। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। বস্তুত 'খেতুরী উৎসবে'ই তিনি গড়েরহাটী বা গরাণহাটী কীর্তনরীতি প্রবর্তন করেন, যেমন মনোহরশাহী কীর্তনরীতির প্রবর্তক শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁর শিষ্যবর্গ। শ্রীনরোত্তম ছিলেন প্রেমিক বৈষ্ণব সাধক ও সুকবি। তাঁর '*প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা*'র পদগুলি এখনো বৈষ্ণব সাধকদের নিত্যপাঠ্য। আর তাঁর প্রার্থনা-পদাবলী আন্তরিক দৈন্যার্তিতে, বৃন্দাবনের কুঞ্জে মানস মঞ্জরীসাধনার ব্যাকুল কামনায় এবং সরল প্রকাশভঙ্গীতে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকল শ্রেণীর পাঠকের মন ভরিয়ে দেয়।

দুঃখী কৃষ্ণদাসের গোপকুলে জন্ম। কিন্তু বৃন্দাবন গিয়ে বৈষ্ণবশাস্ত্রপাঠ ও সাধনায় তিনি গুরুর গৌরব লাভ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর নাম দেন শ্রীশ্যামানন্দ। তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুরে বৈষ্ণব শ্রীপাট ও মন্দির স্থাপন করেন। তাঁরও বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শিষ্য ছিল। শ্যামানন্দ উৎকলের নানা স্থানেও বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও শিষ্যধারা বিস্তার করেন। তিনি সংস্কৃত, ব্রজবুলি, বাংলা এবং বাংলা-ওড়িয়া মিশ্রভাষায় কিছু বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন। মুসলমান-ডাকাত শের খাঁকে বৈষ্ণব দীক্ষা দিয়ে তিনি পদকর্তা চৈতন্যদাসে পরিণত করেন। শ্যামানন্দের স্ত্রী শ্যামপ্রিয়াও কিছু বৈষ্ণব পদ লেখেন। শ্যামানন্দের এক প্রধান শিষ্য শ্রীগোপীজনবল্লভদাস, শ্রীশ্যামানন্দের অপর প্রধান শিষ্য শ্রীরসিক মুরারির জীবনীকাব্য '*রসিকমঙ্গল*' (১৬৬০ খ্রীঃ) রচনা করেন। শ্রীরসিক মুরারির রচিত নিজস্ব কিছু বৈষ্ণব পদও আছে। আর শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত '*ব্রহ্মসূত্রে*'র গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-সম্মত সংস্কৃত '*গোবিন্দভাষ্যে*'র গুরুত্বের কথা আগেই বলেছি।

শ্রীরামচন্দ্রের সংস্কৃতে লেখা '*কড়চা*' গ্রন্থটি পাওয়া যায় নি। শুধু এর দুটি শ্লোক শ্রীরামচন্দ্রের প্রশিষ্য কবি প্রেমদাসের '*বংশীশিক্ষা*' (১৬১৬ খ্রীঃ) গ্রন্থে রক্ষিত হয়েছে। শ্লোকদুটি থেকে বোঝা যায়, এটি ছিল শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ শ্রীবংশীবদন চট্টোর সংস্কৃত জীবনী। শ্রীরামচন্দ্রের '*পাষণ্ডদলন*' সাধন-নিবন্ধ-জাতীয় শাস্ত্রীয় বিচারমূলক কাব্য। এই গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্র ২৪টি বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে ১১৪টি প্রমাণশ্লোক উৎকলন করেছেন। তাদের ভাববিস্তারে শ্রীরামচন্দ্র প্রতিপাদন করেছেন অন্যধর্মের তুলনায় বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। James Long তাঁর বিখ্যাত 'Catalogue'-এ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—"A Vanshnava's refutation of other sects."

শ্রীরামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা—'*অনঙ্গমঞ্জরী সম্পুটিকা*'। চারটি লহরী এবং একটি সংপ্রার্থনায় কাব্যটি সম্পূর্ণ। এটি রামচন্দ্রের দীক্ষাগুরু শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর অনঙ্গমঞ্জরী-পরিচয় এবং তত্ত্বব্যাখ্যানের কাব্য। অনঙ্গমঞ্জরী রাধার অনুজা এবং বলরাম-শক্তি। তাঁর বর্ণনায় রামচন্দ্রের স্নিগ্ধ কবিদৃষ্টি রূপোজ্জ্বল। যেমন—

> "ললাটেসিন্দূরবিন্দু মেঘতলে যেন ইন্দু তারাগণ অলকার ভাঁতি।
> পিঠেতে দোলিছে বেণী ফণিমুখে যেন মণি মল্লিদাম ভ্রমরের পাঁতি।।....
> নীলপট্ট আভরণ মেঘেতে বিজুরি যেন ডগমগি চকিত চাহনি।।
> অনঙ্গকাননমুখে রাধানুজা চলে সুখে নিজ যূথ সঙ্গে করি ধনী।।

Edward C. Dimock (Jr.) তাঁর 'Place of the Hidden Moon' গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রের রচনাবলীকে 'Sahajiya Texts' বলেছেন। মোটেও তা নয়। শ্রীরামচন্দ্রের '*পাষণ্ডদলন*' গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বৈধী সাধনার কাব্য; আর '*অনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা*' রাগানুগা মার্গের মঞ্জরীসাধনার কাব্য। এদের মধ্যে সহজিয়া সাধনার নামগন্ধটুকুও নেই। আমি আমার গবেষণাগ্রন্থ '*বাঘনাপাড়া-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্যে*' অধ্যাপক ডিমকের এই বিষয়ক ভ্রান্তি সম্যক নিরসন করেছি। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন বৈধী ও রাগানুগা সাধনার সমন্বয়-সাধক।

আমি বিভিন্ন পদাবলী সঙ্কলন গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রের ব্রজবুলি ও বাংলায় লেখা আটটি পদ পেয়েছি। তাদের মধ্যে সরল বাংলায় লেখা '*হা হা* মোর কি ছাড় অদৃষ্ট' পদটি ('*শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী*', ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩৩-৩৪ দ্রষ্টব্য) আন্তরিক দৈন্যার্তিতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা-পদকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্রীরামচন্দ্রের তিরোভাব হয় ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দে। তারপর বাঘনাপাড়ার দেবসেবার ও বৈষ্ণবমণ্ডলীর ভার নেন তাঁর ভাই শ্রীশচীনন্দনদাস গোস্বামী। ইনিও শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ও পুত্রবৎ পালিত। এঁরই তত্ত্বাবধানে ও কৃষ্ণনগরের রাজবংশের অর্থানুকূল্যে ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় বলরাম কৃষ্ণের টেরাকোটা অলঙ্করণে সমৃদ্ধ আটচালা রীতির ইষ্টকমন্দির স্থাপিত হয়। এরপর শ্রীশচীনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের '*পাষণ্ডদলনে*'র আদর্শে নানা সংস্কৃত প্রমাণশ্লোক-সহ '*পাষণ্ডৌৎসুক্য প্রার্থনা*'—এই বৈষ্ণব বিধিগ্রন্থটি লেখেন। তাঁর '*গৌরাঙ্গবিজয়*' কাব্যটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি। তবে এর অন্তর্বর্তী 'বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা'-পদটি ('ইহ পহিল মাঘকি মাহ') এবং 'শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তরশত নামে'র ("জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন") পদ-দুটি কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান অষ্টশাখার অন্যতম, তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য দ্বিজ হরিদাস-রচিত ৪৫টি পয়ারে গাঁথা '*শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম*' পদ আজো বৈষ্ণবদের নিত্যপাঠ্য এবং প্রভাতী মঙ্গলটহলের অঙ্গ। শ্রীরামচন্দ্রের অন্যতম শিষ্য বড়ু ঠাকুর রচিত কিছু পদাবলী পাওয়া গেছে। ড. সুকুমার সেনের মতে, "ইনি রাগাত্মিক পদাবলীর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।"

শ্রীরামচন্দ্রের তিরোভাবের পর তাঁর প্রধান শিষ্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামী সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে '*মুরলীবিলাস*' কাব্য লেখেন। এটি কৃষ্ণকরস্থা মুরলীসদৃশ, প্রপিতামহ শ্রীবংশীবদন চট্টো ও তাঁর উত্তর পুরুষগণের জীবনীকাব্য। এতে শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী, শ্রীবীরচন্দ্র ও শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে বহু নতুন ঐতিহাসিক তথ্য আছে। ড. বিমানবিহারী মজুমদার '*শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান*' গ্রন্থে এটিকে '*জাল বই*' রূপে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ড. বিজিতকুমার দত্ত বাঁকুড়ার ভীমরডা গ্রাম থেকে এর একটি প্রামাণ্য সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কার ক'রে ও পুথিটির আলোচনা ক'রে '*মুরলীবিলাস*' কাব্যের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করেন। '*মুরলীবিলাসে*' শ্রীরাজবল্লভের নিজের লেখা একটি দোললীলার পদ আছে।

শ্রীরাজবল্লভের দুই ভাই শ্রীবল্লভ ও শ্রীকেশব লেখেন যথাক্রমে দুটি বৈষ্ণব কাব্য—'*শ্রীবল্লভলীলা*' ও '*কেশবসঙ্গীত*'। কাব্যদুটি এখন লুপ্ত। 'বল্লভদাস' ভণিতায় লেখা কোনো কোনো বৈষ্ণবপদ এই শ্রীবল্লভের রচনা হ'তে পারে।

শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য দ্বিজ হরিদাসের প্রশিষ্য প্রেমদাস বা পুরুষোত্তম মিশ্র সপ্তদশ শতকের আদ্যভাগের শক্তিশালী বৈষ্ণব কবি। এঁর বাংলা ও ব্রজবুলিতে বহু মনোগ্রাহী পদ আছে। তাদের মধ্যে সরল বাংলায় লেখা নিমাইসন্ন্যাসের পদগুলি আন্তরিক ও চিত্তদ্রাবী। প্রথম যৌবনে বৃন্দাবনে বাসকালে ইনি '*ভক্তিরসকৌমুদী*' নামে বৈষ্ণব ভক্তিরস বিচারের একটি তত্ত্বনিবন্ধ কাব্য লেখেন। এঁর '*মনঃশিক্ষা*' পদাবলী নিজ মনকে সম্বোধন ক'রে অধ্যাত্মসাধনার কাব্য। ইনি ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত '*চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে*'র সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ কাব্যানুবাদ করেন '*চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী*' নামে। এতে মূলাতিরিক্ত কিছু নতুন তথ্য আছে। যেমন, পুরীতে জগন্নাথের রথাগ্রে নৃত্য-কীর্তনের সময় শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক শ্রীবংশীবদন চট্টোর পদ "মধুর মধুর বংশী বাজে বনে"-র আস্বাদন।

প্রেমদাসের '*বংশীশিক্ষা*' (১৬২৬) শ্রীবংশীবদনের জীবনী এবং শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক শ্রীবংশীবদনকে 'রসরাজ উপাসনা' শিক্ষাদানের কাব্য। শ্রীকৃষ্ণই রসরাজ। কিন্তু তাঁর উপাসনা-পদ্ধতির বর্ণনায় বেশ কিছু তান্ত্রিক প্রভাব ঢুকে গেছে। এই সূত্রেই পরে হয়তো বাঘনাপাড়া শ্রীপাটের শিষ্যমণ্ডলীতে সহজিয়া প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে। কাব্যটির চতুর্থ উল্লাসে শ্রীবীরচন্দ্র কর্তৃক খড়দহ থেকে শ্রীরামচন্দ্রকে পরীক্ষার জন্য বারোশত শক্তিশালী নাড়াকে বাঘানাপাড়ায় পাঠানোর কথা আছে। এঁরা বৈষ্ণবধর্মে আশ্রিত অপভ্রষ্ট বৌদ্ধ। শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের বৈষ্ণব প্রসাদ ভক্ষণ করিয়ে সন্তুষ্ট করেন। শ্রীবীরচন্দ্রের মতো শ্রীরামচন্দ্রও নাড়াদের ও নাড়ীদের বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয় দেন। তাঁদের সূত্রেও বাঘনাপাড়া-সম্প্রদায়ের একাংশে সহজিয়া-প্রভাব সঞ্চারিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের অবক্ষয়ী যুগে বড়ো কোনো বৈষ্ণব কবি আবির্ভূত হন নি। তবে এ যুগের প্রথমার্ধে বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে সহজিয়া প্রভাব বাড়ে ও বহু তত্ত্বনিবন্ধ লেখা হয়। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লেখা অকিঞ্চনদাসের '*বিবর্তবিলাস*' কাব্য। অকিঞ্চনদাস শ্রীরামচন্দ্রের পরবর্তী উত্তরপুরুষ রসিকবিহারীর শিষ্য। ইনি তাঁর সহজিয়া তত্ত্বকাব্যটিতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীবংশীবদন ও শ্রীরামচন্দ্রের দোহাই দিয়েছেন। '*বিবর্তবিলাস*' তন্ত্রপ্রভাবিত গুহ্য কায়াসাধনার সহজিয়া তত্ত্বকাব্য।

৪. কথাসমাপন ঃ

অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত বাঘনাপাড়া-সম্প্রদায়ে বহু বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁরা সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও বাংলায় নানা পদাবলী লিখেছেন এবং বাংলায় বৈষ্ণব তত্ত্বনিবন্ধ ও ইতিহাস-জাতীয় কাব্য লিখেছেন। এঁদের জীবনী ও রচনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ আমার গবেষণাগ্রন্থ '***বাঘনাপাড়া-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্যে***' লভ্য। গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'অলমতিবিস্তরেণ'।

২০০৭ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে আয়োজিত বিভাগীয় সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা।

ভাগলপুর ঃ বঙ্গ-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপনিবেশ

বিনয়কুমার মাহাতো

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমাণ সোজা পশ্চিম থেকে পূর্বে একটানা আশি কিলোমিটার সুলতানগঞ্জ থেকে কহলগাঁও। সগর বংশাবতংস তপঃসিদ্ধ ভগীরথ ছিলেন পথপ্রদর্শক। সভ্যতার সেই আদি কাল থেকে অদ্যাবধি সে-পথের ব্যতিক্রম ঘটে নি। সুলতানগঞ্জে পৌঁছে গঙ্গা সম্ভবতঃ গৃহগতপ্রাণের ব্যাকুলতায় একটু উত্তরমুখো হয়েছিলেন, কিন্তু জহ্নুমুনির সঙ্গে সঙঘাতে প'ড়ে গিয়ে আবার পূর্বমুখী হতে বাধ্য হলেন। তারপর কহলগাঁও পর্যন্ত একান্ত বাধ্য মেয়ে। কহলগাঁও পৌঁছে আবার একটু মনকেমন করা চোখ-ফেরানো উত্তরে। গঙ্গাকে প্রবোধ দিতেই বোধকরি উত্তরমুখী গঙ্গার ব্যাপক মাহাত্ম্য লোকবিশ্বাসে এবং সংস্কারে। তাতেই সুলতানগঞ্জের গৈবীনাথ আর কহলগাঁওয়ের বটেশ্বরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে অনতিখ্যাত তীর্থস্থান। তবে তীর্থক্ষেত্র রূপে নয়, এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী ভূভাগ সম্ভবতঃ মানব সভ্যতারও আদি ভূভাগ, অবশ্যই পৌরাণিক কিংবদন্তিসাপেক্ষে। এই ভূভাগ ঘিরে ইতিহাসে পুরাকথায় মানবের সভ্যতা-সংস্কৃতি যুগে-যুগে মহিমময় হয়ে উঠেছে, আর তাতে বাঙালির গৌরবও ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে।

গঙ্গার দক্ষিণপ্রান্ত জুড়ে সুলতানগঞ্জ-কহলগাঁও ঘিরেই পৌরাণিক অঙ্গদেশ বঙ্গ-কলিঙ্গ-শুহ্ম-পুন্ড্রের গা-ঘেঁষেই। পুরাণ কথার 'সমুদ্র মন্থনের স্মৃতিচিহ্ন মন্দার পর্বত অঙ্গেরই নাভিকেন্দ্রে। অঙ্গ রামায়ণেও আছে, মহাভারতেও আছে। রাজা দশরথের বংশরক্ষার মূলভরসা ঋষ্যশৃঙ্গ, দুর্যোধনের অন্যতম ভরসা রাধেয় কর্ণ। তাঁদেরই স্মৃতিপূত ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম এবং কর্ণগড়, দুটোই অঙ্গদেশে বিশিষ্ট। ভাগলপুর তারই স্মৃতিবাহী। কালের হিসেবে ভাগলপুর অবশ্যই বর্তমান, পুরাণকথায় সে অঙ্গদেশ আর প্রাচীন এবং মধ্যযুগে সে চম্পা, চম্পাপুরী কিংবা মালিনী। মঙ্গলকাব্যের যুগে সে কখনো চম্পানগর, কখনো বা চম্পকনগর, আবার কখনো বা চম্পাইনগর। ঋষ্যশৃঙ্গ, কর্ণ, বাসুপূজ্য বগুপুটাপ্পা, চান্দো বেনে, বেহুলার মতো তার নায়ক-নায়িকা মহাকাব্য-মঙ্গলকাব্য-ধর্মীয় গাথা আলোকিত ক'রে আছে। গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রায় অবিনশ্বর, অতীত ঐতিহ্য তার গৌরবময়; ভাগলপুর কিংবা তার অঙ্গ-চম্পা-মালিনী-জোড়া অতীত ঐতিহ্যও গৌরবময়।

চান্দো বেনে-বেহুলাকে নিয়ে বিতর্ক আছে, জয়দেব-বিদ্যাপতিকে নিয়েও বিতর্ক। জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত সংস্কৃত পদাবলী বাঙালি আপন ক'রে নিয়েছে তার সাহিত্য-সাধনায়, বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী আপন হয়ে উঠেছে তার সংস্কৃতি-চেতনায়, আর চান্দো বেনে-বেহুলা মিশেছে তার রক্তে লৌকিক ধর্মাচরণে। বিতর্কের ব্যাপারটাকে আর একটু চারিয়ে দিলেই পৌঁছে যাওয়া যায় চর্যাপদের যুগে এবং তার অকুস্থলরূপে ভাগলপুরে।

পালবংশের রাজত্বকালেই দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়েই বিদ্যাচর্চার কিংবদন্তি ক্ষেত্র রূপে প্রাচ্য ভূখণ্ডে সবিশেষ খ্যাতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল বিক্রমশীল মহাবিহার। জ্ঞানচর্চার এই মহাপ্রতিষ্ঠানটির ধ্বংসস্তুপ ভাগলপুরের অনতিদূরেই আন্তিচক গ্রামে। অদূরেই কহলগাঁও-এর উত্তরবাহিনী গঙ্গা এবং তার তটের পাহাড়ে অবস্থিত বটেশ্বরথান জুড়ে চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের 'সাধনগুফা'। এঁদের অনেকেই বিক্রমশীল মহাবিহারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, কিংবা অনেকেই

চর্যাকার রূপে চর্যাকোষ-দোহা-কোষে ঠাঁই পান নি, এমন কথা অবিসংবাদিত রূপে মেনে নেওয়া যায় না। কান্‌পা (কাহ্নপাদ), সরহপা জড়িয়ে আছেন এখানকার কিংবদন্তিতে, শবরপা বেঁচে আছেন ভাগলপুর সংলগ্ন সবোর স্থাননাম ঘিরে। মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রবাদপ্রতিম অধ্যক্ষই ছিলেন না, এখান থেকেই তিব্বতে গিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচারার্থে। বিতর্কিত অবশ্যই, তবে এই বিতর্কের প্রবক্তা স্বয়ং রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

চর্যাপদের 'বঙ্গালী' শব্দটি নিয়ে বোধহয় বিতর্কের অবকাশ নেই। চর্যাকার ভুসুকুপাদ স্পষ্টভাষায় বলেছেন, 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। নিঅ ঘরিণি চণ্ডালে লেলী।' হৃতসর্বস্ব হৃতপত্নী হতভাগ্যের মর্মান্তিক হাহাকার অশ্রু-নিটোল শাশ্বত আলম্বনে গ্রথিত এই চর্যা-চরণে। আদি কবির আদিকাব্যেও এই হাহাকারেরই চরম প্রকাশ, পঞ্চবটী থেকে সেতুবন্ধ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের সমগ্র অরণ্যপথ তার মূক সাক্ষী, প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ঋষ্যমুক পর্বতবাসী সুগ্রীব-হনুমান-নল-নীল-জাম্বুবান। 'বঙ্গালী'র জীবনেও এমন হাহাকারের দিন ঘুরে-ফিরে এসেছে। তুর্কী আক্রমণ, বর্গীর হানা, পর্তুগীজ হার্মাদের লুণ্ঠনে বারে-বারে পর্যুদস্ত তার জীবন। অকুস্থল কখনো 'পঁউআ খাল', কখনো বা গঙ্গা, আবার কখনো বা বঙ্গ-সমুদ্রতটবর্তী ভূভাগ। তথাপি 'বঙ্গালী' হার মানে নি, উল্টে গঙ্গা আর 'বঙ্গালবাণী'র প্রশস্তিতে মুখর হয়ে উঠেছে তার কবিসত্তা বাঙালির ইতিহাসের প্রায় সেই আদিযুগেই—'অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ'।

সগর বংশাবতংস তপঃসিদ্ধ ভগীরথ গঙ্গাকে পথ দেখিয়েছিলেন, পৌঁছে দিয়েছিলেন বঙ্গের হৃদয়দেশ পর্যন্ত, এই হল পৌরাণিক সত্য; বাস্তব সত্য এর বিপরীত—নদীতটেই গ'ড়ে ওঠে মানব-সভ্যতা, নদীর প্রবাহপথ ধরেই তার যাওয়া-আসা উত্থান-পতন। গঙ্গার সঙ্গে বাঙালির ভাগ্য জড়িয়ে গিয়েছিল সুদূর অতীতেই, গঙ্গাকে অবলম্বন করেই বাঙালির সভ্যতা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশিষ্ট স্বরূপে প্রকটিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ সে কারণেই গঙ্গা আর 'বঙ্গালবাণী' সমার্থক হয়ে উঠেছে তার জাতীয় জীবনে। গঙ্গার মাহাত্ম্যেই ভাগলপুর এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বাঙালির সভ্যতা-সাহিত্য-সংস্কৃতির নতুন উপনিবেশ—সমৃদ্ধি-ব্যাপকতা-উত্তুঙ্গতা আর অভিনবত্বে তার তুলনা হয়তো বা সে নিজেই। ভাগলপুরের ক্ষেত্রে হয়তো বা সেটাই স্বাভাবিক। বিক্রমশীল-এর আধারেই সে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, চাঁদ সদাগরের মধ্যেই পৌরুষের পরাকাষ্ঠা খুঁজে পায়, যে-পৌরুষের পায়ে দেবমহিমাও অনন্যোপায়ে মাথা খোঁড়ে। অঙ্গ, চম্পা কিংবা মালিনীর সমৃদ্ধি কিংবা পৌরাণিক ভূমিকা কিংবদন্তির অতলে তলিয়ে গেছে: বিক্রমশীল কিন্তু ধ্বংসস্তূপ ফুঁড়ে উঠেছে ভাগলপুরের দেশেই, চান্দো বেণেও ভাগলপুর ছাড়িয়ে সারা পূর্বভাবতেরই 'মঙ্গলগীতে' দাপিয়ে বেড়িয়েছেন প্রায় অর্ধসহস্রাব্দী ধ'রে।

ভাগলপুর অঞ্চলে বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপনিবেশ গড়ে তোলার ইতিহাস নিঃসন্দেহে 'উলট পুরাণে'র ধারাতেই। আযাবর্তে আর্য-ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল গঙ্গা-যমুনার স্রোতোধারার সমান্তরেই এগিয়ে ছিল পশ্চিম থেকে পূর্বেই—পাঞ্চাল এবং কুরুরাজ্য অতিক্রম ক'রে শূরসেন-কাশী-কোশল-মগধ-বিদেহ ছাড়িয়ে অঙ্গ-গৌড়-বঙ্গ পর্যন্ত। এই নিরিখে ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের পৌরাণিক কাহিনীকে মনে হতেই পারে প্রতীক-দ্যোতনা-সমৃদ্ধ। মনে হতেই পারে সগর বংশাবতংস ভগীরথ গঙ্গা নদীর পথ-প্রদর্শক ছিলেন না, ছিলেন পূর্বভারতে

আর্যের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বার্তাবহ, যেমন ছিলেন অগস্ত্য দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে। প্রতীক আখ্যানের অন্তরালে উভয়েরই অসাধ্য-সাধন-কীর্তিকে অধিকতর মহিমামণ্ডিত করা হয়েছে। তথাকথিত ভগীরথ-নির্দিষ্ট পথের শেষে গঙ্গার সলিল সমাধি ঘটেছে, আর্যসভ্যতা কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েও অন্তর্জলী না হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে নতুন শক্তিতে আর নতুন সম্ভাবনায়। কখনো তা প্রকটিত হয়েছে গৌড় সম্রাট শর্শাঙ্কের পৌরুষে, কখনো বা রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত তনু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনচ্ছটায়, আবার কখনো বা রঘুনাথ শিরোমণির নব্যনায়ের কূট-বিধানে। হিমালয় কন্দরের অরণ্যনির্ভর আশ্রমিক সামগান বাঙালি-হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল কি না তার অভ্রান্ত তথ্য নিরূপণে গলদঘর্ম হয়ে লাভ থাক বা না থাক বাঙালির হৃদয়নিঃসৃত কীর্তনে ব্রজমণ্ডল পর্যন্ত আলোড়িত হয়েছিল সে-তথ্যের অকপট স্বীকারোক্তিতে অবশ্যই সত্য আছে। বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির এই আগ্রাসন ঘটেছিল গঙ্গা-যমুনার উজানেই এ-তথ্যও অধিকতর সত্য।

বঙ্গে স্বকীয় স্বরূপে বাঙালির সাহিত্য-ভাষা-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উপচীয়মান প্রাচুর্যেই তা ভাগলপুর অঞ্চলে পৌঁচেছিল গঙ্গার উজান বেয়েই, এ এক ঐতিহাসিক সত্য। সেকালের হিসেবে ভাগলপুর বঙ্গের অবশ্যই অবিভাজ্য অঙ্গ, আর একালের হিসেবে নিঃসন্দেহে বৃহত্তর বঙ্গের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। যে-যুগে অঙ্গে-বঙ্গে-গৌড়ে-সুহ্মে-বরেন্দ্রে কোনো ভেদ ছিল না সে-যুগেই বরেন্দ্রভূমের দক্ষিণ সীমান্তের বাঙালি পাড়ি জমিয়েছিল অঙ্গদেশে। প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত। পাল রাজত্ব তখন অস্তমিত, বখ্‌তিয়ার খিলজি নামক তুর্কির আক্রমণে অঙ্গ এবং গৌড় বিপর্যস্ত, ধ্বংসস্তূপে পরিণত বিক্রমশীল আর নবদ্বীপ; ঠিক তারই সমসাময়িক কালে বাঙালি নদী-নালা আর সমুদ্রবিধৌত বিধ্বংসী বন্যা ও ভাঙনের দেশ ছেড়ে পাড়ি দিল উল্টোমুখে-পূর্ব থেকে পশ্চিমে। একদা যে-দেশ মাড়িয়েই আসতে হয়েছিল বঙ্গে, এবার সেই ফেলে আসা ঘরের কাছের অঙ্গেই নতুন আস্তানা খুঁজে পেতে চাইল। সে কি কেবলই জীবন ও জীবিকারই অন্বেষণে?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পিতৃ-পিতামহের ভিটে-মাটি ছেড়ে প্রায়শঃ অজানা পরবাসে মানুষ পাড়ি দেয় মূলতঃ দায়ে পড়েই, এবং সে-দায় অবশ্যই প্রাণের দায়। এমনকি, রাজা-বাদশাদের তথাকথিত বিজয় অভিযানের অন্তরালে নিহিত নিগূঢ় মর্মান্তিক সত্যটিও তাই—প্রাণধারণের রসদ-প্রাচুর্য ঘটিয়ে দিন যাপনের গ্লানি উত্তরণ, অন্য কিছু নয়। তবে ভাগলপুরে বাঙালির উপচে পড়া অভিবাসন ঘটেছে অংশত প্রাণের দায়ে এবং সর্বাংশেই ভিন্নতর কারণে। প্রায় সহস্রবর্ষব্যাপী এই অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে কারণ বৈষম্য থাকাও অস্বাভাবিক নয়, যদিও বর্তমানে তার অভ্রান্ত কারণ নির্ণয় একান্তই গবেষণা-সাপেক্ষ।

প্রাথমিক তথ্যের আধারে অবশ্যই অনুমিত হয়, তথাকথিত বঙ্গের বাঙালির অঙ্গভূমিতে আগমনের অন্যতম কারণ, প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস। রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কালে বঙ্গের হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলা মিলিয়ে গঠিত হয়েছিল রাঢ় প্রদেশ। উত্তর রাঢ়ের বাঙালিরাই যুগে-যুগে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন রাঢ় সংলগ্ন ভাগলপুর অঞ্চলে। সূত্রপাত হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতেই। বল্লাল সেন অঙ্গের প্রাদেশিক শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করেছিলেন বটমিত্রকে, যিনি প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন কহলগাঁও সন্নিকটে

পাথরঘাট্টায় গঙ্গার দক্ষিণ তটে। অদূরেই ছিল বিক্রমশীল মহাবিহার এবং পাহাড়চূড়ায় সিদ্ধাচার্যদের 'চৌরাশি সাধনগুফা'। এখানেই বট মিত্রের সংযোজন বটেশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দির। তারই স্মৃতিতে স্থানটির খ্যাতি বটেশ্বরথান নামে।

দ্বিতীয় দফায় বাঙালির আগমন ঘটেছিল দিনাজপুরের খ্যাতকীর্তি উত্তর রাঢ়ী রাজা গণেশ দত্তের রাজত্বকালে চতুর্দশ শতাব্দীতে। প্রথম এবং দ্বিতীয় দফার বাঙালিদের অধিকাংশই ছিলেন শাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত—লোক-লস্কর পাইক-বরকন্দাজ জমিদাবী সেরেস্তার কর্মচারী, মুন্সি-খাজাঞ্চি, পুরোহিত-ঠাকুর-চাকর প্রভৃতি। সকলেরই বসবাস ছিল মুখ্যতঃ শাসনকেন্দ্রের আশপাশ ঘিরেই। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ছবিটা অনেকাংশেই পাল্টে গেল। উত্তররাঢ় উজাড় ক'রে কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণেরা ভাগলপুর জেলায় ঢুকলেন 'বন্যার যেন জল'। গোড়ায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কানুনগো-ই-সদর (রাজস্ব অধিকারী) থাক দত্ত এবং পরবর্তীকালে তাঁর জামাতা শ্রীরাম ঘোষ। এঁদেরই প্রশ্রয়ে লক্ষ-লক্ষ উত্তররাঢ়ী বাঙালি ভাগলপুরের দক্ষিণে (অধুনা বাঁকা জেলা) দত্তবাটি-ঘোষপুর-মাহ্‌গামা-কাজ্‌রেইলি-কেলাপুর অঞ্চলের প্রায় শ'দেড়েক গ্রামে রাতারাতিই জুড়ে বসল। এই জনশক্তির আধার নিয়েই সম্ভবতঃ শ্রীরাম ঘোষ মানসিংহের বঙ্গ বিজয়ের পথে হয়ে উঠেছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। কৃতজ্ঞ মানসিংহ শ্রীরাম ঘোষকে নিয়ে গিয়েছিলেন দিল্লিতে আকবর বাদশাহের দরবারে। মহানুভবতার প্রতিদানে বাদশাহ ১৬০৪ সালের দুর্লভ বাদশাহী সনদে সম্বর্ধিত করেছিলেন। শ্রীরাম ঘোষ পেয়েছিলেন 'মহাশয়' খেতাব (বাঁশবেড়িয়ার রাজা ছাড়া আর কেউ পাননি এমন খেতাব), কানুনগো-ই-সদর-এর স্বীকৃতি এবং সুলতানগঞ্জ থেকে কহলগাঁও পর্যন্ত গঙ্গার জলকর-এর স্বত্ব। সবই বংশানুক্রমে ভোগদখলের অধিকার।

অঙ্গপ্রদেশে বাঙালি অভিবাসনের আদিপুরুষ বট মিত্র; সে-কীর্তিকেও ছাড়িয়ে গেলেন মহাশয় শ্রীরাম ঘোষ, তিনি হয়ে উঠলেন প্রবাদপুরুষ। আর মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে চলে আসা বাঙালীর দল? কালান্তরে তাঁরাও সৃষ্টি করলেন নতুন সমাজ, নতুন ভাষা, নতুন সংস্কৃতি, নতুন ইতিহাস। সে-সমাজ ভাগলপুরের উত্তররাঢ়ী সমাজ, সে-ভাষা ছিকা-ছিকি বোলি (অধুনা অঙ্গিকা) সে-সংস্কৃতি মিশ্র হলেও উদার সামঞ্জস্যের সংস্কৃতি। আর ইতিহাস? সে-এক রূপান্তরিত বাঙালির ইতিহাস—কনৌজ থেকে বঙ্গে, আবার বঙ্গ থেকে অঙ্গে যাওয়ার ইতিহাস, যার মধ্যে আদিশূর বল্লাল সেন শ্রীরাম ঘোষ সকলেই স্বীয় ভূমিকায় ভাস্বর।

মহাশয় পরিবারের ইতিহাস কিন্তু ঘোষপুর-মাহ্‌গামাতেই আটকে থাকে নি। ঘোষপুর-মাহ্‌গামা থেকে মায়াগঞ্জ (ভাগলপুর শহরের পূর্বাংশ) ঘুরে তাঁরা অবশেষে থিতু হলেন পুরাকীর্তির চম্পানগরে। স্থাপিত হল 'মহাশয় ডেউড়ি', স্বেচ্ছায় উঠে এলেন গৃহদেবতা বটুক ভৈরব স্বপ্নাদিষ্ট মহাশয় পরেশনাথ ঘোষের হাত ধ'রে পুষ্করিণী গহ্বর থেকে। কষ্টিপাথরের এই বটুক ভৈরবই চান্দো বেনের আরাধ্য শিব শূলপাণি ছিলেন কি না সে-তথ্য অজ্ঞাত, কিন্তু মন্দিরে অধিষ্ঠিত হলেন বেহুলা-লখিন্দরের কিংবদন্তির লোহার বাসর ঘরের কল্পিত ভূমিতেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ততদিনে মুঘলের বিকল্প শক্তি হয়ে উঠেছিল। দ্বৈতশাসনোত্তর নব রাজস্ব বিধানে কানুনগো-ই-সদর-এর অধিকার খোয়ালেন পরেশনাথ, হলেন জমিদার। অধস্তন জমিদার প্রকৃতই মহদাশয় মহাশয় তারকনাথ অপুত্রকের অভিশাপ এড়াতে হত্যে দিলেন তারাপীঠে। স্বয়ং সাধক বামাক্ষ্যাপা

এলেন চম্পানগরে। পঞ্চমুণ্ডির আসন পেতে তান্ত্রিক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। ভবিষ্যৎবাণী ক'রে গেলেন, 'স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্কর আসবেন তোর পুত্র হয়ে। নাম রাখবি অমরনাথ, সেই পুত্রই তোর সব সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে যাবে।' শঙ্কিত তারকনাথ সাধকদত্ত অমরনাথ নামকরণ করলেও ভবিষ্যৎবাণী বিফল করতে আদরের নাম রাখলেন শ্যাম। মহাশয় অমরনাথ পিতার আদরের নামকরণকে সার্থক করতেই সম্ভবতঃ জমিদারির অর্থে আধুনিককালের বৃন্দাবন কলকাতায় 'সিটি এন্‌টারটেনারস্ (পরবর্তীকালের রঙমহল) নামে স্থাপনা করলেন কুঞ্জবন। ছবি বিশ্বাসের মতো অভিনেতা, কৃষ্ণচন্দ্র দে-র (কানা কেষ্ট) মতো গায়ক সেখানে বাজিমাত করলেও 'কত্তামশায়' সেজে শ্যাম প'ড়ে রইলেন একশ' আট গোপিনীরই অপেক্ষায়।

ভাগলপুরের বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতির ইতিহাসের এ হল একটা দিক। অবশ্যই উত্তররাঢ়ী পর্ব এবং চম্পানগর অধ্যায়। ততদিনে ভাগলপুরের ইতিহাসে প্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যায়ও রচিত হয়ে গেছে এবং তা সম্ভব হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভাগলপুরে বাঙালি অভিবাসনের নতুন জোয়ার আসতেই। ইংরেজি শিক্ষা, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য-বিস্তার—এই ত্র্যহস্পর্শ বাঙালির জীবনে উনবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে এল এক অবিসংবাদিত স্বর্ণযুগ। ভাগ্যান্বেষী বাঙালি পাড়ি জমাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। ঘরের কাছের ভাগলপুর স্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণেই ভিন্নতর মাত্রা পেল। সাগর ছেঁচে মানিক কুড়িয়ে আনার মতোই বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেরা বাঙালির দল নিজেদের প্রত্যক্ষতঃই প্রতিরোপণ (transplantation) ঘটালেন ভাগলপুরের উর্বর মাটিতে। এলেন নদীয়ার শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হালিশহরের কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিশহর-দেবানন্দপুর ঘুরে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, পাবনার রামতনু মজুমদার, কৃষ্ণনগরের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের পুত্র হরেন্দ্রলাল, বর্ধমান-বাখুলিয়ার দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, নৈহাটি-কাঁঠালপাড়ার কীর্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বরিশাল-বানরিপাড়ার কেদারনাথ গুহঠাকুরতা, বহরমপুরের নফরচন্দ্র ভট্ট, কলকাতা-শিমুলিয়ার হেরম্বচন্দ্র ঘোষ, যশোরের উপেন্দ্রনাথ বাগচি; মুর্শিদাবাদের চন্দ্রশেখর সরকার, চব্বিশ পরগণা-কাদিহাটির সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এমনি আরো অনেকে। এই তালিকায় শেষ সংযোজন হুগলি-শিয়াখালার 'কাঁটাবুনে মুখুজ্জে' পরিবারের ডাক্তার বলাইচাঁদ। খানদানি মুঘল ঐতিহ্যকে টেক্কা দিয়ে এঁরা শহরের বুকে গড়লেন আভিজাত্য ও বৈভবের প্রতীক 'রাজবাটি', 'গাঙ্গুলি ভবন', 'মজুমদার ভবন', 'রায়বাড়ি', 'কীর্তিধাম', 'গুহভিল্লা', 'হেরম্ব ভবন', 'বাগচি হাউস', 'সরকার ভবন', 'সারদানিবাস' প্রভৃতি কীর্তিস্তম্ভ। ব্যবহারাজীবী-ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার-জমিদার-ব্যবসায়ী তথা পদস্থ কর্মচারীদের এই সমস্ত পরিবার ঘিরেই ভাগলপুরের নতুন ইতিহাস, নতুন যুগ, নতুন গৌরব—সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্প-শিক্ষা-সংস্কৃতির নতুন ঘরানা, নিঃসন্দেহে ভাগলপুরী ঘরানা যা বাঙালির ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়, এক উজ্জ্বল সংযোজন।

ভাগলপুরের আদিযুগের প্রবাদপুরুষ শ্রীরাম ঘোষ, আর আধুনিক যুগের শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মহানুভবতার কারণে শ্রীরাম মুঘল বাদশার কাছ থেকে 'মহাশয়' খেতাব পেয়েছিলেন, আর ভূস্বামী না-হয়েও শিক্ষা-সংস্কৃতি-জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কারণে 'রাজা' খেতাব পেলেন শিবচন্দ্র খোদ ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে। মহাশয় শ্রীরামকে নিয়ে সেকালে কিংবদন্তি

ছিল কি না জানি না; রাজা শিবচন্দ্রকে নিয়ে কিন্তু প্রবাদের উদ্‌ঘোষণা ভাগলপুরে এখনো লোকেদের মুখে-মুখে ঃ

> ন ঢাক ন ঢোল আংরেজি বাজা;
> ন রাজ ন পাট শিবচন্দর রাজা।

মাত্র এগার বছরের আইন ব্যবসায়। তারই উপার্জনে দু'-দুটো স্কুল করেছিলেন ভাগলপুরে, ওয়াটার ওয়ার্কসের জন্য দিয়েছিলেন দু'লক্ষ, সদর হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডের জন্য পঞ্চাশ হাজার, প্রাসাদোপম 'রাজবাটি'। কুসংস্কার কাটিয়ে বিলেত ঘুরে এসেছিলেন। তাঁর সমস্ত কীর্তিই উনবিংশ শতাব্দীর মাজামাঝি সময়ে মাত্র কয়েকটা বছরেই। তাঁরই সৃষ্ট পরিবেশে সুযোগ্য সন্তান কুমার সতীশচন্দ্র 'রাজবাটি'কে রূপান্তরিত করেছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতির সূতিকাগারে। গ'ড়ে উঠেছিল 'ছায়া' সাহিত্য গোষ্ঠী এবং 'আদমপুর ড্রামাটিক ক্লাব' পারিবারিক রঙ্গমঞ্চের আধারেই। এই সাহিত্য গোষ্ঠীর প্রেরণাতেই সৃষ্ট হল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'ভাগলপুর ও শরৎচন্দ্রের দল'। সে-দলের মধ্যমণি স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর তার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী, বিভূতিভূষণ ভট্ট প্রমুখ। অত্যল্পকাল মধ্যে ১৯০৫ সালে হরেন্দ্রলাল রায়ের নেতৃত্বে স্থাপিত হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভাগলপুর শাখা, কলকাতার মূল প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শাখা। 'ছায়া' গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত না থেকেও সাহিত্যের ভাগলপুরী ঐতিহ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, আশু দে, হরেন্দ্রলাল রায় এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। অনুরূপা দেবীও নিরুপমার 'গঙ্গাজল সই' রূপে ভাগলপুরী ঐতিহ্যে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের ভাগলপুরে আবির্ভূত হলেন বনফুল (ডা. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)—রবীন্দ্র-পরবর্তীকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বহুমুখী প্রতিভা। অনতিকালেই অনন্য বলিষ্ঠতায় বিশিষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন আশালতা সিংহ, প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজেকে প্রগতিশীল লেখিকারূপে, শিকড় তাঁরও ভাগলপুরের মাটিতেই। ভাগলপুরী ধারা অব্যাহত গতি পরবর্তী প্রজন্মের কবি-গল্পকার-ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিতের মধ্যে। বিক্ষিপ্ত কলম চালনা করে হারিয়ে গেছেন অনেকেই। তারই মধ্যে সেকাল-একাল মিলিয়ে কিঞ্চিৎ প্রতিশ্রুতি এবং সম্ভাবনা দেখিয়েছেন যোগেশচন্দ্র মজুমদার, স্বর্ণকমল রায়, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মৃণালিনী চৌধুরী, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মাখনলাল রায়চৌধুরী, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, অমূল্যকৃষ্ণ রায়, গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর (রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়), অমল সেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (সুভাষচন্দ্র ঘোষ), প্রণব ঘোষ, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়।

আদমপুর 'রাজবাটি'র রঙ্গমঞ্চও এক ইতিহাস। আদমপুর ড্রামাটিক ক্লাব বেশিদিন বাঁচে নি, কিন্তু তার নাটকে শরৎচন্দ্র এবং রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার নিয়মিত অভিনয় করতেন স্ত্রী চরিত্রে, এ এক গৌরবের স্মৃতি। প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধার কুমার সতীশচন্দ্র এবং অভিনেতা রাজু অকালে হারিয়ে গেছেন, কিন্তু উভয়েই অমর শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে—সতীশ স্বনামেই 'চরিত্রহীনে' এবং রাজু ইন্দ্রনাথে 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে। 'আদমপুর ড্রামাটিক ক্লাব' ভাগলপুরে ব্যাপক সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছিল

শৌখিন নাট্যাভিনয়ের। 'রাজবাটি'র রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকাদি মানে গুণে সর্বাংশেই ছিল কলকাতার পেশাদার মঞ্চের সমগোত্রীয়। 'রাজবাটি' প্রযোজিত নাটকে সাগ্রহে অংশ নিতেন কলকাতার খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও। নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল অহীন্দ্র চৌধুরী, নীতীশ মুখার্জি প্রমুখের। বিশিষ্ট নাট্যপরিবেশের কারণেই বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অনেক প্রতিভা উঠে এসেছিল ভাগলপুরের মাটি থেকেই। অশোককুমার-কিশোরকুমার-অনুপকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সমীরকুমার, কানন দেবী-ছায়া দেবীর মতো খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে রাজবাটির প্রত্যক্ষ রক্তসম্পর্ক। বোম্বাই চলচ্চিত্র-জগতের হৃষিকেশ মুখার্জি, শশধর মুখার্জিও ছিলেন আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতের আরো অনেকেরই ভাগলপুরের সঙ্গে নাড়ির যোগ। তাঁদের মধ্যে সগৌরবে উল্লেখ্য প্রখ্যাত পরিচালক তপন সিংহ, প্রভাত সিংহ, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা দেবী প্রমুখ। অধুনা সম্মিলিত শিবচন্দ্র ঘোষ তপন সিংহের সহকারী।

নাট্যব্যক্তিত্ব নিয়ে ভাগলপুর জুড়ে কত না কাহিনি, কত না কিংবদন্তি। 'শ্রীকান্তে' তার আভাস আছে। কিংবদন্তির কৌতুককর ঘটনা রূপে এখনো বেঁচে আছে ঃ

* 'রাজবাটি'রই 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের স্ত্রী চিন্তার ভূমিকায় ন্যাড়া (শরৎচন্দ্র) এবং পাগলিনীর ভূমিকায় 'রাজু (ইন্দ্রনাথ) অভিনয় করেছিলেন। 'শ্রীকান্তে'র ইন্দ্রনাথের মতোই অভিনয় শেষে রাজু নিরুদ্দিষ্ট হন।
* 'রাজবাটি'র থিয়েটারেই প্রথম অভিনয় অশোককুমারের। পার্কের বেঞ্চিতে সংবাদপত্র পাঠরত জনৈক ভদ্রলোকের ছোট্ট ভূমিকা। স্যুটকেস হাতে আগন্তুক নায়ক জিজ্ঞেস করলেন, 'মশাই, অমুকবাবুর বাড়িটা কোথায়?' অশোককুমারের সংলাপ ছিল, 'ঐ তো, ঐটা।' ঘাবড়ে গিয়ে ঘেমে-নেয়ে ঐ সামান্য সংলাপটুকুও বেরোয়নি তাঁর মুখ দিয়ে। 'যা ব্বাবা, ভদ্রলোক দেখছি একেবারে বদ্ধ কালা!' ব'লে স্টেজ সামলেছিলেন নায়ক।
* কথা ছিল 'রাজবাটি'র রেমো (অপর্ণাচরণ বন্দ্যো) হবে নায়ক 'অচ্ছুতকন্যা'র। কাজের চাপে পাঠাতে না-পেরে সানুবাবু (শিবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীশচন্দ্র) ভ্রাতুষ্পুত্রের বদলে ভাগনেকে নাবানোর নির্দেশ পাঠালেন। ভাগনে অশোক তখন বোম্বে টকিজের ল্যাবরেটরি-টেকনিশিয়ান।
* 'রাজবাটির সমীরকুমার যখন সফলতম নায়ক, উত্তম কুমার তখন ফ্লপ হিরো, তিন-তিনটি ছবি ক্রমান্বয়ে ফ্লপ হওয়ায় বাতিলের দলে। অনন্যোপায়ে ধ'রে বসলেন 'বসু পরিবার'-এর নির্বাচিত নায়ককে। রাজা শিবচন্দ্রের রক্ত ধমনীতে, তদুপরি সেদিন তাঁর পাকা দেখা। সমীর কুমার অবহেলায় ছেড়ে দিলেন নায়কের ভূমিকা। তাতেই হল উত্থান উত্তমকুমারের, আর বিবাহের পর হানিমুনেই মেতে থেকে সমীরকুমার হলেন বিস্মৃত নায়ক।

ভাগপুরের সঙ্গীতচর্চা নিয়েও কিংবদন্তির ছড়াছড়ি। আভিজাত্যের প্রতীক রূপে সে যুগে

ওস্তাদি সঙ্গীতচর্চা ভাগলপুরের প্রতিটি বনেদি পরিবারেই ছিল আবশ্যকীয় অঙ্গ। 'রাজবাটি', মজুমদার বাড়ি, রায় বাড়ি, বাগচি হাউস সর্বত্রই গৃহশিক্ষকরূপে হিন্দুস্থানি নামী-দামী ওস্তাদ, প্রায়শঃই জমজমাট জলসা। খেয়ে-পরে সুখে-শান্তিতে কালযাপনে কোথাও কোনো বাধা ছিল না, তাই সঙ্গীতের মতো নান্দনিক কলার সাধনায় অর্থব্যয়েও কার্পণ্য ছিল না। উপেন্দ্রনাথ বাগচি 'ভাগলপুর সঙ্গীত সমাজ' নামে একটা প্রতিষ্ঠানই গড়ে তুলেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই। বাড়িতেও সঙ্গীতের ব্যাপক আবহাওয়া, সেই সঙ্গে বীনাপাণির অসীম অনুগ্রহ—পুত্র মনীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দিকপাল হয়ে উঠলেন, কন্যা মনোরমা পুতুল খেলার বয়সেই সরস্বতীর বরপুত্রী রূপে প্রবাদে পরিণত হলেন। 'রায়বাড়ি'র মনোরমাও ছিলেন সঙ্গীতজগতের প্রবাদ কন্যা। ১৯১০ সালে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ভাগলপুরে এসে রবীন্দ্রনাথ উভয় মনোরমারই গান শুনেছিলেন। চমৎকৃত কবি একজনকে খেতাব দিয়েছিলেন 'বীণাপাণি', অন্যকে 'সরস্বতী'। রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার লেখক হিসেবে যেমন বিশিষ্ট ছিলেন, তেমনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেও। লেখায়-আঙ্গিক বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, সঙ্গীতেও অনুরূপ পবীক্ষা-নিরীক্ষায় ছিল স্বভাব-নৈপুণ্য। একবার খেয়ালি চালে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিয়ে ভাগলপুরে, আর একবার হাস্যকর বিকৃত ধ্রুপদী সঙ্গীত শুনিয়ে আরপুলি লেনে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির বাড়িতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই অভিভূত করেছিলেন। ভাগলপুরের সখের সঙ্গীত জগতে প্রকৃতই সঙ্গীত বিশারদরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন হরেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রলাল রায়, এবং মালবিকা রায় (পরবর্তী কালে মালবিকা কানন)।

অঙ্গ কিংবা মালিনী, চম্পা কিংবা চম্পাপুরীর অপার সমৃদ্ধি তথা জগৎজোড়া খ্যাতি নিয়ে কিংবদন্তি ছড়িয়ে আছে পুরাণে তথা ইতিহাসে, কিন্তু কর্ণগড় কিংবা চম্পাকনগর নিয়ে প্রকৃত তথ্য ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছে। কর্ণগড়ের নগর প্রাকার, সুড়ঙ্গ এবং পরিখা আজও পরিদৃশ্যমান। চম্পকনগরের পরিসীমা ছিল গঙ্গা, চম্পানালা এবং কর্ণগড়ের পরিখা দ্বারা সীমাবদ্ধ। ভাগলপুরের পরিসীমা কিন্তু সেভাবে চিহ্নিত হয় নি কোনোকালেই। তার প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত নয়, নামকরণও বিতর্কিত। 'ভাগলপুরকে ভাগেলিয়া কহলগাঁওকে ঠগ' প্রবাদ থেকেও কোনো সুনিশ্চিত সমাধানে পৌঁছোনো যায় না। নিতান্ত অর্বাচীনকালে প্রশাসনিক কারণেই এখানে আস্তানা গেড়েছিল প্রথমে মুঘল তারপর ব্রিটিশ। বঙ্গের উপকণ্ঠে গঙ্গার প্রবেশ মুখে এর সামরিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম সেই তুর্কীহানার কাল থেকেই। ফলে এই নিরীহ অথচ ধনধান্য সমৃদ্ধ জনপদ বারে-বারে বিপর্যস্ত হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবদমান সামরিক শক্তির তাল ঠোকাঠুকিতে। রাজায়-রাজায় প্রায়শঃ যুদ্ধ বেধেছে আর ভাগলপুরের বেচারা উলুখাগড়ার দল বারে-বারে পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে গিয়েই 'ভাগেলিয়া' (পলাতক) অপবাদকে অঙ্গের ভূষণ করেছে। তথাপি এই শহরের মোহ কাটে নি মুঘল ব্রিটিশ কারুরই। দার্জিলিং আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ইংরেজের দৃষ্টিতে ভাগলপুরই ছিল শৈলাবাস; কলকাতা থেকে কহলগাঁওয়ে রাজধানী সরিয়ে আনার কথাও একবার তাদের মাথায় এসেছিল; তথাপি ভাগলপুরের 'ভাগেলিয়া' বা ছন্নছাড়া রূপ মুছে যায় নি। সবই সত্য, অথচ এও সত্য যে তা সত্ত্বেও ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অতগুলো ধুরন্ধর প্রতিভা ভাগলপুরের মাটিকেই কেন স্ফুরণক্ষেত্ররূপে বরণ ক'রে নিল তার সদুত্তর খুঁজে পেতেই মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

সদুত্তর কোথায়?

সদুত্তর সম্ভবতঃ অতিলৌকিক অস্তিত্ববাদে। সদুত্তর মাটির গুণে এবং যুগ মাহাত্ম্যে। মাটির গুণে এবং যুগ মাহাত্ম্যেই একদা বঙ্গের আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল ক্ষণজন্মাদের মিছিলে। সম্ভবতঃ যুগমাহাত্ম্য কোনো এক অমোঘ দৈবনির্দেশেই ভর করেছিল ভাগলপুরের মাটিতে, আর তারই গুণে এখানে এসেছিল প্রতিভার মিছিল, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপচীয়মান সমৃদ্ধি। এর মাটিতে ছিল যাদু, জল-হাওয়ায় ছিল মানসিক রূপান্তরের মোহমন্ত্র। তাই কোম্পানির বেতনভুক কর্মচারী হয়েও রামমোহন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জেলাশাসকের গর্হিত আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এখানকার মাটিতে পা দিয়েই। প্রখর আত্মভিমান, জাগ্রত স্বদেশাভিমান আর সংস্কারমুক্ত অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ভাবী ভারতপথিক তথা আধুনিক ভারতের জনকসত্তার উন্মেষ ঘটেছিল ভাগলপুরের মাটিতেই। সতীদাহ নামক অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মানসিকতাও তিনি সতী বেহুলার দেশ থেকেই আহরণ করেছিলেন কি না তাই বা কে জানে!

১৮০৮-০৯ সালে ভাগলপুরে ছিলেন রামমোহন, সেই সময়েই পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি সন্তান ডিরোজিও ভূমিষ্ঠ হন কলকাতায়। কাকতালীয় মনে হতেই পারে। কিন্তু সেই হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ১৯২৫-২৬ সালে জল-হাওয়ার টানে ভাগলপুরে এসে একেবারে মাটির টানে ভারতকে স্বদেশ ভেবে স্বদেশ প্রেমের কাব্য 'ফকির অব জাঙ্গিরা' তথা 'টু ইণ্ডিয়া, মাই নেটিভ ল্যাণ্ড'এর মতো কবিতা লিখলেন, ব্যাপারটা বোধহয় নিতান্ত কাকতালীয় নয়।

ভাগলপুরের মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষেরা স্বামী বিবেকানন্দের মানসিকতারও পরিবর্তনের কারণ হয়ে উঠেছিল। ১৮৯০ সালে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ গাজিপুর যাওয়ার পথে গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দের সঙ্গে এসেছিলেন ভাগলপুরে। সে-সময় ভাগলপুরের উপকণ্ঠে দারিদ্র্যের যে বীভৎসরূপ এবং মানবতার যে-অবমাননা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা থেকেই আহরণ করেছিলেন জীবনের সাধনমন্ত্র এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মূলমন্ত্র—'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'।

ডিরোজিওর একশ বছর পরে ১৯২৪-২৫ সলে পাথুরিয়াঘাটার খেলাত ঘোষ এস্টেটের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রূপে জঙ্গলমহালে প্রজাবন্দোবস্তের দায়িত্ব নিয়ে ভাগলপুরে এসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সাহিত্য প্রতিভার নবস্ফুরণ ঘটেছিল। ফলে নতুন ক'রে লিখতে হয়েছিল 'পথের পাঁচালী'।

প্রসঙ্গক্রমেই মনে আসে, নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকেই কহলগাঁও-ভাগলপুরের পথে মন্দার হয়ে গয়াতীর্থে গিয়ে ছিলেন পিতৃকৃত্য করতে। পিণ্ডদানের পর মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন ঈশ্বরপুরীর কাছে। তারপরই দেখা গিয়েছিল তাঁর মধ্যে এক অলৌকিক ভাবান্তর। প্রশ্ন জাগে, সে কি শুধুই মন্ত্রদীক্ষা এবং দীক্ষাগুরুর কারণে? ভাগলপুরের যে-মাটি মাড়িয়ে গিয়েছিলেন তার কি কোনোই ভূমিকা ছিল না অনুরূপ ভাবান্তরের পশ্চাতে?

সম্ভবতঃ অপরিমিত প্রাচুর্যের কারণেই দুঃসাহসিকতা প্রায়শঃ ভর করত ভাগলপুরের মানসিকতায়। সে-দুঃসাহসিকতা কেবল 'শ্রীকান্ত'-এর ইন্দ্রনাথেরই একচেটিয়া ছিল না, সে ধরনের চরিত্রই ছিল এখানকার বৈশিষ্ট্য। দুঃসাহসে ভর ক'রে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ভাগলপুর শাখা ১৯১০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ভার নিয়েছিল। তিন দিবসের সেই অধিবেশনে কলকাতা উজাড় করে এসেছিলেন সমসাময়িক সব খ্যাতিমান বাঙালি। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে বিশেষ আমন্ত্রণে বিশেষ অতিথি। দুঃসাহসিকতার ইতিহাস গড়েছিল ভাগলপুর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথকে বিশিষ্ট কবি রূপে সম্বর্ধনা জানিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আজীবন সেকথা স্মরণে রেখেছিলেন। জীবনের উপান্তে উপনীত হয়েও সকৃতজ্ঞচিত্তে বনফুলকে শুনিয়েছিলেন, 'ভাগলপুরেই সর্বপ্রথম এক বড় সাহিত্য-সভায় আমাকে কবি বলে স্বীকার করেছিল।' আরো বলেছিলেন ভাগলপুরের সাহিত্য-সংস্কৃতির কথা কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাভরেই, 'ভাগলপুরে আগে সাহিত্য এবং গান-বাজনার খুব চর্চা ছিল।'

চত্বারিংশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্রষ্টা বনফুলকে সম্বর্ধনাজ্ঞাপন পরিষদেব পক্ষ থেকে, সেও এক দুঃসাহসিক প্রয়াস ১৯৩৯ সালে। চূড়ান্ত দুঃসাহস প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৭৫ সালে শরৎ শতবার্ষিকী অধিবেশন রূপে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টচত্বারিংশ অধিবেশন ভাগলপুরে আয়োজিত হওয়ায়। অভাবনীয় সুফলও পাওযা গিয়েছিল হাতে-হাতে। চপে পড়ে সেই মঞ্চেই বিহারের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল উভয়েই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রের সম্মানে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ খোলার। বাস্তবায়িত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে।

আরো একবার। ১৯৯৯ সালে। ঐ সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের হাত ধরেই বনফুল শতবার্ষিকী অধিবেশন। নিছকই দুঃসাহস। ভাগলপুরের স্থায়ী ঠিকানায় একটানা চার দশক যাঁর সাহিত্য-সাধনা তাঁরই ঋণ পরিশোধের প্রয়াস। কিন্তু ততদিনে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাগলপুরী ঐতিহ্যে ঘুণ ধরেছে। প্রাচীন বনেদি পরিবারের গৌরবময় ঐতিহ্যও অস্তমিত। অপবাদের ভূত ততদিনে বাঙালির ঘাড়েও চেপেছে—'ভাগলপুর কে ভাগেলিয়া'। বাঙালি পলাতক, তার ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যও এক বিস্মৃত অধ্যায়। বাংলা বিভাগে ছাত্র জোটে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণেই। অবশেষে ইন্দ্রনাথই ভাগলপুরের বাঙালির সার্থক প্রতীক—সাহিত্যেও, বাস্তবেও।

উপসংহারে একান্তই গূঢ় প্রসঙ্গ।

প্রেম ব্যতিরেকে সাহিত্য অকল্পনীয়, জীবনও অসম্পূর্ণ। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নিরুপমার এবং হেমেন্দ্রলালের সঙ্গে আশালতার নিগূঢ় প্রেম ছিল অকলঙ্ক। কিন্তু সেকেলে রক্ষণশীল দৃষ্টিতে একটা ছিল অসামাজিক, অন্যটি অসবর্ণ। ফলে প্রশ্রয়ের অযোগ্য। শরৎচন্দ্রের প্রেম সম্পূর্ণতা পায় নি, হেমেন্দ্রলালেরও। শরৎচন্দ্রের 'বড় প্রেম' তাঁকে কাছে টেনে নেয় নি, দূরেই ঠেলে দিয়েছিল; হেমেন্দ্রলালও চিরকুমার থেকে সাহিত্য পরিষৎকেই আঁকড়ে ছিলেন। তবে এই অসামাজিক এবং অবৈধ প্রেমে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল, প্রগতিশীলও। রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর প্রেমে শরৎচন্দ্রের জীবনেরই অনুরণন; অন্যান্য অনেক কাহিনিতেই অনুরূপ সমান্তরাল প্রেম যা মিলনে চরিতার্থ হয় না, তারই ইঙ্গিত। আর 'অনুপমার প্রেম'? 'নিরুপমা', 'অনুপমা'র অনুপ্রাস-সাদৃশ্য? প্রগতিশীল লেখিকার 'অমিতার প্রেম'? 'আশালতা'-'অমিতা'র অন্তরালেও যে অনুরূপ অনুপ্রাসেরই খোঁচা?

কিন্তু ভাগলপুর নিয়ে শরৎচন্দ্র-বনফুল উভয়েরই দুঃসাহসিকতার অভাব আমার কাছে

বিশেষভাবেই পীড়াদায়ক। উভয় স্রষ্টাই ভাগলপুরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত, অথচ তাঁদের সৃষ্টিতে 'ভাগলপুর' স্বনামে কোথাও নেই, পার্শ্ববর্তী-দূরবর্তী স্থান সমূহ স্বমহিমাতেই বিরাজমান। কোন্ নিগূঢ় রহস্যের কারণে? সেখানে কি ভাগলপুরই 'ভাগেলিয়া'? অথবা শরৎচন্দ্র-বনফুল উভয়ই?

সহায়ক গ্রন্থ

১. 'Bihar District Gazetteers : Bhagalpur (1961)'
২. 'রামমোহন রচনাবলী' (হরফ প্রকাশনী)
৩. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা-৮' (উদ্বোধন কার্যালয়)
৪. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-১ ও ৫' (সুকুমার সেন)
৫. 'অবিস্মরণীয় মুহূর্ত' (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)
৬. 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' (বনফুল)
৭. 'শতবর্ষের আলোকে বিভূতিভূষণ' (উত্থক প্রকাশনী)
৮. 'প্রসঙ্গ ঃ ভাগলপুর' (সংকলক ঃ বিনয়কুমার মাহাতো)
৯. 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' (বিনয় ঘোষ)
১০. 'স্মরণী' (শরৎ শতবার্ষিকী অধিবেশন, ভাগলপুর)

২০০২ সালের দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মারক বক্তৃতা হিসেবে প্রদত্ত ভাষণ (১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)।

রাঢ়বঙ্গের গীতিকা ঃ পট ও পুথির অনুষঙ্গে

শ্যামল বেরা

'কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি' এ কথা মৈমনসিংহ গীতিকায় মহুয়ার। মহুয়ার মতই রাঢ়বঙ্গের গীতিকা পটের গানে রাহুতি বলেছে 'কেমন্তে বসাব ছুরি ইহার গলায়।' 'মহুয়া' পালায় হুমরা বেদে মহুয়াকে বলেছে—

'প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুষ্মেনেরে মার।।
আমার পালক পুত্র সুজন খেলোয়ার।
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ।।'

কবি শঙ্করের পালায় রাহুতির দাদা হিদা বলেছে—

বেনা বলে ঘরে তুমি এসো ভগিনী।
বেনা বেটার মাথা কাটি দেহ গো আপনি।।
ঘরে চল কালি বিভা করাব তোমার।
জগতে কলঙ্ক কেনে রাখিবে আমার।।

'মহুয়া' পালায় হুমরা বেদে নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার সম্পর্ক ভেঙে দিতে চায়। এজন্য নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করতে মহুয়ার হাতে ছুরি দিয়েছে হুমরা। ফেশর্যার পালায় পটের গানে, পুথিতে দেখা যায় দস্যু মনোহর মদন ও রাহুতির সম্পর্ক ভেঙে দিতে চায়। রাহুতির হাতে তাই ছুরি। 'মহুয়া' বিয়োগান্তক, কিন্তু 'ফেশর্যার পালা' মিলনান্তক।

মৈমনসিংহ গীতিকার যে গঠনশৈলী, যে বিচিত্র বিষয়ভাবনা—সেই ধারা পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে রাঢ়বঙ্গেও বহমান। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকা যেভাবে আলোচিত হয়েছে, মান্যতা পেয়েছে—রাঢ়বঙ্গের গীতিকাগুলি সেভাবে আলোচিত হয়নি।

দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। মুনমুন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মৈমনসিংহ গীতিকা পুনর্বিচার' গ্রন্থে জানাচ্ছেন ঃ 'দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্দীপনায় এই সংকলন কার্য শুধু পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলার একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রইল না। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্রই সংগ্রাহক ও গবেষক নিযুক্ত হলেন। এমনকি দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও গীতিকা সংগৃহীত হল। উত্তরবঙ্গ থেকে পাওয়া গেল যুগীযাত্রার পালা বা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, ময়নামতীর গান এবং জাগগান।' এখানে 'পশ্চিমবঙ্গ' বলতে কী বোঝানো হল স্পষ্ট হল না। সংগ্রাহক, গবেষকরা 'পশ্চিমবঙ্গ' থেকে কিছু পেলেন কিনা তার খবর নেই।

আমাদের রাঢ়বঙ্গে বিশেষ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় উল্লেখযোগ্য গীতিকার মধ্যে রয়েছে—ললিতা শবরের উপাখ্যান, হরি সাউয়ের কন্যা কথা, ফেশর্যার পালা, চম্পাবতী উপাখ্যান, চড়িয়া চড়িয়ানী ইত্যাদি। এসব পালাগুলি মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকার পর্যায়ভুক্ত বলা যায়। গীতিকা হিসেবে এসব পালা বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে।

উল্লেখ্য, চল্লিশ বছর আগে অজিতকুমার মিত্রের 'গাথা গীতিকায় চিরন্তনী বাঙলা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে ভগবতীমঙ্গল, সত্যমঙ্গল, রামায়ণ, সৃষ্টিতত্ত্ব, শাক্ত সাহিত্য ইত্যাদি। মূলত বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার কিছু কথা এসেছে। এ প্রসঙ্গে লেখক মূলত মৌখিক ঐতিহ্য এবং পুথির ওপর নির্ভর করেছেন।

রাঢ়বঙ্গের গীতিকায় অন্যতম পালা 'ললিতা শবর উপাখ্যান'। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নর নির্দেশে বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণের কৌশলে জগন্নাথ আনয়নের বৃত্তান্তের পাশাপাশি শবর কন্যা ললিতা ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রণয়-পর্ব দেখানো হয়েছে। বিদ্যাপতি ভান আর ভঙ্গী দিয়ে ললিতাকে ভুলিয়েছে, বিবাহ করেছে, আবার কাজ হাসিল হওয়ার পর সহজেই তাকে পরিত্যাগ করেছে। ললিতা তার নারীত্বের অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মাহুতি দিয়েছে। পুত্র অঙ্গপতির দায়িত্ব দিয়েছে পিতা শবরের উপর। এ নিয়ে বাংলা ও ওড়িয়ায় নানাভাবে কাহিনি দানা বেঁধেছে। 'দেউল তোলা' পালার অংশ ঃ

ক্রমে মহাঘোরে বনে মিলিলাক সেই।
একমাত্র ঘর দেখি বিস্ময় হোইলা।।
ললিতা শবর কন্যা অছি রহি।।
ললিতা নিকটে যাই মিলিলা ঝটতি।
কেঁউ দেশে ঘর তুম্ভ কেনে আগমন।।
কেমন্তে অতিথি সেবা করিবি ভাবিলা।।
অতিথি মিলিলা আসি আম্ভর দুয়ারে।।
পরিচয় দিয় মোতে ব্রাহ্মণ গোঁশাই।।

এরপর ক্রমে ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতির সঙ্গে ললিতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। 'ললিতা শবর পালা' বা উপাখ্যানে ললিতার গীত ঃ

গায়ে হাত দিও না ওহে দ্বিজ অনূঢ়া অছি।
অনূঢ়া অছি গো আমি অনূঢ়া অছি।।
এলে যদি মম দ্বারে, বইস গিয়া ঐ স্থানান্তরে।
মৃগচর্ম অছি ঘরে সন্ধ্যা কর তাতে বসি।।
জন্ম আমার দেব অংশে, প্রতিপালক শবর বংশে।
আসি এ আম্বুর দ্বারে করতে চাও কি আমায় দাসী।।

ব্রাহ্মণ চলে যাওয়ার সময় ললিতা বলে—

পুরুষ নির্লজ্জ জাতি লজ্জা নাই মুখে।
যুবতীর কোমল প্রাণে মধু খায় সুখে।।
মধু খেয়ে ফাঁকি দিয়ে পালাইয়া যায়।
ধিক্‌ধিক্ নির্লজ্জ পুরুষ লজ্জা নাহি পায়।।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং বিদ্যাপতি নিজেদের কাজ হাসিল করতে যতদূর নীচে নামতে পারা যায়,

ততটাই নেমেছেন। শবর একদিকে হারিয়েছে কন্যা ললিতাকে, অপর দিকে হারিয়েছে ঠাকুর জগন্নাথকে। ব্যাধ ও ব্যাধ-কন্যার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে রাজতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ঔদ্ধত্য। ললিতার নিরুপায় আত্মাহুতি এ কাহিনিকে করে তুলেছে মর্মস্পর্শী।

'হরি সাউ-এর কন্যা রূপবতীর কথা' শোনা যায় মেদিনীপুর জেলার ফকিরদের কণ্ঠে। এ কাহিনির কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। হিজলীতে পির এসে আশি হাজার বাঘ ছেড়ে পির তার মহিমা বা কেরামতি দেখাতে শুরু করলেন। গোয়ালা গয়ারামের বউ কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের কবলে পড়ে গিয়েও পিরের কৃপায় প্রাণ ফিরে পয়। শুরু হল বন কেটে বসতি স্থাপনের পালা। এরপর ভীম ডাকাত পিরের সোনার 'রেশাবাড়ী' ভাঙতে গিয়ে বিফল হয়। পিরের মহিমা বাড়তে থাকে। হিজলীতে বাজারের পত্তন হয়। এই বাজারেই আসে হরি সাউ-এর কন্যা রূপবতী। পির তাদের পরিচয় নিলেন এবং কামাল জামাল নামে দুই জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে সেকেন্দার আলি পিরের নির্দেশে তাদের আনতে যায়। 'দেখি তারে কহে পির হাসিতে হাসিতে। ... তব কন্যা রূপবতী বিভা দাও মোরে।' পির মসনদ আলীর নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য নেই হরি সাউ-এর। এছাড়া, বাজার আসার আগে তার কন্যাকে আনতে না চাইলে কন্যা বলে—

রূপবতী বলে পিতা বিধাতার লিখন।
দেখিলে আমারে সে যে করিবে হরণ।।
কভু না মানিল কন্যা পিতার বচন, অলংকার পরি কন্যা হইল সাজন।
বাপের মাথার পরে তুলিয়া দোকান, পশ্চাতে চলিল কন্যা অতি হৃষ্টমন।।

নিরুপায় হরি সাউ অবশেষে কন্যার বিবাহ দিয়ে যৌতুক নিল। যবনকে কন্যা দেওয়ার অপরাধে হরি সাউকে সমাজ এক ঘরে করে দেয়। একথা শুনে পির ক্রোধে তেলীপাড়ায় আশি হাজার বাঘ ছেড়ে অত্যাচার শুরু করে। বাঘের কবলে যায় সাতশো তেলী। শেষে পিরের কেরামতিতে তেলীরা শান্ত হল।

হরি সাউ জাতি পাই রহিল গৃহেতে।
মসনদ আলী বাঘ লয়ে চলে হিজলীতে।।
এইখনে শেষ হইল মসনদ আলী গীত।
পিরের চরণে মাগি সবাকার হিত।।

'ফেশর্যার পালা'[১] দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি জনপ্রিয় পালা। লোককাহিনি-নির্ভর এই পালা পটুয়াদের গানে রয়েছে, লোককবিদের কাব্যে রয়েছে। অনিমেষকান্তি পাল হরেন চিত্রকর (মালিগ্রাম, থানা পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর)-এর কাছ থেকে এই পালার ২৫৬ পংক্তি সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯৮৩ সালে 'পট ও পটুয়া' সংকলনে তা প্রকাশিত হয়েছে। পিংলা থানার নয়া'র দুখুশ্যাম চিত্রকরের কাছ থেকে বর্তমান প্রতিবেদকের সংগ্রহ আরো বিস্তৃত। শুধু তাই নয়, দুই পটুয়ার গানের তুলনা করলে বোঝা যায়—দুখুশ্যামের কাহিনিটি এক অর্থে পূর্ণতা পেয়েছে।

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর'-এর তৃতীয় খণ্ডে এই গীতিকার মাত্র ১৫৬ পংক্তি প্রকাশ করেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১৯৯৯ সালে সুহৃদকুমার ভৌমিক 'Patuas and Patua Art in Bengal' গ্রন্থে এ কাব্য-কাহিনির ২২০ পংক্তির একটি ইংরাজী অনুবাদ

মদনকে জামাই বলে ভুলিয়ে ঘরে আনতে। ছেলেরা জানায় রাহুতির যখন আড়াই বছর তখন তার সঙ্গে মদনের বিয়ে হয়েছিল। মদন ফাঁসুড়ার বাড়িতে এসে ভোজন পর্ব শেষ করে বিশ্রামে গেল।

গভীর রাতের উঠিল সে ফাঁসুড়া কুমারী।
মদনকে মারবে তার বাম হাতে ছুরি।।
বলে হেনকালে বিধাতার লিখন কে খণ্ডাবে বল।
সেই মদনের রূপে করে দিছে গোটা ঘর আলো।।
তখন ওযে বিধুমুখী করে হায় হায়।
কেমন্তে বসাব ছুরি ইহার গলায়।।

ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়। ডাকাত-কন্যা রাহুতির নারীসত্তার জাগরণ ঘটে। এই পর্যায়ে কবি বল্লভ দাসের বর্ণনা—

সখীগণ সেতা বসি তার করে বেস।।
কনক চিরনি দিয়া আচড়িল চুল।
বান্ধিল বিনদ খোপা জার নাহি তুল।
চন্দনে সিন্দুরে বিন্দু জত তারাগণ।
নয়নে অঞ্জন রেখা মোহিত মদন।।
নাসা তিল ফুল আভা করে ঝলমল।
মধুলোভে অলি সাথে স্তবনে কুন্তল।।
অদরেতে বিম্বফল দন্তে গজমতি।
গোলেতে মুকুতা দোলে যেন অনুদ্ধতি।।
সারেঙ্গ যুপ্রেস জেন বলে বিধুমুখী।
শ্রীরাম সাক্ষাতে যেন পয়াণ জানকি।।
বাসরে প্রবেস্য রামা প্রেম জলে ভাসে।
কি লাগিয়া কান্দ রামা মদন জিজ্ঞাসে।
সাধু বলে আগো রামা নাহি কান্দ আর।
বিহানে পরাব কালি মণিময় হার।।
এহা শুনি চরণে পড়িয়া রামা কান্দে।
কোথা ছিল পাপ বাহু পরসিল বান্দে।।
রামা বলে প্রাণনাথ হার দিকে কি।
আপনি হুসার হয় প্রাণ না খণ্ডি।
তুমি বুঝ মনে কর শ্বশুরের ডেরা।
আমার বাপের নাম মনোহর ফাসার্যা।।
হত্যা করে বাপ ভাই নাহি ধম্ম জ্ঞান।
আমারে পাঠাল্য তোমার বোধিতে জাহান।।

প্রকাশ করেছেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন ঃ 'This is a very popular folk tale in Midnapore District..... About Seventy years ago a folk drama on the story of Manahar phasura was very popular in Midnapore.'এ সবই পটুয়াদের কাছ থেকে গৃহীত। পুথির প্রসঙ্গ এসব আলোচনায় আসেনি।

'ফেশর্য়ার পালা' নিয়ে কবি কুঞ্জবিহারী দাস, কবি বল্লভ, কবি শঙ্কর কাব্য প্রণয়ন করেছিলেন। লোককাহিনি, লোকনাট্য, পটের গান এবং পুথিতে ফেশর্য়ার পালা কীভাবে আছে তা একত্রিত করতে পারলে কাহিনির একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা যেতো। এখন পাওয়া যাচ্ছে পট ও পুথিতে কীভাবে পালাটি আছে। এসব নিয়ে বিশ্লেষণ করলে রাঢ়বঙ্গের গীতিকার স্বরূপটি বোঝা যাবে। বর্তমান প্রতিবেদক কর্তৃক চার রকমের ফেশর্য়ার পালা সংগৃহীত হয়েছে।

১। পটুয়া দুখুশ্যাম চিত্রকরের কাছ থেকে।

২। কবি শংকরের পুথি।

৩। কবি শংকর রচিত, একটি পুরাতন খাতা।

৪। কবি বল্লভ দাসের পুথি।

বল্লভ দাস ভণিতায় কোথাও কোথাও 'হৃদারাম দাস' নামটিও ব্যবহার করেছেন। শংকরের পুথি পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮। পুষ্পিকায় রয়েছে 'ফেশর্য়ার পালা শাঙ্গ শঙ্করেতে গায়। ইতি শন ১২৭০ শাল তারিখ ১৪ আসাড়।" লিপিকর বা পুথি-মালিকের নাম নেই। বল্লভ দাসের পুথির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮। পুষ্পিকায় রয়েছে 'ইতি সত্যনারাঅনের জাগরণ সম্পূর্ণ। জথা দিষ্ট তথা লিখিতং। ইসাদি স ১২৫৩ সাল তাং ১৫ আসাড় স্ব অক্ষর শ্রী গৌউরমোহন দাস সাং মিহিটিকারি প মন্ডলঘাট। এ পুস্তক পঠনার্থে শ্রী .. ক্রোম রাউত। সাং মিহিটিকারি স. মন্ডলঘাট ইতি।' পুরাতন খাতাটি কোলাঘাটের পশুপতি চক্রবর্তীর পরিবারের। খাতাটির সন্ধান দেন সিতাংশুশেখর চক্রবর্তী। পশুপতিবাবু জানান, এ তাঁদের কয়েক পুরুষের খাতা। এই খাতা দেখে সত্যনারায়ণের পাঁচালি পাঠ করা হয়। মুল পুথিও ছিল। পড়ার সুবিধার জন্য খাতায় লিখে নেওয়া হয়েছে। দুখুশ্যামের কাছ থেকে পাওয়া কাহিনিটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো সমগ্র কাহিনিটিকে এখানে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে রয়েছে আদি পর্ব। কৃষ্ণ ভক্ত মনোহর জঙ্গলে বারো বছর কৃষ্ণ ভজনা করে। ধার্মিক হলেও সে ডাকাতি করে। খড়ি পেতে জেনে যায় কে, কখন, কী নিয়ে যাচ্ছে। তার সাত ছেলে, এক মেয়ে রাহুতি। নারায়ণের অস্ত্রেই তার শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়। এরপর অন্তপর্বের প্রথম ভাগ। ধনপতি সদাগরের কাহিনি। ধনপতি পিরের সিন্নি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলে সত্যপির রুষ্ট হন। অবশেষে পিরের কথা মত সোনার আস্তানা ও গাই-বাছুর দিয়ে পুজা দিলে পির সন্তুষ্ট হন এবং বলেন, ধনপতি পুত্র মদনকেও আমার আস্তানায় আনতে হবে। 'নচেৎ কিন্তু ছারখার করিব যে মুই।'

অন্তপর্বের দ্বিতীয় ভাগ মদন দত্তের কাহিনি। বহু পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত মদন পৌছায় মনোহর ফাঁসুড়ার রাজ্যে। সরোবর পাশে এক গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করে। ফাঁসুড়ার সাত বধূ জল আনতে গিয়ে মদনকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি শ্বশুরকে জানায়। ফাঁসুড়া খড়ি পেতে জেনে যায় 'সাত মানিক আস্তানা নিয়ে মদন করেছে গমন।' সাত ছেলে ফাঁসুড়া আদেশ দেয়

দুখুশ্যামের গানে ঃ

মনে কি ভেবেছো প্রভু শ্বশুরের ডেরা।
আমার বাবার নামটি হয় মনোহর ফাঁসিড়া।।
আমার নাম গো রাহুতি ফাঁসিড়া কুমারী।
তোমার মাথা কাটবো আমি বামহাতে ছুরি।।

কবি শঙ্করের পুঁথিতে বর্ণনা ঃ

কেমনেতে দিব ছুবি এহার গলায়।
বিধাতা পাশন্ড বোড় দোশ দিব কায়।।
অভাগিকে জন্মাইল ফেশ্যারার ঘরে।

রাহুতির কাছে সব কিছু জানার পর মদন তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায়। প্রেম-জ্বরে নিমজ্জিত রাহুতি তখন মদনকে নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে পলায়ন করে। এদিকে মনোহর খড়ি পেতে গণনা করে সব জানতে পারে এবং সাত পুত্রকে পাঠায়। তুমুল যুদ্ধে রাহুতির হাতে সাতভাই মারা যায়। অবশেষে যুদ্ধ হয় পিতা মনোহরের সঙ্গে। মনোহরের মৃত্যু হয়।

হাত নাইকো বুড়া দেখো নাচিয়ে বেড়ায়।
কাটিয়ে যে বুড়ার মাথা জমিনে ফেলায়।।
মরিল ফাঁসিড়া বুড়া পড়িল জমিনে।
মদন বলে ওগো রামা বাঁচিলাম প্রাণে।।

অন্ত্যপর্ব তৃতীয় ভাগ। মদন-রাহুতির কাছে আর কোন বাধা রইল না। রাহুতি রান্নার আয়োজন করে। মদন বাজারে যায়। রূপবান মদনকে দেখে এক মালিনী মুগ্ধ হয়ে পড়ে এবং কৌশলে মালা পরিয়ে তাকে মেড়া করে রাখে। মদনকে হারিয়ে রাহুতি পুরুষের ছদ্মবেশে এক রাজার সৈন্য বিভাগে চাকরি নেয়। রাজ্যে গণ্ডারের হাত মুক্তি পাওয়ার জন্য রাহুতির উপর ভার পড়ে। গণ্ডার নিধনের পর রাজার ঘোষণা মত অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভ করে। অবশেষে রাহুতির ব্রত উদ্‌যাপন। মালিনীকে ধরে আনা এবং মেড়ার গলা থেকে মালা খুলে মদনকে ফিরে পাওয়া। অবশেষে রাহুতি ও রাজকন্যা সহ মদনের রাজ্যে ফেরা। সত্যনারায়ণের পূজা করা। আর উপরে কাঁটা, নীচে কাঁটা দিয়ে মালিনীর শাস্তি বিধান করা হল। পট দেখিয়ে এই গান গাওয়া হয়।

হরেন চিত্রকর ও দুখুশ্যাম চিত্রকরের ফাঁসুড়ার গীত পাশাপাশি রাখলে দেখা যাবে দুখুশ্যামের চারটি পর্ব্বের প্রথম দুটি পর্ব হরেন চিত্রকরের গীতে নেই। বিষ্ণুভক্ত মনোহর বারো বছর ধরে অরণ্যে তপস্যা করে বর লাভ করে এবং প্রাপ্ত ক্ষমতাকে অপপ্রয়োগ করতে থাকে। এই অংশটি এবং পরের অংশ ধনপতি উপখ্যানটি নেই। মদন দত্ত কেন আস্তানা আনতে গেল তার উত্তর কিন্তু হরেন চিত্রকরের গানে নেই। এ দিক থেকে দুখুশ্যামের গীত আরো বেশি সম্পূর্ণ।

'আরো বেশি সম্পূর্ণ' বলার কারণ শংকরের রচনায় দেখা যায়, রুদ্রনগরের রাজা উগ্রসেন এক ব্রাহ্মণের আদেশে সত্যনারায়ণের পূজার জন্য সওদাগর নিধু দত্তকে আস্তানা আনতে পাঠায়। নিধু দত্ত রাজি না হওয়ার কারাগারে বন্দী করা হয়। নিধু দত্তের ছেলে মদন দত্ত আস্তানা আনলে

রাজা সন্তুষ্ট হন। নিধু দত্তের মুক্তি ঘটে। সবাই সত্যনারায়ণের পূজার আয়োজন করে। এই হল প্রাপ্ত খাতার কাহিনি। শংকরের পুথিতে আব ার প্রথম অংশ নেই। আসলে, একটি পুরাতন কাহিনি নানাভাবে রূপ গ্রহণ করেছে। এবং সমস্ত রূপের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে মানবীয় আবেদন। প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে।

কাব্যের নায়িকা 'রাহুতি' বা 'রাউতি'। কবি শঙ্কর এবং কবি বল্লভ দাসের পুথিতে রয়েছে 'রাউতি'। পটুয়াদের গানে 'রাহুতি'। 'রাউত' শব্দের অভিধানিক অর্থ রাজপুত, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুতদের পদবী 'সেনাপতি'। 'রাহুত' শব্দের অর্থ রাজপুত ঘোড়সওয়ার। 'রাউত' বা 'রাহুত' শব্দের সঙ্গে 'ই' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গে শব্দটি হয়েছে 'রাউতি' বা 'রাহুতি'। আলোচ্য শব্দ দুটির অর্থ-অনুষঙ্গ রাজপুত বীর রমণীকে স্মরণ করায়। কাহিনিটি কোন রাজপুত লোককাহিনি থেকেও আসতে পারে। মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস-সংস্কৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বেশ কিছু রাজপুত পরিবার এ অঞ্চলে এসে ভুস্বামী হয়েছিলেন।

সামগ্রিক আলোচনায় দেখা যায় ললিতা, রূপতী, রাহুতি, মালতী, চম্পাবতী প্রমুখ চরিত্রে প্রেমের আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনিগুলি লোকসমাজে সৃষ্টি হয়েছে এবং মুখে মুখে প্রচারিত। কখনো ফকিরদের কণ্ঠে, কখনো পটুয়াদের গানে, কখনো লোকগল্পে বা লোকনাটকে। পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যযুগের কবিরা কোন কোন কাহিনির লিখিত রূপ দিয়েছেন। প্রতিটি কাহিনির বিবরণ সহজ সরল, তবে নাটকীয়তা রয়েছে। কাহিনিগুলি সৃষ্টির পর নানা পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজনের মধ্য দিয়ে রূপান্তর চলেছে। এসব বৈশিষ্ট্য গীতিকার। রাঢ়বঙ্গে এ ধরনের গীতিকার চল ছিল এবং এখনও আছে। এসব পালার সংগ্রহ এবং পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ জরুরি। কারণ, এসব গীতিকার বিচার-বিশ্লেষণ আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান।

২০০৮ সালের ২৯ এপ্রিল তারিখে আয়োজিত বিভাগীয় সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা।